ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা সমাজ ও রূপতত্ত্ব

অরুন্ধতী রায়

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা
সমাজ ও রূপতত্ত্ব

ডঃ অরুন্ধতী রায়

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র,
ত্রিপুরা সরকার

TRIPURAR UPAJATI LOKAKATHA SAMAJ O RUPATATWA
(Tribal Folktales of Tripura— Society and Structural Analysis)
By : Dr. Arundhati Roy M.A, B.Ed., Ph.D.

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা সমাজ ও রূপতত্ত্ব
ড. অরুন্ধতী রায়, এম. এ, বি. এড., পি. এইচ. ডি

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, ২০০০

প্রকাশক ঃ উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার

প্রচ্ছদ ঃ শুভাশিস তলাপাত্র

মুদ্রক ঃ প্রিন্ট বেস্ট, আগরতলা

অক্ষর বিন্যাস ঃ লেজার আর্ট, কলকাতা-৩৮

মূল্য ঃ ১৫০.০০

লেখিকার অন্যান্য বই

কবিতা ঃ
শব্দ ও বর্ণেরা
চিলেকোঠার জানালায় ফেরা পাখি
অনুবাদগ্রন্থ ঃ
অতিমানসচেতনার চিন্তাসঞ্চয়ন (ত্রিপুরা, বাংলাদেশ)

উৎসর্গ—

বাবা, মাকে

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
বিষয়	ঃ	ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা ঃ সমাজ ও রূপতত্ত্ব।	
মুখবন্ধ	ঃ	লোককথার সংজ্ঞা— আদিম মানবগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্য— রূপকথার সঙ্গে লোককথার সম্পর্ক, উভয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য— লোককথায় বস্তুনিষ্ঠতা ও কল্পনা— লোককাহিনী ও আদিম জাতিগোষ্ঠী— ত্রিপুরার উপজাতি গোষ্ঠী ও লোককথা— লোককথায় ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা ও রীতিনীতি— রূপকাশ্রিত আদিম জীবনকাহিনী, এর সামাজিক উপাদানসমূহ— আদিম কৃষি পদ্ধতি— জুমচাষ নির্ভর সমাজজীবন— লোকবিশ্বাস ও লোকপ্রথা— শুভ অশুভের দ্বন্দ্ব সংঘাত— ত্রিপুরার লোককথা রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।	১-৩৫
প্রথম অধ্যায়	ঃ	**ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার বৈশিষ্ট্য** ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার উৎস— উপজাতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীবিন্যাস— লোককথায় নিহিত সমাজ সংঘাতের কয়েকটি দিক— ত্রিপুরার লোককথায় টোটেম, মানা, ট্যাবু ইত্যাদি বিষয়— সামাজিক দ্বন্দ্ব, মিথস্ক্রিয়া ও সমন্বয়।	৩৬-৫৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	**ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার সঙ্গে দেশবিদেশের লোককথার সম্পর্ক।** ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার বিষয়গত বৈচিত্র্য— প্রাচীন ভারতীয় লোককথা, পৌরাণিক কাহিনী ও বৌদ্ধ জাতকের গল্পের সঙ্গে এর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য— বহির্ভারতীয় লোককথা ও ত্রিপুরার লোককথা।	৬০-৮৭

			পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	**ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা ও ঐতিহাসিক উপাদান** ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় নিহিত সমাজের জাতিগত ঐতিহাসিক উপাদান— শ্রুতি, স্মৃতি ও বিস্মৃতি— ত্রিপুরার লোককথায় অন্যান্য লোককথা ও লোকবিশ্বাসের প্রভাব।	৮৮-১২৬
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	**ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার শ্রেণীবিন্যাস।** পশুপাখির কাহিনী— নীতিকথা উর্বরাশক্তিমূলক কাহিনী— গোষ্ঠীগত কাহিনী— সাংসারিক কাহিনী— আদিম প্রথানির্ভর কাহিনী— নিষিদ্ধ জীবনচর্যা ও প্রতিবাদী সুর— নির্বোধের কাহিনী— ভৌতিক গালগল্প— হাস্যকৌতুক— নিরাধার কাহিনী।	১২৭-১৩৩
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	**ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার সামাজিক উপাদান ও তার দ্বান্দ্বিক সূত্র।** ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার মোটিফ— বিভিন্ন চরিত্র ও দ্বন্দ্বের স্বরূপ— কল্যাণ ও অকল্যাণের ধারণা— শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বময় ক্রমপরিণতি— ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার সামাজিক উপাদানের দ্বান্দ্বিক সূত্র।	১৩৪-১৪৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	**ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার রূপগত বৈশিষ্ট্য ও তার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।** ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীকরণ— কাহিনীর কাঠামোগত গতিপ্রবাহ— ক্রিয়াশীলতা— মোটিফ এবং বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ।	১৪৮-২৮৪
উপসংহার	ঃ		২৮৫-২৯৫
পরিশিষ্ট	ঃ	লোককথার সংক্ষিপ্তসার	২৯৬-২৯৯
আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী	ঃ		৩০০-৩০১

প্রাক্‌কথন

লোকসংস্কৃতি এখন আর গ্রামীণ জনগণের জীবন ও আচার-আচরণের অনুষঙ্গ নয়, সমগ্র মানুষের জীবনচর্যারই অঙ্গ। লোকসংস্কৃতির ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত লোকজীবনের সমগ্র জীবন-যাপনের এক তন্নিষ্ঠ চিত্র। এর মধ্যে একদিকে যেমন থাকে অতীতের স্মৃতি, অন্যদিকে থাকে সমকালের চিহ্ন ও ভবিষ্যতের জন্য কিছু সূত্র।

আধুনিককালে ঐতিহাসিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিসমূহের বিজ্ঞাননিষ্ঠ অনুশীলনের দ্বারা লোকসংস্কৃতির পঠনপাঠন বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ণের অবকাশ রাখে বলেই এখন লোকসংস্কৃতির অনুশীলন বা চর্চা আর ব্রাত্যজনের বিষয় নয়, বরং তা সমগ্র বিশ্বব্যাপী আধুনিকতম বিদ্যার প্রতীতি নিয়ে হয়ে উঠেছে পরম সমাদৃত। শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় এর পরিচিতি লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান বা folkloristics রূপে। এর চর্চায় তত্ত্ব ও পদ্ধতি দুইয়েরই সহায়তা একান্ত আবশ্যক বলে নান্দনিক রমনীয়তাকে ছুঁয়েও এটি হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানমন্যতার ধারক।

লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতিরই এক অনন্য উজ্জ্বল অংশ। লোকসাহিত্যের ভেতর দিয়ে লোকজীবন যত বিস্তৃত ও বিচিত্ররূপে ধরা পড়ে মনে হয়না আর অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব হয়। লোকমানসের প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, দুঃখ, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, বিরাগ, শ্রম, ক্লান্তি, ক্ষোভ, আরাম, বিলাস, আনন্দ — সব কিছুই বিভিন্ন চিহ্ন নিয়ে এতে ফুটে ওঠে।

লোকসাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা আজো অবগুণ্ঠিতা। বিক্ষিপ্তভাবে পত্র পত্রিকায় কিছু কিছু লোককথা ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিল। এখানকার লোককথার বিস্তৃত পঠন-পাঠন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণের দিকটি ছিল আরো বেশী অবহেলিত ও অনাবিষ্কৃত।

যার ফলে এই গবেষণাকার্যের জন্য ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণাধিকার কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৮০ সাল) 'ত্রিপুরার রূপকথা' নামক লোককথার সংকলনটি ছাড়া অন্য কোনো সংকলিত পুস্তক পাওয়া যায়নি।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা যে শুধু মনগড়া কল্পকাহিনীই নয়, এর মধ্যে যে বহমান রয়েছে অনাদিকাল থেকে বয়ে আসা মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও জীবনানন্দের ছবি, এর মধ্যে যে লুকিয়ে আছে অদৃশ্য জনমানস ও জনসমাজের ছবি এবং সর্বোপরি এই লোককথাগুলোর অবয়ব যে নির্মিত হয়েছে এক সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক নিয়মানুবর্তিতা মেনে এবং যার ফলে এর কাঠামোতে বা রূপনির্মিতিতে ধরা আছে বিশ্বজনীন এবং বিস্ময়োদ্রেককারী কিছু আঙ্কিক ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য — তার অনুসন্ধানই এই গবেষণাকার্যের উদ্দিষ্ট বিষয়।

এই অনুসন্ধানের জন্য উপরোল্লিখিত গ্রন্থটিতে সংকলিত লোককাহিনীগুলোকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। গবেষণাকার্যের একেবারে শেষ পর্যায়ে শ্রীকুমুদ কুন্ডু চৌধুরী কর্তৃক আরেকটি সংকলন পুস্তক 'কেরেং কথমা' (১) (১৯৯৪ সাল) প্রকাশিত হয়। ফলে সেই গ্রন্থখানি থেকেও সাহায্য নেয়া হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কাহিনীগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। যথাক্রমে চব্বিশটি লোককথার সমাজ ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হল। কাহিনীগুলো হল ঃ রক্তপিপাসু দেবতা, বানর বর, পুরোহিত, উইপোকা স্বামী, রাজহাঁসের কাহিনী, গুল্মকুমারী, কথা বলোনা, বিচার, মুরগীর পিঠে, কথা বলা আংটি, একফালি লাউয়ের গল্প, ধনেশপাখির গল্প, স্বর্গের ফুল রান্না, সজারুর বুদ্ধি, একটি মাছির গল্প, সব কালাদের এক ঘর, প্রতিজ্ঞা, ছাতিম গাছের কাহিনী, ছিপিংতুই মাইরুংতুই, অজগর সাপের গল্প, চাঁদের ছেলে, কাঞ্চনমালা, নাঐ পাখির গল্প ও বিগ্রাছা।

যেহেতু ত্রিপুরার প্রাচীন উপজাতি সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না, তাই লোককথাগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাসম্ভব যুক্তিগ্রাহ্য মীমাংসায় পৌছোনোর প্রয়াস রয়েছে। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরুপনের জন্য এই গবেষণানিবন্ধে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিগুলো যথাসম্ভব অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ স্টীথ টম্‌সন কৃত 'মোটিফ ইনডেক্স'— এর জন্য আশরাফ সিদ্দিকীকৃত 'লোকসাহিত্য' (২য় খণ্ড) বিশেষভাবে সহায়তাদান করেছে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ সিরাজুদ্দীন আহ্‌মেদের অধীনে দীর্ঘ দিন ধরে এই কাজটি করতে গিয়ে তাঁর কাছে যে সহৃদয় সহায়তা পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করার যোগ্যতা আমার নেই। আমার নানা সমস্যা, সঙ্কটে, বিপন্নতায় তিনি আমাকে নানাভাবে সাহস জুগিয়েছেন এবং সহযোগিতা প্রদান করেছেন। সমস্যা সমাধানের পথ বলে দিয়েছেন। তাঁর অকৃপণ সহায়তা ছাড়া আমার পক্ষে এ কাজ কোনদিন শেষ হতোনা বলে মনে করি। তীব্র অসুস্থতার মধ্যেও তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। তাছাড়া তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতী রাবেয়া খাতুনের নামও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনিও নানাভাবে অগ্রজার মতো আমার জন্য তাঁর সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় মহোদয় অকৃপণ উৎসাহ দিয়ে আমাকে এই কঠিন কাজে আরো গতিশীলতা এনে দিয়েছেন। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিনম্র নমস্কার জানাচ্ছি তাঁকে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ডঃ শিশির কুমার সিন্‌হা বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্‌বরক ভাষা বিশেষজ্ঞ শ্রীকুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী বিভিন্ন সভা সমিতিতে আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করেছেন, যার ফলে আমাকে সেভাবে প্রস্তুতি নিতে

হয়েছে। এই সমস্ত প্রশ্নাবলী আমাকে গবেষণার কাজে পরোক্ষে সাহায্যই করেছে। এছাড়াও সময়োচিত কিছু পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। তাঁর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি বিশেষভাবে ঋণী প্রয়াত কবি ও সাংবাদিক মহেন্দ্র দেববর্মার কাছে, যিনি বিভিন্ন সময়ে অসময়ে আমার জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করে এবং আমার সাফল্য কামনা করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

যাঁদের অকৃপণ সহায়তা আমি বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি, তাঁরা শ্রী নরেন্দ্র দেববর্মা (অধিকর্তা, আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র), শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা (পাবলিকেশন অফিসার), শ্রী গণেশ দেববর্মা, (গভর্নমেন্ট মিউজিক কলেজ, আগরতলা), শ্রী জহর আচার্য (বিশিষ্ট পুরাকীর্তি সংগ্রাহক ও গবেষক) ও ডঃ ননীগোপাল চক্রবর্তী।

অনুজপ্রতীম কল্যাণ গুপ্ত (সম্পাদক গোমতী; সাহিত্যপত্র, ত্রিপুরা সরকার) সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাকে সহায়তা দিয়ে রক্ষা করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানাতে পারিনা।

যাঁদের কাছে বিনম্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তাঁরা শ্রী ত্রিপুরেন্দ্র মোহন গাঙ্গুলী (প্রাক্তন অতিরিক্ত অধিকর্তা — শিল্পবিভাগ, ত্রিপুরা সরকার), শ্রীমতী শচীরানী দেববর্মা (খুমলুঙ), চন্দ্রকান্ত দেববর্মা (খেরুয়াপাড়া, কামালঘাট)।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় প্রখ্যাত আইনজীবি শ্রী শুভাশীষ তলাপাত্র প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যেও যেভাবে আমার দিকে সহৃদয়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাতে আমি সত্যিই অভিভূত।

ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সমীরণ রায় পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, আমি আন্তরিকভাবেই তার কাছে কৃতজ্ঞ।

বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন সকলের নিরন্তর অনুপ্রেরণা আমাকে অসহায়তা ও হতাশার মুহূর্তে আশার আলো দেখিয়েছে। আমার স্বামী ডাঃ প্রমথেশ রায়ের সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কন্যাদ্বয় উজ্জয়িনী ও সীমন্তিনী নিজেদের পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে দেশ-বিদেশের লোককথা পড়ে পড়ে ত্রিপুরার লোককথার সঙ্গে এদের তুলনামূলক দিকটি আমাকে বারবার দেখিয়ে দিয়েছে। বইয়ের প্রুফ্ সংশোধনের কাজেও ওরা আমাকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছে। এদের কাছে আমি ঋণী।

ত্রিপুরা ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট বইটি প্রকাশের দায়ভার গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। ট্রাইবেল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর শ্রী সন্তোষ কুমার সরকার এবং রিসার্চ অফিসার শ্রী রতনকৃষ্ণ আচার্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এদের আন্তরিক সহায়তায় এই গবেষণাপুস্তকটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

অন্তরালে থেকে যাঁরা বইটি ছাপার কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন, তাদেরকেও আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এরা ছাড়াও এই দুরূহ কাজে যাঁরা আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, সাফল্য কামনা করেছেন, সহায়তা দিয়েছেন নানাভাবে, তাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরার লোককথার সামাজিক ও রূপতাত্ত্বিক অনুশীলনের বিস্তৃতিতে এই গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু ছাত্র, গবেষক ও সুধীজনের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবেনা যে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার এমন বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ এর আগে হয়নি। সীমিতসাধ্যের ভেতর থেকে এই কাজটি করতে গিয়ে নানারকম অসম্পূর্ণতা ও ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও অনস্বীকার্য। সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। সহৃদয় সুধীজনের উপদেশ ও নির্দেশ সর্বান্তঃকরণে কামনা করছি।

— বিনীতা

রথযাত্রা
২৯শে আষাঢ়, ১৪০৬ আগরতলা।

অরুন্ধতী রায়
এম. এ., বি. এড., পি. এইচ. ডি.।

Flat No. B(R)16/3
Swaranika Cooperative Housing Society
Biren Roy Road (W)
Calcutta - 700 061

ভূমিকা

লোককথা বা ফোক্‌লোর কথাটির উৎপত্তি হয় ১৮৪৬ সালে ইংল্যাণ্ডে। কথাটির অর্থ হল লোকসাধারণের জ্ঞান বা সংক্ষেপে 'লোকজ্ঞান'। স্মরণাতীত কাল থেকে যেসব কাহিনী পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলে আসছে সেগুলোর রচয়িতা কে বা কারা তা জানা যায় না। একটি বিশেষ জনসমষ্টি যৌথ উত্তরাধিকার সূত্রে কাহিনীগুলোকে লালন করে আসছে। এগুলি মূলত মৌখিক সাহিত্য। এইসব লোককথাকে লোকসাহিত্যের আদিযুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়।

সমাজবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট শাখা হিসেবে লোককথা স্বীকৃতি পাবার পর ইয়োরোপে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং ভারতে বিংশ শতকে ব্যাপকভাবে এর সংগ্রহ, অধ্যয়ন ও আলোচনা শুরু হয়। ইয়োরোপের গবেষকরা লোককথার মধ্যে জাতীয় চেতনা, জাতীয় মানস, লোকমানস ইত্যাদি বিমূর্ত ধারণার অনুসন্ধান করতে থাকেন। এরপর লোককথার অধ্যয়ন শুরু হয় নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ভাষাতত্ত্বের গবেষণাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। জার্মানিতে ইয়াকব গ্রিম্ ও তাঁর ভাই ভিলহেল্‌ম্ এই দুই ধারার সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব হ্রাস পায়। আর একটি গবেষণা-ধারায় লোককথার মধ্যে ধর্মীয় চেতনার সন্ধান লক্ষ্য করা গেছে। ঊনবিংশ শতকেরই লোককথার মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীর বীজ অনুসন্ধানের একটি প্রয়াস শুরু হয়। এরপর গবেষকরা একটি নতুন তত্ত্বের নিরিখে লোককথার অধ্যয়ন করতে গিয়ে 'কাহিনীর ভ্রাম্যমানতা'-তত্ত্ব এবং কেউ কেউ আদিকালের এক জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে অন্য জনগোষ্ঠীর 'ঋণগ্রহণ'-এর তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। বিভিন্ন দেশের প্রাচীন লোককাহিনীগুলোর মধ্যে নানারকম বাহ্যিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনেকেই এই তত্ত্বটির ওপর বেশ গুরুত্ব দিলেন। কিন্তু এই পদ্ধতিটিরও অনেক ত্রুটি খুঁজে পাওয়া গেল। তবে এই তত্ত্বটির একটা বড়ো অবদান স্বীকার করতেই হয়। কাহিনীর 'ভ্রাম্যমান' তত্ত্ব বা 'ঋণগ্রহণ' তত্ত্ব এই সর্বপ্রথম গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বস্তুতান্ত্রিক করে তুলতে পেরেছে।

এরপর রুশদেশে ও ইংল্যাণ্ডে আর এক গবেষণা-ধারার পত্তন ঘটল। ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদরা এর নাম দিলেন 'নৃতাত্ত্বিক ধারা', আর রুশ গবেষকরা এর নাম দিলেন 'ঐতিহাসিক ধারা'। এঁরা বললেন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ ও আদানপ্রদানের ফলে এক দেশের লোককাহিনীর অন্য দেশে সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা থাকলেও একে 'ভ্রাম্যমান' বা 'কৃতঋণ' হিসেবে দেখা চলে না। মানবসভ্যতার বিকাশের আদিম যুগে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রায় একইরকম সাংস্কৃতিক ধারা অর্থাৎ একই ধাঁচের কাহিনী, বিশ্বাস, প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য জাতীয় সংস্কৃতির সাদৃশ্য কতটা

প্রত্যক্ষ, কতটা পরোক্ষ, কিংবা সাদৃশ্যের অনুপুঙ্খতা কতখানি তাও বিচার করা দরকার। এসব দিকে থেকে দেখলে এক-জনসংস্কৃতির ওপর অন্য জন-সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কিত তত্ত্বটি দাঁড়ায় না।

এরপর টাইলর, ল্যাঙ্গ এবং ফ্রেজার প্রমুখ গবেষকরা লোককথার গবেষণাকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁরা বললেন, প্রায় সবদেশেই মানবগোষ্ঠীর সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ার স্তরগুলি একই ধরনের। সেজন্যই তাদের কাহিনী, প্রথা, বিশ্বাস ও রীতিনীতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। যে-সব জনগোষ্ঠী আজও আদিম স্তরে পড়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রচলিত জীবন্ত বিশ্বাস, প্রথা এবং সংস্কারগুলোর বেশকিছু অবশেষ আজকের যুগের তথাকথিত সভ্য দেশের বহু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনো বজায় রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আজকের যুগের সভ্য জাতিগুলো সুদূর অতীতকালে ঐরকম আদিম স্তরে ছিল এবং সমাজবিকাশের নানা প্রক্রিয়া পার হয়ে সেইজাতিগুলো আজকের স্তরে এসে পৌঁছেছে। তবে এই তত্ত্বটিও ত্রুটিহীন নয়। কারণ, টাইলর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রাচীন যুগের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক 'অবশেষ' এর উপর এবং তার তত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল 'সর্বপ্রাণবাদ' অর্থাৎ বিশ্বের সব কিছুতে প্রাণ আছে এই বিশ্বাস। পরবর্তীকালে সর্বপ্রাণবাদ-এর উপর ভিত্তি করে আন্‌ড্রু ল্যাঙ্গ 'স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব' নামে একটি তত্ত্ব তুলে ধরেন। আদিম সমাজ বিকাশের এই তত্ত্বটি অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। তবে এর উপযোগিতাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। কারণ, ল্যাঙ্গ তথ্যসংগ্রহ ও সমাজবিকাশ-প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে লোককথা-গবেষণার ক্ষেত্রটি অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

এরপর জার্মানিতে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ভুন্‌দ্‌ নামক এক মনস্তত্ত্ববিদের নেতৃত্বে কয়েকজনের গবেষণা শুরু হয়। তাঁরা মানবমনের সমষ্টিগত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর জোর দিলেন। তাঁরা বললেন, লোককাহিনীগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে আদিম গোষ্ঠীমানুষের 'ইচ্ছাপুরণ'। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক ধারার গবেষকরা এই তত্ত্বকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, ধর্মীয় ধারণা, কাব্যময় কল্পনা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ইত্যাদির পিছনে আদিম মানবমনের কল্পনাপ্রবণতা, স্বপ্নাবিষ্টতা, ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে; কিন্তু শুধুমাত্র এই মনস্তত্ত্বের নিরিখেই সমাজবিকাশের সমগ্র ও বহুবিচিত্র প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এরপর জে. জি. ফ্রেজার তাঁর পূর্ববর্তী ল্যাঙ্গ -এর 'সর্বপ্রাণবাদ' কে গুরুত্ব দিলেনই। উপরন্তু তিনি আর একটি মতবাদ নিয়ে এলেন। তার নাম 'জাদু' বা 'ম্যাজিক'। তিনি বললেন, আদিম মানুষের জীবনে, চিন্তায় এবং কর্মের পিছনে রয়েছে জাদুমন্ত্র ও অনুষ্ঠানের ওপর বিশ্বাস। ফ্রেজারের এই তত্ত্বটি লোককাহিনীর অধ্যয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে এবং আজও পাচ্ছে।

১৯১৭ সালে রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সেখানকার নৃতত্ত্ববিদরা সুপরিকল্পিতভাবে জনগণের লোককথা সংগ্রহ ও অধ্যয়ন শুরু করেন। তাঁর বস্তুবাদী ও সামাজিক

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লোককথার বিচার করতে গিয়ে দেখলেন, যে-সব পশ্চাৎপদ জনসমষ্টির লিখিত ভাষা ও সাহিত্য নেই তাদের লোককথা-সম্পদ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সেই সম্পদকে কিভাবে তাদের মধ্যে নবচেতনার জাগরণ ঘটানোর কাজে লাগানো যায় তাঁরা সে কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন, লোককথার উৎস, চরিত্র ও সামাজিক ভূমিকা নির্ণয় ও তার মূল্যায়ন ছাড়া সেই কাজটি সম্ভব নয়। তাঁরা আরো দেখলেন, লোককথার মধ্যে রয়েছে একটি জনগোষ্ঠীর পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাণ্ডার। তাঁরা এই ভাণ্ডারকে দুটি ভাগে ভাগ করলেন। একটা হল অতীতের সঞ্চয় বা অবশেষ, এবং অপরটি হল প্রবহমান ধারা। পুরোনো কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নতুন নতুন উপাদান। ফলে কাহিনী লোকমুখে শাখাপ্রশাখা ছড়ায়, কল্পনার দ্বারা উন্মুক্ত হয়। ধীরে ধীরে কাহিনী বদলায়। তারপর লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার পর কিছু কিছু কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়। এই ব্যাপারটা লোককথার সব বিভাগেই ঘটে। সেই বিভাগগুলো হল পুরাণ কাহিনী, জাতির অতীত কাহিনী ও কিংবদন্তী, বীর কাহিনী, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, লোকগীত, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদি। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির গবেষকরা লোককথার মধ্যে লোকমানসের প্রতিফলনের দুটি পটভূমিকে বোঝার চেষ্টা করলেন। একটা হল কাহিনীর প্রবহমান প্রক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টি হল সমাজবিকাশের প্রক্রিয়া।

পল লাফার্গ তাঁর 'আদিম সংস্কৃতির ইতিহাস' বইটিতে এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনায় বললেন, লোককবিতা শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার স্বরূপের মধ্য থেকে উঠে আসে। এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত এবং সত্যনিষ্ঠ। তাই শুধু সাহিত্যের অধ্যয়নের জন্যই নয়, ইতিহাসের দিক থেকেও এইসব কবিতা-কাহিনী খুবই মূল্যবান। এর পর ম্যাক্সিম গোর্কি লোককথা অধ্যয়নের একটি সামগ্রিক কাঠামো উপস্থাপিত করে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিলেন। তিনি বললেন, আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থায় সঙ্ঘবজীবন ছিল খুব বড়ো জিনিস। তখন মানুষ শুধু সঙ্ঘশক্তির জোরে প্রকৃতি ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং বার বার জয়লাভ করেছে। লড়তে লড়তে তারা জয়ের কামনা করেছে, জীবনযাত্রার কষ্টলাঘবের স্বপ্ন দেখেছে। তারা এগিয়ে গেছে সুন্দর ভবিষ্যতের কল্পনাকে সম্বল করে। তাদের স্বপ্ন, সংগ্রাম, কামনা, অভিজ্ঞতাগুলো চেতনার রঙে রঙিন হয়ে লোককথার মধ্য দিয়ে বহুবিচিত্র ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেজন্য এইসব আদিম কাহিনীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাদের সঙ্ঘশক্তির প্রতি বিশ্বাস। সেই সঙ্ঘশক্তির প্রতিভূ হল গোষ্ঠীপতি। প্রাচীন কাহিনী এবং পরবর্তী বীরগাথা কিংবা মহাকাব্যে সেই মহাবীরেরা ছিল সমগ্র সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প ও শক্তির প্রতীক। এই জন্যই তারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, কখনো কখনো বিদ্রোহও করেছে। গোর্কির মতবাদকে অবলম্বন করে পরবর্তী গবেষকরা তাজিকিস্তানে প্রচলিত শিরিঁ-ফরহাদের প্রেমকাহিনীর ব্যাখ্যা করে বললেন যে শিরিঁ শেষপর্যন্ত ফরহাদের প্রেমকে স্বীকার

করতে রাজি হয় একটিমাত্র শর্তে। সেটা হল পাহাড়ের ওপার থেকে নদীর জলধারাকে এপারে প্রবাহিত করতে হবে। এই কাহিনীর মধ্যদিয়ে ব্যক্ত হয়েছে সেখানকার কৃষিজীবি মানুষের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত কামনা ও স্বপ্ন।

গোর্কি আরো বলেছিলেন, আদিম সমাজের যৌথচেতনা ও যৌথশক্তির ভাঙন ধরল, যখন সমাজটা শ্রেণীবিভক্ত হয়ে গেল। একটা শ্রেণী অন্যশ্রেণীর ওপর শোষণ অত্যাচার শুরু করল। তখন এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ সংগ্রামে লিপ্ত হল। শোষকশ্রেণী তাদের নগ্ন শোষণ প্রক্রিয়াকে ঢাকবার জন্য জনগণের ওপর নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস চাপিয়ে দিল। এতে করে জনগণের যৌথচেতনা ও যৌথশক্তির ওপর আস্থা কমে গেল ঠিকই, কিন্তু তাদের প্রতিবাদের রূপ গেল বদলে। এই প্রভুশ্রেণীকে ব্যঙ্গ করে জনমানসে রচিত হল বোকার গল্প, ভাঁড়ের মন্ত্রী-ঠকানো গল্প ইত্যাদি। মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কিংবা গোপাল ভাঁড়ের গল্প, গ্রীসের প্রমিথিউস, ইংল্যাণ্ডের 'ফাউস্ট', ইতালির 'পানচিনেলো', তুরস্কের কারাপেত্, রুশদেশের 'পেত্রুশ্কা' ইত্যাদি গল্পে স্থান পেয়েছে লোকবীরদের কথা। আমাদের দেশেও অনুরূপভাবে রাম-সীতা, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, দেবকীপুত্র বাসুদেব, হরপার্বতী, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা, জাতককাহিনী, বেতাল পঞ্চবিংশতি, সত্পুরুষদের কাহিনী, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদির গল্প সুপ্রাচীন কাল থেকে জনমানসে রচিত ও সঞ্চিত হয়েছে এবং পরবর্তী স্তরে গ্রামীণ কথকের গানের রূপ ধরে এইসব কাহিনী লোকরঞ্জনের উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরে এগুলি মহাকাব্য অথবা আখ্যানকাব্যের রূপ নিয়েছে। ভারতীয় লোককথার অধ্যয়ন করলে বৃহত্তর ভাবগত সংহতিসাধনে এগুলির একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। স্মরণাতীত কাল থেকে বহুভাষাভাষী ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের যে মিশ্রণ ও মিথষ্ক্রিয়া এখানে ঘটেছে, তা ফল্গুধারার মতো কাজ করে চলেছে। আজকের যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীর বিশেষ করে উপজাতি-লোককথার গবেষণা ও অধ্যয়ন আমাদের এক অনাবিষ্কৃত রত্নভাণ্ডারের সন্ধান দিচ্ছে। এবং আমাদের এই সত্যে উপনীত করেছে যে, যে-সব জনগোষ্ঠী অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ, তাদের লোককথা, লোকগাথা ইত্যাদি উপেক্ষার বিষয় নয়। সেগুলি তাদের নীরব অতীত ইতিহাসের স্মারক।

আদিবাসী বা উপজাতিদের লোককথার ভাণ্ডার অনুসন্ধানে গবেষকরা খুবই আগ্রহী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিম জাতিগোষ্ঠীর লোককথা নিয়ে গবেষণার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভারতেও কিছু কাজ হয়েছে। তবে তা যথেষ্ট অপ্রতুলই বলা চলে। বিশেষত উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির লোককথা-ভাণ্ডারের একটা বড়ো অংশ আজও অনাবিষ্কৃত। ভারতে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীগুলির সামাজিক অনুষ্ঠান, কৃষিভিত্তিক ও ঋতুভিত্তিক নৃত্যগীত, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি দিকগুলি নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নের ফলে উদ্ঘাটিত হয়েছে। উপজাতি লোককথার সমাজ-অধ্যয়নে নৃতত্ত্ব অনেকখানি সহায়ক ভূমিকা নিতে পেরেছে। এইসব লোককথায় বিশ্বসৃষ্টি ও মানবসৃষ্টি, দেবতা, ভূত-প্রেত-দৈত্য, পশুপাখি-

গাছপালা, জল-মাটি-আগুন, কৃষি, মৃত্যু-পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে যে-সব কাহিনী পাওয়া যায়, তার মূলগত বিষয়গুলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আদিম লোকপুরাণের কাহিনীবিন্যাস ছিল সহজ-সরল। কালের পরিবর্তন-ধারায় সেগুলি ক্রমশ জটিলতর হয়েছে। তবে এগুলির স্বরূপ-বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার এখনো অভাব রয়েছে। তবে এ পর্যন্ত গবেষণায় একটা জিনিস সুস্পষ্ট হয়েছে, যে আদিবাসী বা উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলি তাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং অতীত গৌরব সম্পর্কে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করে। তাদের লোককথা-বিচারের সময় এগুলোর বাহ্যিক বিষয়গুলোকেই সবকিছু বলে মনে করা সঙ্গত নয়। যেতে হবে আরো গভীরে। তাহলে খুঁজে পাওয়া যাবে কাহিনীর অন্তর্নিহিত সংগ্রামী প্রাণবস্তুকে। দেখা যাবে, নতুন যুগের উপযোগী চেতনার বিকাশের মধ্যদিয়ে আদিবাসী জীবনের সংগ্রাম কিভাবে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

লোককথা অধ্যয়নে এই সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি আর একটি আলোড়নকারী পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটেছে, সেটা হল রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। ১৯২৮ সালে রুশ লোকসংস্কৃতিবিদ ভ্লাদিমির জে. প্রপ্ এই পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটান। তিনি বললেন, লোককথা-অধ্যয়নে নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব নির্ভর বিশ্লেষণ পদ্ধতির অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে, তবে তাঁর পূর্বসূরীদের সেই পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অভাব ছিল। প্রপ্ সেই অভাব পূরণের জন্য তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিলেন। প্রথমত, লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র উপাদানগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে সাজানো; দ্বিতীয়ত সেগুলির যথার্থ শ্রেণীকরণ করা এবং তৃতীয়ত শ্রেণীকরণের সময় শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর ওপরই নয়, কাহিনীর মৌলিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য লোককথার অন্তর্নিহিত ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করা।

ভ্লাদিমির প্রপ্ এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। তবে এর আগেই অ্যান্টি আর্নে এবং স্টিথ টমসন যে টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, তা তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে যথেষ্টভাবে পুষ্ট করতে সমর্থ হয়। প্রপ্ দেখালেন, কাহিনীগুলো স্থানান্তরিত হবার সময় লোককথার নানা রূপান্তর হয় এবং তার বিষয়ের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু তার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকে। কাহিনীর পরিবর্তন শক্তির তিনি নাম দিলেন 'ভেরিয়েব্‌ল্' বা 'চলক' এবং অপরিবর্তনীয় শক্তিকে বললেন 'কন্‌স্ট্যান্ট্' বা 'ধ্রুবক'। তিনি ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে দেখালেন যে, বিশেষ বিশেষ ভাষায় বাক্যের ভেতর কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার যেরকম একটা ক্রম থাকে, ঠিক তেমনি লোককথার কাহিনীর মধ্যেও কোন্ মোটিফের পর কোন্ মোটিফ আসবে তার একটি বিশেষ রীতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি মোটিফের এই ক্রমকে বললেন 'সিনট্যাগ্‌টিক মডেল' বা 'বাক্‌প্রবাহক্রমিক ছাঁচ'।

প্রপ্ আরো বললেন, লোককথা বিশ্লেষণের জন্য কাহিনীর মৌল চরিত্রকে জানতে হবে। কাহিনীকে বিশ্লেষণ করে তিনি মোট চারটি ক্রিয়াশীলতা খুঁজে পান। তবে সব কাহিনীতেই কিন্তু চারটি ক্রিয়াশীলতা নাও থাকতে পারে অবশ্য। ক্রিয়াশীলতার ধারা বা ক্রমপ্রবাহ সব লোককথাতেই একইরকম সংগতিপূর্ণ থাকে। তাঁর মতে, এই ক্রিয়াশীলতার ওপর ভিত্তি করেই লোককথার যুক্তিসংগত শ্রেণীকরণ সম্ভব। এই চারটি ক্রিয়াশীলতা প্রাথমিক, কারণ কাহিনীকে এরাই গতিশীল করে তোলে।

প্রপ্ কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের ক্রিয়াশীলতাকে মোট ৩১টি ভাগে ভাগ করে কাহিনীর প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, প্রতিটি গল্পেই এই প্রাথমিক অবস্থা থাকতেই হবে। যেমন — নায়কের পরিচয়, তার সামাজিক স্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে ধাপে ধাপে ক্রিয়াশীলতাগুলো আসবে।

এরপর ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ ক্লদ লেভি স্ট্রস তাঁর 'স্ট্রাকচারাল অ্যানথ্রোপলজি' (১ম খন্ড — ১৯৬১, ২য় খন্ড — ১৯৭৬) গ্রন্থে লোককথার রূপতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, আগে লোকে ভাবত আদিবাসী বা উপজাতি লোককথা হল বর্বর, অসভ্য ও বুদ্ধিহীন মানুষের সৃষ্টি। একথা সত্য নয়। বরং সেই অদিম কালে যাঁরা এমন অপরূপ লোককথা সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁরা খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। পৌরাণিক লোককথা এবং তার ভেতরের রূপতাত্ত্বিক কাঠামো — এসবই আদিম মানুষের সচেতন সৃষ্টি। প্রপ্ এর মতো লেভি স্ট্রসও মোটিফ ইনডেক্সের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এক নতুন পদ্ধতি তুলে ধরেন। তার নাম 'প্যারাডাইমেটিক অ্যানালিসিস' বা 'পদপ্রকরণজাত বিশ্লেষণ'। তিনি লোকসাহিত্যের সমস্ত রকম উপাদানের মধ্যে 'বাইনারি অপোজিশন' বা 'যুগ্ম বৈপরীত্যে'র অস্তিত্বকে আবিষ্কার করেন। তিনি তাঁর এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে মানুষের মনের চিন্তাভাবনাকে অনুধাবন করে দেখিয়েছেন যে, আদিম মানব মনের সঙ্গে আধুনিক মানব মনের খুব বেশি পার্থক্য নেই।

এর পর বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী নোআম চমস্কি-র 'সঞ্জননী ব্যাকরণ' বা 'জেনারেটিভ গ্রামার' পদ্ধতি প্রয়োগ করে কেউ কেউ লোককথা বিশ্লেষণে আগ্রহ দেখান। কিন্তু এই পদ্ধতি তেমন কার্যকর হয়নি। লেভি স্ট্রসের পদ্ধতি অনুসরণ করে এরপর এলি কংগাস্ মারান্ডা ও তাঁর স্ত্রী পিয়েরে মারান্ডা — দুজনে মিলে আরো কিছু পদ্ধতি যোগ করেন। এরপর অ্যালান ডানডেস্ তাঁর পূর্বসূরী ভ্লাদিমির প্রপ্-এর তত্ত্বের সঙ্গে আরো কিছু নতুন সূত্র যোগ করেন। তিনি 'অভাববোধ' এবং 'অভাববোধ দূরকরার ইচ্ছা ও চেষ্টা' অর্থাৎ 'ল্যাক' এবং 'লিকুইডেশন অব ল্যাক' নামক পদ্ধতির সাহায্যে উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের লোককথা বিশ্লেষণ করে এর উপযোগিতা সপ্রমাণ করেন।

এইভাবে লোককথা বিশ্লেষণের জন্য যে টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স্ তৈরি হয়েছে, লোকসমাজ -মনের গতিপ্রকৃতিকে বুঝতে এ পর্যন্ত সেটাই সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সব রকম লোককথার ভেতরই কী উপাদানের দিক থেকে, কী ঘটনার দিক থেকে এবং কী চরিত্রের দিক থেকে একটা দ্বান্দ্বিক বিকাশের সূত্র লক্ষ্য করা যায়। কখনো সেটা প্রত্যক্ষ, কখনো বা পরোক্ষ কিংবা রূপকাশ্রয়ী। বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে যেখানে সামাজিক মানসিকতা মানিয়ে নিতে পারেনি বা কম পেরেছে সেটা বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। যেখানে বেশি মানিয়ে নিতে পেরেছে সেটা হয়েছে পরোক্ষ। আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থা যত এগিয়েছে, ততই সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। এই সংঘাতের প্রকাশ কোথাও পরোক্ষ, কোথাও বা রূপকধর্মী। ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক শোষণ যত বেড়েছে, ততই লোককথার চরিত্রের বদল ঘটেছে। সেজন্য লোককথা বিশ্লেষণ এর দ্বান্দ্বিক বিন্যাসের সূত্রসন্ধান জরুরি হয়ে পড়ে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ। এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি বৈচিত্র্যময়। এদের আছে নানা ট্যাবু, নানা টোটেম। এদের আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা, সংস্কারও বহু ধরনের। এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোককথার ভান্ডার সমৃদ্ধ এবং প্রায় অনাবিষ্কৃত। লোককথার সংগ্রহও সন্তোষজনক স্তরে পৌঁছয়নি। সারা পৃথিবীর লোককথার উপাদানের সঙ্গে এই অঞ্চলের উপাদানের যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তেমনি বৈসাদৃশ্যও আছে। সাপ এই অঞ্চলের বিশেষ একটি টোটেম। এছাড়া অন্যান্য পশুপাখিও আছে, যাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এদের কেউ কেউ এই অঞ্চলের লোককথার নায়ক। এইসব লোককথায় আধুনিকীকরণের স্পর্শ খুবই কম। অনেক ক্ষেত্রেই এখানে রয়েছে অতীত যুগের বৈশিষ্ট্য। তার রূপান্তর ঘটলেও মূল কাঠামো আজও অক্ষত।

এই সমগ্র অঞ্চলের জীবনজীবিকা ও জীবনধারার সঙ্গে প্রকৃতি, মাটি, পাহাড়, নদী, পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি জড়িয়ে আছে। প্রাচীর যাযাবরবৃত্তি আজও এখানে বর্তমান। পশু শিকার, আদিম জুম চাষ নির্ভর কৃষি অর্থনীতি এখানকার সমস্ত উপজাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রাণবস্তু। সেজন্য এই অঞ্চলের লোককথা আজও যেন অনাঘ্রাত সতেজ ও টাটকা বনফুলের সুরভি ও সৌন্দর্য ছড়ায়। ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা তারই এক গৌরবোজ্জ্বল গুচ্ছ।

ড. অরুন্ধতী রায় তাঁর 'ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা ঃ সমাজ ও রূপতত্ত্ব' নামক গবেষণা-গ্রন্থে সাধারণভাবে লোককথার প্রাচীন ঐতিহ্য, এগুলির অধ্যয়নে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং উপজাতি লোককথা-গবেষণায় এগুলির উপযোগিতা নির্ণয় করেছেন। এছাড়া এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার একটি বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নেরও তিনি প্রয়াস পেয়েছেন। ত্রিপুরার লোককথার ওপর ভিত্তি করে তিনি এখানকার উপজাতি জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংঘাত, লোককথার সঙ্গে দেশবিদেশের লোককথার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, প্রাচীন ভারতীয় লোককথা, পৌরাণিক কাহিনী, জাতককাহিনী ইত্যাদির সম্পর্ক,

এগুলির ইতিহাসগত উপাদান, এর সামাজিক উপাদানের দ্বান্দ্বিক সূত্র নির্ণয় — ইত্যাদি সম্যক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। ড. অরুন্ধতী রায়ের আগে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা নিয়ে এমন মূল্যবান গবেষণা নির্ভর অধ্যয়ন আর কেউ করেননি। তিনি এখানে পথিকৃতের মর্যাদালাভের অধিকারী।

এই গবেষণা গ্রন্থের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হল ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীকরণ, এবং কাহিনীগুলির কাঠামোগত গতিপ্রবাহ নির্ধারণ, ক্রিয়াশীলতা, মোটিফ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি অত্যাধুনিক রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলির ফলিত রূপের উদঘাটন। ড. শ্রীমতী রায় এই রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অ্যান্টি আর্নে, স্টিথ টমসন, ভ্লাদিমির জে. প্রপ্, লেভি স্ট্রস, নোআম চম্স্কি, উইলিয়াম হেনড্রিক্স্, মারান্ডা দম্পতি, অ্যালান ডান্ডিস্ প্রমুখ পন্ডিতদের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার কাহিনীর গাণিতিক বিন্যাস, মোটিফ, ক্রিয়াশীলতা সার্থকভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন। এই অধ্যয়ন ড. অরুন্ধতী রায়ের সুদীর্ঘ শ্রমসাধ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফসল। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার তত্ত্বাবধানে এই দুরূহ গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে এবং শ্রীমতী রায় এজন্য ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। এজন্য সমস্ত গৌরব ড. রায়েরই প্রাপ্য।

শুধুমাত্র ত্রিপুরার লোককথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ সমগ্র ভারতের লোককথা গবেষণার ক্ষেত্রেও ড. অরুন্ধতী রায়ের এই অমূল্য গবেষণা-গ্রন্থটি এক অসাধারণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং পরবর্তী গবেষণায় এক নবদিগন্তের সূচনা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৯৯
আগরতলা

সিরাজুদ্দীন আমেদ
ডীন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

লোককথার সংজ্ঞা

লোককথাকে লোকসাহিত্যের অন্যতম এবং এক অনন্য শাখা হিসেবেই গণ্য করা হয়। মৌখিক ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, লোককথা।

সমগ্র পৃথিবী জুড়েই মানুষের মুখেমুখে অনাদিকালের উৎস থেকে যুগান্তরে বয়ে চলেছে যে বিভিন্ন সাহিত্যিক আবেদনযুক্ত গল্পকাহিনীর ধারা, তাকেই সাধারণতঃ বাংলায় 'লোককথা' বলা হয়, যার ইংরাজী সমার্থক শব্দ Folktale ।

লোককথা লোকসাহিত্যেরই একটি অঙ্গ। যখন আদিম মানব লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখেনি, তারও অনেক অনেক আগে লোককথার উদ্ভব হয়েছিল। আদিকালে এক একটি মানবগোষ্ঠী যখন সর্বজনবোধ্য একটি সরল ভাষার অধিকারী হল, তখন তাদের মুখে মুখে নানা ধরণের গল্পগাথা রচিত হল। অবশ্য তারও অনেক আগে, এই গল্পগাথা বা কাহিনীগুলো মৌখিকভাবে প্রকাশিত হবার আগে রেখাচিত্রের মাধ্যমে গুহার দেওয়ালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই চিত্রগুলোকে আমরা পরবর্তীকালের মৌখিকভাবে প্রকাশিত কাহিনীর ভাব প্রকাশক প্রতীকরূপেই ধরে নিতে পারি। পরবর্তীকালে মানুষ যখন মনের ভাব মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হল, তখনই মৌখিকভাবে লোককথা সঞ্চারিত হল এক থেকে অন্যে।

যে কাহিনীর প্রণেতা কে তা কেউ জানেনা, যা লোকের মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত, যার মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবন, পরিবেশ ও স্বপ্ন প্রতিবিম্বিত তা-ই এক অর্থে লোককথা। (১) এই কাহিনীগুলোতে ভাবরস, বস্তুরস বা সাহিত্যরস যতই থাকুক না কেন, তা হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও অযত্নপ্রয়াসে উদ্ভূত। বস্তুতঃ লোকসমাজেই লোককথার জন্ম হয়ে থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ মানুষেরই এক চিত্ররূপ, লোককথা।

"লোককথার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রুতিপরম্পরায় যে সকল বিষয়বস্তু চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ইহার উপকরণ.....একটি মৌলিক বা জনশ্রুতিমূলক ধারা অনুসরণ করিয়া লোককথা সমাজের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। কতকগুলি অপ্রচলিত ও আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব উপকরণ ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইলেও, ইহাদের একটি অন্তর্নিহিত সর্বজনীন আবেদন থাকে, তাহা দ্বারাই ইহারা কালজয়ী হইয়া অমরত্ব লাভ করে।" (২)

কখনো কখনো কল্পনার রঙ মিশিয়ে বাস্তব ঘটনার চিত্র যেমন আঁকা হয়, তেমনি কখনো কখনো শুধুই কল্পনার রথে চড়েও লোককথার সৃষ্টি হয়। লোকমুখে ঘুরে ঘুরে এই সমস্ত লোককাহিনী চিরস্থায়ী আসন পেতে নেয়, এক একটি জাতিগোষ্ঠীর জীবনে। যুগের পর যুগ ধরে এবং দেশভেদে মানুষের নিজস্ব ভাবনা, ধারণা ও কল্পনাকে ধারণ করে লোককথার যাত্রা আজও অপ্রতিহত হয়ে রয়েছে।

লোককথাকে কখনোই ব্যক্তিবিশেষের রচনার পর্যায়ে ধরা যায় না। এমনকি দেশকালের সীমাতেও বাঁধা যায় না। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, প্রারম্ভিকভাবে লোককথা ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি হলেও, একদিকে যেমন তাতে গোষ্ঠীজীবন বা সমাজজীবনমানস প্রতিফলিত হয়, অন্যদিকে তেমনি 'সঞ্চরণশীলতা' লোককথার একটি অনিবার্য শর্ত হওয়ার দরুণ তাতে নানাভাবেই পরিবর্তন-পরিবর্ধন-এর সম্ভাবনা থেকে যায়। যার জন্য দায়ী করা যেতে পারে 'লোককথাবলিয়ে' বিভিন্ন কথককে। কারণ, লোকমুখে কাহিনী যখন দেশ থেকে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এতে ছোটখাটো সংযোজন-বিয়োজন ঘটে যায়। প্রাচীন সংহত লোকসমাজের বিশ্বজনীন অভিব্যক্তির রূপটিই প্রকাশিত হয় 'লোককথা'-র ভেতর দিয়ে।

লোককথার সংজ্ঞা হিসেবে এই উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। ".....Prose narratives that are regarded as fiction are called folktales. They usually recount the adventures of animals or humans, but ogres and even deities may appear in them. A variety of subtypes may be distinguished including drolls or noodles, trickster tales, tall tales, dilema tales, formulistic tales and moral tales or fables. Folktales are known as Märchen in German. They have been known as fairy tales in English, but this is inappropriate both because fairies seldom appear in folktales and because narratives about fairies are usually regarded as true.

The distinction here between truth and fiction refers only to the beliefs of those who tell and hear these tales and not to our belief, to historical or scientific fact, or to any ultimate judgement of truth and falsehood. In diffusing from one society to another, a myth or legend may be accepted without being believed, thus becoming a folktale, in the borrowing society."

(International Encyclopedia of Social Sciences, vol. 5 and 6)

লোককথা সহজ সরল গদ্যের মাধ্যমেই বিস্তারলাভ করে। কাহিনীর কাঠামো বা বর্ণনা উভয়ক্ষেত্রেই সমস্তরকম জটিলতা পরিহার করে একটি স্বচ্ছন্দগতিতে কাহিনীর স্বচ্ছন্দ ধারাটি বয়ে চলে। (৩) এটি একটি সজীব শিল্প বা Living Art। (৪)

লোককথাকে আদিমানবের উত্তরাধিকার হিসেবেই অভিহিত করা চলে। 'লোককথার' উৎস সম্পর্কে এরকম ভেবে নেওয়া যেতে পারে যে, আদিতে একটি কথা ব্যক্তিবিশেষের মন থেকে জাত, যা তাঁর কল্পনার অথবা দৈনন্দিন জীবনের স্মৃতিবাহী। পরবর্তী সময়ে শ্রুতিমাধ্যমে অন্য শ্রোতার কাছে তা পৌঁছুলে পর কোনোও অসম্পূর্ণতা থাকলে তা দূর করে নতুনরূপে পুনর্গঠিত হবার সুযোগ পায় এবং এভাবেই একটি 'কথা' বা কাহিনী সৃষ্টি হবার সময় যে রূপে থাকে, পরবর্তী সময়ে ঠিক সেই রূপে থাকে না। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, একটি

কাহিনীর মধ্যে পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো কাহিনীর অংশবিশেষ বা কখনো অন্য একটি পূর্ণ কাহিনীই অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। অথবা এমনও হতে পারে যে, প্রথমোক্ত কাহিনীটিই অন্য কোনো কাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। এর ফলে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হ'তে হ'তে কোনো কাহিনী অনেক বেশী প্রচার লাভ করতে পারে যেমন, তেমনই লুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে।

এই অতি প্রচলন বা বর্জন দুটোই নির্ভর করে লোকসমাজ বা গোষ্ঠীর ভালো লাগা বা না লাগার উপর। কাহিনীটির আকর্ষক গুণটিই এক্ষেত্রে প্রধান উপজীব্য।

লোককথায় যেমন মানুষ পশুপাখি ইত্যাদিকে ঘিরে জীবনকাহিনী দেখা যায়, তেমনই অন্যদিকে মানুষের বাস্তববোধ, সৌন্দর্যবোধ, আবেগ আকাঙ্ক্ষা, কর্মকৌশল, মনন, কল্পনারও অবকাশ থাকে। এককথায় বলা চলে মানুষের সামাজিক মনটি এতে ধরা পড়ে। তার অবচেতন ও অচেতন মনের ক্রিয়াও ধরা পড়ে লোককথায়। এভাবেই দৈনন্দিন জীবনের কর্মময়তার মাঝেও মানুষের অন্তরে যে নান্দনিক নির্যাস থাকে, তা দিয়েই পুষ্ট হয়ে ওঠে লোককথার উপাদানগুলো।

লোককথায় বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের পরিবেশ, বিশেষ জীবনধারণ প্রকৃতি, জীবিকা প্রণালী, জীবন ও জীবিকার উপকরণ সবই প্রকাশিত হয়, যা প্রকৃতপক্ষেই এক সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে। এছাড়াও পার্থিব-অপার্থিব বস্তুসমূহ, ধর্মীয় আচার, সংস্কার, বিশ্বাস, নৃত্যগীত, শিল্পভাবনা, বোধবুদ্ধি, আমোদ-প্রমোদের চিত্রও বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়। সহজভাবে বলা যায়, একটি লৌকিকরূপের উদ্ঘাটন হয় লোককথার মাধ্যমে।

লোককথার মধ্যে যুগ থেকে যুগান্তে সঞ্চরনশীলতার লক্ষণ যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান, তেমনি শ্রুতিধর্মও একান্ত অনিবার্য শর্ত। ভাষার অকৃত্রিম সারল্যও লোককথার অন্যতম উপাদান। লোককথার মধ্যে নীতিকথা বা উপদেশ প্রচ্ছন্ন থাকলেও, তা কখনোই কাহিনীকে ছাপিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় না। আদি ও অকৃত্রিম গল্পকথনের মধ্যে সুপ্ত থাকে 'গল্পের জন্য গল্পকথন' ভাবনাটি। লোককথায় ব্যক্তিমানসের উদ্দেশ্যটি অনুপস্থিত থাকে।

লোককথার ক্ষেত্রে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কাহিনীগুলোর ভেতর দিয়ে যে কতগুলো ঘটনাই শুধু বর্ণিত হয় তা নয়, মানসিক চর্চা ও বুদ্ধির চর্চায় অগ্রসরমান সমাজের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলোতে রূপক ও সঙ্কেতের সাহায্যে মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতার নানা পরিচয়ও প্রকাশিত হয় (৫)।

আধুনিককালে পৃথিবীর লোককথা বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক অধ্যাপক স্টিথ্ টমসন লোককথা বিষয়ে সর্বপ্রথম একটি নীতির প্রবর্তন করেন, তা-ই Aarne Thompson প্রবর্তিত Index of Tale Types বলে পরিচিত (৬)। Type অনুযায়ী লোককথাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, পশুপাখির কাহিনী (Animal Tales) - এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে বন্যপশু ও গৃহপালিত পশু, মানুষ ও বন্য পশু; গৃহপালিত পশুপাখি ও

অন্যান্য পশুপাখির কাহিনী। দ্বিতীয় বিভাগটির নাম সাধারণ লোককথা, যার অন্তর্ভুক্ত হল দৈব বিড়ম্বনা, দৈব অথবা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন স্ত্রী বা স্বামী কিংবা অন্য আত্মীয়, অলৌকিক কর্তব্য পালন, দৈব সহায়ক, ঐন্দ্রজালিক বস্তু, অলৌকিক শক্তি বা অলৌকিক জ্ঞান, বিবিধ অলৌকিক কাহিনী, ধর্মীয় কাহিনী, রোমান্টিক কাহিনী, বুদ্ধিহীন রাক্ষসের কাহিনী ইত্যাদি। তৃতীয় বিভাগটিতে হাস্যরসাত্মক বা অন্যান্য ছোটখাট কাহিনীর স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন, বোকার গল্প, দাম্পত্যজীবনের গল্প, নারী-পুরুষ বিষয়ক গল্প, সমস্যামূলক গল্প ও অন্যান্য গল্প।

এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা সত্ত্বেও একেকটি লোককথার মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রেরও Type বা আদর্শ থাকার জন্য অনেক লোককথাকেই স্বাধীনভাবে কোনও Type - এর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়না বলে অধ্যাপক স্টীথ টমসন motif বা অভিপ্রায় অনুযায়ী লোককথার শ্রেণীবিভাগ করেন। এর ফলে লোককথাকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা হয়।

(১)	পৌরাণিক লোককথা	(Myths)
(২)	পশুপাখির কাহিনী	(Animal Tales)
(৩)	নিষেধাজ্ঞামূলক কাহিনী	(Taboo Tales)
(৪)	ঐন্দ্রজালিক কাহিনী	(Magic Tales)
(৫)	প্রেতলোক বা ভৌতিক কাহিনী	(The Dead)
(৬)	বিস্ময়মূলক কাহিনী	(Marvels)
(৭)	রাক্ষস সম্পর্কিত কাহিনী	(Ogres)
(৮)	পরীক্ষা	(Tests)
(৯)	পণ্ডিত ও মূর্খের কাহিনী	(Tales of the Wise and the foolish)
(১০)	প্রতারণামূলক কাহিনী	(Deception)
(১১)	ভাগ্যবিপর্যয়মূলক কাহিনী	(Reversal of Fortune)
(১২)	সুযোগ ও ভাগ্য	(Chance and Fate)
(১৩)	সমাজ	(Society)
(১৪)	পুরষ্কার ও শাস্তি	(Rewards and Punishments)
(১৫)	বন্দী ও পলাতক	(Captives and Fugitives)
(১৬)	পাশবিক নিষ্ঠুরতামূলক	(Unnatural Cruelty)
(১৭)	ধর্মমূলক কাহিনী	(Religion)
(১৮)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	(Traits and Character)
(১৯)	হাস্যরসাত্মক কাহিনী	(Humorous Tales)
(২০)	বিবিধ অভিপ্রায়মূলক	(Miscellaneous Groups of motifs)

এই শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত ব্যাপক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জীবন ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত বলে এটিই আজ সর্বত্র গৃহীত হয়ে থাকে (৭)। এছাড়াও লোককথায় প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব সংস্কার অনুযায়ী এক একটি অভিপ্রায় গুরুত্ব লাভ করে থাকে (৮)।

সামগ্রিকভাবে লোককথায় মাটি-আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-নরক, ইহলোক-পরলোক, জীবন-মৃত্যু সবই খুব কাছাকাছি। একটি থেকে অন্যটিতে যাতায়াতের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত। প্রয়োজনবোধে চলে গেলেই হ'ল। কেন যাওয়া হ'ল বা কিভাবে যাওয়া হ'ল এসব প্রশ্নেরও কোনো অবকাশ থাকে না, লোককথার 'প্রয়োজন'-ই এইসব অসাধ্যসাধনে তৎপর হয়।

এছাড়াও "পশু-পাখি, রাক্ষস, ডাইনী, দ্রব্য, প্রেত, দেবতা, ঈশ্বর, জিন, পরী, দানব, প্রকৃতি, বৃক্ষ, মেঘ, রৌদ্র, দেবদূত, যমদূত, সুর, অসুর সবাই এখানে অংশগ্রহণ করে। নদী, সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য, তারকা ইত্যাদিরও একটি ভূমিকা লোককাহিনীতে সুপরিজ্ঞাত। লোককথায় পশুপাখি মানুষের মত আচরণ করে এবং কথা বলে, জড় পদার্থও গতিশীল এবং বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। অসম্ভব বলে কোনো কাজ লোককথায় নেই। লোককাহিনীর জগত যেমন বিচিত্র তেমনি দিগন্ত বিস্তৃত। এ যেন নিজেই একটি নিজস্ব বিশ্ব' (৯)।

আদিম মানবগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্য ঃ

বর্তমানে আমরা লোককথার যে রূপটির সঙ্গে বহু পরিচিত তা তার লিখিত রূপ। লিখিত রূপটি সৃষ্টির বহু পূর্বেই মৌখিক রূপটির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সে সময়ে এর আকার বা প্রকার কি ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। গ্রামাঞ্চলে এখনো লোকপরম্পরায় লোককথা প্রচলিত আছে বহুল পরিমানে। অন্যদিকে শহুরে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষের কাছে যে "কথা" গুলো প্রচলিত, তা অধিকাংশই এসেছে লিখিতরূপের মাধ্যমে।

আদিম মানবগোষ্ঠীর মৌখিক ঐতিহ্যের প্রতিরূপ লোককথা — এই ধারণাটিই বর্তমান সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

আদিম মানবগোষ্ঠীর কাছে ভাষা প্রকাশের কোনো লিখিত মাধ্যম যখন ছিল না, তখন মুখে মুখে লোককথা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই মৌখিক সাহিত্যেই ধরা থাকতো তৎকালীন সাধারণ মানুষের জীবন ও স্বপ্নের ছবি। ফুটে উঠতো তার ইচ্ছাপূরণের বিভিন্ন চিত্র। অসম্ভব কার্যাবলীও ইচ্ছা ও কল্পনার সাহায্যে সেই মানবগোষ্ঠীর 'কথা' বা 'কাহিনী' — তে সম্ভবে পরিণত হ'ত। এই সমস্ত কাহিনীর স্রষ্টা কে, কখনইবা সৃষ্ট হয়েছিল, তা আজ আর জানার উপায় নেই। পৃথিবীর সর্বদেশে সাধারণ বৌদ্ধিকস্তরের মানুষের মধ্য থেকেই গড়ে ওঠে লৌকিক, মৌখিক কথাসাহিত্য।

আদিকালে এক একটি মানবগোষ্ঠী যখন সর্বজনবোধ্য একটি সরল ভাষার অধিকারী হল, তখন তাদের মুখেমুখে নানা ধরণের গল্পগাথা রচিত হ'ল। লোকমুখে ঘুরে ঘুরে এই সমস্ত

গল্পগাথা চিরস্থায়ী আসন পেতে নিয়েছে এক একটি জাতিগোষ্ঠীর জীবনে। দেশভেদে একই ব্যাপার বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাবনা, কল্পনা, ধারণাকে বহন করে তার বহমানতা রক্ষা করেছিল। পরবর্তীকালে কখনো যাযাবর বৃত্তির জন্য, কখনো বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবার জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে সচলতা বৃদ্ধি পায় এবং লোককথাগুলোও সচলতাপ্রাপ্ত হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দৈনন্দিন জীবনের কর্মময়তার মধ্যেও মানুষের অন্তরে যে নান্দনিক নির্যাস থাকে, তাই দিয়েই পুষ্ট হয়ে উঠেছে আদি মানবের মৌখিক সাহিত্য। তবে স্পষ্টতঃই এর উদ্ভব হয়েছে সমাজের আদিম ও সরল বিশ্বাসের এক ক্ষেত্র থেকে। তাই দেখা যায় কখনো একই রূপে, কখনোবা পরিবর্তিত রূপে এই সমস্ত কাহিনীগুলোকে স্থানান্তরে পাওয়া যায়।

International Encyclopedia of Social Science এ বলা হয়েছে ঃ

"In nonliterate societies it (folkliterature) is virtually identical with culture". (vol 5 & 6)

"....Prose narrative or "tale" which is one of the most widespread forms of verbal art. (vol 5 & 6)

সমগ্র পৃথিবী জুড়েই অনাদিকালের উৎস থেকে যুগ থেকে যুগান্তরে বয়ে চলেছে এই মৌখিক সাহিত্যের ধারা। মানুষের ভাবনা, ধারণা, কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যচেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্মকুশলতা, মনন অর্থাৎ মানুষের সামাজিক মনটিকে ধরে নিয়ে জীবন ও জীবিকার চিত্ররূপটি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস রয়েছে এতে। যুগের পর যুগ ধরে এভাবেই দেশভেদে লোকসাহিত্যের যাত্রা অপ্রতিহত হয়ে রয়েছে। শ্রুতিনির্ভর এই কথাসাহিত্য আধুনিককালে সঙ্কলকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হওয়ায় মৌখিক সাহিত্যও লিখিত সাহিত্যের রূপপ্রাপ্ত হয়।

আদিকাল থেকেই অর্থাৎ যখন থেকে মানুষের জীবনের সঙ্গে লোককথা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল, তখন থেকেই তা মৌখিক সাহিত্য হিসেবেই চলে এসেছে।

আকৃতিগত বা বৌদ্ধিক, যে কোনো পরিবর্তনই সংঘটিত হয়েছে মৌখিক সাহিত্য হিসেবে চলমানতার মধ্যেই। লোকসমাজের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে ক্রম পরিবর্তনতা প্রাপ্তিও লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। এই পরিবর্তনকে একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে বলা যেতে পারে যে, জীর্ণপত্র পরিত্যাগ করেও মূল অক্ষত রাখা যেমন বৃক্ষের ধর্ম, তেমনি লোকসাহিত্যেরও মূলধারা অক্ষুন্ন রেখে বহিরঙ্গগত পরিবর্তনসাধন অবশ্য পালনীয় ধর্ম (১০)।

দীর্ঘ বিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে যেতে মানুষ যখন চিন্তায়, মননে, ভাবনায় উন্নত হয়ে 'মানুষ' নামের অভিধা পেতে শুরু করলো, তখন থেকেই তার মন প্রশ্নাতুর হতে শুরু করলো। শিশুর মতই আদিম মানুষের মনে কিছু প্রশ্ন আলোড়ন তুলেছিল।

'আকাশের ওপারে কি কিছু আছে?' 'এই পৃথিবীর বাইরে কিছু আছে কি'? 'পৃথিবীর সৃষ্টি হল কেমন করে'? এই 'কেন' ও 'কিভাবে'-র উত্তর খুঁজতে গিয়েই মানুষ 'কথা' বা 'কাহিনী'-র সৃষ্টি করেছিলো।

আমাদের দেশে সন্ধ্যাবেলা ঠাকুমা দিদিমারা নাতিনাতনীদের এসব কাহিনী বলতেন। দেশভেদে একই ব্যাপার যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে।

লোককথা, রূপকথা, ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, লোকসঙ্গীত, উপকথা ইত্যাদিই ছিল মৌখিক সাহিত্যের বাহ্যিক রূপ। এই মৌখিক সাহিত্যের ভেতর দিয়ে সীমিতসাধ্য মানুষের ইচ্ছাপূরণের কাহিনীই প্রকাশিত হয়েছে।

'লোককথা' আদিম সংহত সমাজের ঐতিহ্য বহন করে। সংহত সমাজে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির প্রাধান্য বেশী স্বীকৃত হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি লোককথার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। দেখা যায় যে, অনেক সময় জনশ্রুতিই হোক, কি কল্পনাশ্রয়ী বিষয়ই হোক, কি বাস্তবে সংঘটিত কোনো ঘটনাই হোক, ব্যক্তিবিশেষের মনে যে ভাবটির উদয় হয়, তা জনসমষ্টির হাতে পড়ে অনেকানেক সংযোজন ও পরিবর্ধনের দ্বারা একটি অন্যরূপ গ্রহণ করে। তখনই সেই সৃষ্টিকর্মটি ব্যক্তির সৃষ্টি না থেকে সমষ্টির সৃষ্টিতে পরিণত হয়। এভাবে সমষ্টির ভাবনা ও কল্পনাকে ধারণ করার ফলে, তা সমষ্টির কাছে আদরনীয় হয়ে উঠে এবং এক অপরিসীম প্রাণশক্তির সাহায্যে প্রাচীনতার মধ্য দিয়ে প্রবহমান থেকেও নতুনত্বের ছোঁয়ায় নিজেকে সঞ্জীবিত করে রাখে। (১১)

একেবারে গোড়ায় এগুলো হুবহু রূপ নিয়েই মুখ থেকে মুখে প্রচারিত হয়েছে বলেই মনে করা হয়। বিশেষতঃ লোককথাগুলোর আয়তন ও কল্পনার আতিশয্যহীনতা বা ন্যূনতাই তার সাক্ষ্য দেয়। একেবারে আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারিত কাহিনীগুলোকে তাই অনেকটা 'অপৌরুষেয়' বিবেচনায় শ্রদ্ধা করা হয়ে থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে, কল্পনার রথে চড়েই মৌখিক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব, আসলে তা নয়। সমাজের ভাব ও রুচির উপর ভিত্তি করেই তার সৃষ্টি হ'তে হয়। শ্রুতিপরম্পরায় আমরা যে সমস্ত মৌখিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তাদের প্রতিটিরই একটি আলাদা রস ও ভঙ্গি আছে, যা ইচ্ছে করলেই রচনা করা অসম্ভব। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীরই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেন এতে অন্তর্লীন থাকে। যদিও স্থানান্তরে মৌখিক সাহিত্যের একটি আপাতসাদৃশ্য থাকে, তবু এমন কোনো বিশেষত্ব থাকে যার মাধ্যমে বিশেষ কোনো গোষ্ঠীসত্ত্বার পরিচয় প্রকাশিত হয়।

মৌখিক সাহিত্য তাই কখনো পুরনো হয়ে যায়না। একশ' বছর আগের শিশু তাঁর পিতামহী বা মাতামহীর কাছে যে পরম আগ্রহ ও পরম কৌতূহল নিয়ে ছড়া, ধাঁধা, লোককথা বা রূপকথা শুনতো, একশ' বছর পরের উত্তরকালের শিশুও একই আগ্রহ ও তৃপ্তি নিয়ে সেই কাহিনী শোনে। পার্থক্য যদিওবা কিছু থাকে, তা থাকতে পারে শুধু কাহিনীর বিন্যাস বা বিস্তৃতির উপর।

আরণ্যবৃক্ষের মতো মৌখিক সাহিত্যের শিকড় প্রবিষ্ট রয়েছে অতীতের কোলে। বাস্তবের রস যৎসামান্য হলেও কিছুটা মিশে থাকে মৌখিক সাহিত্যে। এভাবেই সমসাময়িক কালও অঙ্গীভূত হয়ে যায় এই সাহিত্যে। প্রতিটি সমাজেরই নিজস্ব একটি শিক্ষার ধারা থাকে। তা যে পুঁথিগত শিক্ষাই হবে, তা নয়। প্রতিটি সমাজের এক একটি সুনির্দিষ্ট নীতি থাকে। আদিম মানবগোষ্ঠীরও সেই সমাজনীতি ছিল। মৌখিক সাহিত্যের মাধ্যমে সেই নীতিশিক্ষার কাজটি সচল থেকে চিরদিনই সমাজদেহকে একই সঙ্গে রক্ষা ও পুষ্ট করে এসেছে।

আদিম নিরক্ষর মানবগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত অনেকগুলো বিষয় দেখা যায়। যেমন ছড়া, লোকসঙ্গীত, ধাঁধা, কথা বা কাহিনী, গীতিকা, প্রবাদ ইত্যাদি।

ছড়ার মধ্যে একটি চিরকালীন সর্বজনীনতা যেমন থাকে, তেমনি এর মধ্যে থাকে সারল্য। বিচিত্র বিষয় নিয়ে ছড়া রচিত হয়। মেয়েলী আচার-অনুষ্ঠান, ব্রত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যেমন ছড়া আছে, তেমনি ঐন্দ্রজালিক ছড়া, নৈসর্গিক ছড়া ইত্যাদিও আছে।

মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম অংশটি হল সঙ্গীত। সঙ্গীতের সুসংযত ভাব নিবেদন শ্রোতাকে বড় সহজেই একাগ্র করে রাখে। লোকসঙ্গীতের মধ্যে যৌথ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে শ্রমজীবি মানুষকে আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপিত করা, অনুপ্রেরিত করাই তার প্রথম কৃত্য। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, পার্বণাদি উপলক্ষে গীত মেয়েলি গান, বিবাহের গান, কর্মসঙ্গীত বা এই ধরণের বিভাগগুলো যদিও অনেক পরবর্তীকালের সংকলন, তবু বলা চলে যে, সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে তৎকালীন জীবনের সারমর্ম, যৌথতাই প্রকাশিত হ'ত।

আদিম মানুষের কামনা ছিল দুটো। শস্য ও সন্তান। সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে তার এই কামনা প্রস্ফুটিত হ'ত। যদিও অনেক পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে, তবুও আমরা এই কামনারই চিত্র দেখতে পাই ছান্দোগ্য উপনিষদ সহ অন্যান্য উপনিষদেও। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১.৩.১৭) বলা হয়েছে

(১) 'অথাত্মনে ন্নাদ্যমাগায়দ্যদ্ধি কিংচান্নমদ্যতে নেনৈব

তদদ্যত ইহ প্রতিতিষ্ঠতি' — অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণ গান করে নিজের জন্য অন্নলাভ করেছিলেন। প্রাণীগণ যা কিছু আহার করে, এই প্রাণের সাহায্যেই করে থাকে। প্রাণ অন্নে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

(২) 'ইদং সর্বং যদন্নং তদাত্মন আগাসীঃ' (বৃহদারণ্যক ১.৩.১৮)

এই যে অন্ন রয়েছে, গান দ্বারা নিজের জন্য লাভ করেছো।

অন্যত্র ছান্দোগ্য উপনিষদেও (২.৬.২) আছে—

(৩) 'ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।'

অর্থাৎ, যিনি পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, পশুসমূহ তার ভোগ্যবস্তু হয় এবং তিনি বহু পশুর অধিকারী হন।

(৪) ছান্দোগ্য (১.৩.৭) উপনিষদে — 'অন্নবানন্নাদো ভবতি, য এতান্যেবং বিদ্বানুদ্‌গীথমক্ষরাণ্যুপাস্তে'।

এখানে 'উৎ' বা প্রাণ, 'গী' বাক, আর 'থম্' অন্ন। প্রাণ, অন্ন ও গান বৈদিক 'উদ্‌গীথে' পরস্পর সম্পৃক্ত। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ, শ্রম (শ্রম থেকে অন্ন উৎপাদন হয়) ও গান এখানে অবিচ্ছেদ্য।

এই অংশগুলোর সাহায্যে এটুকু বোঝা যায় যে, আর্য ধর্মদর্শন সংক্রান্ত সংকলনেও আদিম লোকায়ত চর্যা স্বীকৃতি পেয়েছিল।

যে শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে সঙ্গীতের জন্ম, তা মানুষের যূথবদ্ধ জীবনে আশা, উদ্যম ও সাফল্যেরই দ্যোতনা নিয়ে এসেছে। ফলে সমকালীন সমাজের ঐক্যবদ্ধ রূপটিই তাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শ্রমের সঙ্গে যেমন সঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে তেমনি শ্রম অপনোদনের জন্যও একে ব্যবহার করা হয়েছে।

ত্রিপুরার লোককথাসাহিত্যের কেন্দ্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এখানকার প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি 'জুম'— এর উল্লেখ। এই জুম চাষ যে শুধুমাত্র একটি শ্রমপদ্ধতি তা নয়, এর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে জুমের গান। যে গানের ভেতর দিয়ে উপজাতি জীবনের দুঃখদুর্দশা, দারিদ্র্য, বিরহ, প্রেমের আকুতি, ঋতুকালীন আবর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়, যা তাদের জীবনচর্যারই অঙ্গ, সব ধরা পড়ে। এককথায় বলা চলে, লোকচর্যার যে অভিব্যক্তি লোকসঙ্গীতের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়, তার সাহায্যে সমাজের জীবনযাত্রাকে সুস্থ, সহজ ও সুন্দর করে তোলারই প্রয়াস থাকে।

ধাঁধা বা হেঁয়ালী মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত মননের ফসল। এর অবয়ব তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র হয়। বক্তব্য অনেক সময়ই কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একে বলেছেন আলো আঁধারী ভাষা। এটি লোকমুখে প্রচারিত হয়ে হয়ে একটি লোকবৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছে। বাংলায় আমরা অজস্র ধাঁধার প্রচলন দেখি। এই প্রসঙ্গে দু-একটি উপজাতি ধাঁধার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'জাকুং কুরুই, জাক করুই, দুনিয়া বেরাই চাও' — যার হাত নেই, পা নেই, দুনিয়া বেড়ায়। কি? — চিঠি। অথবা, 'রাজার পুখুরি কন্‌খলাইয়া মানইয়া' — রাজার পুকুরে দাগ পড়েনা — চোখ।

অর্থ বোঝার আগেই একটি অপূর্ব ব্যঞ্জনা আমাদের মনকে অধিকার করে নেয়।

প্রবাদ যে-কোনো জাতিগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্যের আকর। এটি জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি। প্রবাদের ভেতর দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বহু পরীক্ষিত উপদেশ বা জ্ঞান এবং নীতি প্রচারিত হয়। এর অবয়ব ক্ষুদ্র এবং এর সাহায্যে দেশকালনিরপেক্ষ মানবজীবনের নিতান্ত বাস্তব তথ্যই প্রকাশিত হয়। মানবজীবনের সাধারণ বৃত্তিকে অবলম্বন করে প্রবাদ রচিত হয় বলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই ধরণের প্রবাদ প্রচলিত দেখা যায়। যেমন একটি চাকমা উপজাতি প্রবাদ — 'বেজা গরুর দাঁত চেলে কি অহব' (বিক্রী করা গরুর দাঁত দেখে কি হবে?) এর সঙ্গে ইংরেজী 'Let by gone be by gone' — এর মিল রয়েছে।

মৌখিক সাহিত্যের আরেকটি অংশের নাম গীতিকা। এটি মূলতঃ পদ্যাশ্রয়ী ও আখ্যানমূলক হয়। তবে কেবলমাত্র আবৃত্তি না করে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে লৌকিক ছন্দযুক্ত করে এবং লৌকিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গীত হয়। ইংরেজীতে এই ধরণের আখ্যানমূলক গীতকেই Ballad বলা হয়।

মৌখিক সাহিত্যের বিশিষ্ট অংশটির নাম 'লোককথা'। শ্রুতিপরম্পরায় চলে আসা গদ্য আশ্রিত লোককথা এক অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে শতসহস্র বৎসর ধরে লোকসমাজের মধ্যে বেঁচে রয়েছে। কোনো কোনো লোককথা সারা পৃথিবী জুড়েই প্রচলিত রয়েছে এমনও দেখা যায়। বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে প্রচলনের ফলে এক 'সাংস্কৃতিক ঐক্যের সম্ভাবনার কথাও মৌখিক সাহিত্যের প্রতি উৎসাহী বিদগ্ধজনের মনে ধরা পড়ে।

প্রতিটি জাতিই আপন আপন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোককথার সম্ভার নিয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। আবার অন্যভাবেও বলা যায় যে, কোনো কোনো বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন লোককথার জন্যও কোনো জাতি গৌরবান্বিত হয়ে উঠতে পারে। ইউরোপীয় লোকসাহিত্যের "সিণ্ডেরেলা", 'স্নো হোয়াইট' অথবা বাংলা লোকসাহিত্যে 'লালকমল নীলকমল' যেন এক একটি জাতীয় জীবনের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে এই গল্পগুলোর মধ্যে একটি সর্বজনীনতাও আছে, যা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

লোককথা দেশ বা কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ হতে পারে না কখনো, তবু অঞ্চল ভেদে, দেশভেদে কাহিনীর মৌলিকতা কিছু থাকেই। স্থানোপযোগী চরিত্রের আচার-আচরণ, ব্যবহারিক প্রকৃতি, পদ্ধতি, প্রকরণ ইত্যাদির মৌলিক পার্থক্যগুলোর জন্যই কোনো কোনো অঞ্চলের লোককথা সেই সেই অঞ্চলের জাতিসত্ত্বার পরিচায়ক হয়ে উঠে। তবে সবসময়ই যে পার্থক্য থাকবেই তা-ও নয়।

রূপকথার সঙ্গে লোককথার সম্পর্ক, উভয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ঃ

রূপকথার সঙ্গে লোককথার সম্পর্ক অভিন্ন। রূপকথা হ'ল লোককথার অঙ্গীভূত একটি শ্রেণীমাত্র। সব লোককথাই রূপকথা নয়। রূপকথা বলতে আমরা এক বিশেষ ধরণের কাহিনীকে বুঝি, যাকে উপকথাও বলা চলে এবং যে কাহিনীতে পশুপাখি এবং Supernatural কোন কিছু এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অতি প্রাকৃত বিষয় বা ঘটনা রূপকথারই মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আষাঢ়ে কল্পনায় ভর করে রূপকথার পাখা ভেসে চলে। যেমন, আমরা বিদেশী fairy tale গুলোতে ড্রাগন, উড়ন্ত চাদর বা ভারতীয় গল্পে পরী, পক্ষীরাজ ঘোড়া ইত্যাদিকে এর উদাহরণ হিসেবে ধরতে পারি।

রূপকথায় বাস্তবের সঙ্গে যোগসূত্র থাকে খুব ক্ষীণ। দৈত্য, পরী, পশুপাখি, মৃত ব্যক্তির কথা বলা ইত্যাদি নানা কিছু মূল আসন দখল করে নিতে পারে।

রূপকথায় বাস্তবের সীমানা পার হয়ে অকল্পনীয়ের সাম্রাজ্যে অবাধ বিচরণের এবং তজ্জনিত মুক্তির স্বাদের এক বিকল্পহীন চিত্র ফুটে উঠে।

বাংলায় যাকে রূপকথা বলা হয়, ইংরেজীতে তাকেই Fairy tale বলা হয়। কিন্তু সাধারণভাবে 'Fairy' শব্দটির অর্থ 'পরী' হওয়াতে; পরীর গল্পই বোঝায়। বাংলা রূপকথায় কখনো কখনো পরী থাকলেও আদিবাসী রূপকথায় পরী অনুপস্থিত। জার্মান ভাষায় Märchen নামে যে শ্রেণীর গল্পকে অভিহিত করা হয়, তা রূপকথারই সমতুল।

Stith Thompson তাঁর The Folktale গ্রন্থে বলেছেন, A Märchen is a tale of some length involving succession of motifs or episodes. It moves in an unreal world without definite locality or definite characters and is filled with the marvellous. In this never never land humble heroes kill adversaries, succeed to Kingdoms and marry princesses

এটি রূপকথার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রূপকথাতে কথার সঙ্গে গীত এর ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। এইজন্যই রূপকথার মধ্যে একটি কাব্যধর্মিতা থাকে।

রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাণী ইত্যাদি চরিত্রগুলোর সঙ্গেই রাক্ষস ডাইনি ইত্যাদি খল চরিত্রগুলোর সম্পর্ক থাকে এবং কখনো কখনো ছদ্মবেশে এরা রাজকীয় অনুষঙ্গের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে মিলেমিশে যায়। কখনো রাজা, রানী বা রাজপুত্রকে বধ করে অথবা বন্দী করে রাখে অথবা অন্য কোনো ক্ষতিকারক কাজে লিপ্ত থাকে। রূপকথায় কখনো একাধিক উপকাহিনীও থাকে। এতে উৎসুক মন রহস্য ও রোমান্সের এক সন্ধান পায় বলে চিরত্ব লাভের পক্ষেও সহায়ক।

লোককথার সঙ্গে রূপকথার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য প্রসঙ্গে বলা যায় যে, লোককথায় সাধারণভাবে আমরা দৈনন্দিন জীবনের সবধরণের নিত্যসহচর পশুপাখির সন্ধান পাই। কিন্তু রূপকথায় থাকে অসাধারণ পশুপাখির দল, যা আমাদের প্রত্যক্ষতার সীমানার বাইরে। যেমন, বিদেশী রূপকথায় আমরা দেখি উড়ন্ত ঘোড়া, ড্রাগন। বাংলার রূপকথাতে পাই ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, পক্ষীরাজ, শুকসারী ইত্যাদি। এরা রূপকথার চরিত্র। অন্যদিকে লোককথার সাধারণ চরিত্রেরা ইঁদুর, বিড়াল, বানর, বাঘ, হাতি, মুরগী, কুকুর, সাপ সবই হ'তে পারে।

রূপকথায় কল্পনার স্পর্শ একটু বেশী। অন্যদিকে লোককথায় বাস্তববোধ বেশী প্রকাশিত।

লোককথা যে আকারে খুব দীর্ঘ হ'বে তাও নয়। কিন্তু রূপকথা আকারে অত্যন্ত দীর্ঘ হয় অধিকাংশ স্থলেই। যদিও বিষয়গত সংস্থানে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায় না। কতকগুলো সাধারণ বিষয় পরিবেশগত অভিন্নতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। যেমন, পুত্রহীন রাজার দৈব উপায়ে পুত্রলাভ। রাজপুত্রের দেশান্তরে নিরুদ্দেশ যাত্রা ও ভাগ্যান্বেষণ। রাজকন্যাও রাজ্যলাভ। রাজ্যে প্রত্যাবর্তন ও সুখী জীবন যাপন। কখনো আবার ফিরে না ও আসতে পারে। অপুত্রক রাণীর পুত্র সম্ভাবনায় ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন দ্রব্যগ্রহণ ইত্যাদি অভিপ্রায়গুলো বর্তমান থাকে।

রূপকথার চরিত্রদের কোনো নাম থাকেনা। রাজা, রাণী, রাজকন্যা, রাজপুত্র, ডাইনী ইত্যাদি নামেই এরা পরিচিত হয়। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত সকলেই নির্বিশেষভাবে পরিচিত হয়। বিশেষ নামহীনতার জন্যই এরা যুগযুগান্ত ধরে সারাবিশ্বে পরিভ্রমণ করে চলতে সক্ষম হয়েছে।

রূপকথার মধ্যে নরবলি, নরমাংসাহার ইত্যাদির উল্লেখ দেখে একে লোকজীবনের এক প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের রসসৃষ্টি বলে মনে করা হয়। কালের প্রবাহে অন্য অনেক উপাদান এসে এই কাহিনীগুলোতে মিশে এদের এক অনন্যরূপ দিয়েছে। রূপকথায় 'ভাগ্য' বা 'নিয়তি' কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণ করে। এতে অজানার প্রতি, আদেখার প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ যেমন থাকে, তেমনি এর অন্তরালে থাকে রূপক।

রূপকথার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেন—

"ইহাদের মধ্যে পরীদের কথা যে থাকিতেই হইবে, তাহা নহে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকেনা— ইহা দীর্ঘায়তন; বিভিন্ন বিষয় ও বিচিত্র শাখা কাহিনীর দ্বারা জটিল, ইহার পরিবেশটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও স্বপ্নিল — সুনির্দিষ্ট কোনো স্থান ও সুস্পষ্ট কোনো চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হয়না, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনা দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ। (পৃঃ ৪৯৩, ১ম খণ্ড)।

লোককথা ও রূপকথা দুটোই কল্পনাশ্রয়ী, তবে লোককথায় কল্পনা লাগামছাড়া নয়। এতে মোটিফ্ ও কাহিনীর অগ্রগতির একটা মিল এবং বিন্যাস পাওয়া যায়। রূপকথায় জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে আদিম কিছু ব্যাপারও মিশ্রিত থাকে এবং এর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে মুখ্যভাবে কল্পনা।

লোককাহিনীগুলো রূপক ইত্যাদির আশ্রয়ে এসে রূপকথার আভিজাত্য অর্জন করে নিচ্ছে আকার ও প্রকার উভয় দিক থেকেই।

রূপকথার মধ্যে পাওয়া যায় এক দ্বন্দ্বমধুর পরিবেশ। বাস্তব ও অবাস্তব মিলে অতিবাস্তবের প্রকাশ। এর কাব্যধর্মী ভাষা ও রূপসৃষ্টির বৈচিত্র্যও লক্ষ্যনীয়। এটি সবসময়ই রূপকাশ্রিত হয়ে থাকে বলে এর 'রূপকথা' বা 'রূপক কথা' নামটি সার্থক। (আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৩৪)।

লোককথার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে রূপকথার জনপ্রিয়তাই বেশী। এর পেছনে যে অনৈসর্গিক আবহ তৈরী হয়, অলৌকিক ঘটনাবলীর সাহায্যে, সেখানে তত্ত্ব বা উপদেশ কোনো কিছুরই সরব উপস্থিতি থাকেনা বলে অতি সহজেই আমাদের মনে স্থায়ী আসন গ্রহণ করে।

রূপকথার শব্দ, রূপকল্প, চরিত্র ও পরিমণ্ডল এমন একটি মাত্রা তৈরী করে যে' এই মাত্রাটিই আমাদের জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে থাকে এবং যার ফলে শৈশবে শোনা রূপকথাও ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের মানসলোকের দরজাটি খুলেই রাখে।

রূপকথার গল্পে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার যেমন থাকেনা, তেমনি কোনো ঐতিহাসিক

চরিত্রও নায়ক হয়না। কাহিনীতে ভূত প্রেত, পশু-পাখি থাকলেও তারা কাহিনীর নিয়ন্ত্রক হয়না। তবে কিছু অপ্রাকৃত পশুপাখি, রাক্ষস-রাক্ষসী, পক্ষীরাজ, শুকসারী ইত্যাদি 'রূপকথা'র গল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে সে গল্পে মানুষ এবং মানুষের কাহিনী সর্বদাই প্রাধান্য পায়। রূপকথার কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হিসেবে থাকে প্রধানতঃ প্রেমও নিয়তি বা ভাগ্য। এই গল্প বিয়োগান্ত হয় না। দুষ্ট চরিত্রের পতন সেখানে অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন লোকবিশ্বাস ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকলেও উপদেশদানের ভেতর দিয়ে গল্প শেষ হয় না। রূপকথার ভাষা গদ্য ও গীতি কাব্যের মধ্যবর্তী রেখা ধরে সরল পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু লোককথার ভাষা হয় স্পষ্ট গদ্যানুসারী। বাস্তব উপাদানকে নির্ভর করেই রহস্যময় সৌন্দর্য্য নিয়ে রূপকথার অবয়ব গড়ে উঠে। সীমার মাঝে যে অসীমের সুর আমরা রূপকথায় বাজতে দেখি, লোককথায় তা সবসময় শ্রবণগোচর হয় না।

এছাড়া রূপকথায় যে গ্রামীণ মানুষ, রাজারাজড়া, খাদ্যসামগ্রী, পরিধেয় বসন, অলংকার, গৃহাদি, বাদ্যযন্ত্র, ফুল, গাছ, অস্ত্রশস্ত্র, পরিবহন, পশুপাখি, কীটচরিত্র, ঐন্দ্রজালিক শক্তির পরিচয় পাই— তা থেকে এটাই বোঝা যায় যে' রূপকথার প্রাণশক্তি আহরিত হয়েছিল গ্রামজীবনের সর্বস্তর থেকে।

তবে কিছু কিছু কাল্পনিক বা অতিপ্রাকৃত চরিত্র দেখা যায় রূপকথাগুলোয়, যা সাধারণ লোককথায় থাকেনা। রূপকথাগুলো সৃষ্টি হয়েছিল যে সময়ে, তখন নগরসভ্যতার বিকাশ হয়নি। যে রাজা-রানী, মন্ত্রী, মহার্ঘ্য বেশভূষার প্রসঙ্গ দেখা যায়; তা গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সামন্ততন্ত্রেরই প্রতিভূস্বরূপ।

বাংলা রূপকথায় যেমন দেখা যায় রাজপুত্রের সঙ্গে কোটালপুত্রের বন্ধুত্ব অথবা রাজপুত্র-রাজকন্যার গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা করার ব্যাপার, তেমনি ত্রিপুরার আদিবাসী কাহিনীতেও দেখা যায় রাজমহিষী নিজে পুকুর থেকে জল আনেন, রাজপুত্র ও রাজকন্যারা পাতালপুরীতে বাস করে। এমনকি চন্দ্রমাদেব ছেলেকে অর্দ্ধচন্দ্রবাণ দিয়ে আশীর্বাদ করেন। সাধারণ অচাই (পুরোহিত) — এর কন্যাও রাজরাণী হয়। (অজগর সাপের গল্প)।

ঐন্দ্রজালিক শক্তিরও প্রকাশ দেখা যায় বিভিন্ন গল্পে। সভ্যতার উন্মেষকালে মানুষ ছিল আদিম সাম্যবাদী কৌমজীবনে অভ্যস্ত। সঙ্ঘজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকার ফলে, সঙ্ঘশক্তির জোরেই সে বেঁচে থাকতে পারতো। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অরণ্যজীবনের বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে কয়েকটি পর্যায়ের ভেতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসেও দেখা যায় রূপকথা বা লোককথার মাধ্যমে মানুষের সেই যৌথশক্তির প্রতি অবিচল বিশ্বাস, শ্রদ্ধা প্রকাশিত হচ্ছে।

লোককথা বা রূপকথার বীর বা নায়কেরা সমাজের সমবেত শক্তির প্রতীক। সমাজমানসের অবচেতনে প্রবাহিত হতে থাকা সমস্ত বীর্য্য, শৌর্য্য, আশা আকাঙ্ক্ষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদির চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম সামাজিক দ্বন্দ্ব, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ,

নতুন ও পুরাতনের মধ্যে সংঘাত ইত্যাদি মানুষের সমাজচেতনার এক বিশালতা এর মধ্যে জড়িয়ে থাকে। এক একটি জাতি বা জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস পরোক্ষে এতে বিধৃত থাকে। ফলে লোককথা, রূপকথা "জাতীয় মানস" — এর ঐশ্বর্য ও মূলসুরকেই পরিস্ফুট করে তোলে। এভাবেই লোককথা ও রূপকথা "সমাজসত্য" প্রকাশের এক দর্পণ হয়ে দাঁড়ায়।

লোককথায় বস্তুনিষ্ঠতা ও কল্পনা ঃ

লোককথা মানুষকে আনন্দ ও রসের জোগান দেয় যেমন, তেমনই অন্যদিকে একটি জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চরিত্রনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করতে গিয়েই লোককথাকে সত্যাশ্রয়ী হয়ে উঠতে হয়। যে সত্য নিহিত থাকে কোনো জাতিগোষ্ঠীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে, যে সত্য প্রকাশিত হয় ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে, আচার-আচরণের মাধ্যমে, যে সত্য বিধৃত থাকে প্রেম-অপ্রেম, সুখ-দুঃখ, বঞ্চনা-প্রাপ্তির মধ্যে, সবকিছুকে ঘিরে বইতে থাকে লোককথার প্রাণপ্রবাহ। ব্যক্তি ও সমাজের এই সত্যনিষ্ঠ চিত্র উপহার দিতে গিয়েই লোককথা বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সমাজব্যবস্থায় প্রতিনিয়তই এক বির্বতন ঘটে চলেছে। সবসময় যে তা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তা-ও নয়। এরই ভেতর দিয়ে নানারকম রূপান্তরের ভেতর দিয়ে লোককথাও বয়ে চলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। স্মৃতিবিস্মৃতি, গ্রহণ-বর্জনের অনুগামী হ'বার ফলে এতে বিশেষ কোনো 'কাল' ধরা না পড়লেও মানুষের সামাজিক মনটি ধরা পড়ে বস্তুনিষ্ঠতা ও কল্পনার সাহায্যে।

অন্নসংস্থানের পন্থা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, ক্ষোভ, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষ অনেকটাই সর্বজনীন। মানুষের মানবিক, জৈবিক বৃত্তিসমূহ এবং জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষের সর্বকালিক এবং সামাজিক মনের বাস্তব সত্যের হদিশ দেয় লোককথাগুলো। সেজন্যই লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রামের কথা, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার কথা যেমন লুকোনো থাকে, তেমনই দারিদ্র্য, বঞ্চনা, প্রেম, সামাজিক অবিচার, উৎপীড়ন, জীবনযুদ্ধের যন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র, আত্মত্যাগ — চিরকালীন মানুষের একই মনন ও প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় লোককথায়।

তবে সবসময়ই যে জীবনের সব অনুষঙ্গ খোলাখুলিভাবে বিবৃত হয় তা নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় একটি রূপকের আড়ালে লুকোনো থাকে প্রকৃত কাহিনীটি। এছাড়াও কল্পনার রঙে রঞ্জিত করা হয় কাহিনীকে। মানুষমাত্রই কল্পনাপ্রবণ। বাস্তবে যা তার কাছে অসম্ভবের ব্যাপার, কল্পনাশ্রয়ী কথা বা কাহিনীর ভেতর দিয়ে সে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে চেষ্টা করে এবং এমনি করেই কল্পনার আশ্রয়ে লোককথা হয়ে উঠে তার ইচ্ছাপূরণের কাহিনী।

আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের ধারণা এই যে, লোককথার আদিরূপ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। পরবর্তীকালে কথকের চিন্তা ও কল্পনা মিশ্রিত হয়ে সেগুলো বৃহৎ আকার লাভ করেছে।

সবলের উৎপীড়ন, অবহেলা দুর্বলের প্রতিই নিক্ষিপ্ত হয়। উৎপীড়িতের অবচেতনে তা

সবসময়ই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং প্রকাশের ক্ষেত্র সন্ধান করে। অথচ অনেক সময়ই প্রতি-আক্রমণের আশঙ্কাও থাকে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই তখন রূপকের আশ্রয় নিয়ে লোককথায় প্রকাশ করা হয়।

পৃথিবীর সব আদিম সমাজেই প্রায় লোককথার নায়ক হিসেবে মনুষ্যেতর প্রাণীদেরই প্রাধান্য দেখা যায়। পশুপাখি-সরীসৃপবিধৌত অরণ্যপ্রান্তর সেই কাহিনীর পটভূমি। অরণ্যের সঙ্গে মানুষের তখন প্রতিটি মুহূর্তের সম্বন্ধ। আরণ্যক প্রাণীই তাকে যোগায় ক্ষুন্নিবৃত্তির উপাদান। আবার আরণ্যক প্রাণীই তার অপঘাত মৃত্যুর কারণও। ওদিকে মানুষও প্রবৃত্তির দিক থেকে পশুদের অনেক কাছাকাছি। ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে-সমস্ত কাহিনীর উদ্ভব বলে বনে করা হয়, সেগুলোতে পশুদেরই নায়ক বা প্রধান চরিত্র হিসেবে দেখা যায়।

সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবনার স্তরেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তারই প্রতিফলন ঘটে তার কল্পনায়। যে-কোনো ঘটনার পিছনেই যখন তার মনে 'কেন?' বা 'কি করে হল?' জাতীয় প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে, তখনই সে আপন সামর্থ্য অনুযায়ী কল্পনার সাহায্যে সেই ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে। Myth বা পুরাকাহিনী জাতীয় কাহিনীগুলোতে আমরা কল্পনারই বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত রূপ দেখি।

আদিম সমাজে মনুষ্যতের প্রাণীদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করা বা পশুপাখিকে যাদুজ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করা ইত্যাদি তৎকালীন সমাজমানসের কল্পনাশক্তিরই প্রকাশ করে। কল্পনাশক্তি যে লোককথায় কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা সৃষ্টিমূলক লোককথাগুলোতে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় রূপকথাজাতীয় কাহিনীগুলোতেও।

লোককাহিনী ও আদিম জাতি গোষ্ঠী ঃ

পৃথিবীতে সভ্যতার বিবর্তন সর্বত্র সমানভাবে হয়নি বলে মনে করা হলেও বিবর্তনের একটি ছক পাওয়া যায়, যার দ্বারা মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিবর্তনও একটি পরম্পরাকে অনুসরণ করেছে বলে মনে করা হয়।

সেদিক থেকে মানুষের বিবর্তনের স্তরপরম্পরাকে লুই হেনরী মর্গ্যান তাঁর "এনশিয়েন্ট সোসাইটি" গ্রন্থে সাতটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন।

(১) নিম্নস্তরের বন্য পর্যায় অর্থাৎ যে সময়ে ফলমূল সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং ভাষার উদ্ভব হয়েছে।

(২) মধ্যস্তরের বন্য পর্যায়ে মাছ ধরা ও আগুনের ব্যবহার শেখা।

(৩) উচ্চস্তরের বন্য পর্যায়— তীর ধনুকের ব্যবহার আয়ত্তে আনা।

(৪) উচ্চস্তরের বর্বর পর্যায়, যখন মানুষ মাটির বাসন তৈরী করলো।

(৫) মধ্যস্তরের বর্বর পর্যায়— পশুপালন ও কৃষিকাজের শুরু।

(৬) উচ্চস্তরের বর্বর পর্যায়— ধাতুর ব্যবহার শুরু এবং

(৭) সভ্য পর্যায়— ধ্বনিনির্ভর হরফ ও লেখার সূত্রপাত।

সৃষ্টির প্রথম থেকে অরণ্যের হিংস্র পশুই ছিল মানুষের নিকটতম প্রতিবেশী। এই প্রতিবেশীর দিক থেকেই প্রতিমুহূর্তে তার বিপদের সম্ভাবনা ছিল। বিপদমুক্তির উপায় হিসেবে অস্ত্রের প্রয়োজন তার কাছে প্রথম অনুভূত হল। সামনের দুটো পা হাতের ভূমিকা পালন করতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ পাথর কিংবা গাছের ডাল তুলে নিয়েছে তার শত্রুর বিরুদ্ধে। এরপরের পর্যায়ে সে আগুনের ব্যবহার শিখলো। প্রকৃতির উপর প্রথম, সামান্যতম হলেও প্রভুত্ব করবার সূচনা হল। যে অন্ধকার রাত ছিল মানুষের কাছে ভয়ানক আরণ্যক, সেই অসহায় রাতের বিভীষিকা সৃষ্টিশীল কাজের ভেতর দিয়ে তার কাছ থেকে অপসৃত হ'ল যেমন একদিকে, অন্যদিকে তেমনই তার খাদ্যাভ্যাসেও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। নিহত পশুর কাঁচা মাংসের পরিবর্তে ঝলসানো মাংসের স্বাদ যখন আদিম মানব জানল, তার সংস্কৃতির দরজা তখন যেন এক নিমেষে খুলে গেল। অস্ত্র, শ্রম ও আগুন তাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেল।

অবশ্য এই পর্যায়ের অনেক আগে থেকেই বৃক্ষকোটর থেকে মানুষ তার বাসস্থান সরিয়ে এনেছে। দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটলো যেমন একদিকে, তেমনি চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ক্ষমতাও অর্জন করলো। দেহ ঋজু হল। বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন হ'ল। এই সবকিছু মিলিয়েই চেতনার উৎসার ঘটাতে ঘটাতে মানুষ মানুষে পরিণত হল।

আদিম মানবের জীবন প্রকৃতপক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে এবং শ্রমসাধ্য পদ্ধতির সাহায্যে মানুষের মানসিক গঠন দৃঢ় হল এবং সে তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও দৃঢ় নিশ্চিত হ'ল। বুঝতে শিখলো তার অনুকূল পরিবেশ কোনটি; কোনটিই বা প্রতিকূল। এই সচেতন অস্তিত্ব সচেতন কর্মধারার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলো মানুষকে।

অর্বিভাবের দিন থেকেই মানুষের প্রধান সমস্যা ছিল আত্মরক্ষা ও খাদ্য আহরণ। অতিকায় হস্তী, বন্যমহিষ, ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল মানুষ। বন্য ফলমূল ও পশুমাংসই ছিল প্রধান খাদ্য। আত্মরক্ষা ও পশুশিকারের জন্য যে অস্ত্রগুলো সেদিন মানুষ তৈরী করেছিলো, সেগুলোই ছিল তার কৃষ্টির একমাত্র নিদর্শন।

এই শিকারীজীবনই আদিমতম কৌমজীবন। যে পশুকে আদিমতম মানুষ ভয় পেতো, যে প্রকৃতির বিভিন্নরূপ দেখে কখনো, ভয়ার্ত, বিপন্ন অথবা হতবাক হতো, সেই পশু ও প্রকৃতির মধ্যে একসময় তারা এক অলৌকিক শক্তির কল্পনা করে বসেছে। ভয় থেকে জন্মালো এক ভক্তিমিশ্রিত ভাব। এইভাবেই পশুপুজোর শুরু।

আদিমতম মানব যূথবদ্ধভাবে যেমন শিকারে যেতো, তেমনই আহরিত খাদ্যও যূথবদ্ধভাবেই গ্রহণ করতো। গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে সে এভাবেই সংযুক্ত করেছে। আদিম মানবের জীবনযাত্রায়

পরিবেশ এমনই ছিল যে এককভাবে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। আপন অস্তিত্বের প্রয়োজনেই তাকে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে চলতে হতো।

সারা পৃথিবী জুড়েই আজ অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর বাস। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের ঐকমত্য এখানেই যে, পৃথিবীতে বর্তমানে যত জাতিগোষ্ঠী বিদ্যমান, সকলেই একই বর্গ ও প্রজাতি থেকে উদ্ভূত। তাদের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্যমূলক আবয়বিক পার্থক্য আছে, তার জন্য তাদের বিভিন্ন জাতি (race) পর্যায়ের লোক বলা হয়। (১২)

একই বর্গ ও প্রজাতিতত্ত্বের কারণেই আদিম জাতিগোষ্ঠির জীবনে জীবনযাত্রার অনন্য সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করা যায়।

শিকারজীবন ও ফল আহরণের পরবর্তী পর্যায়ে বুদ্ধির উৎকর্ষের দ্বারাই মানুষ বুঝতে শিখলো পশু হত্যার চেয়েও পশুকে পোষ মানানো তার পক্ষে আরো বেশী ফলদায়ক। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাজে পোষ মানানো পশুকেই সেদিন মানুষ তার অন্যতম সহযোগী হিসেবে তৈরী করে নিয়েছে একদিকে, অন্যদিকে পশুকে পোষ মানিয়ে দুধ, মাংস, ইত্যাদি সংগ্রহ করে আহার্য্যের ব্যবস্থা করেছে। আর মৃত পশুর চামড়াতো ছিলই বসন ও আবাসনের কাজে ব্যবহৃত হ'বার জন্য।

পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিকর্মের উদ্ভাবন হল। আদিম মানব যখন পশুপালনে ব্যস্ত, তখন আদিমমানবী গৃহকর্মের অবসরে কৃষিকাজের সূচনা করে।

পরবর্তীস্তরে কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। পুরুষ কৃষিকাজে জড়িয়ে পড়ার ফলে উভয়েই সমানভাবে কাজে অংশগ্রহণ করলো। ঘরের কাজকর্ম মেয়েদেরই করতে হতো, অন্যদিকে বাইরের কর্মক্ষেত্র। অবধারিতভাবেই তাদের দায়িত্ব তুলনামূলক ভাবে বেশী হল।

আদিম জাতিগোষ্ঠী এভাবেই আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় নিজেদের সংপৃক্ত করে রাখলো। পশুচারণকালেও যেমন তারা যূথবদ্ধভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে প্রচরণ করেছে, কৃষি উদ্ভবের পর এই পর্যায়েও যূথবদ্ধতা একই থেকে গেছে।

যূথবদ্ধতা থেকেই সমবন্টন ও সমান অধিকারের সৃষ্টি।

এই আদিম সাম্যবাদী সমাজের প্রবহমানতা আজও যে সমস্ত আদিম জাতিগোষ্ঠী সারা পৃথিবীজুড়ে টিঁকে আছে, তাদের অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

আদিম সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, অনেকগুলো পরিবার নিয়ে 'গ্রাম' তৈরী হতো। বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেই 'সর্দার' নির্বাচিত হতো। যাকে রাজাও বলা চলে। গ্রাম-সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা, ব্যক্তি বিষয়ক বিচার-বিবেচনা, শাসনপ্রণালী সম্পর্কিত ধারণা, পণ্য বিষয়ক বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল 'সর্দার'— এর। গ্রামস্থ অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হতো 'সমিতি'। এখানে সর্দারকে তারাই সমস্ত কাজে সহায়তা করতো।

এই গোষ্ঠীজীবন-যাপনের স্মৃতি বহন করে টিঁকে আছে পৃথিবীর অসংখ্য উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ। দক্ষিণ ভারতের 'বাদাগা' উপজাতির কৃষিকেন্দ্রিক জীবনে এই ছায়া যেমন দেখা যায়, তেমনি লক্ষ্য করা যায় জুমচাষ নির্ভর ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবনেও।

আদিমজীবনের স্মৃতি ধারণ করে রাখে লোককথা। যে জীবনচর্যা প্রতিদিনের আচরণের মধ্য দিয়ে অনুসৃত হয়েছে, যে অভিজ্ঞতায় আদিম মানুষ প্রতিদিন পুষ্ট হয়েছে, তারই স্মৃতিচিহ্ন সে ধরে রেখেছে আদিম গুহাচিত্রের মাঝে। বিশেষ করে আদিম মানবের শিকারজীবনের গণস্মৃতি লক্ষ্য করা যায় এই চিত্রাবলীতে। পরবর্তী সময়ে সহজবোধ্য ভাষার অধিকারী হয়ে এই অভিজ্ঞতার কাহিনীকেই আদিম মানুষ কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে মৌখিকভাবে নিজেদের কাছে জীবন্ত করে রেখেছে। প্রচরণশীল জীবনযাত্রার কারণেই একসময় এই সমস্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী বা লোককথাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে স্থান থেকে স্থানান্তরে।

বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষই কোন্ অনাদিকাল থেকে এই লোককথা সৃষ্টি করে চলেছেন তার সঠিক কাল নির্দ্ধারণ করা না গেলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় লোককথার সৃষ্টি ও চর্চা তাদের জীবনযাপনেরই অঙ্গ ছিল। সামাজিক প্রয়োজন, ধর্মীয় প্রয়োজন ও অনাবিল আনন্দ লোককথা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে। যে কথা সহজভাবে বলা যায়নি, যে প্রতিবাদ সোজাসুজি করা যায়নি, লোককথার ভেতর দিয়ে সে-সমস্তই প্রকাশিত হয়েছে। নির্ভেজাল আনন্দদায়ক লোককথা তো ছিলোই।

ত্রিপুরার উপজাতিগোষ্ঠী ও লোককথা ঃ

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশে অরণ্য-পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার অবস্থান। ১০,৪৯১.৬৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই রাজ্যের উত্তর দিকে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, নোয়াখালি ও কুমিল্লা জেলা। দক্ষিণে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা, পশ্চিমে কুমিল্লা জেলা এবং পূর্ব দিকে আসাম ও মিজোরামের সীমান্ত। পূর্বদিক দিয়েই বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে এই রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ। এর প্রধান পাহাড়গুলোর নাম লংতরাই, আঠারমুড়া, দেবতামুড়া, বড়মুড়া, শাখানটাং, জম্পুই পাহাড় এবং নদীগুলোর মধ্যে ফেনী, মুহুরী, গোমতী, হাওড়া, খোয়াই, ধলাই, মনু, দেউ, জুরি, লংগাই, ইত্যাদি প্রধান।

আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যই 'পার্বত্য ত্রিপুরা' বা 'হিল টিপারা' নামে পরিচিত ছিল।

ত্রিপুরার বর্তমান রাজধানীর নাম আগরতলা। এই রাজ্য তিনটি জেলায় বিভক্ত — উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা। তিনটি জেলার মহকুমাগুলোর নাম যথাক্রমে — ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর, সদর, খোয়াই, সোনামুড়া, উদয়পুর, বিলোনীয়া, অমরপুর, সাব্রুম।

এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ২৭,৫৭,২০৫ জন (১৯৯১- র জনগণনা অনুসারে) উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীরা এ রাজ্যের আদিম বাসিন্দা। এছাড়াও অনেকে অবিভক্ত বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে জীবিকার প্রয়োজনে ত্রিপুরায় এসে পরবর্তী সময়ে এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। ১৯৯১ সনের লোকগণনা অনুসারে ত্রিপুরার মোট উপজাতির সংখ্যা ৮,৫৩,৩৪৫ জন। অগ্রসর মানবগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও অনগ্রসর মানবগোষ্ঠী যাঁরা নগরসভ্যতা থেকে অনেক দূরে, তাদের আদিম বাসস্থান বনে-জঙ্গলে বাস করে এবং যাদের জীবনযাত্রার বিশিষ্ট ধরণ-ধারণ এখনো বজায় আছে অর্থাৎ যারা আদিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে রয়েছে এখনো, তাদেরকেই 'উপজাতি' আখ্যা দেওয়া হয়। আদিম ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থা, আদিম সমাজ ব্যবস্থা, আদিম ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই এদের জীবন চর্যা। এদের রয়েছে নিজস্ব লিপির অভাব। (গাণ্ডীব, বিশেষ লোক সংখ্যা ১৯৯০ ঃ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার পৃঃ ৬০)।

ত্রিপুরার আদিম অধিবাসীদেরও এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যই 'উপজাতি' বলা হয়েছে। শহুরে সভ্যতার অধিকারী না হওয়া, সামাজিক চলমানতার অভাব অথবা ধীরলয়ে চলা সামাজিক অগ্রগতি ইত্যাদি এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে 'জুম' চাষ (অরণ্যের গাছপালা কেটে পুড়িয়ে পরে চাষ করা) যা আদিম জীবনযাত্রার চিহ্নবাহী। রয়েছে শিকার-জীবনের প্রতি ভালোবাসা।

এইসব বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে এদের জীবন আজও বহমান বলেই এরা এখনো 'জাতি' পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি।

ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য ব্যয়িত হয় নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস। পরবর্তী সময়ের অবসরের মুহূর্তকে এরা কাজে লাগায় শিকারের মাধ্যমে। আদিম উপজাতিদের যে কোন নির্দিষ্ট বাসভূমি থাকে তা-ও নয়, তারা বেশীর ভাগ সময়ই প্রচরণশীল। এর পেছনে অবশ্য সমাজ মনস্তাত্ত্বিক কতগুলো কারণও কাজ করে। যেমন, এক জায়গায় দীর্ঘদিন চাষ করা যায় না মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে। সেজন্য মানসিক দিক থেকেও একই জায়গার প্রতি একটি অনীহা জাগে। এছাড়াও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অন্যান্য গোষ্ঠীর দ্বান্দ্বিক মনোভাব, রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ইত্যাদি এদেরকে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে বাধ্য করে। বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ভারতে খ্রীষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য এখানকার উপজাতি সমাজ চার্চকেন্দ্রিক সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার উপজাতিরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী। এই পরিবর্তনের ফলে অনেক উপজাতি সমাজেই এখন ডাইনী, জাদু মায়াজাল, ভূতপ্রেত ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে উর্বরাশক্তি-কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান, উৎসব বা প্রথা ইত্যাদিও ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে।

এই রাজ্যে বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীকে মোট ১৯টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এরা যথাক্রমে (১) ত্রিপুরী (২) রিয়াং (৩) জমাতিয়া (৪) চাক্‌মা (৫) হালাম (৬) নোয়াতিয়া

(৭) মগ (৮) লুসাই (৯) উচই (১০) কুকি (১১) গারো (১২) মুণ্ডা (১৩) ওরাঁও (১৪) সাঁওতাল (১৫) খাসিয়া (১৬) ভীল (১৭) ছাইমল (১৮) ভুটিয়া (১৯) লেপচা। এরা ছাড়াও আরো অনেকগুলো উপজাতি গোষ্ঠী রয়েছে যাদের সম্বন্ধে তেমন কোনো তথ্য প্রাপ্ত হয়নি। যেমন মলসুম, কাইপেং, কাইবং ইত্যাদি।

(১) **ত্রিপুরী ঃ** ত্রিপুরীরা এই রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই বসবাস করে। এরা হিন্দুধর্মাবলম্বী। এদের মোট জনসংখ্যা (১৯৮১- র জনগণনা অনুসারে) ৩,৩১,১৯১ জন। অধিকাংশই বাস করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ও সদর মহকুমায়।

সমতলবাসীরা ছাড়া অন্যরা টংঘরে বাস করে। অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে বাস করে। এই স্থানটির নাম পাড়া বা পঞ্জি। সাধারণতঃ কোনো সর্দারের নামানুসারে পাড়ার নামকরণ হয়। এরা হিন্দুভাবাপন্ন হওয়ার অনেক আগে থেকেই নানা লৌকিক দেবদেবীর পুজো করে আসছে। বাঁশ এদের জীবনের প্রধান অঙ্গ।

(২) **রিয়াং ঃ** এরাও হিন্দু। কেউ কেউ মনে করেন রিয়াংরা ত্রিপুরীদেরই একটি অংশ। এখন একটি বিরাট অংশের মানুষই খ্রীষ্টধর্মে ধর্মন্তরিত হয়ে গেছে। এরা প্রধানতঃ অমরপুর, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমা এবং উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমায় বসবাস করে। বর্তমানে সাব্রুম ও সোনামুড়া ছাড়া সব মহকুমায়ই এদের দেখা পাওয়া যায়। ১৯৮১-র জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা ৮৪,০০৪ জন। আগে এরা সর্বপ্রাণবাদী ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। বর্তমানে লৌকিক দেবতার পূজার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের প্রভাবে 'কালী' ও বিষ্ণুর পূজোও করে।

(৩) **জমাতিয়া ঃ** লৌকিক দেবতা ছাড়াও এরা বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মে অনেকেই বিশ্বাসী। খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এরা গড়িয়া পুজো করে। গড়িয়া পুজো ত্রিপুরার উপজাতিদের জাতীয় উৎসব। জমাতিয়াদের অধিকারে থাকা গড়িয়া মূর্তিটি সোনার তৈরী। তবে শোনা যায় কয়েক বৎসর আগে এই মূর্তিটি চুরি হয়ে গেছে। জমাতিয়া সম্প্রদায় সোনামুড়া, উদয়পুর, অমরপুর মহকুমায় অধিকসংখ্যায় বাস করে। এদের লোকসংখ্যা ৪৪,৫০১ জন (১৯৮১-র গণনা অনুসারে)।

(৪) **চাক্‌মা ঃ** এদের বাসস্থান সাব্রুম, কৈলাসহর, ধর্মনগর, অমরপুর অঞ্চলে। জনসংখ্যা ৩৫,০৭৯ জন (১৯৮১-র গণনা অনুসারে)বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে সঙ্গে শিব পূজো, লক্ষ্মীপূজো ইত্যাদিও করে। তবে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এদের মধ্যে বেশী। যাদু বিশ্বাস খুব উল্লেখযোগ্য।

(৫) **হালাম ঃ** কুকি জাতি দীর্ঘদিন ত্রিপুরার মহারাজার অধীনতা স্বীকার করেনি। এদের যে অংশ অধীনতা স্বীকার করেছিল তারাই হালাম নামে পরিচিত। সাব্রুম মহকুমা ছাড়া রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই এরা বাস করে। ১৯৮১-র জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা ২৯,০৪০ জন। আচার আচরণের দিক থেকে এরা ত্রিপুর ক্ষত্রিয়দের নিকটবর্তী।

(৬) **নোয়াতিয়া ঃ** নোয়াতিয়াদের নতুন ত্রিপুরীও বলা হয়। এরা বৃহত্তর ত্রিপুরীদেরই একটি অংশ। সাব্রুম, বিলোনীয়া, অমরপুর, উদয়পুর ইত্যাদি স্থানে এরা বাস করে। বর্তমানে কৈলাসহর ও ধর্মনগর মহকুমায়ও এরা বাস করে। ১৯৮১-র জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা ৭,১৮২ জন।

(৭) **মগ ঃ** প্রায় দুই শতাব্দী আগে এরা আরাকান থেকে ত্রিপুরায় আসে। বিলোনীয়া, সাব্রুম, কৈলাসহর ও ধর্মনগর মহকুমায় এরা বসবাস করে। কমলপুর মহকুমায়ও কিছু মগ উপজাতি বাস করে। ১৯৮১-র জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা ১৮,২৩০ জন। লৌকিক দেবদেবীর পুজোর সঙ্গে সঙ্গে এরা এদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ক্যাং পুজো উদ্‌যাপন করে।

(৮) **লুসাই ঃ** মিজো অধিবাসীদেরই লুসাই নামে অভিহিত করা হয়। সম্ভবতঃ 'জুম' চাষোপযোগী জমির সন্ধানেই এরা ত্রিপুরা রাজ্যে আগমন করে। 'লুসাই' শব্দটি 'লুচাই' থেকে এসেছে যার অর্থ 'মুণ্ডশিকারী'। উত্তর ত্রিপুরা জেলার লংতরাই, কাঞ্চনপুর ও জম্পুই পাহাড়েই এদের বসবাস। বর্তমানে এরা অধিকাংশই খ্রীষ্টান প্রভাবে প্রভাবিত। ১৯৮১ সালের লোকগণনা অনুসারে এদের জনসংখ্যা ৩,৭৩৪ জন।

(৯) **কুকি ঃ** কুকি ও লুসাই উপজাতিগোষ্ঠী দুটো ভিন্ন গোষ্ঠী হলেও মূলতঃ তাদের উৎস এক। মিজো পাহাড় থেকে আগত কুকিরা খোয়াই, কৈলাসহর, ধর্মনগর, অমরপুর, কাঞ্চনপুরে বাস করে। জনসংখ্যা ৫,৫০২ জন (১৯৮১ সেন্সাস অনুযায়ী)।

(১০) **গারো ঃ** গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারোরা সোনামুড়া, ধর্মনগর ও সাব্রুম মহকুমা ব্যতীত ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্রই বাস করে। ১৯৮১-র গণনা অনুসারে এদের লোকসংখ্যা ৭,৩১১ জন। এদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। তবে লৌকিক ধর্মকেও এরা অস্বীকার করেনা।

(১১) **মুণ্ডা ঃ** বিহারের ছোটনাগপুরের অধিবাসী মুণ্ডারা ত্রিপুরার খোয়াই, সদর মহকুমা ও কৈলাসহর মহকুমায় বসবাস করে। এদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। জনসংখ্যা ৭,৯৯৪ (১৯৮১-র সেন্সাস অনুসারে)।

(১২) **ওরাঁও ঃ** মূলতঃ বিহারের অধিবাসী ওরাঁওদের ত্রিপুরায় আগমনের মূল কারণ জানা যায়নি। বর্তমানে ১৯৮১-র জনগণনানুসারে এদের জনসংখ্যা ৫,২১৭ জন।

(১৩) **সাঁওতাল ঃ** বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাঁওতালরা ত্রিপুরায় আসে চা-চাগিচা শ্রমিক হিসাবে। খোয়াই ও সদর মহকুমায় এদের বাসস্থান। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়াতেও বাস করে কিছু সংখ্যক সাঁওতাল। হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হলেও 'সর্বপ্রাণবাদেও এদের বিশ্বাস।

(১৪) **খাসিয়া ঃ** খাসিয়াদের সংখ্যা এই রাজ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এরা আসাম থেকে ত্রিপুরাতে আসে। আসামের খাসিয়াদের তুলনায় এই রাজ্যের খাসিয়ারা তুলনামূলকভাবে দরিদ্র। ১৯৮১ জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা মাত্র ৪৫৮ জন।

(১৫) **ভীল ঃ** সদরের চা-বাগান সংলগ্ন অঞ্চলেই এদের বসবাস। গায়ের রঙ কালো। নিজেদের এরা হিন্দু বলে। বহুবিবাহ প্রচলিত। এরা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। আনুমানিক গত দুশ-আড়াইশো বছরের মধ্যে তারা ত্রিপুরায় এসেছে।

(১৬) **ছাইমল ঃ** হালাম-কুকি গোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত একটি গোষ্ঠীর নাম ছাইমল। এদের রীতিনীতি আচার-আচরণ হালাম-কুকিদের মতোই। জুম-ই এদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। ষাটের দশকের প্রথম দিকে কৈলাসহর, কমলপুর, ও ধর্মনগর মহকুমায় এদের বসবাস ছিল। ১৯৮১-র সেন্সাস অনুযায়ী এদের জনসংখ্যা মাত্র ১১ জন।

(১৭) **ভুটিয়া ও** (১৮) **লেপ্চা ঃ** এরা আসাম, সিকিম, ভুটান ইত্যাদি অঞ্চল থেকে ত্রিপুরায় আসে। লেপ্চাদের জনসংখ্যা ১০৩ এবং ভুটিয়াদের জনসংখ্যা ১৯ জন। (১৯৮১-র গণনা অনুসারে)।

(১৯) **উচই ঃ** এরা রিয়াং সম্প্রদায়েরই অংশ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে উচইরা ত্রিপুরাতে আসে চট্টগ্রাম থেকে। অমরপুর এবং বিলোনীয়া মহকুমায় এরা বসবাস করে। ১৯৮১-র জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা ১৩০৬ জন। (A Look into Tripura : Suren Debbarman)

এই বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠীর রীতিনীতি, আচার-আচরণে মোটামুটিভাবে সাদৃশ্য রয়েছে। জীবন যাপনেও একটি সহজ-সরলতা রয়েছে। জুম নির্ভর সমাজ জীবনে বিবাহ, পূজা-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতেও রয়েছে এক সাদৃশ্যমূলক অবস্থান। আদিবাসীদের মধ্যে ত্রিপুরী, রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রূপিনী, কলই, উচই, মুরাসিং এই আট জনগোষ্ঠীর লোকেরা 'কক্বরক্' ভাষায় কথা বলেন। 'কক্বরক্' তিব্বতী-বার্মিজ ভাষাগোষ্ঠীর বোড়ো শাখার অন্তর্গত। 'কক' শব্দের অর্থ কথা, 'বরক' অর্থ মানুষ।

এই পুস্তকে বিশ্লেষিত কাহিনীগুলোতে এখানকার উপজাতি মানুষদের জীবনযাত্রার এক তন্নিষ্ঠ চিত্রই ধরা পড়ে।

"ঐতিহ্যনির্ভর সাধারণ জনসমষ্টি বোঝাতে যে-অর্থে 'ফোক্' (Folk) শব্দটি ইংরেজীতে ব্যবহৃত হয়, প্রায় অনুরূপ অর্থেই 'লোক' শব্দটির সাধারণ স্বীকৃতি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।"
(লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান ঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৫)

ত্রিপুরার উপজাতি গোষ্ঠীর লোককথায় এখানকার উপজাতি লোকসমাজের কথা বা কাহিনীই বোঝাচ্ছে।

লোককথায় ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা ও রীতিনীতি ঃ

ত্রিপুরা সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন মানুষের মিলনস্থল হিসেবে পরিচিত। এখানকার উপজাতি জনগোষ্ঠী বাঙালী জাতির সংস্পর্শে বিশেষভাবেই বসবাস করছে বহু আগে থেকে।

তবু তাদের জীবনচর্যায় আদিবাসী ধ্যানধারনার একটি সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। সহজ সরল জীবনযাত্রার মূল সুরটিই সেখানে শোনা যায়। দেখা যায় অলৌকিক অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস এবং নির্ভরতা। সর্বপ্রাণবাদী (animism) ধারনার প্রতি একনিষ্ঠতাও উল্লেখনীয় ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই মূলসূত্রগুলোকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে উপজাতিদের সমগ্র রীতিনীতি ও জীবনযাপনের উপাদানগুলো। এই সমস্তই লোককথায় ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে।

খাদ্য আহরণ তথা জীবনধারণের মূল উৎস ছিল জুমচাষ। সহজভাবে বলা যায় জীবনধারণের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল এটি। যাবতীয় আচার-আচরণ, অনুষ্ঠানদির পেছনে জুমচাষ সম্পর্কিত বিষয়গুলোই প্রভাব বিস্তার করেছে। রীতি-নীতি, বিধিনিষেধ ইত্যাদি একে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ধর্মসম্পর্কিত ভাবনায় তারা দেবদেবীর কোনো সুস্পষ্ট রূপকল্পনা করেনি। দেবদেবীর আরাধনায় প্রতীকরূপে বাঁশ পূজো পেয়েছে। গাছপালা, নদী, পাহাড়, পশুপাখি, মাটি ধর্মভাবনার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূজো, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে ঘিরে আমোদ প্রমোদের যে আয়োজন হতো, তারও চিত্র রয়েছে লোককথায়।

সঙ্গীত যে উপজাতিদের জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রকাশক হিসেবে তারও প্রমাণ রয়েছে লোককথায়।

দৈনন্দিন জীবনের বঞ্চনা- প্রাপ্তি, হতাশা, অত্যাচার, প্রেম, স্নেহ, ঈর্ষা সব কিছুরই নিটোল চিত্রও ধরা পড়েছে। যূথবদ্ধ জীবনযাত্রায় সকলের অংশগ্রহণের বিষয়টিও যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অন্তর্লীন মানসিক দ্বন্দ্ব, বিরোধের চিত্রটিও লক্ষ্যনীয়।

সামাজিক রীতিনীতির চিত্রটিও প্রত্যক্ষ অনেকগুলো লোককথায়। পুজো-অর্চনায় অন্যান্য উপচারের সঙ্গে ঘরে তৈরী মদের ব্যবহার আদিবাসীদের জীবনে এক অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। মদ পবিত্রতা সূচক।

এছাড়াও অতিথি আপ্যায়নেও মদ (লাঙ্গি) সর্বাগ্রে ব্যবহৃত হয়। এই মদ তৈরীতে একটি বিশেষ ধরণের পিঠা ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ভেষজ ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে এটি তৈরী করে অনেকদিন রেখে দেওয়া যায়। এর নাম 'চুউান'। লাঙ্গি তৈরী করার সময় এই পিঠার কিছুটা অংশ ভেঙ্গে এতে মিশিয়ে দেয়া হয়।

এদের সাধারণ জীবনযাপনে বাঁশ যেমন দেবপ্রতীক হিসেবে পূজিত হয়, তেমনি খাদ্যদ্রব্য রাখা বা বহন করার কাজেও বাঁশের পাত্রই ব্যবহৃত হয়। বাঁশের একটি গাঁট থেকে অন্য গাঁট পর্যন্ত কেটে পাত্রটি তৈরী করা হয়। এর নাম 'ওয়াছুং'। জুমের কাজে যাবার সময় আদিবাসীরা এতে করে খাবার বয়ে নিয়ে যায়।

পারিবারিক জীবনে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের যে একটি প্রভাব ছিল, তাও বিভিন্ন লোককথায় লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন দেবদেবীকে পূজার মাধ্যমে তুষ্ট করলে যে জীবনে সুখশান্তি ও ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয়, সেই বিশ্বাসও অত্যন্ত গভীর।

উপজাতিদের মধ্যে একবিবাহ ব্যবস্থারই প্রচলন ছিল দেখা যায়। কোনো কোনো কাহিনীতে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের কথা থাকলেও দেখা যায় যে, জুমিয়া প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারের প্রয়োজন তথা শিশুসন্তানের পরিচর্যার কথা ভেবেই দ্বিতীয়া স্ত্রী ঘরে আনে।

অন্যদিকে বিধবা বিবাহের রীতিও প্রচলিত ছিল। এর প্রমাণও কয়েকটি কাহিনীতে রয়েছে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রী অপরাধের যথাযোগ্য দণ্ড পেতো, সে সাধারণ জুমিয়ার স্ত্রীই হোক, কি রাজরাণীই হোক — তাও লক্ষ্য করা যায়।

অতিথি সেবাকে উপজাতিরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছে। তাছাড়া মুখের কথায় অপরকে বিশ্বাস করার মতো মানসিক বলিষ্ঠতাও এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দাসপ্রথাও যে প্রচলিত ছিল তারও প্রমাণ বহন করে এখানকার লোককথা। রাজার অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও রাষ্ট্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে উপজাতি জনগোষ্ঠী সরব হয়ে উঠতে পারেনি। বরং সুন্দরী মেয়েদের বাবা-মাকে নিরাপত্তাহীনতার যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হয়েছে।

রূপকাশ্রিত আদিম জীবন কাহিনী, এর সামাজিক উপাদানসমূহ ঃ

সাধারণ মানুষ অনেক সময়ই প্রভুশ্রেণীর আচার আচরণকে মেনে নিতে না পেরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে অথবা প্রভুশ্রেণীর শোষণ, নৃশংসতা বা অর্থগৃধ্নুতা ইত্যাদি তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে আদিম মানব মনের কথাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সোচ্চার হতে পারেনি নানা কারণে। সেখানেই রূপকের মাধ্যমে তাদের জীবনের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। পশুপাখির কাহিনীর অন্তরালে মানুষেরই জীবনকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে এভাবে। বিড়াল ও মুরগীর বন্ধুত্বও স্বার্থজনিত কারণে শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। এটি আসলে মানুষেরই স্বার্থপরতা তথা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কাহিনী, যা রূপকের আড়ালে বলা হয়েছে (মুরগীর পিঠে)। সঙ্ঘশক্তির অমরত্ব ও চূড়ান্ত বিজয়ের আশার যে আশ্বাস মানুষের মনে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত, এটি তারই দ্যোতক। 'বিচার' গল্পটি পশুপাখিকে ঘিরে। অথচ এখানে রাজা দোষী ব্যাঙকে শাস্তি দিচ্ছেন, যা একেবারেই অস্বাভাবিক ব্যাপার। সমাজে বসবাস করতে গেলে যে পারস্পরিক সমঝোতা সম্পর্কের নীতিটি অনুসৃত হয়, তা একটু বেহিসেবী হলেই, প্রত্যেকের সুবিধেভোগী মুখোশটি অনাবৃত হয়ে পড়ে এবং উচ্চতম ন্যায়াধীশ এর সাহায্য প্রার্থনা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না, এই উপজীব্য বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে কাহিনীটিতে রূপকের সাহায্যে।

রাজার বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার সাধারণ মানুষের থাকে না। অথচ প্রতিনিয়ত এরা রাজার শোষণ, পীড়নের শিকার হয়। যদিও এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তারা সোজাসুজি করতে পারে না, তবু মনের অবচেতনে মুক্তির পথ খোঁজে তারা এবং অবশেষে বুদ্ধির জোরে অতিপরাক্রমী শাসক তথা শোষককেও যে গদীচ্যুত করতে পারে সেই কাহিনীটিই রূপকের

মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখা যায় 'সজারুর বুদ্ধি' কাহিনীতে। শ্রেণী ভিত্তিক সামন্তসমাজে সামন্তপ্রভুর উৎপীড়নকে হাতির রূপকে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

এভাবেই বিভিন্ন রূপকের অন্তরালে এক একটি উপজাতি লোককথা তার প্রাণরস প্রবাহিত করে রেখেছে।

গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসৃত হবার ফলে সর্বতোভাবে উপজাতি মানুষদের সমবেত প্রচেষ্টা চিন্তাভাবনা, পারস্পরিক সম্পর্ক, ঐক্যবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলোই সামাজিক উপাদান হিসেবে লোককথায় উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। আদিম কৃষিপদ্ধতি, জুমচাষ নির্ভর সমাজজীবন, লোকপ্রথা, লোকবিশ্বাস, শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বসংঘাত ইত্যাদি প্রাণসম্পদগুলো নানাভাবে কাহিনীতে উঠে এসেছে।

আদিম কৃষি পদ্ধতি ঃ

সভ্যতা বিকাশের বর্তমান স্তরে কৃষিপদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কৌশলের ব্যবহার হলেও আদিম কৃষিপদ্ধতির রূপটি ছিল অন্যরকম। অন্যভাবে বলা যায়, আগুন ও কৃষির আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই আদিমমানব সভ্যতার একটি স্তরে উন্নীত হয়েছিল।

ত্রিপুরাতে প্রচলিত কৃষি পদ্ধতি, যা 'জুমচাষ' নামে পরিচিত, তা যে শুধু ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যেই প্রচলিত তা নয়, এখনো 'জুম'ই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ আদিবাসীদের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। শুধু তাই নয় নৃতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা পৃথিবীর সর্বত্রই একদিন এই কৃষিপদ্ধতিই জনজীবনে প্রচলিত ছিল। (১৩)

'জুম' পদ্ধতিতে যারা চাষ করে তাদের 'জুমিয়া' বলা হয় ত্রিপুরাতে। ইংরেজীতে এদেরই নাম Shifting Cultivators। তবে 'জুম' নামটি সর্বত্র প্রচলিত নয়। এই পদ্ধতির নাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। নিম্নলিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে এই প্রসঙ্গটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

".....For instance the Garos tell it 'abagana' while the Khasis use the word 'Lyngkhalum'. This system of cultivation is known as 'Bewar' or 'Dyaya' in Madhya Pradesh, 'Kumari' by Malayalars or Malabar, 'Pama Dohi' 'Konon' or 'Bringa' in North Orissa, 'Gudia' or 'Doongarchar' in the South Orissa. The Reang of Tripura again have 'Hookni Smong' as synonym to Jhum. However all the tribal communities including personnal of the administration are very much closely acquainted with only the term 'Jhum'. (১৪)।

'জুম' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয় যে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে যে মানবগোষ্ঠী আসামের পার্বত্যাঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল, তাঁরা তাদের আদি বাসভূমিকে 'চাও-থিউস' নামে অভিহিত করতো। পরবর্তী সময়ে এই শব্দটি নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে 'জুম' শব্দে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে এই বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য।

"There are few lines of historicl interest behind the evolution of the term 'Jhum'. Rajmohan Nath, the eminent historian who wrote book of ethnological importance mentioned that the people who once migrated from the south west part of China to Kamrup used to tell 'Chao-Thieus' when refering their original place of above. The very word 'Chao-Thieus' assumed many changes in it and it was pronounced in various typical ways depending upon different phonetic change which took place from time to time. Thus 'Chao Thieus' was once developed as 'Jehe-thieus' which meant people of high land and since then 'Jehe' was 'evolved' as a word to mean 'high land', because the people of this group who migrated from south-west part of China settled in the hilly part of Assam and adopted a type of cultivation in which paddy, turmeric and other useful seeds were sown by the use of 'Takhal' (a kind of hoe). Such cultivation was named 'Joho-Mo' and this very term 'Joho-Mo' sometimes assumed the name Jhum which means cultivation in hill slopes by the use of hoe." (১৫)

এই প্রথায় চাষ করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার উপজাতিরা কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস নাগাদ জুমের জন্য স্থান নির্বাচন করে। একটি বাঁশকে দুখণ্ড করে কেটে উঁচুতে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। যদি একটি টুকরো সোজা ও অন্যটি উল্টো ভাবে মাটিতে পড়ে তবে নির্বাচিত স্থানটিকে শুভ বলে ধরে নেওয়া হয়। জুমের জন্য নির্বাচিত জায়গায় একটি বাঁশের ডগায় দুটো বাঁশের ছোট টুকরো আড়াআড়িভাবে বেঁধে দিয়ে মাটিতে বাঁশটিকে পুঁতে দেওয়া হয়। এই চিহ্ন দেখে অন্যান্যরা বুঝতে পারে যে, স্থানটি অন্য কেউ জুমচাষের জন্য নির্বাচন করে গেছে। ফলে সেই জায়গায় অন্য কেউ আর জুম চাষের উদ্দেশ্যে আসে না। তারপর নির্বাচিত জমির গাছপালা কেটে দিয়ে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এই জঙ্গল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গাছপালা পোড়া ছাই জমিতে সারের কাজ করে। এরপর বৈশাখী বৃষ্টি পেয়ে মাটি উর্বরা হয়ে উঠে। তখন বীজ বোনার পালা। ভালো দিন দেখে স্নান করে বীজ বোনা হয়। এতে পরিবারের সকলেই প্রায় অংশ নেয়। নানা ধরণের বীজ যেমন ধান, তিল, ভুট্টা, লঙ্কা, ফুটি, বেগুন, কাঁকুড়, তুলো, শশা, তরমুজ একসঙ্গে বোনা হয়। প্রথম বৃষ্টির পরই টাক্কাল দিয়ে মাটিতে গর্ত করে মুঠো মুঠো বীজ সারিবদ্ধভাবে (সবগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে) বুনে দেয়। চারা বেরোনোর পরই শুরু হয় আগাছা পরিষ্কারের কাজ। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে জুমক্ষেত পরিষ্কার করা হয়। এই সময়ে ভুট্টা, ফুটি, কাঁকুড় প্রভৃতি সুপক্ক হয়।

ভাদ্রমাসে ধান কাটা হয়। কার্তিক মাসে কার্পাস ও তিল সংগ্রহ করা হয়। এভাবে একের পর এক ফসল উৎপাদিত হতে থাকে এবং সারা বছরের খাদ্য সংগৃহীত হয়। 'জুম'-এ উপজাতিরা নানা রকম কচু উৎপন্ন করে। সেগুলো অত্যন্ত স্বাদু। জুমের ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য বীজ বোনার কাজ শেষ হয়ে যাবার পরই অদিবাসীরা জুমচাষের জায়গার কাছাকাছি বাঁশ দিয়ে উঁচু

করে একটি ঘর তৈরী করে, এই ঘরটির নাম এদের ভাষায় 'গীয়রিং'। বাড়ীর বয়স্ক ছেলে সস্ত্রীক এই 'গীয়রিং'-এ থেকে ফসল পাহারা দেয়। কখনো কখনো অবিবাহিত যুবকযুবতীরাও বিভিন্ন 'গীয়রিং-এ থাকে। জুমের কাজে স্ত্রী পুরুষ সকলেই নিযুক্ত থাকে। (১৬)

দীর্ঘদিন কোনো এক জায়গায় 'জুমচাষ' করা হলে পরবর্তী সময়ে মাটির উর্বরতা কমে যাওয়ার ফলে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় না। সেজন্য প্রতি ৩/৪ বৎসর পর পর জুমের জমি পরিবর্তন করা হয়। পূর্বোল্লিখিত ভবে নতুন স্থান নির্বাচন করে একই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। সেখানেও এভাবে ৩/৪ বৎসর করার পর আবার অন্য জমি নির্বাচন করা হয়। কখনো পূর্বের জমিতেও ফিরে আসে, কারণ ততদিনে পুরনো পরিত্যক্ত জমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এভাবেই আবর্তিত হ'ত আদিম অধিবাসীদের জুমিয়া জীবন। ত্রিপুরার পার্বত্যাঞ্চলে আজও একইভাবে বয়ে চলেছে আদিবাসীদের জুম কৃষিভিত্তিক জীবন।

জুমচাষ নির্ভর সমাজজীবন ঃ

ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের কাছে 'জুমচাষ' শুধুমাত্র জীবনধারণের উপায়ই নয়, এদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটি এমনভাবে গ্রথিত যে 'জুমচাষ'ই এদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। 'জুম' একটি চাষপদ্ধতি যেমন, তেমনই এটিকে ঘিরেই আবহমানকাল ধরে এদের জীবন আবর্তিত হচ্ছে। সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক সমস্ত কিছুই জুমকেন্দ্রিক। বিভিন্ন উৎসব, নতুন ঘর তৈরী করা, বিয়ের দিন স্থির করা ইত্যাদিও নির্ভর করে জুমচাষের উপর। জুমচাষের বিভিন্ন পর্যায়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরণের সংগীত ও নৃত্য। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ নিয়ে এই সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে ফুটে ওঠে জুমে ভালো ফসল উৎপাদনের কামনা।

জুমনির্ভর অর্থনৈতিক জীবনে উপজাতি সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সহজ জীবনযাপনেই অভ্যস্ত ছিল। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিষই নিজেরা তৈরী করে নিতো। কারো কাছে সাহায্যের জন্য তাদের হাত পাততে হত না। কখনো কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে বিনিময়ে দাতাকে কোনো জিনিষ দেয়া হ'ত।

জুমের ফসলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বুক থেকে তারা সংগ্রহ করেছে বিভিন্ন ফল-মূল, কচু, ওল, বাঁশের করুল, তারা (বেতের অঙ্কুর)। ছোট ছোট ছড়ানদী জুগিয়েছে বিভিন্নধরণের মাছ আর অরণ্য দিয়েছে বিভিন্ন পাখি, এমনকি হরিণ, বাঁদর, হাঁস, বাঘ, মুরগী, কাক, ছাগল, শূয়োর, সাপ, হাতি ইত্যাদির মাংস। বিভিন্ন পশুপাখিকে বিশেষভাবে হত্যা করা হ'ত এদের হাত থেকে জুমের ফসল রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। যার ফলে বয়স্ক ব্যক্তিরা ছোট ছোট ছেলেদের খুব অল্প বয়সেই অস্ত্র চালনা ও ফাঁদ পেতে পশুশিকার করার বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দিতো। বয়স্ক ব্যক্তি এবং যুবকেরা এককভাবে যেমন, তেমনই যূথবদ্ধভাবে শিকারে অংশগ্রহণ করতো। তবে শিকারে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। জুমের ফসলের লোভে আসা হরিণ, শূয়োর, খরগোস ইত্যাদি ছোট প্রাণীগুলো ব্যক্তিগতভাবেই শিকার করা হ'ত।

জুমিয়াদের সামাজজীবন কতটুকু জুমনির্ভর তা বোঝা যায় জুমচাষের বিভিন্ন পর্যায়গুলো লক্ষ্য করলে। জীবনের মৌলিক চাহিদা খাদ্য ও বাসস্থান। জুমক্ষেত তাদের খাদ্যের সমস্ত উপকরণের জোগান দিয়েছে আর বাসস্থানও নির্মিত হয়েছে জুমক্ষেত সন্নিহিত স্থানেই। মূল উদ্দেশ্য ছিল জুমের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ। চাষের জন্য জমি নির্বাচন থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত চাষ-পর্যায়ে সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যায়ে ফসল তোলার সময় পরিবারস্থ সকলে সমবেতভাবে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রয়োজন হলে গ্রামের অন্য জুমিয়ারাও কাজে সহায়তা করে। এভাবে এরা প্রত্যেকেই একে অন্যকে পারস্পরিক সহায়তা দান করে।

জুমের কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও এরা নিজেরাই তৈরী করে। বিশেষতঃ বাঁশ-বেতের কাজে উপজাতি যুবকদের দক্ষতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বলে গণ্য হয়। 'লাঙা' (ফসল নেবার ঝুড়ি, যা পিঠে বহন করা হয়) তৈরী করার দক্ষতা থাকা প্রত্যেক পুরুষেরই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে যুবক উৎকৃষ্ট 'লাঙা' তৈরী করতে সক্ষম হয়, সে বিবাহযোগ্য পাত্র হিসেবেও উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিধেয় 'রিছা' (বক্ষাবরণী) ও 'পাছড়া' বোনায় দক্ষতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই এই দক্ষতার অভাব অত্যন্ত অসম্মানজনক বিষয়। রিছা, পাছড়া ইত্যাদিও প্রস্তুত হয় জুমে উৎপাদিত তূলোর সাহায্যে। তূলোর বীজ ছাড়ানোর কাজে পুরুষেরা সাহায্য করে, এমনকি বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে তাঁতযন্ত্রটিও পুরুষেরাই তৈরী করে দেয়, কিন্তু বয়নের কাজে শুধু মেয়েদেরই অধিকার।

পরিবারগুলোতেও যূথবদ্ধজীবনের ছবি। যদিও স্বামী স্ত্রী ও শিশুসন্তানদের নিয়ে গঠিত ছোট পরিবারও (নখংকসু) রয়েছে তবু বৃহদায়তন পরিবারের প্রতি (নখংগকাতার) এদের প্রচ্ছন্ন আনুগত্য রয়েছে। তিন-চার প্রজন্মের জীবিত মানুষদের নিয়ে গঠিত হয় বৃহদায়তন পরিবারগুলো। এরা একই আশ্রয়ে বাস করে এবং একই অন্নে জীবনধারণ করে। আট থেকে কুড়ি সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত বৃহৎ পরিবারগুলো এখনো আদর্শ পরিবার হিসেবে বিবেচিত হয়। জুমচাষের ক্ষেত্রে পরিবারস্থ সকলের অংশগ্রহণই হয় উল্লেখযোগ্য এবং বৃহৎ পরিবারের প্রতি আকর্ষণের অন্যতম মূল কারণ এটি। পরিবারগুলো বিভক্ত হয়ে ছোট ছোট এককে পরিণত হলে জুমের ক্ষেত্রও বিভক্ত হয়ে যায় এবং এতে ফসলের উৎপাদনও কম হয় বলে জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও অসুবিধেজনক। অন্যদিকে বৃহদায়তন পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে জুমচাষটিও হয় সবদিক থেকে লাভজনক।

বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টির সঙ্গেও জড়িত রয়েছে জুমবিষয়ক ভাবনা। বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীগ্রহণ করার সময় স্ত্রীর পিতাকে বিনিময়মূল্য দেবার (bride price) প্রথা রয়েছে উপজাতি সমাজে। পিতার পরিবারে জুমের উৎপাদনে মেয়েটির প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে। বিবাহের ফলে তার অভাবজনিত ক্ষতিপূরণের ভাবনাটিই এই প্রথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এছাড়াও

উপজাতিদের মধ্যে 'চামারি কামানি' বা 'জামাইখাটা' নামে যে বিবাহ পদ্ধতি অত্যন্ত আদরণীয় ছিল, তাতে দেখা যায় যে বিবাহযোগ্য যুবককে নির্বাচিতা কন্যার বাড়ীতে থেকে এবং বিভিন্ন কাজকর্মের দ্বারা নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হ'ত। ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে যুবকদের ৩ থেকে ৫ বৎসরব্যাপী সময়কাল অতিবাহিত করতে হত। সেখানে দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে জুমের কাজেও তাকে নিয়োজিত হ'তে হ'ত। কারণ বাঁশ-বেতের কাজে দক্ষ এবং জুমচাষের কাজে দক্ষ যুবকই বিবাহের জন্য যোগ্যতম পাত্র বলে বিবেচিত হত। অন্যদিকে পাত্রী নির্বাচনেও লক্ষ্য রাখা হত মেয়েদের তাঁতের কাজে ও জুমের কাজে দক্ষতার উপর। ফলে বিবাহের মাধ্যমে পরিবারে নতুন সদস্য বা সদস্যার আগমনও জুমচাষকেন্দ্রিক ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই বিবাহপদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে লক্ষ্য করা যায় যে, সংসারজীবনে প্রবেশাধিকার লাভে ইচ্ছুক যুবকদের জুমচাষ সংক্রান্ত সব কাজে প্রশ্নাতিরিক্ত দক্ষতার প্রমাণ লাভ করা। পনেরো/ষোল বছর বয়স থেকেই জুমের কাজে ছেলেদের নিয়োগ করা হয়। উচ্ছৃঙ্খল আচার আচরণ থেকে তাঁদের বিরত রাখার জন্যই 'জামাইখাটা' নামক বিবাহ প্রথার প্রচলন বলেও মনে করা হয়। (১৭)

খাদ্য ও বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পূরণের পর উপজাতি মানুষের মন নান্দনিক অনুভবের পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে যে সঙ্গীত, নৃত্য বা লোকসাহিত্যের জন্ম দিয়েছে সেখানেও ফুটে উঠেছে জুমক্ষেতের অথবা জুম সম্পর্কিত বিভিন্ন চিত্র। প্রেম-প্রীতি, বিরহের কথায় বা গানেও জুমেরই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।

নান্দনিক অনুভবের জন্যই উপজাতিদের সমাজ জীবনে কোনো জটিলতা অথবা মারাত্মক অপরাধজাতীয় ঘটনাও অতীতে তেমন ছিল না।

উপজাতি সমাজ জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ, বিভিন্ন পূজো আর্চার মধ্যেও রয়েছে জুমের জন্য মঙ্গলকামনা। জুমচাষের একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই শুরু হয় জুমকেন্দ্রিক পূজো-অর্চনা। উৎপাদনের প্রতিটি পর্বেই থাকে কিছু না কিছু জুম সম্পর্কিত অনুষ্ঠান।

জুমচাষ আসলে ত্রিপুরার উপজাতিদের সমগ্র সমাজজীবন তথা যূথবদ্ধতার প্রতীক। এর ভেতর থেকেই জন্ম নিয়েছে এদের সমাজ-সংস্কৃতি। সকলের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার স্পর্শ নিয়ে আচরিত হয়েছে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ সমস্ত কিছুই। এখানকার লোককথাগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জুমচাষের উপরই যে তাদের বৃত্তিগত ঐতিহ্য তা খুবই স্পষ্ট ও প্রকট। জুম থেকে এদের কাহিনীকে কখনোই আলাদা করা যায় না।

লোকবিশ্বাস ও লোকপ্রথা ঃ

সংহত জনসমষ্টি যে বিশেষ আচার আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে এবং যেগুলোর সঙ্গে শুভ-অশুভবোধ জড়িত, তা-ই লোকবিশ্বাস। শুভ-অশুভবোধের ধারণা জড়িয়ে যে সমস্ত আচরণ বা কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তা লোকপ্রথা।

এমন কোনো জনগোষ্ঠী দেখা যায় না, যাদের মধ্যে কোনরকম লোকবিশ্বাস ও লোকপ্রথা অনুপস্থিত। আদিম মানুষের ক্রমাগত এবং পৌনঃপুনিক পর্যবেক্ষণের ফলে এই সমস্ত লোকবিশ্বাস এবং লোকপ্রথার উদ্ভব। ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায়ও উপজাতি সমাজের বিভিন্ন বিশ্বাস ও প্রথার পরিচয় রয়েছে।

এখানকার উপজাতি সমাজের লোকবিশ্বাস ও লোকপ্রথা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এক অলৌকিক জগৎ তথা 'আত্মা' সম্পর্কিত ধারণাকে কেন্দ্র করে। এই ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও জুমসম্পর্কিত সমস্তরকম ভালোমন্দকে ঘিরে। যার ফলে বিভিন্ন আচার-আচরণ ও পুজোর উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়।

ত্রিপুরার প্রধান পুজো উৎসব 'খার্চি ও ' কের'-এর মূল উদ্দেশ্যই দেবদেবীদের কাছে জনসমাজের মঙ্গল কামনাজনিত। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ দেবদেবী কল্পনা করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শুভ ফলদানকারী হিসেবে। যেমন মাইলুমা (ধান্যের দেবী), মতাই-কতর ও মতাই-কতরমা (সুরক্ষা ও ঐশ্বর্যের দেবদেবী), আখাত্রা-বিখাত্রা (দ্বৈতভাবে এদের নাম 'লাম্প্রা'। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অগে এদের পুজো করা হয়) তুইমা (জলের দেবী), সাংগ্রামা (ধনসম্পদের দেবতা), খুলুমা (তুলোর দেবী), নক্ছুমৌতায় (গৃহের দেবী), কালাইয়া গরাইয়া (সাফল্যের দেবতা), ছাক্লাক মৌতায় (সুস্বাস্থ্যের দেবতা), মামিতা বা মৌইকাতাল (বিন্নিচালের পুজো), বুড়াছা (রোগশোকের দেবতা) ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে আরো অসংখ্য গ্রাম্য দেবদেবী। আদিম মানুষের মনে ভয় এবং বিশ্বাস থেকে বিভিন্ন জীবপুজো, অচেতন পদার্থ পুজো এবং সর্বপ্রাণ পুজোর সৃষ্টি হয়েছিল বলেই মনে করা হয়। বিভিন্ন প্রকার মন্ত্রের অশেষ কার্যকারিতায়ও বিশ্বাসী আদিবাসী সমাজ। এই প্রসঙ্গে 'অচাই' বা ওঝার (পুরোহিত) সামর্থ্য প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকৃত।

দেহের বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে অশুভ শক্তির যোগ থাকে, এই বিশ্বাসটি নানা জায়গায়ই দেখা যায়। এই বিশ্বাসটিই প্রত্যক্ষভাবে ত্রিপুরার লোককথায় পাওয়া যাচ্ছে পাখিদের মল ত্যাগের মধ্য দিয়ে, 'নাঐ পাখির গল্পে'।

উপজাতি জীবনে বাঁশের এক অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে। গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য সমস্ত উপকরণই তৈরি হয় বাঁশের সাহায্যে যা ত্রিপুরার আরণ্যক পরিবেশে সহজলভ্য। এদের সহজ সরল জীবনে খাদ্য ও আশ্রয় দুটোরই জোগান দিয়েছে বাঁশ। হয়তো এই কারণেই কোনোরকম মূর্তি কল্পনার অবকাশ না রেখে এখানকার জনগোষ্ঠী সরাসরিভাবে 'বাঁশ'কে পুজো করে আসছে আবহমানকাল ধরে। অন্যদিকে এর ভেতর দিয়ে আদিম সমাজের বৃক্ষ পূজার নিদর্শনও প্রকাশিত হয়।

গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে মানুষের একাত্ম কল্পনা আদিম মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন তথা লোকবিশ্বাসেরই পরিচায়ক। তারও চিত্র পাই উপজাতি লোককথায় চন্দ্র দেবতার সঙ্গে মর্ত মানবীর বিবাহের মাধ্যমে। (দ্রঃ 'চাঁদের ছেলে' কাহিনী)

স্বপ্নের মাধ্যমে দেবতার নির্দেশ পাওয়ার ব্যাপারে এরা খুবই বিশ্বাসী। বিভিন্ন লোককথাগুলো তার পরিচয় দেয়। জুমচাষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, চাষের জমি নির্বাচন করা হলে পর সেই জমির একটু মাটি এনে কাপড়ে বেঁধে পরিবারের কর্তাব্যক্তি রাতে তার বালিশের নীচে রেখে ঘুমোয়। রাতে স্বপ্নের মাধ্যমে সে জানতে পারে এই জমি চাষের পক্ষে ভালো হবে কিনা। আবার জমি তৈরী হলে পর বীজ বোনার দিনও নির্দিষ্ট হয় স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী ।(১৮) এভাবেই দেখা যায় স্বপ্নভিত্তিক লোকবিশ্বাস এদের সমাজজীবনে কত দৃঢ়মূল হয়ে আছে।

শুভ অশুভের দ্বন্দ্বসংঘাত

শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে মানুষ চিরকালই শুভের পূজারী। সত্য ও শুভকে যত সে কামনা করেছে, ততই অসত্য, অশুভ তাকে তাড়া করে ফিরেছে। এভাবেই সৃষ্টির অদিলগ্ন থেকে প্রকৃতির বুকে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে বিরোধী শক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই বিরোধীতা কখনো এসেছে প্রকৃতির ভেতর থেকেই। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদির সঙ্গে বনের হিংস্র পশুর আক্রমন তো আছেই। তাছাড়াও মানুষই মানুষের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে একসময়। অশুভ চিন্তা শুভচেতনাকে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছে। যদিও পরিণতিতে সবসময়ই অশুভ পরাজিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব সংঘাত সবই ফুটে উঠেছে লোককথায়।

এই সংঘাতের চিত্রটি ফুটে উঠেছে কখনও পশুতে-পশুতে, কখনো মানুষে রাক্ষসীতে, কখন মানুষ ও পশুতে কখনও অলৌকিক শুভ শক্তির সঙ্গে অকল্যাণকারী শক্তির।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্রটিই সর্বক্ষেত্রে প্রকাশিত । তবে অশুভ শক্তি লোককথায় কখনোই জয়ী হতে পারেনি।

ত্রিপুরার লোককথার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রিম ও উইলহেলম কার্ল গ্রিম নামে দুভাই প্রথম লোককথার একটি সংকলন প্রকাশ করেন। তখন থেকেই লোককথার পদ্ধতিগত অলোচনার সূত্রপাত হয় এবং একে একে গড়ে ওঠে নানা পদ্ধতি, মতবাদ ও তত্ত্ব।

লোকপ্রথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলো একের পর এক উদ্ভাবিত হ'ল সেগুলো এরকম (১) তুলনামূলক পদ্ধতি, (২) ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতি (৩) মনোসমীক্ষাগত পদ্ধতি (৪) ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি (৫) জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি, (৬) নৃবিজ্ঞানগত পদ্ধতি (৭) রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও (৮) টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতি।

তুলনামূলক পদ্ধতিতে গ্রিমভাইরা বললেন যে, সাদৃশ্যমূলক লোককথাগুলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত। তাঁদের এই ইন্দো ইউরোপীয় তত্ত্ব অবশ্য স্বীকৃতি পায়নি(১৯)

পরবর্তীকালে জুলিয়াস ক্রোন ও তাঁর পুত্র কার্লে ক্রোন তুলনামূলকপদ্ধতি অনুসরণ করে সৃষ্টি করলেন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বলা হল, যে কোনো একটি

লোককথার সৃষ্টির ইতিহাস ও উৎসের অনুসন্ধান সম্ভব এই ঐতিহাসিক- ভৌগোলিক পদ্ধতিতে। এরজন্য প্রয়োজন সেই বিশেষ লোককথার বিশ্বব্যাপী যত পাঠান্তর অছে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই পদ্ধতিতে লোককথার উৎস নির্ণয়ে ও লোককথার বিশ্বব্যাপী পরিভ্রমণের তথ্যানুসন্ধানে সার্থক হলেও একটি লোককথার বিশ্বব্যাপী পাঠান্তর সংগ্রহের কাজে সীমাবদ্ধতাজনিত অসুবিধে কিছুটা থেকে যায়।

অষ্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড লোককথা বিষয়ে মনোসমীক্ষাগত পদ্ধতির জনক। তিনি লোককথাকে মনোসমীক্ষণের দ্বারা বিশ্লেষণ করে বললেন যে, পুরাকাহিনীতে যে ঘটনা ছিল আকস্মিক, অজানা এবং দুর্ঘটনাজনিত, তার মধ্যে আসলে নিহিত ছিল যৌনচেতনা।

সুইজারল্যাণ্ডের মনোবিজ্ঞানী কার্ল গুস্তাভ য়ুং এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আরো একটু এগিয়ে বললেন যে, অধিকাংশ পুরাকাহিনী মানসিক ও যৌন অতৃপ্তি থেকেই জাত। লোকসংস্কৃতিবিদরা লোককথার উৎস সন্ধানে এই পদ্ধতিকে মেনে নিতে পারেন নি। লোককথা বিশ্লেষণে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যথেষ্ট সহায়ক, এ কথাও অনস্বীকার্য।

কার্ল-মার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদ, যাকে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি' বলা হয়, তাতে বলা হয় যে মানবসভ্যতার ইতিহাস আসলে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। এই দর্শনে বলা হয়, আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া আবহমানকাল ধরে যে সমাজধারা চলে আসছে তা হল শ্রেণীদ্বন্দ্ব, হানাহানি, বিদ্বেষ ও শোষণের ইতিহাস। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষরূপে অবিরাম সংগ্রাম করেছে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে। সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব হওয়াতেই এই বিরোধের সৃষ্টি। যে জমিতে সকলের অধিকার ছিল, অসমবন্টনের ফলে এবং অসম সুযোগের ফলে তাতে দেখা দিল বৈষম্য। চতুর ও শক্তিশালী মানুষেরা চাষের ভালো জমি দখল করে বসলো। আর যারা অল্প ও অনুর্বর জমিতে প্রাণপণে চাষ করেও বছরের খোরাক জোগাড় করতে পারলো না, তারা বাধ্য হ'ল অন্যের জমিতে শ্রমশক্তি নিয়োগ করতে।

এই পদ্ধতি ইতিহাস সম্মত ও বিজ্ঞান নির্ভর হওয়া সত্বেও লোক সংস্কৃতিবিদ্দের বিরূপতার সম্মুখীন হল। তবে লোককথার ঐতিহাসিক-সামাজিক বিশ্লেষণে এই পদ্ধতির সংযোজন উল্লেখনীয়। সমাজমননকে এই পদ্ধতিতে কিছুটা স্পর্শ করা যায়। জাতীয়তাবাদী তত্ত্বের মূল উদ্গাতা এডলফ হিটলার। লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন ঐতিহ্যের লিখিত রূপ প্রকাশ করে এই পদ্ধতিবাদীরা বললেন প্রাচীনতম লোকায়ত উৎস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জার্মানজাতি পৃথিবীর সুসভ্যতম জাতি। উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থন থাকায় এই পদ্ধতি সমর্থন পায় নি লোকসংস্কৃতিবিদ্দের কাছে।

নৃবিজ্ঞানগত পদ্ধতির উদ্গাতা হলেন নৃবিজ্ঞানীরা। এর পথিকৃৎ-এর নাম ফ্রোন্জ বোয়াজ। বোয়াজ প্রমাণ করলেন যে, লোককথার মধ্যে সুদূর অতীতের মানব সংস্কৃতির ফসিল নিহিত থাকে। টাইলর, ফ্রেজার প্রভৃতিরা এই পদ্ধতির অনুসরণ করলেন। নৃবিজ্ঞানগত পদ্ধতিতে বলা হল, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের গ্রামীণ সমাজের মৌখিক ঐতিহ্য লোককথা সেই সমাজের

লোকায়ত সংস্কৃতিকে ধরে রাখে। সমাজ বিবর্তনের ধারায় এটা বোঝা গেছে যে, অসম বিকাশ সত্ত্বেও প্রতিটি সমাজই কতগুলো নির্দিষ্ট সামাজিক স্তর অতিক্রম করে। (২০) এরাই সমাজ বিবর্তনের ধারায় লক্ষ্য করলেন পৃথিবীতে সমাজের এক বিশেষ স্তরে ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ-রীতির প্রচলন ছিল। এই পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ধারাকে অনুসরণ করলেও অনেকেই এর সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করলেন।

সাম্প্রতিককালে লোকসংস্কৃতি আলোচনায় সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বিতর্কিত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হল রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। ১৯২৮ সালে সোভিয়েট লোকসংস্কৃতিবিদ্ ভ্লাদিমির জে প্রপ তাঁর 'মরফোলজিয়া স্কাজ্‌কি' নামক গ্রন্থে লোককথার রূপতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন। তাঁর প্রদর্শিত মৌলিক তথ্যগুলো এরকম ছিল—(১) লোককথা যখন একস্থান থেকে অন্যস্থানে অথবা এক গোষ্ঠী থেকে অন্যগোষ্ঠীতে পরিভ্রমণ করে, তখন নানা রূপান্তর বা বিষয়ের পরিবর্তন ঘটলেও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হয় না। (২) পরিভ্রমণের সময় ক্রিয়াশীলতা অপরিবর্তনীয় থাকে। এই ক্রিয়াশীলতার ক্রম প্রবাহ সকল লোককথাতেই সঙ্গতিপূর্ণ থাকে। তাছাড়া এই ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতেই লোককথার শ্রেণীকরণও করা প্রয়োজন। (৩) তৃতীয়তঃ লোককথার পাত্রপাত্রীদের মূল ক্রিয়াশীলতাকে মোট একত্রিশটি ভাগে ভাগ করা হল। প্রথমেই নায়কের পরিচয়, সমাজে তার স্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান প্রভৃতি লোককথার প্রাথমিক অবস্থা হিসেবে কাহিনীতে থাকবে। এরপরই আসবে ক্রিয়াশীলতাগুলো। (২১) সব ক্রিয়াশীলতাই যে সব গল্পে থাকবে তা নয়। দেখা গেছে অধিকাংশ লোককথায়ই দশটি থেকে বাইশটি ক্রিয়াশীলতার সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রপ্ লোককথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্সের গুরুত্বও অনুভব করেন। ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লড্ লেভি ষ্ট্রস্‌ও লোককথার রূপতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রপের মতোই প্রতিটি মোটিফের বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দিলেন। রূপতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে ষ্ট্রস্ একটি নতুন কথা বললেন যে, লোকসাহিত্যের সকল উপাদানের মধ্যেই একটি যুগ্ম বৈপরীত্য বা binary opposition রয়েছে। এর সপক্ষে তিনি একটি সূত্রও নির্দেশ করলেন।

রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে পরবর্তীসময়ে সম্প্রসারিত করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে নোয়াম চমস্কি, ই কে মারাণ্ডা, পি মারাণ্ডা, অ্যালান ডানডেস্ অন্যতম। ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই চমস্কির বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি অধিক কার্যকর।

লেভি ষ্ট্রসকৃত সূত্রটিকে অনুসরণ করে মারাণ্ডা দম্পতি নিজস্ব কিছু পদ্ধতিও যোগ করেছেন। অ্যালান ডানডেস্ ও মোটিফ ইনডেক্সের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। ত্রিপুরার লোককথার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে প্রপ্‌কৃত মৌলিক তথ্যগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকা, ক্রিয়াশীলতার সঙ্গতিপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় ক্রমপ্রবাহ এবং প্রাথমিক অবস্থাসহ ক্রিয়াশীলতার বিভিন্নরূপ ইত্যাদি লোককথার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো ত্রিপুরার লোককথায় বিদ্যমান রয়েছে লক্ষ্য করা যায়।

তাছাড়া গল্পগুলোর শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে অ্যান্টি আর্ণে-স্টীথ টমসনকৃত টাইপ ইনডেক্সের সহায়তা নেয়া হয়েছে। প্রতিটি গল্পেরই শ্রেণীকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকসংস্কৃতি গবেষক স্টীথ টমসন নির্দেশিত মোটিফ বিন্যাস পঞ্জীকে অনুসরণ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, টমসন যে পঁচিশ হাজার মোটিফ পঞ্জীভুক্ত করেছেন তার বাইরে নতুন মোটিফ অবিষ্কৃত হলেও সেগুলোকে মূল ভাগগুলোর অন্তর্গত মোটিফের সংখ্যায় দশমিক প্রথা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। টাইপ ইনডেক্সের ২৪৯৯টি সংখ্যার ক্ষেত্রেও তেমনি ক, খ, গ, ঘ (a,b,c,d) র সাহায্যে বাড়িয়ে নেয়া যায়।

বর্তমান পুস্তকে সংকলিত সমস্ত কাহিনীর টাইপ ও মোটিফ বিশ্লেষণের কোথাও কোথাও 'টাইপ ইনডেক্স' ও 'মোটিফ ইনডেক্স' এর নির্দিষ্ট সূচক সংখ্যার নির্দেশ করা না গেলেও মূল শ্রেণী (টাইপ) ও মূল অভিপ্রায় (মোটিফ) গুলো সব ক'টি কাহিনীর ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ করে দেখানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া লেভি স্ট্রসের সূত্রানুযায়ীও

[সূত্র - fx (a) : fy (b) :: fx (b): fa-1(y)]

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যুগ্ম বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়াশীলতায় কাহিনী আবর্তিত হতে হতে মধ্যস্থকারী শক্তির সহায়তায় এদের সুন্দর পরিসমাপ্তি লক্ষ্য করা যায়।

কয়েকটি কাহিনীর ক্ষেত্রে মারাণ্ডা দম্পতিকৃত সূত্রটিও (QS : QR : FS : FR) প্রয়োগ করে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ত্রিপুরার উপজাতি সমাজমানস নিরূপণের প্রচেষ্টা রয়েছে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদী' পদ্ধতির আলোয় লোককথাগুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতির মূলসুরটিকে গ্রহণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু কিছু লোককথার সঙ্গে ত্রিপুরার লোককথাগুলোর পাঠান্তর লক্ষ্য করে এখানকার কাহিনীগুলোর উৎস নির্ণয় এবং লোককথার বিশ্বব্যাপী প্রচরণের তথ্যের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়।

সূত্র উল্লেখ ঃ—

(১) মফিজুল ইসলাম ঃ লোককাহিনী, প্রসঙ্গকথা।
(২) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯১।
(৩) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৫।
(৪) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৮।
(৫) "Many folktales, at least among people of quick wits and intellectual capacity, have not merely the surface meaning of the narrative but contain also a less explicit, perhaps in the main unconscious meaning, which we may call allegorical or symbolic, of value as a general myth bearing some relation to human nature and experience something very much wider and deeper than the plain surface meaning of the story."—

R. M. Dawkins, "The Meaning of Folktales," Folk-lore LXII (1951) p413

(৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৪।

(৭) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৫।

(৮) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৮।

(৯) মযহারুল ইসলাম ঃ ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, পৃঃ ৭৬।

(১০) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০।

(১১) "All aspect of folklore, probably originally the products of individuals are taken by the folk and put through a process of recreation, which through constant variation and repetition become a group product"—
— Standard Dictionary of Folklore. Mythology and Legend (SDFML)ed. Maria Leach,
New York 1949-50, P. 501.
(আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড,পৃঃ ৫ থেকে উদ্ধৃত)

(১২) ডঃ অতুল সুর ঃ ভারতের আদিম মানব ও তার ধর্ম (প্রবন্ধ)
পূর্বাদ্রি, লোকধর্ম সংকলন ১৯৮৯, পৃঃ ৩।

(১৩) "...The general consensus of opinion among anthropologists is that the foundation of agriculture economy was once laid by the shifting cultivators in all parts of the globe."
— A study of the Jhum and Rehabitation in the Union territory of Tripura, By Directorate of Research, P. 10.

(১৪) DO - DO - DO P.10

(১৫) DO - DO - DO P.10

(১৬) কৈলাসচন্দ্র সিংহ ঃ রাজমালা (অখণ্ড), বর্ণমালা প্রকাশনী, পৃঃ ২০।

(১৭) Suchintya Bhattacharjee : From Jhuming to Tapping, P.50

(১৮) DO - DO - DO P.28

(১৯) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ লোককথা বিশ্লেষণের পদ্ধতি, অনুষ্টুপ শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃঃ ১২৮।

(২০) "The assumption is that all people have gone through the same stages of culture in a direct line of evolution and that in each stage they react to the world and express themselves in the same way."
Stith Thompson : The Folktale, University of California Press, 1977, P. 382.
(দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ লোককথা বিশ্লেষণের পদ্ধতি, অনুষ্টুপ শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃঃ ১৬৮ থেকে উদ্ধৃত।)

(২১) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ লোককথা বিশ্লেষণের পদ্ধতি, অনুষ্টুপ শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃঃ ১৪৭।

১ম অধ্যায়

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার বৈশিষ্ট্য

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার উৎস ঃ

ত্রিপুরা সুদূর প্রাচীণকাল থেকে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও সংস্কৃতি মিলনক্ষেত্র রূপে পরিচিত হয়ে আসছে। নানা জাতির সংস্পর্শে, বিশেষতঃ বাঙালী জাতির সংস্পর্শে এই রাজ্যের অধিবাসীগণ বহুকাল ধরেই রয়েছেন। ত্রিপুরার উপজাতি লোককথাসমূহের আকৃতি একটি সুষ্ঠু সংস্কৃতিপূর্ণ সমাজেরই পরিচয় দেয়। লোককথাগুলো জনসমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই প্রতিরূপ।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা একটি অগ্রসরমান আদিম সমাজেরই সৃষ্টি, যে সমাজ পারস্পরিক ভাববিনিময়ে সদা প্রস্তুত ছিল। লোককথা সৃষ্টির উৎস ব্যক্তি বিশেষের মন হলেও, পরবর্তীকালে তা সমষ্টির মানসকেই প্রতিফলিত করে থাকে এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে তার ব্যাপ্তি ঘটে। (১)

সারা বিশ্বজুড়েই লোককথা সৃষ্টির পেছনে মানুষের যে চিরন্তন চিন্তাভাবনা, ভাবাবেগ কাজ করেছে, ত্রিপুরার লোককথার উৎসমূলেও আছে সেই একই প্রেরণা। অরণ্যচারী মানুষ যখন ধাপের পর ধাপ অতিক্রমণের মধ্য দিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ হিসেবে একটি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করতে সক্ষম হল, তখনই ধীরে ধীরে তার মধ্যে দেখা দিলো তাঁর গোষ্ঠী বা সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা। সে সচেতন হল তাঁর পরিবেশ সম্পর্কে। এই সচেতনতা জন্ম দিলো তাঁর মনে সাংস্কৃতিক উপকরণের।

দৈনন্দিন কাজের অবসরে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের মনই নিভৃত আরাম খোঁজে। সেই আরামের অবকাশে মন কখনো কখনো কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে চলে অজানাকে জানার অন্বেষণে। অনুসন্ধিৎসা এসে জড়িয়ে ধরে মনকে। কখনো প্রশ্ন জাগে মনে কার্য্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে, কখনো মনই কার্য্যকারণকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে সমাধানের দিকে এগিয়ে যায়।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার উৎসেও রয়েছে উপজাতি মানুষের কল্পনা, চিন্তাভাবন ও সমাজ মনস্কতার পরিচয়। তাঁদের জাতীয় বীরত্বের কাহিনী, প্রেমিক-প্রেমিকার উচ্ছাস ত্রিপুরার রাজাদের কাহিনী, ধর্মাচরণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদির কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের সূক্ষ্ম রসবোধও ধরা পড়ে। বিভিন্ন পুজোর প্রচলন কি করে হল ইত্যাদিও লোককথ সৃষ্টির মূলে রয়েছে। কোনো কোনো লোককথায় আদিম মানুষের ছায়াও দেখতে পাওয়া যায় তেমনি কোনো কোনো গল্পে আছে প্রাচীন যুগের সেই স্মৃতি যখন মানুষ আগুন ও কৃষি আবিষ্কারে ভেতর দিয়ে সমাজ গঠনে প্রায়াসী হ'ল। শিল্পবোধের প্রসার ঘটলো তাদের জীবনে। ভাষা সৃষ্টি হল, ধর্মবোধও জেগে উঠলো ধীরে ধীরে চেতনায়।

আদিমকালের স্মৃতিবাহী জুমচাষ প্রথা উপজাতি জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তা প্রতিটি লোককথার মধ্যেই কোনো না কোনো না কোনো ভাবে উঠে এসেছে

জীবনধারণের প্রধান উৎসই ছিল ''জুম''। তাই জুমকে ঘিরে উপজাতি জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড, আচার, অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ত। যেহেতু নারী পুরুষ উভয়েই জুমের কাজে নিরত থাকতো, তাই তাদের উভয়েরই জীবনের নানা স্বপ্নও জুমের ক্ষেতে কর্মচাঞ্চল্যের ভেতর দিয়েই গড়ে উঠতো। জীবনধারণের প্রধান উপাদান জুমক্ষেত বা জুম সম্পর্কিত নানা ভাবনা তাই তাদের লোককথায় অবধারিত ভাবেই উঠে আসে।

লোককথার উৎসে তাঁদের ধর্মসম্পর্কিত চেতনাও রয়েছে। তারা প্রাচীণকাল থেকেই দেবদেবীর কোনো সুস্পষ্টরূপ কল্পনা করেনি। আদিমমানব সারা পৃথিবী জুড়েই সভ্যতার একটি স্তরে পৌঁছে প্রকৃতির সকল বিষয়কে স-প্রাণ বলে ভাবতে শিখেছিলো; এটি সকলেই স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর সকল বস্তুতেই সাদৃশ্যের নীতি প্রয়োগ করে মানবীয় গুণারোপের ফলে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্তকিছুই আদিমমানবের কাছে পূজনীয় হয়ে উঠেছিলো। 'সর্বপ্রাণবাদ' বা Animism এর ধারণাই আদিম মানুষের ধর্মসম্পর্কিত ধারণা। গাছপালা, নদী, পাথর, মাটি, পশুপাখি সবকিছুতেই তাঁরা আত্মার অবস্থান কল্পনা করে ধর্মভাবনার আদিভিত্তি রচনা করে। এই ভাবনা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিলো। (২)

এখানকার উপজাতি জীবন চর্যার ক্ষেত্রেও এই ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে। লোককথায় ফুটে উঠেছে সেই বিশ্বজনীন ''সর্বপ্রাণবাদে''-র চিত্র। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, সর্প ইত্যাদির হাতে অসহায় মানুষের মৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই এই সব দুর্যোগ বা উপাদানের হাত থেকে নিষ্কৃতির উদ্দেশ্যে নানারকম চিন্তাভাবনা ও কল্পনা করতে শুরু করলো তারা। এক সময়ে এই সমস্ত চিন্তাভাবনা ও কল্পনার মাধ্যমে তাদের সামনে প্রতিকারের পথও উন্মোচিত হ'ল। গাছপালা, মাটি, পাথর ইত্যাদিকে ভয়মিশ্রিত ভক্তির দ্বারা অর্চনা করতে শুরু করলো। লোককথাগুলোতে তারও চিত্র ধরা আছে কোথাও কোথাও।

পুজো, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে ঘিরে আমোদ-প্রমোদেরও যে আয়োজন হত, তারও চিত্র পাই এইসব লোককথায়।

সমাজজীবনের বিভিন্ন বঞ্চনা, হতাশা, অত্যাচারের কাহিনী, যা মানুষের যন্ত্রণায় ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে সেইসব কাহিনীও লোককথার জন্ম দিয়েছে।

বাস্তবভিত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা কোনো কাহিনী বা ঐতিহাসিক কাহিনীও লোককথার আকার পরিগ্রহ করে। কিংবদন্তীমূলক বহু লোককথারই সৃষ্টি হয়েছে সমষ্টিগত মানুষের চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্র করে।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার যে ঐতিহ্য প্রবহমান, তা প্রধানতঃই মৌখিক। এদের কোনো লিখিত ভাষা ও সাহিত্য ছিলোনা ! মৌখিকভাবেই পরম্পরাক্রমে লোককথার মধ্য দিয়ে তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করে এসেছে। এদের কাহিনীগুলোর উৎস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য, অবমাননা, অজ্ঞতা সত্বেও কাহিনীগুলোর ভেতর দিয়ে সুন্দর জীবনের এক স্বপ্নকে উজ্জীবিত করে রাখা হয়েছে।

লোকমানসে সৃষ্টির যে প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলে, তা পুরুষানুক্রমে প্রবহমান থাকে। লোক সাধারণের মননভঙ্গী ও হৃদয়াবেগের বিশিষ্ট ধারা গঠনের প্রক্রিয়া একটি জাতির উত্তরাধিকারস্বরূপ হয়ে উঠে। লোককথা এই প্রক্রিয়ার একটি প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ হয়।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় এমন অনেক গল্পের সাক্ষাৎ পাই যেগুলোর সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের লোককথারও মিল আছে। স্বাভাবিকভাবেই এই লোককথাগুলোর উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে মনে।

বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ ই বি টাইলর, অ্যান্ড্রু ল্যাঙ্গ, জে জি ফ্রেজার তাঁদের প্রচলিত নৃতাত্ত্বিক ধারাকে অনুসরণ করে বলেছেন যে, সমস্ত দেশের ও জাতির মানবমন এক নিগূঢ় ঐক্যে গ্রথিত। (৩) তাঁদের মতে সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ায় প্রতিটি দেশের প্রতিটি জাতিই একই ধরণের স্তর অতিক্রম করে। এরই ফলে তাদের কাহিনী, প্রথা, বিশ্বাস ইত্যাদিতে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অতীত যোগাযোগ ছাড়াও একই ধাঁচের কাহিনী, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার উপজাতিদের সম্পর্কে (migration) যে তত্ত্বটি পাওয়া যায়, তার মধ্যেও লোককথার উৎস থাকতে পারে। আদিবাসভূমি থেকে এই অঞ্চলে বসতি গড়ার সময়কার মধ্যবর্তী জীবন অভিজ্ঞতার চিহ্নও লোককথা সৃষ্টির উৎসে রয়েছে বলে বিশ্বাস।

ধর্মীয় ধারণা, কাব্যময় কল্পনা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ইত্যাদির উৎসে মানুষের প্রবণতা, ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষার ভূমিকাকে দায়ী করা হয়। আদিম সংঘবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে একমাত্র সংগ্রাম করতে হতো প্রকৃতি ও পরিবেশের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে নিজেকে জয়ী করার জন্যই নানাভাবে তারা যাদুমন্ত্র ও অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিতো। ত্রিপুরার লোককথার উৎসে এই সমস্তকেই খুঁজে পাওয়া যায়।

অতিপ্রাচীণকাল থেকে শুরু করে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে তৎকালীন মানুষের চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে এই কাহিনীগুলো উপজাতি মানুষদের দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও মূর্ত করে তুলেছে। কাহিনীগুলোতে যে অতি অলৌকিক ও কাল্পনিক ঘটনার সংযোজন দেখা যায়, তার সাহায্যে প্রাচীণ মানুষদের বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণার যেমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি নিজের পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের পূর্বপুরুষদের সুদূর অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বয়ে আসা আশা আকাঙ্ক্ষার বীজ, সংস্কার, ইচ্ছা পূরণের বাসনা ইত্যাদি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে যেতেও তাদের সৃষ্ট লোককথার অন্তরে বাসা বেঁধেছে।

পুরুষ থেকে পুরুষে প্রবাহিত হ'তে হ'তে কখনো তাতে রঙের প্রলেপ পড়েছে আবার হয়তো কখনো অনেক উপাদান হারিয়ে যেতে যেতেও কিছু স্মৃতিচিহ্ন ধরে রেখেছে লোককথায়।

প্রাকৃতিক শক্তির উপর জয়লাভ করা সেই আদিমযুগের মানুষের কাছে সহজসাধ্য ছিলো

না। কল্পনাই ছিল তাঁদের একমাত্র ভরসাস্থল। প্রকৃতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লোককথার মধ্যে।

এছাড়াও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম ও বিদ্রোহের ফল্গুধারা অন্তঃসলিলা হয়ে বইতে থাকে, তা-ও লোকমানসের উজ্জ্বল রঙে রঙীন হয়ে ত্রিপুরার লোককথায় ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি ও সমাজের সম্বন্ধ লোককথার একটি বিরাট অঞ্চলকে ধারণ করে আছে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রেম-প্রীতি, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব সংঘাত তো রয়েছেই লোককথার প্রাণবস্তু হিসেবে।

পৃথিবীর প্রায় সমগ্র আদিবাসী সমাজের লোককথায় যে টোটেম প্রথা, মানা, ট্যাবু ইত্যাদির উল্লেখ, তা ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায়ও উপস্থিত। কোনো কোনো কাহিনী টোটেম, মানা, ট্যাবু ইত্যাদিকে ভিত্তি করেই সৃষ্ট হয়েছে।

পুরুষ পরম্পরায় কথকেরা লোককথার মৌখিক ঐতিহ্যকে অকৃত্রিম রাখার জন্য সচেষ্ট থাকলেও প্রতিনিয়তই মানুষের অভিজ্ঞতার ঝুলি নানাভাবে পূর্ণ হ'তে থাকে যেহেতু, তাই শিকার, কৃষি, বাসস্থান ইত্যাদিকে ঘিরে মানুষের জীবনধারার পরিবর্তন, চিন্তাভাবনার উন্নয়ন ইত্যাদি ঘটেই চলেছে। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিবর্তন দৃষ্টিগ্রাহ্য না হলেও একটি সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই জাতি অগ্রসর হয়। বিবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনযাত্রায় সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণের গ্রহণ-বর্জন দুটোই ঘটে। (৪)

এই গ্রহণ বর্জনের স্মৃতি ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা ধরে রেখেছে।

সমাজজীবনের পূর্ণ ইতিহাস ধরা না দিলেও বিশেষ কালের রীতিনীতি, লোকাচারের অস্পষ্ট রেশ ত্রিপুরার লোককথায় রয়ে গেছে।

উপজাতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীবিন্যাস

উপজাতীয় সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে প্রথমেই মনে পড়ে আদিম জনমানবগোষ্ঠীর কথা যাঁরা কৌমজীবনে অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে তাদের বেঁচে থাকতে হ'ত। সেদিন তার পক্ষে বেঁচে থাকা এবং জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব ছিল শুধুমাত্র সঙ্ঘশক্তির জোরে, তাই আদিম সমাজের মানুষ সঙ্ঘজীবনের সঙ্গে ছিল ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ ছিল শিকারজীবনে অভ্যস্ত। শিকারে আহৃত খাদ্যেও ছিল সকলেরই সমান অধিকার। আদিম এই স্তরটিকে আদিম সাম্যবাদী সমাজজীবন বলেই ধরা হয়।

শিকার জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই আদিম মানুষ বনের বুনো পশুকে পোষ মানাতে শিখলো। বনের পশুর কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে দুধ, মাংস, চামড়া ইত্যাদি গ্রহণ করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজেকে বাঁচানোর পথ অবিষ্কার করলো। আদিম সাম্যবাদী সমাজে শিকারজীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলে পশুপালনও। একসময় যৌথশক্তির প্রতীক রূপে নির্বাচিত হ'ল 'গোষ্ঠীপতি' বা

'কুলপতি', যার ভেতর দিয়ে সমগ্র জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প ও শক্তির প্রকাশ ঘটতো।

শিকারজীবন ও পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিরও অবিষ্কার হ'ল। নারীই কৃষির আবিষ্কারক। প্রাথমিক অবস্থায় পুরুষ যখন পশুপালনে ব্যস্ত, সেসময় নারী নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে কৃষিকাজে। অর্দ্ধেক পশুপালন, অর্দ্ধেক কৃষিকাজ ইত্যাদির ভেতর দিয়ে আদিম কৌমজীবনে কৃষি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

জীবনযাত্রা কৃষিভিত্তিক হবার ফলে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন হ'ল। কৃষিকাজ পুরুষ করলো। নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের ফলে শ্রমের সমবন্টন হ'ল। ঘরের কাজে মেয়েরা ব্যপৃত হল।

কৃষির আবিষ্কারের ভেতর দিয়েই আদিম মানুষ সমাজজীবনে প্রবেশ করলো। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়ে এগিয়ে চললো পরিবর্তিত মানবসমাজের গতিধারা। এখান থেকেই মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরের শুরু।

ধীরে ধীরে সংহত গ্রামীণসমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে জনগোষ্ঠী সুসংবদ্ধ হল।

কৃষি হিসেবে উপজাতীয় সমাজে জুমচাষ প্রথা প্রচলন হ'বার মূলে রয়েছে উপজাতি সমাজের প্রচরণশীল জীবনযাত্রা। আবার স্থানান্তরে প্রচরণ করার উদ্যেগের পেছনেও মূল কারণ ছিল, খাদ্যের অপ্রতুলতা। ''জুম চাষ''—এ অরণ্য পুড়িয়ে ফসল উৎপাদিত হয়। একই ভূমি খণ্ডে নির্দ্ধারিত কয়েকবছর ক্রমান্বয়ে ফসল উৎপন্ন হবার পর সেখানকার মাটি অনুর্বরা হয়ে যায়। এছাড়া অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিও খাদ্যাভাবের কারণ হ'তে পারে। নদীর তীর ধরে এগোবার সময় বসতি গড়ার ফলে এরা মৎস্যশিকারে অভ্যস্ত হ'ল। নদীতে সবসময় মাছের প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনার দিকটিও উপেক্ষিত হয় নি।

গোষ্ঠীজীবনে বন্য পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি বীরত্বের ও বুদ্ধির প্রমাণ দিতো অথবা বিপদমুক্তির সন্ধান দিতে পারতো, তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয়া হ'ত। দৈহিকভাবে বলশালী ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে, তাকে সর্দার বা 'নেতা' বলে মেনে নিয়ে গোষ্ঠীজীবন আরো একটু এগিয়ে গেল। দেহবল থেকেও যে বুদ্ধিবল শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণিত হল এই পর্যায়ে।

''জুমচাষ'' কে ঘিরেই উপজাতি গোষ্ঠীর সমগ্র জীবনচর্যা চলেছে। এখানেও তাদের যৌথভাবনার প্রতিফলন ঘটে। ফসল উৎপাদনের প্রতিটি পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এদের সমবেত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। অরণ্য পরিষ্কার করা, শুকনো গাছপালাকে পোড়ানো, জমি তৈরী করা, বীজবোনা, আগাছা পরিষ্কার করা, ফসলের পরিচর্যা, দেখাশোনা, ফসল ঘরে তোলা সবই গোষ্ঠীগতভাবে করা হ'ত। উৎপাদিত ফসল বন্টনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় সকলেই সমানাধিকারী ছিল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ যেহেতু কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো না, শ্রেণীবিভক্ত সমাজও ঠিক সেভাবে গড়ে উঠে নি। সমবেতভাবে জুমিয়া জীবনযাপনের ফলে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসজনিত সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাপারটি দেখা যায় না। 'নেতা' বা 'সর্দার' হিসেবে গৃহীত ব্যক্তি ''প্রধান'' বা ''চক্‌দ্রি'' হিসেবে আখ্যাত হ'ল। গোষ্ঠীগতভাবে 'সর্দার (চক্‌দ্রি) এবং সাধারণ 'জুমিয়া'-এই দুটো স্তরেরই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। লোককথায় এদের মধ্যে পেশাগত কোনো শ্রেণীবিন্যাসও লক্ষ্য করা যায় না।

উপজাতিদের এক একটি বাড়ী, এক একটি ছোট পল্লীর সমান। তাকে 'পাড়া' বলে। অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে সেখানে বাস করতো। প্রত্যেক 'পাড়া'র একজন সর্দার ছিল তাঁকে রাজসরকার থেকে চৌধুরী, কব্‌রা, ইত্যাদি উপাধি দেওয়া হতো। এই সরদারেরাই এক একজন সামন্ত নরপতির মতো। সামাজিক বিরোধ ইত্যাদির নিষ্পত্তি তাঁদের দ্বারাই হতো। (৫)

আদিম সামন্ততন্ত্র অধ্যুষিত উপজাতি সমাজে রাজাই সমস্ত কিছুর মূলে থাকতেন। রাজার উপর উপজাতি সমাজের গভীর আস্থা। রাজা ঈশ্বরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। তিনি সমস্ত অন্যায়ের উর্দ্ধে। তিনি যে সার্বভৌমরূপে রাজ্যশাসন করেন, তা ঈশ্বরেরই শক্তিদ্বারা। ঈশ্বরের প্রতিভূরূপে 'ফা' অর্থাৎ পিতারূপে তিনি জনমানসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ঈশ্বরীয় শক্তিতে তিনি শক্তিমান হবেন, যিনি সবরকম লৌকিকতার উর্দ্ধে বিরাজ করেন। তাই দেখা যায়, রাজারা নিজেদের কোনো দেবদেবী, বিশেষ করে 'সূর্য' ও 'চন্দ্রে'র সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করার চেষ্টা করেন।

রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্যের প্রয়োজনেই কিছুটা শ্রেণীবিন্যাস হলেও উপজাতি সমাজ সমগ্রভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। বিচারব্যবস্থায় রাজার আদেশই চূড়ান্ত ছিল। সমতা ও বিবেকবুদ্ধি আশ্রিত আদিম বিচার পদ্ধতি অনুসৃত হ'ত। (৬)

আইন রক্ষার কাজে নিযুক্ত হ'ত বিরিন্দিয়ারা (পুলিশ)। বিশেষতঃ যুদ্ধে প্রত্যেক পুরুষের যোগদান অবশ্য কর্তব্য ছিল। 'ফুরাই' (পরোয়ানা) নিয়ে বিরিন্দিয়ারা গ্রামে হাজির হতো সবল পুরুষদের যুদ্ধে নিয়ে যাবার জন্য।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে পূজকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল, তা লোককথার মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে। উপজাতিদের জাতীয় পুরোহিত ওঝাই (অচাই) বলে পরিচিত। এরা প্রয়োগবিধিতে দক্ষ। তবে চতুর্দশদেবতার প্রধান পূজক 'চন্তাই' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁর অধীন পূজকেরা 'গালিম' নামে অভিহিত হন। প্রধান 'গালিম' 'চন্তাই' হন। পুরোহিতের পুত্র পুরোহিত হবে এমন কোনো নিয়ম নেই উপজাতি সমাজে। মন্ত্রাদি ঠিকমতো শিখে নিতে পারলে যে কোনো ব্যক্তিই 'ওঝাই' ও 'গালিম' হতে পারে। (৭)

ত্রিপুরার লোককথায় নিহিত সমাজ সংঘাতের কয়েকটি দিক

উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থা সমাজের আদিম ও সহজরূপ। এদের গোষ্ঠীসমাজের সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিকে নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীকেই মূল্য দেয়া হত বেশী। গোষ্ঠীই ছিল সমস্ত কিছুর মূলে। বরং সমগ্র গোষ্ঠীকেই একটি ব্যক্তির মর্যাদা দেয়া হত। ব্যক্তি মানুষের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা গোষ্ঠী মানুষের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষারূপেই গণ্য হ'ত।

সমাজ ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘপথ পরিক্রমার পর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হয়।

সেই আদিম সমাজ থেকেই মানুষের মনে সংঘচেতনার বা গোষ্ঠী চেতনার সৃষ্টি। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অরণ্যের হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষার তাগিদেই আদিমানবের একতাবদ্ধ হয়ে পথ চলার শুরু। এই পথ চলতে গিয়ে আপন আপন গোষ্ঠীর বাইরের সকলকেই কোনো না কোনো কারণে শত্রু মনে করতো। এই বোধ থেকেই সমাজসংঘাতের সৃষ্টি। পরবর্তী সময়ে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রূপ পাল্টেছে, পাল্টেছে সংঘাতের রূপও। সভ্যতার প্রাক্‌লগ্নে মানুষ লৌকিক আচরণের মধ্য দিয়ে যে মানস আকাঙ্ক্ষাকে বা প্রতিবাদকে ব্যক্ত করতো, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রবল পরাক্রমী রাষ্ট্রিক ক্ষমতার অধিকারীদের বিরুদ্ধে বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তারা একইভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে চেয়েছে। এমনকি যখন বিভিন্ন দেবতা স্বীকৃত হ'ল, তখনও দেখা যায় সাধারণ শোষিত মানুষের হাতে শোষক দেবতারা বারবার পরাজিত হয়েছে। হয়েছে রাজ্যভ্রষ্ট। গ্রীক পুরাণ, রামায়ণ, ভারতীয় পুরাণাদি তার পরিচয় দেয়। (৮)

সমাজ সংঘাতের বস্তুনিষ্ঠ দৃঢ় ভিত্তিচিত্র আমরা সেখানেও পাই। অনেক সময় আবার সংঘাতজনিত প্রতিবাদ প্রত্যক্ষভাবে করাও সম্ভব হয়নি। পরোক্ষভাবে তার ছায়া ধরা পড়েছে লোককথার মধ্য দিয়ে।

ত্রিপুরার লোককথায়ও আমরা সমাজসংঘাতের চিত্রগুলো ফুটে উঠতে দেখি। আশ্চর্যের বিষয়, এই সংঘাতসমূহের অবসানে উপজাতি মানুষের গোষ্ঠীচেতনারই জয় ঘোষিত হয়েছে বারবার। সত্যের জয়, শুভের জয়, নতুন মূল্যবোধের জয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"রক্তপিপাসু দেবতা" কাহিনীটিতে সমাজ সংঘাতের চিত্রগুলো ফুটে উঠতে দেখি মোষ, পাঠান্তরে ষণ্ড ও দেবতাদের সংঘাতের মাধ্যমে। মোষটি দেবতাদের তাড়া করে নিয়ে এসেছে অন্য জায়গা থেকে। মোষের আপন অধিকার বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাটি দেবতাদের তাড়া করে নিয়ে আসার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

সমাজের উচ্চস্তরের প্রতীক দেবতাদের বিরুদ্ধে মোষটির এই বিরোধিতার মধ্যে সাধারণ জনগণের সম্মিলিত শক্তির প্রতীকী ভাবটিই ফুটে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, রানীমা ও দেবতাদের মধ্যেও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। রানীমা যথাসাধ্য দেবার্চনা করা সত্ত্বেও দেবতারা কুমারের রক্ত

অন্যায়ভাবে পান করার জন্য এই সংঘাতের উদ্ভব। সেখানে সমাজের উচ্চস্তরের অন্তর্দ্বন্দ্বটি প্রকাশিত। পরিশেষে আমরা দেখি দেবতারা রানীমার জয় ঘোষণা করছেন। এই জয় অসম শক্তির দ্বন্দ্বে বঞ্চিত অথচ ক্রমসচেতন অনার্য জনগণের সংঘায়িত যূথশক্তির জয়।

'বানরবর' কাহিনীটিতে বানরের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের ফলে মেয়েটির মনে যে মানসিক সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে এবং যার ফলে সে একদিন সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়, তার মূলে রয়েছে একটি অসম সামাজিক ব্যবস্থা। বানর অরণ্যচারী জনজাতি গোষ্ঠীর প্রতীক। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তারতম্যের জন্য জীবনযাপনে অসাম্যজনিত মানসিক সংঘর্ষের এক জীবন্ত চিত্র এই কাহিনীটি। নিম্নতর শ্রেণীর সঙ্গে সচ্ছল শ্রেণীর জীবন ও মানসিকতার পার্থক্যটি সূচিত হয়েছে এখানে।

সমাজ দেহের অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বয়ে যাওয়া ঈর্ষাপ্রসূত মানসিক সংঘাতের একটি আবছা ছায়া ধরা আছে 'উইপোকা স্বামী' কাহিনীতে। চাষীর মেয়ের রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় চাষীবৌ ঈর্ষায় দগ্ধ হয়। কারণ, তার মেয়ের তখনো বিয়ে হয়নি। চাষীর মেয়ের রাজরানী হওয়ার অর্থ হ'ল নিম্নতর শ্রেণী থেকে তার উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তরণ। এই উত্তরণের স্পৃহা মানুষের একটি সহজাত স্পৃহা। চাষীবৌয়ের মেয়ের পক্ষে এই উত্তরণ সহজসাধ্য না হওয়াতেই মানসিক সংঘাতটি প্রকাশিত হয়েছে প্রতিদিন চাষীকে মেয়ের জন্য জামাই খুঁজে আনতে বলার মধ্য দিয়ে।

সপত্নীকেন্দ্রিক পরিবারিক সংঘাতের প্রচ্ছন্ন পরিচয় রয়েছে "গুল্মকুমারী" লোককথাটিতে। যদিও এখানে গুল্মকুমারীর পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে কাহিনীর বেশীর ভাগ অংশে, তবু ছিলাই কুমারীর মনে এক গোপন ও অলক্ষ্য ঈর্ষা এই সংঘাতের সৃষ্টি করেছে। লকই-এর স্ত্রী হওয়াতে ছিলাইকুমারী স্বামীর নিঃসপত্ন অধিকার প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু একটি সাধারণ গুল্মের প্রতি স্বামীর আকর্ষণ লক্ষ্য করে তার মধ্যে দ্বান্দ্বিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। যার ফলে বারবার গুল্ম রূপান্তরিত হলেও সে বারবারই তাকে কেটে ফেলে। অধিকারভোগের স্পৃহাই এই সংঘাতের মূল কারণ।

রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের মনে ক্ষোভ সঞ্চিতই থাকে। নানারকম বঞ্চনা ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে রাষ্ট্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠতে পারেনা। রাজা পিতার মতো হলেও ("ফা" শব্দটি তা-ই প্রতিপন্ন করে), পিতার মতো কর্তব্য পালনে অক্ষম। বরং শোষকরূপেই তার পরিচয়। সুন্দরী মেয়েদের নিরাপত্তা স্বয়ং রাজার দ্বারাই বিঘ্নিত হয়। গ্রাম থেকে খুঁজে খুঁজে ধরে এনে সুন্দরী মেয়েদের দাসী করে রাখা হ'ত রাজ অন্দরমহলে। মেয়েরা বড় হওয়ামাত্রই তাই বাবা-মায়েদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবনের শুরু হ'ত। এই শোষণের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোনো সুযোগ না থাকাতেই এই শোষণ জনিত সংঘাত বা প্রতিবাদের একটি বিশেষ ধরণ হিসেবে জুমিয়া বাবা-মা মেয়েদের

কথা বলতে বারণ করে যায়। সংঘাতের রূপটি এখানে সরাসরি প্রকাশিত হয়েছে। রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রজাদের মুখ খোলার অধিকার ছিল না। অন্যায় অবিচারকে মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়ে প্রজাদের অন্তরের নিভৃতে জমা হয়েছে ক্ষোভ, ধিক্কার ও ঘৃণা।

'বিচার' নামক কাহিনীটিতে সংঘাতের রূপটি অনেক স্পষ্ট। বিভিন্ন পশুপাখিকে কেন্দ্র করে এই কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রই একটি শ্রেণীসম্পর্ককে নির্দেশ করেছে, যেখানে সকলেই, একটি সমঝোতা সম্পর্কের মাধ্যমে পারস্পরিকভাবে সহাবস্থান করে এবং তা করে আপন অস্তিত্বরক্ষার জন্যই। কিন্তু কোনো তুচ্ছ কারণেও যদি আপন স্বার্থ আহত হয়, তাহলে পারস্পরিক সংঘাতও অনিবার্য হয়ে উঠে। এই কাহিনীতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে প্রতিটি প্রাণীর আচরণের দ্বারা।

"মুরগীর পিঠে"-তেও সংঘাতের চিত্রটি অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রতীকি পশুর মাধ্যমে কাহিনীটি বলা হলেও তা সমাজ মানুষেরই জীবনচিত্র। বিড়াল ও মুরগীর বন্ধুত্ব ও পরে শত্রুতা কাহিনীর উপজীব্য। তুলনামূলকভাবে বিড়াল সবলশ্রেণীর ও মুরগী দুর্বল শ্রেণীর প্রতীক। সমাজ মানুষকে সমন্বয় বা সমঝোতার মাধ্যমেই সমাজজীবন যাপন করতে হয়। সবল ও দুর্বল পরস্পর প্রতিপক্ষ হলেও আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তারা আপস বা সমঝোতায় আগ্রহী হয় কিন্তু তা সত্বেও সুযোগ পেলেই দুর্বল পক্ষ তার প্রতিদ্বন্দ্বী সবল পক্ষের সঙ্গে দর কষাকষি করে। এই সংঘাতের রূপটিই ফুটে উঠেছে বিড়াল ও মুরগীর দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে।

অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য যে সমাজ সংঘাতের একটি মূল বিষয় তার পরিচয় রয়েছে "একফালি লাউয়ের গল্পে"। দারিদ্র্য যে রক্তসম্পর্ককেও অস্বীকার করে দিতে পারে, তারই প্রমাণ এই লোককথাটি। দুই বোন। একজন ধনী, অন্যজন দরিদ্র, ভিক্ষা করে দিন যাপন করে। এই অর্থনৈতিক বৈষম্যই দুই বোনের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে। এটি জ্ঞাতিদ্বন্দ্বেরও দ্যোতক।

"ধনেশ পাখির গল্পে" সমাজসংঘাতের চিত্রটি অন্যরকম। ছাম্পারি মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতীক হিসেবেই সব কাজের দায়িত্ব পালন করে এবং তার স্বামী আলসে, মদ খায় ও কোনো কাজ করেনা। তা সত্ত্বেও সে স্ত্রীকে সামান্যতম ত্রুটিতেই বকাঝকা করে। স্বামীর মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চিহ্ন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সূচনাজনিত সংঘাতের চিত্রটিই ফুটে উঠেছে।

"সজারুর বুদ্ধি" কাহিনীটিতেও সংঘাত অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। এখানেও পশুরূপকের মাধ্যমে সমাজমানুষেরই জীবন সংঘাতের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। সবলের শক্তিই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রধান অস্ত্র। অন্যদিকে সবলের সঙ্গে সংঘাতে আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দুর্বল বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে। সবল হাতি আপন দৈহিক শক্তির দম্ভে স্ফীত হয়ে দুর্বল প্রাণী সজারুকে ভয়ে পর্যুদস্ত করে দেবার চেষ্টা করলেও সজারু বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে বলীয়ানকেই পরাভূত ও

বিতাড়িত করে। সমাজে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষকশ্রেণীর প্রতিরোধ, বিদ্রোহ ও প্রতি আক্রমণ এভাবেই সংঘটিত হয়। হাতি এখানে শাসকশ্রেণীর ও সজারু শোষকশ্রেণীর প্রতীক।

''সব কালাদের এক ঘর'' কাহিনীতে একই পরিবারের সকলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায়। সমাজে দৈহিকভাবে অক্ষম বা পঙ্গুদের প্রতি সাধারণ মানুষের অবহেলা বা ব্যঙ্গোক্তি থেকেই তাদের মনে হীনম্মন্যতাবোধের সৃষ্টি হয়। এই বোধ থেকেই তাদের মধ্যে দেখা দেয় সন্দেহ এবং যেহেতু কেউ কারো বক্তব্য বিষয় বুঝতে পারেনা, তাই একের বিরুদ্ধে অন্যের মনে ঈর্ষা দ্বন্দ্বমূলক চেতনার সৃষ্টি হয় এবং এভাবেই কাহিনীটিতে সমাজসংঘাতের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। তবে লক্ষ্যণীয় এই যে, পড়শীরা এসে এই সংঘাতটি মিটিয়ে দেয়।

'ছাতিম গাছের কাহিনী'-তে সমাজ সংঘাতের চিত্রটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে পুরনো মূল্যবোধ ও নতুন মূল্যবোধকে ঘিরে। ভাইবোনের বিয়ে একসময়ে সমাজে গৃহীত হলেও পরবর্তী সময়ে এটি সমাজে নিন্দিত হয়। ভাইয়ের এই বিকৃত ইচ্ছার বিরুদ্ধে বোনের মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তা পুরনো মূল্যবোধের প্রতি অনীহা থেকেই জাত। এই মানসিক সংঘাত থেকেই সে ছাতিমচারার সাহায্যে মুক্তির পথ খোঁজে অর্থাৎ সংঘাত থেকে উত্তরণের পথ খোঁজে।

শ্বশুরের পরিবারে মেয়ের জামাই অন্য গোষ্ঠী থেকে আগত হয় বলে পারস্পরিক দূরত্বের মনোভাবটি সমাজমানসে প্রচ্ছন্ন থাকে। ''অজগর সাপের গল্প'' কাহিনীতে অচাই কর্তৃক অজগরকে কেটে ফেলার মধ্যে এই মানসিকতা থেকে জাত দ্বন্দ্বটি কাজ করেছে। অজগর, যাকে অচাইয়ের মেয়ে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছে, অন্য গোষ্ঠীর প্রতীক।

''চাঁদের ছেলে'' কাহিনীটিতে চাঁদের ছেলেকে আশ্রয় করেই 'নক্‌ছু মৌতায়'-এর দেবত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারলাভ হয়। এখানে সংঘাতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 'নক্‌ছু মৌতায়' লৌকিক দেবতা। চন্দ্রকুমার নিজে দেবতা না হলেও চন্দ্রদেবতার পুত্র বলে সে উচ্চবর্গের মানুষের সমকক্ষ হ'বার জন্য সুযোগসন্ধানী হয় এবং 'যেন তেন প্রকারেণ' তা ফলপ্রসূ করে তোলে, তারই দ্যোতক এটি।

'কাঞ্চনমালা কাহিনীতে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও মর্মবেদনাটিই সংঘাতের রূপক হিসেবে প্রকাশিত। 'বিরিন্দিয়া' রাজশক্তির প্রতীক। সুতরাং সে রাজার পক্ষেই থাকে। এরা যদিও সাধারণ মানুষের শ্রেণী থেকেই আগত, তবু কখনো সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলে না। রাজরোষ থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ জনগণ তখন এদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চায় উৎকোচের মাধ্যমে। এটি সর্বকালেরই সমাজচিত্র।

'ছিপিংতুই মাইরুংতুই' কাহিনীতে মাইরুংতুই সুবিধাভোগী শ্রেণী ও মাতৃহীনা ছিপিংতুই বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষ। মাইরুংতুইয়ের ঈর্ষাতে সুবিধাভোগী মানুষের অন্তরের প্রতিফলন রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সংঘাতটি প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ে ছিপিংতুই রাজরানী হওয়াতে। মাইরুংতুই ও তার মা নিম্নতর শ্রেণী থেকে সমাজের উচ্চতম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে না পারায় এই সংঘাত তীব্র আকার নেয়। ক্ষমতার ভোগ-দখলের প্রশ্নটিই এখানে প্রধান।

"নাঐ পাখির গল্পে" দুটো মেয়ের মধ্যে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়, তারই ফলশ্রুতিতে বড়োবোন খুমতিকে চরম দণ্ড পেতে হয়। মাতৃহীনা বড়ো বোন খুমতি সৎমায়ের সংসারে কখনোই ন্যায্য প্রাপ্তি পায়না। বঞ্চিত হ'তে হ'তে সে একসময় নিজেও অন্যকে বঞ্চনা করার সুযোগ নেয় এবং এভাবে আত্মতৃপ্তি পায়। প্রতারিত হয়ে হয়ে অবশেষে প্রতারণার মাধ্যমেই আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। এই ভাবনাটিই খুমতির আচরণে প্রতিফলিত হচ্ছে। এটিও সমাজ মানুষের মানসিক সংঘাতেরই একটি চিত্র। এই গল্পেই দেখা যায় পিতাও কন্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার। এই পিতা-কন্যার দ্বন্দ্বও একধরণের আদিম প্রজন্ম সংঘর্ষের সূচক বলে মনে করা হয়।

ত্রিপুরার লোককথায় টোটেম, মানা, ট্যাবু ইত্যাদি বিষয়

Totemism বা টোটেমবাদকে অনেকে পৃথিবীর আদিমতম বা প্রাচীনতম ধর্ম বলেছেন। এক ধরণের প্রাণী, লতা, গুল্মের প্রজাতি বা কখনো কখনো একশ্রেণীর জড়বস্তুর সঙ্গে কোনো সামাজিক গোষ্ঠী যখন বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে তখন সেই প্রাণী, লতাগুল্ম বা জড়বস্তুকে "টোটেম" বলা হয়। অনেকসময়ই 'টোটেমকে' গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ হিসেবেও গণ্য করা হয়। (৯)

কখনো কখনো কোনো সমাজগোষ্ঠীর নামকরণ টোটেমের নামানুসারে হয়। যদিও 'টোটেম' কোনো ঈশ্বর নয়, তবুও সমগোত্রীয় শ্রদ্ধার পাত্র। এভাবেই সাপ, ষাঁড়, ভেড়া, বাঁদর ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে অনেক জাতিগোষ্ঠীর। উত্তর আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়।

পশুনামের 'টোটেম' মেক্সিকোর অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনজাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই Totem পশু বা পাখি উপস্থিত। বাংলার সমাজজীবনে হাতি, বাগ, সিংহ ইত্যাদি উপাধি এই আভাস বহন করে।

'টোটেম' কোনো বিশেষ গাছ বা প্রাণী নয়। একটি প্রজাতিকেই সাধারণতঃ টোটেম হিসেবে বোঝানো হয়। সাধারণ কাজে একে ব্যবহারও করা যায় না। পবিত্রভাবে একে উৎসর্গ না করে হত্যাও করা যায় না। পরবর্তীকালে ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে "উৎসর্গ" বা "বলি" ইত্যাদির প্রচলন হল এই 'টোটেম' প্রথার ভেতর দিয়েই।

দীর্ঘকাল এই 'টোটেম'ই মানুষের একমাত্র উপাস্য ছিল, যাকে গোষ্ঠীদেবতাও বলা যেতে পারে।

অবশ্য সব আদিমসমাজেই যে এই প্রথা প্রচলিত তা-ও নয়। আবার যারা 'টোটেম' - এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তারা সকলেই যে 'টোটেম'কে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতো, তা-ও নয়।

আবার অনেক আদিবাসী সমাজেই 'টোটেম' ব্যাপারটিই অপরিচিত। যেমন শ্রীলঙ্কার ভেদা উপজাতি, আন্দামানের আধিবাসী বা নিম্ন ব্রাজিলের উপজাতিদের মধ্যে 'টোটেম' বিশ্বাস দেখা যায় না। অষ্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো উপজাতি 'টোটেম' বিশ্বাস করলেও এর উপাসনা করে না। তাদের কাছে 'টোটেম' কোনো দেবদেবী নয়।

এই টোটেমবাদ-এ বিশ্বজনীনতার আভাস আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি ধর্মভাবনার কাছাকাছি গেলেও, তা কোনো ধর্ম নয় বলেই বলা হয়। এটিকে একটি আদিম সমাজ গোষ্ঠীবন্ধন প্রথাও বলা যেতে পারে।

ত্রিপুরার লোককথায় এই টোটেমভাবনাটিকে আমরা দেখতে পাই বিভিন্নরূপে। ষণ্ড পাঠান্তরে মোষ/চেলা/গব গোষ্ঠীপ্রতীক (Totem)। (দ্রষ্টব্য, রক্তপিপাসু দেবতা)।

বিশেষতঃ মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে মানব মানবীর বিবাহের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনের যে আদিম সূত্রটি টোটেম-এ পাওয়া যায়, তা এখানেও উপস্থিত। 'বানর-বর' গল্পে 'বানর' অরণ্যচারী জনজাতিগোষ্ঠীর টোটেম বিশ্বাসজাত। একই ভাবনার সাক্ষ্য দেয় উইপোকা ও মানবী এবং অজগর ও মানবীর বিবাহ। "উইপোকা স্বামী" গল্পে উইপোকা ও অজগর টোটেম-বিশ্বাসজাত। "গুল্মকুমারী" গল্পের গুল্মটিও টোটেম প্রথার পরিচয় দেয়। এছাড়াও রয়েছে 'সোনাব্যাঙ সন্তান'। ব্যাঙের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ (দ্রঃ চাঁদের ছেলে) ইত্যাদি। গুল্ম থেকে লেবু, লেবু থেকে লাউ, লাউ থেকে ল্যাটামাছ, ল্যাটামাছ থেকে নারকেলে রূপান্তরের ব্যাপারটি সর্বপ্রাণবাদের পরিচয়ের সঙ্গে টোটেম বিশ্বাসজাত।

আবার মানুষ থেকে পাখিতে রূপান্তরের (স্বর্গের ফুল রান্না, নাঐ পাখির গল্প, কথা বলা আংটি), ছোট বোন ধরামাত্র রান্নাফুল শুকিয়ে যাওয়া এবং বড়বোনের ছোঁয়ায় অবিকৃত থাকা (দ্রঃ স্বর্গের ফুল রান্না) রাজার দুঃখে হরিণের দুঃখ অথবা উভয়ের সহমর্মিতা (দ্রঃ ছিপিংতুই মাইরুংতুই), গেরস্তবৌ ও গাইমার সম্পর্ক ও ভবিষ্যতে মানুষী-মা ও গরুমার ছেলেমেয়ের বিবাহের শপথ করা, সাদাহাতির সঙ্গে রাজকুমারীর বন্ধুত্ব (দ্রঃ প্রতিজ্ঞা) ইত্যাদিও ত্রিপুরার আদিম জনজাতি জীবনের টোটেম বিশ্বাসেরই আভাস দেয়।

মানব সংস্কৃতির এক উচ্চস্তরে পৌঁছে যাবার পর আদি মানবের মনে আত্মা বা প্রাণ-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে উঠে। এই সময়েই সে সর্বপ্রাণবাদী ধারণার সাহায্যে ভাবতে পেরেছিল যে, গাছপালা, পাহাড়, পর্বত, পশুপাখি, নদনদী অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চের সবকিছুতেই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। (১০)

কিন্তু আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ ও গবেষকরা এরও আগের একটি স্তরের কথা বলেছেন, যাকে প্রাক-প্রাণবাদীয় স্তর বা (Preanimistic Stage) বলা যায় অর্থাৎ যখন মানুষের মনে একটি নৈর্ব্যক্তিক রহস্যময় শক্তির অস্পষ্ট ধারণা এবং সেই শক্তির প্রতি ভক্তিমিশ্রিত ভয়ের অনুভূতি ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিম সংস্কৃতিতে এই জাতীয় শক্তির অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়। এই রহস্যময় শক্তিরই নাম "মানা"। এটি মেলানেশীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের দেয়া নাম হলেও নৃবিদ্যায় সাধারণ অর্থে এইপদটিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আদিম মানুষের কাছে 'মানা' এক সর্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় শক্তি যা রহস্যময় এবং ভীষণভাবে ক্রিয়াশীল। এই 'মানা' যে কোনো বস্তুর মধ্যে বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হ'তে পারে। এর নির্দিষ্ট

কোনো রূপ না থাকলেও এটি ঠিক কোনো জড়শক্তি নয়, এক রহস্যময় মানসিক শক্তি বা চিৎশক্তি। (১১)

আদিম মানবের মনে জড় ও চেতন পদার্থ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা না থাকলেও সে বুঝতে পারতো এই রহস্যময় শক্তিই অসাধারণ ব্যক্তি, ঘটনা বা বস্তুর ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কাজে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায় তাহলে তা তার ব্যক্তিগত দক্ষতার জন্য নয়, তার মধ্যে 'মানা' আছে বলেই সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই 'মানা' জড়বস্তুকেও আশ্রয় করে থাকতে পারে। 'টোটেম'-এ 'মানা'-র উপস্থিতি বিশ্বাস করা হয়। পরবর্তীকালে কবচ, মাদুলি ইত্যাদির ব্যবহার এই 'মানা' বিশ্বাসসঞ্জাত। যে অস্ত্রদ্বারা শত্রুকে পর্যুদস্ত করা হয়, তার মধ্যেও 'মানা' থাকে। (১২)

ত্রিপুরার লোককথায় 'মানা'র অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন অলৌকিক অবিশ্বাস্য ঘটনার ভিতর দিয়ে। 'রক্তপিপাসু' দেবতায় সতী নারী রানীমা যে রিছা (বক্ষাবরণী) দ্বারা মোষকে বাগে আনতে সমর্থ হন, তার দ্বারা 'মানা'র রহস্যময় শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যেই দেবতাদের এইরাজ্যে আগমন। দেবতাদের অসাধ্য কাজ রানীমা করতে সমর্থ হন রিছার 'মানা'র সাহায্যেই।

'ভাতের হাঁড়ি তুমি এমনি টগবগ করে ফুটতে থেকো' — (দ্রঃ বানরবর) বলার ফলে ভাতের হাঁড়ির ফুটতে থাকা অথবা 'বাঁশের পাত্র, তুমিও এভাবে জল ঝরাতে থেকো—' বলার ফলে জল ঝরানো (বানর বর দ্রঃ) — ইত্যাদি সম্পাদনের ভিতর দিয়ে মেয়েটির মধ্যে 'মানা'র রহস্যময় শক্তির ধারণা করা যায়। এই শক্তির সাহায্যেই যে প্রবঞ্চক বানরের হাত থেকে মুক্তি পায়।

অচাই সাতবার কলাপাতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে নাগরাজার শরীর সাতটুকরো হয়ে যাওয়ার মধ্যেও (দ্রঃ পুরোহিত) এই শক্তিরই প্রকাশ ঘটেছে।

প্রাক্-প্রাণবাদী 'মানা'র আরেকটি সুন্দর প্রকাশ দেখি, "এই পালকটিই একটি রাজহাঁস হয়ে যাক্"— বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজহাঁস হয়ে যাওয়ার ভেতর দিয়ে পালকের মধ্যে 'মানা'র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। (দ্রঃ রাজহাঁসের কাহিনী)।

আধুনিক মননের কাছে আপাত অবাস্তব মনে হতে পারে যে ভাবনা, তা-ই একান্তভাবে, বিশ্বস্ত একটি রূপকল্প নিয়ে উঠে এসেছে "গুল্মকুমারী" নামক লোককথায়। 'মানা' এখানে বিচিত্ররূপে সংলগ্ন হয়ে আছে গুল্মরূপী গুল্মকুমারীর মাঝে। কাহিনীটি একটি প্রাগৈতিহাসিক মানবমনকে ধরে রেখেছে, যেখানে মানুষে গুল্মে কোনো পার্থক্য নেই, মানুষে লেবুতে বা লাউ, নারকেলে, মাছে রয়েছে অভেদ সম্পর্ক। এরই ফলে গুল্ম হয়ে যাচ্ছে কখনো লেবু, কখনো লাউ, কখনো মাছ, এবং অবশেষে মানুষ। জৈবিক নিয়মকে অস্বীকার করে মানার শক্তিতে শক্তিমতী হয়েই গুল্মের এই নব নব রূপান্তর। সুগন্ধি গুল্মের সঙ্গে আরণ্যক মানুষের আনুরূপ্য কল্পনা আরণ্যক মানুষের রুচিশীল মনের পরিচায়ক।

এই 'মানা'র শক্তিতেই জড়বস্তু সোনার আংটি কথা বলতে পারে, টংঘর বানিয়ে দেয়। এমন কোনো কাজ নেই, যা সে করতে পারে না। এই আংটি হাতের আঙ্গুলে থাকার ফলেই গ্রামের সমস্ত যুবক ছেলে যে শক্তিশালী শূয়োরটিকে কাবু করতে পারেনি, সেই শূয়োরটিকে বিধবার ছেলে অনায়াসে চোখের নিমেষে এক হাতে বধ করে ফেলে এক হাতেই (চক্‌দ্রির ঘোষণামতো) চেঁছে ছুলে রান্না করে গাঁয়ের সবাইকে খাইয়ে দিলো এবং চক্‌দ্রির মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল (দ্রঃ কথা বলা আংটি)।

আংটির রহস্যময় শক্তি যেমন আশ্চর্যজনকভাবে কর্ম সম্পাদন করেছে, তেমনি ছেলেটির আঙ্গুলে থাকার সময় তার মধ্যেও আংটির অতীন্দ্রিয় শক্তিটি (মানা) সঞ্চারিত হয়েছে।

রাঙ্গিয়া ও শ্বেতহস্তীর লড়াইয়ে ('প্রতিজ্ঞা' গল্পে) প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রাণী হস্তীর বিরুদ্ধে রাঙ্গিয়ার (মানব সন্তান জয়ের মধ্য দিয়েও 'মানা'র আভাস পাওয়া যায়। এই বীরত্ব মনুষ্যশক্তির চরম পরাকাষ্ঠার প্রকাশ। এই শক্তির জন্যই রাক্ষসী চাক্‌বাইয়ামাও রাঙ্গিয়ার নামে ভীতসন্ত্রস্ত। চাক্‌বাইয়ামাও বধ হয় তার হাতে। 'মানা'র শক্তি তাকে আশ্রয় করেছে বলেই বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাগুলোর প্রকাশ ঘটে তার মধ্য দিয়ে এবং এই শক্তির বলেই সে মন্ত্র পড়ে মাটিতে পুঁতে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত ঘিলা লতাও বেঁচে ওঠে। অবশেষে এই লতার সাহায্যেই সে অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

''ছাতিম গাছের কাহিনী'' লোককথাটিতে মানার শক্তি প্রকাশিত হয়েছে মেয়েটির মধ্য দিয়ে। তার কথায়, গানে ছাতিম গাছ বড় হ'তে হ'তে একসময় আকাশকেও ছুঁয়ে যায়।

রাজার নিজের হাতে ছিপিংতুইয়ের মাথায় গুঁজে দেয়া ফুলটিতে 'মানা'র অস্তিত্বের জন্যই তা রানীর রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারতো। (দ্রষ্টব্য ছিপিংতুই মাইরুংতুই)।

খোঁপায় ফুলটি গুঁজে রাজা বলে দিয়েছিলেন, যতক্ষণ এটি খোঁপায় থাকবে ততক্ষণ রানীর কোনও বিপদ হবে না। কিন্তু অসাবধানে তা পড়ে যায়। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্যই ছিপিং এর জীবনে নেমে আসে দুর্বিপাক। একটি ফুল সাধারণ হয়েও অসাধারণ হয়ে উঠেছে 'মানা'র শক্তির জন্যই। এই একই অতীন্দ্রিয় শক্তি প্রকাশিত হয়েছে নাঐ পাখির পালক, নখ, ঠোঁট জড়ো করে তৈরী করা পোষাকের ভেতর দিয়ে (দ্রঃ নাঐ পাখির গল্প) সেজন্যই এই পোষাকটি গায়ে দেয়া মাত্রই খুমতি তার শরীরে প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করে।

''চাঁদের ছেলে'' কাহিনীতে 'মানা' রয়েছে ব্যাঙের খোলার মধ্যে। ব্যাঙের খোলাতে যে 'মানা'র অবস্থান ছিলো সে আশ্রয় নেয় গৃহকোণে এবং তার শক্তির প্রভাবেই অপদেবতাদের হাত থেকেও গৃহস্থের অমঙ্গল হবার আর কোনো ভয় রইলো না।

'টোটেম' শব্দটির সঙ্গে আরো একটি শব্দও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই শব্দটির নাম 'ট্যাবু' (Taboo)। এর অর্থ কোনো বস্তু বা ব্যক্তির পবিত্র অথবা অপবিত্র প্রকৃতি এবং তার সম্পর্কে যাবতীয় বাধানিষেধ মানা বা না মানার জন্য যে ধরণের শুচিতা বা অশুচিতা ঘটে সব কিছুকেই

বোঝায়। (১৩) 'ট্যাবু' হল নৈতিক বিধিনিষেধ, আইনগত নয়। 'ট্যাবু'কে দুটো ভাগে বিভক্ত করা হয়। কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা ক্রিয়া 'ট্যাবু' হতে পারে, তার বিশেষ প্রকৃতির জন্য। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কোনো স্থান বা বিশেষ কোনো খাদ্যকে বিশেষ কোনো ব্যক্তি (যেমন পুরোহিত, যাজক ইত্যাদি) দ্বারা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হ'লে।

শব্দটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলের পলিনেশীয় জাতির নিজস্ব ভাষা থেকে গৃহীত হয়ে সকল পাশ্চাত্য ভাষার অন্তর্গত হয়েছে।

আদিম সমাজজীবনে এই নিষেধাজ্ঞাগুলো সাধারণ কোনো বিষয় ছিলো না, এদের ফল প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল। এদের বিশ্বাস ছিলো যে, এই 'ট্যাবু' অমান্য করার ফলে সামাজিক নির্বাসন, দৈবদুর্বিপাক এমনকি মৃত্যুও হ'ত। এই দণ্ড মানুষ আপনা থেকেই পেতো। আধুনিক শিক্ষিত মনের কাছে নিষেধাজ্ঞাগুলো অর্থহীন বলে মনে হলেও আদিম জনজীবনে-এর যে গভীরতা ছিল তা লোককথায়ও ফুটে ওঠে। নিষেধ অমান্য করার ফলে কাহিনীর ধারাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। আদিম জীবনে 'ট্যাবু'র প্রভাব অনস্বীকার্য ছিল বলে, তা লোককথারও একটি প্রধান অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'ট্যাবু'র ধারণার সঙ্গে অসাধারণত্ব ব্যাপারটি জড়িত থাকে।

নানারকম বাধানিষেধ অনুসরণ করার এই প্রাচীন লোকবিশ্বাসটি ত্রিপুরার লোককথায় নানাভাবে প্রকাশিত।

"রক্তপিপাসু দেবতা" গল্পে দেখা যায় রানীমার উপর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব। দেবতারাও প্রতিজ্ঞা করেছেন রানীমার কাছে বাঁধা থাকবেন। কিন্তু রক্তপানের অভাব ঘটায় দেবতাদের পুজোয় ব্যাঘাত ঘটে। পূজাবিধি লঙ্ঘন করার ফলে (ট্যাবু) দেবতারা কুমারকে ছাগলে রূপান্তরিত করে তার রক্ত পান করে। ফলে পুত্রটি দিনদিন রুগ্ন হয়ে যায়। এভাবেই ট্যাবু ভঙ্গের ফলে শাস্তি হয়। "পুরোহিত" গল্পে জুমে আগুন দেবার আগে দেবদেবীর পুজো না দেওয়াতে ট্যাবুভঙ্গ হয়েছে। "উইপোকা স্বামী" তে অজগর ও উইপোকা টোটেম ভাবনারই ফসল। ট্যাবু অভিপ্রায়টি রয়েছে উইপোকারা যখন আগুনে পুড়ে মরবে তখন ভালোভাবে হাত পা টিপে দিতে হবে। পাখার ব্যবহার ও জলপান করলেই আর উইপোকার ভেতর কুমারের প্রবেশ হবে না—ইত্যাদির মধ্যে। "রাজহাঁসের কাহিনী" তে ট্যাবু প্রসঙ্গটি এসেছে এভাবে-রাতভোর হ'বার আগে রাজার পুকুরে 'ছাকলক্' দেবীর নামে একটি হাঁসের পালক ফেলে আসতে হবে। কিন্তু ফিরে আসার সময় পেছনে তাকানো নিষেধ। এখানে যথাযোগ্য বিধি পালন করা হয়েছে।

প্রকৃতির হাতে অসহায় আদিম সমাজের মানুষ প্রকৃতির অন্তরালের অদৃশ্য শক্তির উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। এর ভালো মন্দ দুটো দিকই তাকে নানাভাবে চিন্তা করার অবকাশ দিতো।

'গুল্মকুমারী' কাহিনীতে দেখা যায় গুল্মের বিভিন্ন রূপান্তরকালে ছিলাইকুমারীকে লকই বারবার নিষেধ করা সত্বেও সে প্রতিবারই লেবু, লাউ, ল্যাটামাছ ইত্যাদি কেটে ফেলে। এই ট্যাবুভঙ্গের পরিণতিতেই ছিলাইকুমারীর মৃত্যু হয়।

আবার জুমে যাবার সময় বাবা-মায়ের দেওয়া 'কথা না বলা'র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ফলেই দুবোন রাজার লোকদের হাতে ধরা পড়ে। (দ্রঃ কথা বলো না)

"স্বর্গের ফুল রান্না"তে দেখা যায় সুগন্ধি রান্না, যা নাকি দেবতাদের জন্যই ফোটে, সেই ফুল মানুষ পড়লে অনিষ্ট হয় একথা জানা সত্বেও স্ত্রী ফুলটি মাথার খোঁপায় গুঁজে দেয়। দেবতার ফুল দেবতাকে উৎসর্গ করার কথা মনেও হয় না। স্ত্রীর ট্যাবুভঙ্গের ফলে স্বামী হুলক-এ পরিণত হয়ে যায়। স্ত্রীও শাস্তিস্বরূপ মানবী থেকে গোধিকা-তে (মুফুক) রূপান্তরিত হয়ে গেল। "প্রতিজ্ঞা" গল্পে ছোটভাই রাঙ্গিয়ার নির্দেশ অমান্য করে ভুতুয়া নিজের নাম বলার জন্যই ট্যাবুভঙ্গ হয়েছে। এর ফলেই রাক্ষসী চাকবাইয়ামা ভুতুয়াকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে যায়।

ভাই-বোনের বিয়ে ব্যাপারটি ট্যাবুর অন্তর্গত (দ্রঃ ছাতিম গাছের কাহিনী)। "অজগর সাপের গল্পে" দেখা যায় বড়বোন ডুবে যাবার আগে ছোটবোনকে সাতপথের মোড়ে গিয়ে সাতডালযুক্ত বটগাছে সোনার চরকা দিয়ে সুতো কাটার নির্দেশ দেয় এবং ছোটবোন সেই নির্দেশ অনুসরণ করে। ফলে একসময় সে রাজরানী হয়। দ্বিতীয় ট্যাবুটি এরকম ঃ রাজা ছোটরানীকে প্রসববেদনা শুরু হলে দড়ি টানতে বলেছিলেন। কিন্তু এখানে ছোটরানী (ট্যাবুভঙ্গ করে) রাজার নিষেধ অমান্য করে অন্যান্য রানীদের কথায় আগেই দড়ি টেনে সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

কোনো এক দেবতার কারণে চন্দ্রকুমারকে কিছুদিন ব্যাঙ হয়েই থাকতে হবে। তবে ইচ্ছে করলেই সে ব্যাঙের খোলাটি খুলে মানুষ হয়ে চলাফেরা করতে পারবে। কিন্তু কোনো মানুষের সামনে একাজটি করতে পারবে না- "চাঁদের ছেলে" রূপকথাটিতে ট্যাবু এভাবেই এসেছে।

"নাঐ পাখির গল্প" কাহিনীতে ছোটবোন করম্‌তি খুম্‌তিকে দুটো 'মায়দুল' (ভাতের মোচা) ও একচোঙ্গা জল বাঁশের ডগায় বেঁধে দিয়ে বললো, সে যেন একথা কাউকে না বলে। কারণ, একথা জানাজানি হলে তারও বড়বোনের মতো বন্দীদশা জুটবে। এটি ট্যাবু হিসেবে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সামাজিক দ্বন্দ্ব, মিথষ্ক্রিয়া ও সমন্বয়

লোককথায় পারস্পরিক আচার-আচরণের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মানসিকতার মাধ্যমেই সামাজিক দ্বন্দ্বের চিত্রটি প্রকাশিত হয়। যেহেতু গোষ্ঠীজীবনে অভ্যস্ত মানুষ, তাই এই বিরোধের মধ্যেও একটি সংমিশ্রণের চেষ্টা হয়। তাকেই মিথষ্ক্রিয়া বলা হচ্ছে। স্মরণাতীত কাল থেকে লোকমুখে যে সমস্ত কাহিনী প্রচারিত হয়ে আসছে, তাতে ধরা রয়েছে, প্রাচীনতম যুগের বিস্মৃত

পূর্বপুরুষদের স্মৃতি। তেমনি যুগে যুগে পুরুষে পুরুষে নতুন কাহিনী সৃষ্টি হলে তাতে থাকে নতুন অভিজ্ঞতার স্মৃতি। আবার পুরনো কাহিনীর কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে সেখানেও নতুন অভিজ্ঞতার ফসলকে গ্রন্থিবদ্ধ করে দেয়া হয়। সংমিশ্রণের কাজটি এভাবেও হয়।

লোককথার মধ্যে প্রায়শঃই উপাদান, ঘটনা বা চরিত্রের দিক থেকে একটি দ্বান্দ্বিক পরিবেশের আভাস লক্ষ্য করা যায়। মানবজীবন বিকাশের প্রাথমিক স্তর থেকে উন্নতস্তরে বিবর্তনের পথে প্রতিস্তরেই কোনো না কোনোভাবে এক বা একাধিক শক্তির দ্বন্দ্বের লব্ধফলরূপে সংস্কৃতির গড়নটা একটা আকৃতি ধারণ করেছে। দ্বন্দ্বের পাত্র বা বিষয়ভেদ হলেও দ্বন্দ্ব চিরন্তন হওয়াতে দ্বন্দ্বজাত সমস্ত কাহিনীর মধ্যেই একটি ঐক্য বা সমন্বয়ের আভাসও থাকে। এভাবেই ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের একটি ধারা সবসময়ই প্রবহমান থাকে।

মঙ্গোলয়েড্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরার উপজাতি জীবন, জুমকৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রা ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনুসারী হয়ে এসেছে বহু প্রাচীনকাল থেকেই। উপজাতি লোককথাগুলোর মধ্যে তাদের কল্পনার বিস্তার এবং সহজসরল জীবনযাত্রার স্বাভাবিক চিত্র পাওয়া গেলেও অনেকক্ষেত্রেই খুব সূক্ষ্মভাবে সুদূর অতীতের কিছু কিছু ছায়া ধরা পড়ে, যা কখনো কখনো অন্যতর এক সূক্ষ্ম সামাজিক সংযোগ, তজ্জনিত দ্বান্দ্বিকভাবনা ও সমন্বয়ের সন্ধান দিতে পারে বলে মনে হয়।

"রক্তপিপাসু দেবতায়" চৌদ্দজন দেবতা নিজেদের দেবতা বলে পরিচয় দিলেও মোষের রক্তপান করার মধ্যে তাদের আসুরিক গুণেরই প্রকাশ ঘটেছে। 'বলি' প্রসঙ্গটি অষ্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে আগত (১৪) বলে মনে করা হয়। এখানে বহিরাগত চৌদ্দজন দেবতার আশ্রয় গ্রহনের ঘটনার পেছনে অন্য কোনো আর্যেতর গোষ্ঠীর আগমন ও আশ্রয় গ্রহণের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট হতে পারে। রাজকুমারের রক্তপান করার সময় মন্ত্রপড়া এবং জল ছিটিয়ে দেয়ার মধ্যেও ঐন্দ্রজালিক (দানবসদৃশ) কাজকর্মের লক্ষণ প্রকাশ পায় (১৫) যার দ্বারা দেবতাদের অসুর বা দানব বলেই মনে হতে পারে। রানীমার সঙ্গে তথাকথিত এই দেবতাদের দ্বন্দ্ব সংঘাত দানা বেঁধে উঠেছে রাজকুমারের রক্ত পানকে ঘিরেই।

কিংবদন্তী অনুযায়ী রাজকুমার ত্রিলোচনের পিতা রাজা ত্রিপুর শিবের অভিশাপে নিহত হয়। এখানে লক্ষ্যণীয়, বহিরাগত দেবতাদের তাড়া করে এনেছে মোষ (পাঠান্তরে, ষণ্ড)। ষণ্ড শিবের বাহন বলে স্বীকৃত। মোষ বনাম দেবতা, দেবতা বনাম রানীমার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে এখানকার আর্যেতর উপজাতি সমাজে অন্য কোনো আর্যেতর গোষ্ঠীর (অষ্ট্রিক হতে পারে) আগমন ও আশ্রয় গ্রহণের ইতিহাসের মধ্যবর্তী সংঘাতের চিহ্ন সুপ্ত থাকতে পারে। চৌদ্দজন দেবতাকে বহিরাগত গোষ্ঠীর প্রতীক বলে গণ্য করা যায়, যারা নিজেদের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ, মায়াজাল ইত্যাদির দ্বারা উপজাতিদের কাছে নিজেদেরকে দেবতার পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সর্বপ্রাণবাদী অস্তিত্বে বিশ্বাসী ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে দেবতাসম্পর্কিত ধারনায় মূর্তির কোনো স্থান ছিলনা। এখনো যে চৌদ্দদেবতার পুজো অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে দেবতাদের প্রতীক হিসেবে চৌদ্দটি মুণ্ড-প্রতীক পুজো হয়।

উপজাতিসমাজে আবহমানকাল ধরে বাঁশই দেবপ্রতীক হিসেবে পূজিত হয়ে আসছে। 'মুণ্ড' পুজোর মধ্যেও অষ্ট্রিক প্রভাব থাকতে পারে। (১৬)

সর্বপ্রাণবাদী ধারণায় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একজন সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের ধারণার মধ্যেও আদিবাসীদের আদিম বিশ্বাসও সংস্কৃতিতে অষ্ট্রিক সংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব মিলনের প্রভাবটি অনুভব করা যায়। (১৭)

এখানকার সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় মাতৃপ্রাধান্যই স্বীকৃত ছিল। নারীর জন্য কোনো বিধি-নিষেধের প্রশ্ন আরোপিত হয়নি। পরবর্তী সময়ে পিতৃপ্রাধান্য বিস্তারলাভ করার ফলশ্রুতি হিসেবেই নারীর জন্য নতুনতর সংজ্ঞার সৃষ্টি হ'ল।

পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ফলে নারীর অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় গণ্ডীবদ্ধতার সূচনা হল। "নারীর সতীত্ব" সংক্রান্ত ধারনার মধ্য দিয়ে সেই সামাজিক পালা বদলের চিত্রটি ধরা পড়ে। প্রাধান্য খর্ব হওয়ার ফলে নারীর মনে এবং সমাজ পরিপার্শ্বিকে যে মানসিক সংঘাতের সূচনা অবশ্যম্ভাবী, তাকেই অবদমিত করার জন্য পুরুষশাসিত সমাজকে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নারীকে "সতী নারী" শিরোপায় ভূষিত করে।

অন্যদিকে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে এই অবস্থায় দাসত্ব স্বীকার করে এবং সমস্ত দ্বান্দ্বিক মনোভাবকে দূরে সরিয়ে আত্মস্বার্থরক্ষার জন্যই নারী "সতী নারী"র শিরোপাটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

এই কাহিনীতে দ্বন্দ্বের আরো একটি রূপ প্রতিফলিত হয় রাণীমার মধ্যে। আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের প্রবণতা থেকেই রানীমার মধ্যে দেবতাদের প্রতি সহমর্মিতা জন্মায় এবং মোষ (ষণ্ড) বধের দ্বারা তিনি দেবতাদের রক্ষা করেন। আবার পুত্রের রক্তপান জনিত অপরাধের জন্য তিনি ঐ একই তাগিদে ধ্বংসকামী মনোভাব নিয়েই দেবতাদের তিরস্কার করেন।

সংরক্ষণকারী ও সংহারকারী চিত্তবৃত্তিগুলোর প্রত্যেকটি তার ঠিক বিপরীতটির মতোই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই দুই বিপরীত চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্বে অবশ্যই সমন্বয়ের বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে রানীমার 'জয়' ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

"বানরবর" কাহিনীতেও দুটো গোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। বানর শিকার জীবনে অভ্যস্ত পুরোপুরি আদিম কোনো আরণ্যক জীবগোষ্ঠীর প্রতীক হতে পারে। কারণ, এই কাহিনীর বানর মদের নেশায় বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যদিকে মেয়েটি জুমভিত্তিক একটি সংহত গোষ্ঠীর মানুষ। জীবনযাত্রায় এদের দুজনের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। প্রতারিত হয়ে মেয়েটি বানরের হাতে ধরা পড়ে এবং জীবনযাপনে

স্বীকার করতে পারলোনা। বিশেষ করে স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হ'লে, অথবা স্ত্রী অন্য পুরুষে আসক্তা হ'লে কেউই তা সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারেনি। বাংলা প্রবাদ 'বঁটি-বঁটি-বঁটি, সতীনকে কাটি' কথাটির মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত। গুল্মের প্রতি লকইয়ের আসক্তি ছিলাইয়ের মনে ঈর্ষাপরায়ণতার জন্ম দিয়েছে। বারবার বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হলেও গুল্মকে ছিলাই তাই বারবার কেটে ফেলেছে। সপত্নীকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে এখানে। অবশেষে দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটে ছিলাইকুমারীর হত্যার মধ্য দিয়ে।

'কথা বলোনা' কহিনীটি একটি করুণ ঘটনার অন্তরালেও কিছু সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ করে। একদিকে গ্রামীণ জুমিয়া চাষীসমাজ, অন্যদিকে পাহাড়ের অধিপতি ও তার বিভিন্ন অনুষঙ্গ।

রাষ্ট্রব্যবস্থা ও গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা এমন পারস্পরিকভাবে সংবদ্ধ যে, এখানে ব্যক্তিমানুষের বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। ব্যাক্তির চেয়ে সমাজ এখানে প্রধান এবং সর্বোপরি রাজা ঈশ্বর সম।

সুতরাং রাজার ইচ্ছাপূরণে অসহায় মানুষও বাধ্য। এই কাহিনীতেও বাবা-মা সুন্দরী দুই বোনকে বাড়ীতে রেখে কাজে যেতে ভরসা পায়না, না জানি কখন রাজার লোকেরা মেয়েদের এসে ধরে নিয়ে যায়। রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মুখ খোলার অধিকার ছিলোনা, শত অন্যায় অবিচারকেও মাথা পেতে বরণ করে নিতে হয়েছে। এর ফলে অন্তরের নিভৃতে জমা হয়েছে ক্ষোভ, ধিক্কার, ঘৃণা। অস্তিত্ব বিপন্ন হবার ভয়ে ক্ষোভ বা ঘৃণা প্রকাশের সৎসাহসও ছিলোনা। এই সংঘাতচিত্র ও ক্রোধের রূপটি পিতৃ ও মাতৃহৃদয়ের স্নেহের ছোঁয়ায় অন্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বাবা মা জুমে যাবার সময় মেয়েদের বলে যায় চুপ করে বসে থাকতে। কথা বলতে শুনলেই রাজার লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে যাবে।

'বিচার' নামক লোককথাটিতে ব্যাঙ আর চামচিকের সামান্য মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে পশুপাখিদের সমাজের সংঘাতময় পরিবেশের যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা মনুষ্য সমাজের সংঘাতময় পরিবেশেরই রূপক। বিচিত্র মানসিক অভিব্যক্তি নিয়েও পারস্পরিক সমঝোতা ও সহাবস্থানের দ্বারা সমাজ জীবন এগিয়ে চললেও, সামান্যতম সুযোগেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করতেও পিছপা হয়না। এর দ্বারা অবশ্য সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতিই শুধু বৃদ্ধি হয়। তাই প্রয়োজন হয় সমন্বয়ের। রাজা সমাজনিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থেকে এই দ্বন্দ্বের সাধন করেন ন্যায়বিচারের মাধ্যমে। রাজা এখানে মিথষ্ক্রিয়ার উপাদান।

''মুরগীর পিঠে'' তে মুরগী ও বিড়ালের মধ্যে এক অসম বন্ধুত্বের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এখানেও মনুষ্য সমাজমানসিকতার একটি রূপকল্প উদ্ভাসিত হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে মুরগী ও বিড়াল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও সমাজে আপন অস্তিত্বের সুরক্ষার প্রয়োজনে মুরগী বিড়ালের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করে। দুর্বল নিজের প্রয়োজনেই সবলের

স্বীকার করতে পারলোনা। বিশেষ করে স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হ'লে, ও
পুরুষে আসক্তা হ'লে কেউই তা সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারেনি। বাংল
বঁটি-বঁটি, সতীনকে কাটি' কথাটির মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত। গুল্মের প্রতি লক
ছিলাইয়ের মনে ঈর্ষাপরায়ণতার জন্ম দিয়েছে। বারবার বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত
ছিলাই তাই বারবার কেটে ফেলেছে। সপত্নীকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে এখ
দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটে ছিলাইকুমারীর হত্যার মধ্য দিয়ে।

'কথা বলোনা' কহিনীটি একটি করুণ ঘটনার অন্তরালেও কিছু সামাজিক
করে। একদিকে গ্রামীণ জুমিয়া চাষীসমাজ, অন্যদিকে পাহাড়ের অধিপতি ও
অনুষঙ্গ।

রাষ্ট্রব্যবস্থা ও গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা এমন পারস্পরিকভাবে সংবদ্ধ যে, এখানে
বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। ব্যাক্তির চেয়ে সমাজ এখানে প্রধান এবং স
ঈশ্বর সম।

সুতরাং রাজার ইচ্ছাপূরণে অসহায় মানুষও বাধ্য। এই কাহিনীতেও বাবা
বোনকে বাড়ীতে রেখে কাজে যেতে ভরসা পায়না, না জানি কখন রাজার লো
এসে ধরে নিয়ে যায়। রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মুখ খোলার অধি
শত অন্যায় অবিচারকেও মাথা পেতে বরণ করে নিতে হয়েছে। এর ফলে অ
জমা হয়েছে ক্ষোভ, ধিক্কার, ঘৃণা। অস্তিত্ব বিপন্ন হবার ভয়ে ক্ষোভ বা ঘৃণা প্রকাশে
ছিলোনা। এই সংঘাতচিত্র ও ক্রোধের রূপটি পিতৃ ও মাতৃহৃদয়ের স্নেহের ছোঁ
প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বাবা মা জুমে যাবার সময় মেয়েদের বলে যায় চুপ করে
কথা বলতে শুনলেই রাজার লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে যাবে।

'বিচার' নামক লোককথাটিতে ব্যাঙ আর চামচিকের সামান্য মনোমালিন্য
পশুপাখিদের সমাজের সংঘাতময় পরিবেশের যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা ম
সংঘাতময় পরিবেশেরই রূপক। বিচিত্র মানসিক অভিব্যক্তি নিয়েও পারস্পরিক
সহাবস্থানের দ্বারা সমাজ জীবন এগিয়ে চললেও, সামান্যতম সুযোগেই পরস্প

সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়। মুরগী পিঠের অভাবে, বিড়ালের কাছে মুখরক্ষা করতে পারবেনা ভেবেই, বিড়ালছানাকে পিঠের বদলে অভক্ষ্য নোংরা পদার্থ খাইয়ে দেয়। এই সুযোগেই মুরগীর উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে বিড়াল। এর ফলে সৃষ্টি হয় উভয়ের দ্বন্দ্বের। দ্বন্দ্ব থেকে সংঘাতসৃষ্টি হয় এবং পরিণামে সমাধান হয় বিড়ালের হত্যা দ্বারা। বলবান শত্রুর সঙ্গে আনুগত্যমূলক মিত্রতার মাধ্যমে আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জয়ী হওয়ার কামনা এবং এতে ব্যর্থকাম হলে পর শত্রু যদি প্রবলতর হয়ে উঠে তবে শত্রুনিধনই শ্রেয়। এতে কিছুটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

সামাজিক দ্বন্দ্বের আরেকটি চিরন্তনরূপ অর্থনৈতিক অসাম্য জনিত দ্বন্দ্ব। এটি ''কথা বলা আংটি'' তে প্রকাশ পায় অচাইয়ের গরীব বিধবার জুমে 'বালা কামাদি' পূজা দিতে অসম্মত হওয়ার মধ্যে। মদ তো দূরের কথা, পেট পুরে একবেলা খাওয়াবার সামর্থ্যই নেই বিধবার। প্রতিবেশীরাও কেউ বিধবার কোনো খোঁজখবর রাখেনা। দৈবী সাহায্যে হঠাৎ সে ধনী হয়ে গেলে পুরোহিত তার প্রাপ্য পায় ও এই দ্বন্দ্বের অবসান হয়। এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ অর্থ এবং অর্থ দ্বারাই ধনী বনাম দরিদ্রের দ্বন্দ্বটি অপসৃত হয় এবং বিধবা আবার সমাজের সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। পুরোহিত যজমানের হয়ে পুজো করে। বিনিময়ে দক্ষিণা নেয়। দর কষাকষি করে যথাসম্ভব আদায় করার প্রসঙ্গটি আজো সমাজে সমানভাবেই প্রচলিত।

একই ধরণের অর্থনৈতিক অসাম্যজনিত দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় 'একফালি লাউ'য়ের মধ্যে। রক্তসম্পর্কও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় এখানে আর্থিক অক্ষমতার কাছে। ধনী ছোটবোনের কাছে দেনা পাওনার প্রসঙ্গটিই বড় হয়ে উঠে। ফলে গরীব বড়বোনের প্রতি এক দ্বান্দ্বিক মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। ছোটবোন বড়বোনকে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। পরবর্তী সময়ে দৈবী সহায়তায় বড়বোনের আর্থিক অসাম্য দূর হয়। তবে এখানে উভয়ের দ্বন্দ্বের কোনো সমাধান লক্ষ্য করা না গেলেও উভয়ের মানসিকতার একটি সমান্তরাল স্তরে দ্বন্দ্বটির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। অর্থ-বিত্তসম্পদ অন্যকে দেখানোর মধ্যে কারও কারও মানসতৃপ্তি ঘটে। এই দেখনদারি মনোভাব, যা দুই বোনের আচরণেই প্রতিফলিত, সমাজমানসের অর্ন্তদ্বন্দ্বেরই চিত্রায়িত রূপ।

অন্যদিকে ''ধনেশপাখির গল্প'' কাহিনীটিতে লক্ষ্য করা যায় কচাক ও ছাম্পারির মধ্যে একটি দ্বন্দ্বময় পরিবেশ। মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থার প্রতিভূ হিসেবেই ছাম্পারিকে সংসারের যাবতীয় কাজ, দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। কচাকের আলসেমি, সারাদিন বাঁশী বাজানো, কাজকর্ম না করা ইত্যাদিও সংসারের প্রতি তার দায়মুক্ততার প্রকাশ করে। কিন্তু কারণে-অকারণে ছাম্পারিকে বকাঝকা করা ইত্যাদি আচরণ পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থার ঈঙ্গিত দেয়। মনে হয় মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ অবস্থা ও পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুরু এই দুই পর্বের মধ্যবর্তী স্তরের দ্বান্দ্বিক প্রতিভাসটি এখানে ধরা পড়েছে। পিতার অসাবধানতায় ছেলের মৃত্যুতে এই

দ্বন্দ্বটি পূর্ণ প্রকাশিত হয়। ছাম্পারি স্বরূপ ফিরে পেয়ে ক্রোধে ক্ষোভে কচাককে অভিশাপ দেয়। আলসে পুরুষের সংসারে দুর্ভোগ এবং মানসিক কষ্ট থেকে উৎসারিত অভিশাপ বর্ষণ করে ছাম্পারি গভীর বনে চলে যায় এবং দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায়। সমাজে পুরুষের প্রাধান্য যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি তখনো, স্ত্রীর চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাও প্রকাশ পায়।

"সজারুর বুদ্ধি" নামক লোককথাটিতেও পশুর আচরণের মধ্য দিয়ে মানবসমাজের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিচয়টি ফুটে উঠেছে। পেশীবলের সাহায্যে শক্তিমান সবসময়ই ক্ষুদ্রকে পরাভূত করতে চায়। অন্যদিকে এখানে দুটো পশুর দ্বন্দ্বে জাতিদ্বন্দ্বের আভাসও রয়েছে। উভয়ের এই বিরোধে সজারুর বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে হাতির পরাভব ঘটে এবং এভাবে দ্বন্দ্বটির সমাধান ঘটে। 'প্রতিজ্ঞা' নামক লোককথাতে দ্বন্দ্বের স্বরূপটি প্রকাশিত হয় ছোটভাই রাঙ্গিয়ার প্রতি ভুতুয়ার ঈর্ষাপ্রসূত মনোভাব থেকে। বীরত্ব প্রদর্শন করে রাক্ষসীকে পরাভূত করার চেষ্টা করেও সে বিফলকাম হয়। পরবর্তী সময়ে রাজকন্যাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে দুরভিসন্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেও ব্যর্থ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ছোটভাই সফলকাম হয়। অন্তরের অন্তরালে ছোটভাইয়ের প্রতি তার একটি দ্বান্দ্বিক মনোভাব ছিলোই। কিন্তু কাহিনীর শেষাংশে দেখা যায়, রাঙ্গিয়া রাজকন্যাকে বিয়ে করে তার প্রাপ্ত সম্পদ থেকে কিছুটা অংশ বড় ভাইকে দেয়। এভাবে সমন্বয়ের একটা আভাস পাওয়া যায়।

"ছাতিম গাছের কাহিনী"তে দ্বন্দ্বের স্বরূপটি মূলতঃ প্রকাশিত হয়েছে ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা শুনে বোনের যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে। পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছের যে কোনো মূল্য নেই তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশই মূল বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত। এককালে প্রচলিত হলেও ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ পরবর্তী সময়ে নিন্দিত হ'ল। সেই নিন্দার্হ প্রথার পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা তার কাছে মর্যাদা হানিকর বলে মনে হয়েছে এবং সে এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে ছাতিমগাছের সাহায্যে। মিথষ্ক্রিয়ার উপাদান হিসেবে স্বপ্নে দৈবী নির্দেশ কাজ করেছে।

"চাঁদের ছেলে" কাহিনীতেও দুটো সমাজ ব্যবস্থার অন্তবর্তী দ্বন্দ্বের রূপটি ধরা পড়ে। কুমারী মেয়ে কুফুরের গর্ভবতী হওয়ার নিশ্চিত কারণটি জানতে না পারার পেছনে তার বহুচারিনী স্বভাবটি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। এতে মাতৃপ্রধান সমাজেরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে। (১৯) গ্রামের লোকেরা যে কুফুরের মামাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে তাতেও সেই সময়েরই লক্ষণ দেখা যায় যখন রক্তসম্পর্কের মধ্যে বিবাহ গর্হিত বা নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়নি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য এই ধরণের সম্পর্ক অনৈতিক বলে গৃহীত হ'ল।

মাতৃপ্রধান সমাজের ধারা অনুসারে সন্তান মাতৃনামযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত বলে চন্দ্রদেবতাসংসর্গের রং চাপিয়ে একদিকে যেমন সমাজের একটি জটিল সমস্যার আপাতবাস্তবরূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে, অন্যদিকে পিতৃপরিচয় সুদৃঢ় করার জন্য পুত্রের নাম রাখা হল 'চন্দ্রকুমার'। এই দুটো বিষয়ই পুরুষপ্রধান সমাজের চিত্র

উদঘাটন করে। পুরুষপ্রধান সমাজে সতীত্বের যে ধারণা, মাতৃপ্রধান সমাজে তার অস্তিত্ব ছিলনা। (২০)

এখানে নারীস্বাধীনতা অন্তর্হিত হবার মুখে। পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুটো ব্যবস্থার অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়েছে কুফুর। যার ফলে তাকে একটি পরিত্যক্ত জুমে নির্বাসন দিয়ে দ্বন্দ্বটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা দেখা যায়। পুত্রের জন্মদাতার পরিচয় প্রদানে অক্ষম হওয়ায় সে সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত বলেই গৃহীত হয়েছিল।

সমাজের পালাবদলের মধ্যে দ্বান্দ্বিক ভাবনাটি অন্তর্লীন থাকেই। চন্দ্রকুমারের নামকরণের মধ্যেই তার সূক্ষ্ম চিত্রটি ধরা পড়েছে। মাতৃপ্রাধান্য থেকে পিতৃ প্রাধান্যের দিকে সমাজের এগিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরাধিকার মাতৃধারার দিক থেকে পিতৃধারার দিকে এগিয়ে গেছে। রাজা-রাণী পুত্রহীন হলে জামাতা চন্দ্রকুমারকেই পুত্রস্বরূপ জ্ঞান করে রাজত্ব দান করেন। এর মধ্যেও এই ভাবনাটি পরিস্ফুট। সামাজিক ক্ষেত্রে মাতৃপ্রাধান্য ও পিতৃপ্রাধান্যের এই দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থান এভাবেই কাহিনীতে প্রকাশ পেয়েছে।

সূত্র উল্লেখ

১) আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।

২) It is a power or influence, not physical, and in a way supernatural; but it shows itself in physical force, or in any kind of power excellence which a man possesses. : —The Melanesian : Studies in their Anthropology and Folklore (1988) - R.H. codrington, P 118.

৩) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঃ মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ৮।

৪) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ আদিবাসী লোককথা, পৃঃ ক।

৫) কৈলাসচন্দ্র সিংহ ঃ রাজমালা (অখণ্ড) ১৯৮৫। পৃঃ ২০

৬) ঐ ঃ ঐ - পৃঃ ৪৭।

৭) ঐ ঃ ঐ - পৃঃ ২৪।

৮) সুখেন্দু রায় ঃ মার্কসীয় বীক্ষণ - লৌকিক অভিজ্ঞান। 'গাণ্ডীব' বিশেষ লোকসংখ্যা, ১৯৯০, পৃঃ ১৫০।

৯) সুশীল কুমার চক্রবর্তী ঃ ধর্মদর্শন, (অনুবাদ), পৃঃ ২৮।

১০) কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত ও অমিতাভ বন্দ্যোপাধায় ঃ ধর্মদর্শন, পৃঃ ২০।

১১) ঐ ঃ ঐ পৃঃ ২৫।

১২) ঐ ঃ ঐ পৃঃ ২৬।

১৩) " Taboo is enforced by custom, not by written law. When a taboo is violated, the offender need not be punished by his society because it is believed that punishment such as death, disease, or accident - is automatic. The individual offender or the members of his family may be punished... Taboos may be classed in two groups : A person, Place, thing, or action may be taboo because of its basic nature or because it has been proclaimed taboo. A priest, ruler, or sacred animal would fall in the first group. Because of their holiness, they are held to be taboo. The taboo may be that they are not to be touched, or in some cases not to be seen. A plot of ground or a particular food declared taboo by a priest or other person of authority are examples of the second group"— Britannica Junior Encyclopaedia vol. 14 P. 2 Taboo

১৪) Paul Manasala : The Naga Race, P.9

১৫) Do : Do — P. 58, P.60

১৬) Suniti Kr. Chatterjee : Kirat-Jana-Kriti P.219

১৭) Paul Manansala : The Naga Race, P. 8

১৮) Do : Do — P.8

১৯) সুজিৎ চৌধুরী ঃ প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য, পৃঃ ১৯।

২০) ঐ ঃ ঐ পৃঃ ১৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার সঙ্গে দেশ-বিদেশের লোককথার সম্পর্ক।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার বিষয়গত বৈচিত্র্য ঃ

সাধারণভাবেই দেখা যায় লোককথায় ঘটনাবলী এবং চরিত্রসূহ মিলেমিশে এমন এক পৃথিবীর সৃষ্টি হয় যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে কখনো বা একাকার হয়ে যায়, আবার কখনো বাস্তবতাকে অতিক্রম করে এক না-দেখা না বোঝা জগতে নিয়ে যায়। সেই চরিত্রেরা কখনো সাধু, কখনো খল। কেউবা প্রধান, কেউবা অপ্রধান। যে ঘটনাবলী কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেগুলো লৌকিক বা অলৌকিকও হতে পারে। বস্তুনির্ভর অথবা কল্পনাশ্রয়ী হতে পারে। আবার কখনো দেখা যায় মানব-মানবী, পশু-পাখিকে কেন্দ্র করে সাধারণ আটপৌরে জীবনের চিত্ররূপেই কাহিনীগুলো গড়ে উঠে।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথাও এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যেই গড়ে উঠেছে। গল্পগুলোতে লোককথার শর্ত সম্পূর্ণভাবেই রক্ষিত। চিরকালীন মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আকাঙ্খা, কল্পনাপ্রিয়তা যেমন উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি গোষ্ঠীজীবনবদ্ধতার দায়-দায়িত্ব, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের হতাশা, বঞ্চনা, প্রাপ্তিও লোককথাগুলোকে একটা দৃঢ় বাঁধুনি দিয়েছে। মানবেতর প্রাণীদের ঘিরে যে সমস্ত ছোট ছোট গল্প আছে সেখানেও দেখি মুখ্য কাহিনীর অন্তরালে সাধারণ উপজাতি মানুষের হাসিকান্নার ফল্গুধারাই বয়ে চলে। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে প্রতিটি গল্পই উপজাতি জীবনযাত্রার এক একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হয়ে আছে। অরণ্য ও মাটিকে ঘিরে যেখানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা হয়, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই জীবনের একটা প্রধান শর্ত থাকে যূথবদ্ধতা। লোককথাগুলোতে এই যূথবদ্ধ জীবনের চিত্রও ফুটে উঠেছে নানাভাবে। বিশেষ করে জুমচাষের ক্ষেত্রে যে সমবেত শ্রমদান প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল, তা পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠেছে।

এই লোককথাগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েকটিই আয়তনের দিক থেকে ছোট। আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের ধারণা এই যে, 'লোককথা'র আদিরূপ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল। আদিম মানুষ বিস্তৃত চিন্তাকে সূত্রবদ্ধ করতে অপারগ ছিল। পরবর্তীকালে কথকের চিন্তা মিশে সেগুলো দীর্ঘ হয়েছে। (১) 'কথা বলো না', 'মুরগীর পিঠে', 'এক ফালি লাউয়ের গল্প', 'ধনেশ পাখির গল্প', 'স্বর্গের ফুল রান্না', 'সজারুর বুদ্ধি', 'সব কালাদের এক ঘর'— এই সাতটি গল্পই আকারের দিক থেকে ছোট যেমন, তেমনই এদের ক্রিয়াশীলতায় তেমন কোনো জটিলতাও পরিলক্ষিত হয় না। তবে কাহিনীগুলোতে পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে, যা আশ্চর্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যেমন 'কথা বলো না' গল্পে দু'বোন পাখি হয়ে পরজন্ম গ্রহণ করে। 'কথা বলা আংটি' তে বড় ভাই শকুনের ডিম খেয়ে শকুন হয়ে গেল। 'এক ফালি লাউয়ের গল্পে' দেবতার

আদেশে উনুনে চাপানো কচু সেদ্ধ হ'তে হ'তে সোনা হয়ে যায়। 'ধনেশ পাখির গল্পে' দেখি স্ত্রী ছাম্পারির অভিশাপেই তার স্বামী কচাক পরজন্মে ধনেশ পাখি হয়ে জন্মায়। 'স্বর্গের ফুল রান্না'তেও দেখি স্ত্রী সাবধানবাণী অনুসরণ না করার জন্যই স্বামী 'হুলক'-এ পরিণত হয়ে যায় এবং শেষে স্ত্রী-ও মৃত্যুর পর 'গোধিকা' (মুফুক) রূপে জন্মগ্রহণ করে। 'সজারুর বুদ্ধি' গল্পটির নামকরণেই অবশ্য গল্পের পরিণতি বুঝিয়ে দেয়। উপরে উল্লিখিত প্রতিটি গল্পই আয়তনের দিক থেকে যেমন প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয়, তেমনি এক প্রাচীন সময়ের ছবি ফুটিয়ে তোলে যে সময়ে অতিলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বিষয়ে মানুষের বিশ্বাস ছিল দৃঢ় এবং বেদনাক্লিষ্ট মানুষের মুখোচ্চারিত বাক্যও যে না ফলে যায় না এমন বিশ্বাসও মানুষের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল।

লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান অনুযায়ী লোককথাকে যে সমস্ত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, তার প্রতিটি ভাগই আমরা সাধারণভাবে ত্রিপুরার লোককতায় দেখতে পাই। যেমন, বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু, গাছপালা, সাংসারিক জীবনভিত্তিক, প্রেমপ্রীতি, হাস্যরসাত্মক, ঈর্ষামূলক, নিষ্ঠুরতা, দুর্বুদ্ধিতা, নির্বুদ্ধিতা, বীরত্বমূলক, ইন্দ্রজাল, সুযোগ ও ভাগ্যের উপর নির্ভর করা, আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক, দেবতা অথবা কোনো ঘটনাপরম্পরা ইত্যাদি নানা বিষয়ভিত্তিক কাহিনী রয়েছে। কিছু কিছু কাহিনী রয়েছে পৌরাণিক কাহিনীকে ঘিরেও।

চরিত্রসমূহের ও কাহিনীর মোটিফের সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে একই কাহিনী সামান্য ভিন্নরূপে, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে মিল থাকা প্রায় সকল উপজাতি জনগোষ্ঠীর মাঝেই প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। বিশেষতঃ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কারণটিও লোকসংস্কৃতির আদান প্রদানের ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় থাকতে পারেনি। যার ফলে রামায়ণ মহাভারত, জাতক, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, হিতোপদেশের গল্প ইত্যাদি উপজাতি জনজীবনে পরিচিত এবং এই সমস্ত কাহিনীতে ব্যবহৃত কিছু কিছু মোটিফ ত্রিপুরার উপজাতি লোককথাগুলোতেও দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশের লোককথায় যে পীর বা ফকিরদের উল্লেখযোগ্য আধিদৈবিক ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায়, সেরকম কোনো কাহিনী ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় পাওয়া যায় না। এর কারণ হিসেবে একথা বলা চলে যে, ত্রিপুরা দীর্ঘদিন একনাগাড়ে কোনো মুসলমান শাসকের অধীনে শাসিত হয়নি। যার ফলে এখানকার সংস্কৃতিতে এই ধরণের কোনো প্রভাব পড়েনি।

ত্রিপুরা উপজাতি লোককথায় গ্রামীণ জীবনের ঘটনা ও চরিত্রসমূহেরই অপ্রতিরোধ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উপজাতি জনজীবনের আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনারই প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করা যায় এই সমস্ত কাহিনীতে। লোককথার চরিত্রসমূহকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়।

(১) বন্য অথবা গৃহপালিত জীবজন্তু, পাখি, সাপ, ফুল ইত্যাদি।

(২) শিকারী, সংগ্রহকারী, জুমিয়া, পুরোহিত, প্রধান, রাজা ইত্যাদি।

(৩) দেবতা, রাক্ষসী, প্রেতাত্মা ইত্যাদি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সমস্ত চরিত্রেরা কখনো এককভাবে লোককথায় উপস্থিত থাকে না। প্রতিটি চরিত্রই এখানকার উপজাতি লোককথায় একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধিত। তারা একসঙ্গেই বসবাস করে, একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে। উপকার যেমন করে, ক্ষতিও করে। বলা চলে, একে অন্যের পরিপূরক। একজনকে ছাড়া অন্যের যেমন চলে না বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে, তেমনি ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার প্রাণ অর্থাৎ গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে অপরের অনুপস্থিতিতে । এভাবেই আমরা দেখা পাই 'কথা বলা পাখি'দের এবং 'দুর্ঘটনার বিবরণ দেয়া প্রাণী'দের। দেখা পাই অজগর সাপের ছদ্মবেশধারী মহান দেবতার, যিনি জুমক্ষেতে কর্মরতা দরিদ্র মেয়েদের জন্য 'গীয়রিঙ' (টংঘর) বানিয়ে দেন এবং পরবর্তী সময়ে মেয়েটিও অজগর সাপকে বিয়ে করার মাধ্যমে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। দেখাযায়, নাঐ পাখিদের, যারা দুর্ভাগা মেয়েটিকে তার কষ্টকর গৃহজীবন থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে পালক আর নখ উপহার দিয়ে।

অধিকাংশ লোককথাই কৃষিজীবন অর্থাৎ জুমচাষনির্ভর জীবনযাত্রাকে ঘিরে আবর্তিত হলেও সেখানে কোথাও রাজা, কোথাও দেবতা, কোথাও 'ফুরাই' (যুদ্ধে যাবার পরোয়ানা) হাতে নিয়ে 'বিরিন্দিয়া' (সৈন্য) এসে হাজির হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় লোককথা, পৌরাণিক কাহিনী ও বৌদ্ধজাতকের গল্পের সঙ্গে এর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যঃ

অনাদিকাল থেকেই মানুষ লোককথা সৃষ্টি করে আসছে। শুধু যে অনাবিল আনন্দ থেকেই এর সৃষ্টি হয়েছে তা নয়, যে ইচ্ছাকে বাস্তবের ভূমিতে রূপায়িত করতে পারেনি, তাকে লোককথার মাধ্যমেই রূপায়িত করেছে এবং এর মাধ্যমে তার ইচ্ছাপূরণ করেছে। এভাবেই লোককথা হয়ে উঠেছে আদি মানবের ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম। মানুষের স্থান থেকে স্থানান্তরে প্রচরণের সঙ্গে সঙ্গে এই কাহিনীগুলোও স্থানান্তরিত হয়েছে। আবার পুরুষানুক্রমে প্রচারিত হয়ে হয়েও এই গল্পগুলো মানবগোষ্ঠীর মাঝে জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

এইসব লোককথা অনেকক্ষেত্রে পরবর্তীকালের অনেক কাব্যের উৎস হিসেবেও স্বীকৃত হয়েছে।

তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সর্বদেশের লোককথার আপাতসাদৃশ্যটি লক্ষ্য করা যায়। লোককথার এই চিরকালীন বিশ্বজনীন রূপটি ত্রিপুরার লোককথায় আমরা পূর্ণভাবে লক্ষ্য করি। প্রাচীন ভারতীয় লোককথা, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির সঙ্গেও ত্রিপুরার লোককথার সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। সাদৃশ্যের প্রসঙ্গে বৈসাদৃশ্যের প্রসঙ্গটি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে।

পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, পিল্‌পের নীতিকথা ইত্যাদির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় লোককথার যে চিত্রটি ধরা আছে, আশ্চর্যজনকভাবে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথাগুলোতেও আমরা সমধর্মী চিত্র দেখতে পাই। এছাড়া বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী সমূহ এবং রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীসহ জাতকের কাহিনী সমূহের সঙ্গেও এখানকার গল্পগুলোর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই লক্ষ্য করা যায়। লোকসমাজ খুব সহজে বাইরের কোনোকিছু গ্রহণ করেনা। আপন ঐতিহ্যের প্রতি তাদের এক অনন্য মমত্ববোধ থাকে। ফলে এক কঠিন সাংস্কৃতিক আবরণের মধ্যে নিজেদের তারা আবৃত করে রাখে। যা কিছু তাদের নিজস্ব ভাবনা ও অনুভূতির সঙ্গে খাপ খায়, তাকেই তারা আপন করে নেয়।

এই কঠিন অলিখিত শর্ত পার হয়েও আমরা ত্রিপুরার লোককথার সঙ্গে প্রাচীন লোককথাগুলোর এক অদ্ভুত সাদৃশ্য পাই।

পঞ্চতন্ত্র ঃ পৃথিবীর লোককথার সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন হিসেবেই পঞ্চতন্ত্রকে গণ্য করা হয়। এর ভেতর দিয়ে নীতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর পশুপাখিদের মতোই ত্রিপুরার লোককথার পশুপাখিরাও মানব চরিত্রের প্রতীক ও রূপক হিসেবে কাহিনীতে এসেছে। পঞ্চতন্ত্রের "কাক ও কৃষ্ণসর্প" নামক কাহিনীতে রয়েছে-প্রকাণ্ড এক বটগাছে এক কাক দম্পতি বাস করতো। ঐ গাছেরই গর্তে বাস করতো কৃষ্ণসর্প। যতবারই কাকের ডিম ফেটে বাচ্চা হতো, ঐ সাপটি বাচ্চাদের খেয়ে ফেলতো। এতে কাকদম্পতি অন্য গাছে গিয়ে বাসা বাঁধবে ঠিক করলো। কিন্তু তাদের বন্ধু শেয়াল তাদের যেতে বারণ করলো এবং বললো রাজকন্যার গলার হার এনে সাপের গর্তে রেখে দিতে। বন্ধুর কথামতো কাক সোনার হার এনে গর্তে রাখলে পর, হার উদ্ধার করতে এসে রাজপ্রহরীরা সাপকে লাঠি দিয়ে মেরে ফেলে। (২) শারীরিক শক্তি ছাড়াও বুদ্ধিবলের দ্বারাও যে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা যায় তারই প্রমাণ এই কাহিনীটি। ত্রিপুরার "মুরগীর পিঠে" লোককথাটিতে আমরা এই ভাবনারই প্রতিরূপ দেখতে পাই। সবলের প্রতিভূ বিড়ালের হাত থেকে বাঁচার জন্য মুরগী বুদ্ধির আশ্রয় নেয় ও অবশেষে বিড়ালের মৃত্যু হয়। এই কাহিনীটির মধ্য দিয়ে 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'— এই নীতিকথাটিই প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

"সজারুর বুদ্ধি" নামক উপজাতি লোককথাটিতে দেখি ছোটপ্রাণী সজারুর বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়ে এক বিশালাকার হাতি সেই বন থেকেই পালিয়ে যায়। পঞ্চতন্ত্রের " বোকা হাতির গল্প" কাহিনীটিতে ছোট্ট প্রাণী খরগোশের বুদ্ধির কাছে হাতি পরাভূত হয়ে বন ছেড়ে পালিয়ে যায়। কাহিনীটি এরকম ঃ এক বনে চতুর্দন্ত নামে এক হাতি বাস করতো। সে ছিল সব হাতির রাজা। একবার জলাভাবের সময় অন্যান্য হাতিদের অনুরোধে চতুর্দন্ত সবাইকে অন্য একটি জলাশয়ে নিয়ে যায় এবং সেখানে সুমিষ্ট জল পান করে ও শরীর ডুবিয়ে স্নান করে, জলকেলি করে আনন্দ করলো। ঐ জলাশয়ের চারদিকের গর্তে বসবাসকারী অনেকগুলো

খরগোশ হাতিদের আসাযাওয়ার সময় পায়ের চাপে মারা গেলে খরগোশরা সবাই ঠিক করলো অন্য কোথাও চলে যাবে। কিন্তু লম্বকর্ণ নামে একটি খরগোশ যেতে চাইলো না। সে সাহস করে চতুর্দন্তকে গিয়ে বললো, যে, সে চন্দ্রদেবের কাছ থেকে এসেছে। এই খরগোশরা চন্দ্রদেবের আশ্রিত। সুতরাং যদি হাতিরা প্রাণে বাঁচতে চায়, তবে যেন শীঘ্রই এই স্থান থেকে চলে যায়। লম্বকর্ণের কথায় অবশেষে হাতি সদলবলে বন ছেড়ে পালিয়ে যায় (৩)

সাদৃশ্যমূলক কাহিনী দুটো ছাড়াও "তিন ধূর্ত" কাহিনীটিতে দেখা যায়, মিত্রশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণকে তার যজমান একটি ছাগল দান করলে তিনি ছাগলটি কাঁধে নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। পথে ব্রাহ্মণের ছাগলের উপর তিন ধূর্তের খুব লোভ হ'ল। এক ধূর্ত ব্রাহ্মণকে বললো যে, তিনি কুকুর কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন। কিছুদূর যাবার পর দ্বিতীয় ধূর্ত বললো যে, তিনি একটি মরা পশু নিয়ে যাচ্ছেন। আরো দূরে যাবার পর তৃতীয় ধূর্ত এসে বললো যে, তিনি একটি গাধার বাচ্চা কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনজনের কাছে এরকম কথা শুনে ব্রাহ্মণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ছাগলটিকে পথে রেখে বাড়ীর পথে রওয়ানা হলেন। ব্রাহ্মণ চলে গেলে তিনধূর্ত ছাগলটি কেটে তার মাংস খেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করলো।

এখানে ব্রাহ্মণের এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে ছাগলটি হস্তচ্যুত হবার কাহিনীর অনুরূপ কাহিনী ত্রিপুরার লোককথায় পাওয়া যায় না।

পঞ্চতন্ত্রে "সর্প ও পূজা" নামক কাহিনীটিতে হরিদত্ত ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও চাষাবাদ করে সংসার চালাতো। একদিন সে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম করছিল এমন সময় দেখলো একটি ঢিবির উপর একটি বিষধর সর্প ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। হরিদত্ত ভাবলো ইনি ক্ষেতের দেবতা। তাই একে প্রতিদিন দুধ ও কলা খেতে দিতে লাগলো। প্রতিদিন একটি করে স্বর্ণমুদ্রাও পেতে লাগলো সর্পের কাছ থেকে। কিছুদিন যাবার পর হরিদত্ত ভাবলো মাটির ঢিবির নিচে অনেক স্বর্ণমুদ্রা আছে নিশ্চয়ই। তাই একদিন হরিদত্ত দুধকলা সাপের সামনে এগিয়ে দিয়ে লাঠি দিয়ে সাপের মাথায় আঘাত করলো। কোনোরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে সাপ প্রচণ্ড রাগে ফণা বিস্তার করে হরিদত্তকে ছোবল দিলো। হরিদত্তের মৃত্যু হ'ল (৪)।

এই কাহিনীটির অনুরূপ কোনো কাহিনী ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে পাওয়া না গেলেও কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। "সাপকে ক্ষেতের দেবতা" মনে করার যে মোটিফটি এই গল্পে রয়েছে, তা "অজগর সাপের গল্প" তেও লক্ষ্য করা যায়। সাপই 'গীয়রিঙ' তুলে দিয়েছে, ভেবে বড়োবোন অজগর সাপকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করে নেয়। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর সঙ্গে ত্রিপুরার কাহিনীর একটি বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। অনেক দুর্বল সংঘবদ্ধ হ'লে একটি বিশেষ শক্তিমানও তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, লোকমানসের এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি দুটো ক্ষেত্রেই রয়েছে।

মন্ত্রের দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার মোটিফটি ত্রিপুরার লোককথায় পাওয়া যায়। যেমন

"প্রতিজ্ঞা" গল্পে রাঙ্গিয়া কর্তৃক ঘিলালতা মাটিতে পুঁতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লতার বেড়ে যাওয়া অথবা "ছাতিম গাছের কাহিনী" তে ছাতিম চারার বেড়ে যাওয়ার মধ্যে। এই একই মোটিফ "পঞ্চতন্ত্রে"র কাহিনীতেও পাওয়া যাচ্ছে। তার কাহিনীটি এইরকম ঃ

চারজন ব্রাহ্মণপুত্র। তিনজন শাস্ত্রে পারদর্শী, কিন্তু বুদ্ধিহীন। চতুর্থজন বুদ্ধিমান কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানহীন। একদিন তিনবন্ধু বিদ্যার গর্ব করতে করতে একটি মৃতসিংহের হাড়গোড় জড়ো করে মন্ত্র পড়তে লাগলো। সিংহ বেঁচে উঠে এদেরকে আগে খাবে ভেবে চতুর্থ বন্ধু নিরাপদ উচ্চতায় গাছে উঠে বসলো। ওদিকে তিন বন্ধুর মন্ত্রের জোরে সিংহ বেঁচে উঠলো এবং তিন বন্ধুকেই খেয়ে ফেললো (৫)।

পঞ্চতন্ত্রে কাহিনীর সঙ্গে নীতিবাক্যগুলোও প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরার লোককথায় এমনভাবে তা প্রকাশিত না হলেও মাঝেমাঝে গানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। (দ্রঃ অজগর সাপের গল্প, বানরবর, চাঁদের ছেলে) (৬)। ছড়ার ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায় কিছু কিছু কাহিনীতে, যেমন 'বিচার', 'একটি মাছির গল্প', 'এক ফালি লাউয়ের গল্প', 'ছাতিম গাছের কাহিনী', 'মুরগীর পিঠে' ইত্যাদি।

পঞ্চতন্ত্রের অধিকাংশ কাহিনীর পাত্রপাত্রীর নামই গুণবাচক। অর্থাৎ নামগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা গুণের পরিচয় যেন পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। যেমন অমরশক্তি, উগ্রশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতি, চতুরক এবং এমন আরো অনেক। এই বিষয়টি ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার পাত্রপাত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন, ত্রিলোচন (রক্তপিপাসু দেবতা)। কিংবদন্তী এই যে, কুমার ত্রিলোচন শিবের আশীর্বাদে তিনটি নেত্র নিয়ে জন্মেছিল। "গুল্মকুমারী" গল্পে গুল্মকুমারী অর্থাৎ গুল্মস্থিত কুমারী। চন্দ্রমাদেবের সঙ্গে মিলনে পুত্রের জন্ম হয়েছিল বলে কুফুরতির ছেলের নাম হয় চন্দ্রকুমার (দ্রঃ চাঁদের ছেলে)। "নাঐ পাখির গল্পে" গায়ের রঙ হলুদবর্ণ বলে মেয়েটির নাম রাখা হয় 'করমতি'।

কথাসরিৎসাগর ঃ

কাশ্মীররাজ অনন্তের সভাকবি কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ সোমদেব রচিত "কথাসরিৎসাগর" এর রচনাকাল ১০৬৩ - ১০৮১। রাজা অনন্তের মহিষী সূর্যমতীর চিত্তবিনোদনের জন্য রচিত হয়েছিল এটি গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' কে অবলম্বন করে। "মানবেতর প্রাণীর মানবে রূপান্তরে"-র যে মোটিফটি ত্রিপুরার লোককথায় রয়েছে 'কথাসরিৎসাগরে'-র একটি কাহিনীতে তারই অনুরূপ মোটিফ লক্ষ্য করা যায়।

যজ্ঞসোম অর কীর্তিসোম দুভাই। যজ্ঞসোম দান করে নিঃস্ব হয় আর কীর্তিসোম ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি করে। অভাবে পড়ে বড়ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে কোনরকম সাহায্য না পেয়ে বনের পথে রওয়ানা হ'লে একটি বড় সাপ এসে যজ্ঞসোমকে খেয়ে ফেললো। যজ্ঞসোমের

স্ত্রীর কান্নায় সাপ একটি স্বর্ণপাত্র তাকে দিলো। কিন্তু স্ত্রী ভিক্ষা চাইলো যজ্ঞসোমকে। তখন সাপ যজ্ঞসোমকে মুখের ভেতর থেকে অটুট অবস্থায় বের করে দিলো এবং সাপটি নিজে একজন দিব্যদর্শন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এই সাপটি আসলে বিদ্যাধরদের রাজা। গৌতম মুনির অভিশাপে সাপ হয়ে ছিল। পরমুহূর্তেই বিদ্যাধররাজ আকাশে উধাও হয়ে গেলেন(৭)।

এই গল্পটির সঙ্গে উপজাতি লোককথার সাপ কর্তৃক ছোট মেয়েকে (দ্রঃ উইপোকা স্বামী) খেয়ে ফেলার সাদৃশ্য রয়েছে। আবার সাপের দিব্যদর্শন পুরুষে রূপান্তরের অভিপ্রায়টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে "অজগর সাপের গল্পে"। উইপোকার সঙ্গে চাষীর মেয়ের বিয়ে হয় প্রথমোক্ত কাহিনীতে। সেখানেও উইপোকা রূপান্তরিত হয় দিব্যদর্শন রাজকুমারে।

"স্বর্গের ফুল রান্না" গল্পের অনুরূপ একটি গল্প রয়েছে 'কথাসরিৎসাগরে'। এক মূর্খের স্ত্রী ছিল দারুণ তিরিক্ষি মেজাজের। সে একদিন বাপের বাড়ী ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবে বলে তার স্বামীকে বললো যেভাবে হোক তাকে একটা নীলপদ্মের মালা এনে দিতে। স্বামী রাজবাড়ীর দীঘি থেকে নীলকমল চুরি করতে গিয়ে প্রহরীর হাতে ধরা পড়লো। কিন্তু রাজা দয়ালু বলে লোকটিকে শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দিলেন (৮)। অন্যদিকে ত্রিপুরার গল্পেও দেখা যায় স্ত্রী বারবার অনুরোধ করাতে স্বামী রান্না ফুল ছিঁড়ে আনে। কিন্তু ট্যাবুভঙ্গ করাতে দুজনেই শাস্তি পায়। পূর্বোক্ত গল্পে রাজার দেয়া শাস্তি মকুব হয়ে যায়।

'কথাসরিৎসাগরের' আরেকটি গল্প রয়েছে বোকা জামাইকে ঘিরে। এমন গল্প বাংলা লোককথায়ও রয়েছে। কিন্তু উপজাতি লোককথায় এমন গল্প পাওয়া যায় না। বোকা জামাইয়ের গল্পটি এরকমঃ এক মুর্খ প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে এসে দেখে, তার শ্বাশুড়ী রান্না করার জন্য সাদা ধবধবে চাল বের করে রেখেছেন। জামাই কিছু চাল মুখে দেয়ামাত্রই শ্বাশুড়ী এসে পড়ে সেখানে। লোকটি লজ্জায় তা ফেলতেও পারে না, গিলতেও পারে না। ফোলা মুখ নিয়ে সে চুপ করে রইলো। শ্বাশুড়ী ভয় পেয়ে ডেকে আনলেন তাঁর স্বামীকে। শ্বশুরও জামাইয়ের অবস্থা দেখে কিছু বুঝতে না পেরে ডেকে আনলেন বৈদ্যকে। বৈদ্য জামাইয়ের মুখের ভেতরে আব হয়েছে মনে করে মুখ দেখার জন্য যেই তার মুখ ফাঁক করলেন অমনি মুখ থেকে সব চাল মাটিতে পড়লো। সবাই আসল কারণ বুঝতে পেরে কি হাসি (৯)।

"বানরবর" কাহিনীটিতে দেখা যায় বানরের হাত থেকে কিভাবে তার মানবী স্ত্রী রক্ষা পেয়েছিল। কাহিনীর অন্তে মেয়েটিই বানরকে মৃত্যুফাঁদে পড়ে যেতে বাধ্য করে। কথাসরিৎসাগরের একটি গল্প প্রায় একই অভিপ্রায় যুক্ত। কিন্তু এখানে বানর স্ত্রীলোকটিকে ধরতে পারেনি। গল্পটি এমন ঃ একদিন একটি স্ত্রীলোক একগ্রাম থেকে অন্যগ্রামে যাচ্ছিল। এমন সময় একটি বানর এসে তাকে ধরবার চেষ্টা করলে সে একটি গাছের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে বানরের দুটো হাত চেপে ধরে। এমনসময় এক রাখাল সে পথে যাচ্ছিল। স্ত্রীলোকটি রাখালকে ডেকে আনে ও তাকে বানরের হাতদুটো চেপে ধরতে বলে। পরে নিজে বানরকে ছোরার

সাহায্যে হত্যা করে। তারপর একদল পথিকের সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাদের সঙ্গেই সে গন্তব্যস্থলে চলে যায়। দুটো গল্পেই বুদ্ধির সাহায্যে স্ত্রীলোকেরা রক্ষা পায় বানরের হাত থেকে (১০)।

"ধনেশপাখির গল্পে" স্ত্রী ছাম্পারির অভিশাপে স্বামী কচাক রায় ধনেশ পাখি হয়ে জন্মায়। "কথাসরিৎসাগরেও এমন একটি কাহিনী আছে যেখানে পিতার অভিশাপে প্রাক্তন বিদ্যাধর দেবঘোষ এক মূর্খ সিংহ রূপে জন্মগ্রহণ করে (১১)।

"একটি মাছির গল্পে" সূত্রমূলক কাহিনীর লক্ষণ হিসেবে দেখা যায় মাছির বদলে চুউান, চুউানের বদলে মোরগ, মোরগের বদলে ছাগল এবং এভাবে অবশেষে একটি যুবক স্ত্রী লাভ করে। "কথাসরিৎসাগরে" একটি কাহিনী দেখা যায় যেখানে এক গৃহস্থের সম্বল বলতে শুধু একটি মাত্র ষাঁড়। দেবীর কৃপায় লোকটি একটি ষাঁড় বিক্রী করে আরেকটি পায় এবং এভাবেই ক্রমান্বয়ে এক একটি করে ষাঁড় পেয়ে লোকটি সংসারযাত্রা নির্বাহ করে (১২)।

হিতোপদেশ

পণ্ডিত নারায়ণ বিরচিত হিতোপদেশ, প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম। নীতিশিক্ষামূলক এই গ্রন্থে লোককথার নানা উপাদান ছড়িয়ে আছে। একটি গল্প এইরকম ঃ

ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলক নামে একটি হাতি ছিল। তাকে দেখে সকল শেয়াল চিন্তা করলো, যদি কোনো উপায়ে একে হত্যা করা যায় তা হলে এর দেহ দিয়ে চারমাসের প্রচুর খাদ্য হবে। এক বৃদ্ধ শেয়াল প্রতিজ্ঞা করলো, বুদ্ধিবলে হাতির মৃত্যু ঘটাবে। শেয়াল কর্পূরতিলকের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললো, 'দেব, আমাকে অনুগ্রহ করুন'। হাতি বললো 'তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো? শেয়াল তখন বললো যে, বনবাসী সব পশু তাকে হাতির কাছে পাঠিয়েছে এই বলে যে, যেহেতু তিনি (হাতি) সকল গুণে বিভূষিত, অতএব বনরাজ্যে অভিষেকের জন্য তিনিই নিরূপিত হয়েছেন।

এরপর কর্পূরতিলক রাজ্যলোভে আকৃষ্ট হয়ে শেয়ালের পেছনে পেছনে দৌড়োতে গিয়ে কাদার মধ্যে পড়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে শেয়ালের শরণাপন্ন হ'লে সে বললো, যেহেতু আপনি আমার ন্যায় ধূর্তের কথায় বিশ্বাস করেছেন, তার ফল এই। বলেই শেয়াল একটি নীতিকথা বললো।

যে সময় অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করবে, তখনই জীবিত থাকবে, আর যখন অসৎসঙ্গে মিলিত হবে, তখন বিপদে পতিত হ'বে।

এই কাহিনীটির সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক একটি কাহিনী ত্রিপুরার লোককথায় রয়েছে। "সজারুর বুদ্ধি।" দুটো কাহিনীর অবয়বগত পার্থক্য এই যে, হিতোপদেশের কাহিনীতে হাতি প্রবঞ্চিত হ'লে ছোট অথচ বুদ্ধিমান প্রাণী শেয়াল হাতিকে নীতিকথা বলে। কিন্তু "সজারুর বুদ্ধি" তে এমন কোনো নীতিকথা প্রকাশ্যে বলা হয়নি। তবে এই দুটো কাহিনীতেই একটি সাদৃশ্য দেখা

যায় যে হাতি বলশালী হয়েও তার চেয়ে ছোট একটি প্রাণীর কাছে পরাজিত হয়। ত্রিপুরার গল্পে সজারু তার গায়ের কাঁটা ছুঁড়ে হাতিকে ভয় দেখায় এবং এভাবে হাতি প্রবঞ্চিত হয়। দুটো কাহিনীর রূপ, রীতি ও মোটিফগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। হিতোপদেশের আরেকটি কাহিনী, রাজা শূদ্রকের রাজদ্বারে বীরবর নামে এক রাজপুত্র রাজার অধীনে কার্যে নিয়োজিত হ'তে ইচ্ছে প্রকাশ করলে রাজা মন্ত্রীদের কথানুসারে তাকে তাঁর প্রার্থিত অর্থের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করলেন। বীরবর তাঁর লব্ধ অর্থের অর্দ্ধাংশ দেবতা ও ব্রাহ্মণদের দান করতেন। অবশিষ্ট অর্থের অর্দ্ধাংশ দরিদ্রদের ও তার অর্দ্ধাংশ অর্থ আহার ও বিলাসের জন্য ব্যয় করতেন। এই সমস্ত প্রাত্যহিক কাজ সমাপ্ত করে হাতে খড়্গ নিয়ে রাজদ্বারে প্রহরীর কাজ করতেন।

একদিন কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রিতে শোকাকুল ক্রন্দনধ্বনি শুনে বীরবর রাজার আদেশে কারণ অনুসন্ধানে বের হয়ে নগরের বাইরে গেলেন এবং রূপযৌবনবতী এবং সালঙ্কারা ক্রন্দনরতা এক নারীকে দেখে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। নারী বললেন তিনি রাজা শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী। বহুকাল শূদ্রকের বাহুচ্ছায়ায় ইনি বাস করছেন তবে মহিষীর অপরাধে শূদ্রক তৃতীয়দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হ'বেন এবং তিনি রক্ষকহীনা হ'বেন।

একথা জেনে বীরবর বললেন, যেখানে বিপদের সম্ভাবনা, সেখানেও সম্পদের সম্ভাবনা আছে। তাহ'লে কেন পুনরায় এখানে দেবীর অবস্থান হ'বে না? তখন লক্ষ্মী বললেন, যদি বীরবর তাঁর পুত্র শক্তিধরকে ভগবতী সর্বমঙ্গলার কাছে বলি দেয় তবেই রাজা শতবৎসর বাঁচবেন এবং তিনিও সুখে সুদীর্ঘকাল বাস করবেন ব'লে অদৃশ্য হ'লেন। বীরবর দেবীর আদেশে নিজ পুত্রের বলিদান করেন। পুত্রহীন জীবনের অসারতার কথা চিন্তা করে নিজেও আত্মঘাতী হ'লেন। অবশেষে স্বামী ও পুত্রের জন্য শোকার্ত হয়ে বীরবলের স্ত্রীও একইভাবে আত্মদান করলেন।

এইসব দেখে রাজা শূদ্রকও মৃত্যুবরণ করার উদ্দেশ্যে খড়্গ উত্তোলন করলে ভগবতী সর্বমঙ্গলা আবির্ভূত হয়ে শূদ্রককে বললেন যে, তিনি শূদ্রকের উপর প্রসন্ন হয়েছেন। তাঁর রাজ্যভঙ্গ হ'বে না সুতরাং তাঁর এমন সাহসের প্রয়োজন নেই।

পরে রাজা শূদ্রকের অনুরোধে রাজপুত্র বীরবর দেবীর আশীর্বাদে, স্ত্রী পুত্রসহ পুনর্জীবনলাভ করেন।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা 'রক্তপিপাসু দেবতা' সঙ্গে এই কাহিনীটির সাদৃশ্য- বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

ত্রিপুরার কাহিনীতে দেখা যায়, রানী হীরাবতী নদীর ঘাটে জল আনতে গেছেন এমন সময় নদীর ওপার থেকে ভেসে এলো কাতরধ্বনি। প্রশ্ন করে রানী জানলেন যে এঁরা চৌদ্দজন দেবতা। একটি পাজি মোষের তাড়া খেয়ে শিমুল গাছে উঠেছেন। মোষের ভয়ে গাছ থেকে এখন আর নামতে পারছেননা। সতী নারী রানীমা তাঁর 'রিছাটি (বক্ষাবরনী) মোষের পিঠে ফেলে দিলেই মোষ বাগে আসবে এবং দেবতারা নিচে নামতে পারবেন।

অবশেষে রানীমা তাঁর অনুগত কুড়ি পঁচিশজন লোক নিয়ে এলেন। মোষকে বধ করা হল। দেবতারাও নির্ভয় হ'লেন এবং রানীমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পরবর্তী সময়ে এ দেবতারাই রানীমার ছেলে ত্রিলোচনকে ছাগলে রূপান্তরিত করে প্রতিদিন তার রক্ত পান করতেন। এতে রাণীমা দেবতাদের খুব কড়া কথায় বকলেন। অবশ্য পরে দেবতাদের প্রিয় রুধিরভোগের ব্যবস্থা করলেন প্রতিদিন। দেবতারাও খুব সন্তুষ্ট হয়ে রাণীকে আশীর্বাদ করলেন। 'জয় রানীমার জয়! জয় রানীমার জয়' বলে।

দুটো কাহিনীর মধ্যে একটি অন্তর্লীন সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অভিপ্রায়গত সাদৃশ্য হিসেবে এসেছে বলি-প্রসঙ্গ। দুটো কাহিনীই গড়ে উঠেছে রাজা ও রানীর সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক তথা আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা ঘিরে। রাজা শূদ্রকের রাজ্যে রাজলক্ষ্মী তথা প্রধান দেবী তিনি এবং রানী হীরাবতীর রাজ্যে এই চৌদ্দজন দেবতা প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত। দুটো কাহিনীরই মুল মোটিফ দেবতার (দেবী) আশ্রয় গ্রহণ। বৈসাদৃশ্য যেটুকু লক্ষ্য করা যায় তা দুটো কাহিনীর অবয়বে।

পিল্‌পের নীতিকথা ঃ

পিল্‌পের নীতিকথা "পঞ্চতন্ত্রের" সময়সীমায় রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই সংক্ষিপ্ত নীতিকথাগুলোতে লোকশিক্ষার বিষয়টি রয়েছে। এখানে কিছু লোককথা রয়েছে যার সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথাগুলোর কাঠামোগত এবং অভিপ্রায়গত একটা আপাতসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কখনো কখনো সাদৃশ্যের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যটিও চোখে পড়ে। পশুপাখিদের মাধ্যমে জীবনের সত্যোদ্ঘাটন করার চেষ্টা রয়েছে পিল্‌পের নীতিকথায়। 'মুরগী ও বাজপাখি'র গল্পে দেখা যায় একদিন একটি বাজপাখি একটি মুরগীকে বললো, তোমরা বড় অকৃতজ্ঞ, উপকার স্বীকার করনা। তোমাদের কত ভালো ভালো খাবার দেয়া হয়, থাকতে দেয়া হয় কত সুন্দর ঘরে। শেয়াল যাতে রাতের আঁধারে তোমাদের ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য প্রভু তোমাদের ঘরকে মজবুত করে গড়েছে। আর প্রভু যখন তোমাদের ধরতে যায়, আদর করতে চায়, তোমরা তখন ডাক ছেড়ে পালাও। আর দেখ, আমরা এতো সুযোগ পাইনা। তবুও মানুষ যখন আমাকে ধরে, আদর করে তখন আমি পালাই না, আদর নিই। বনে-জঙ্গলে মাঠে শিকারের সময় আমি তাই ওদের সাহায্য করি। তোমরা এমন কর কেন?

মুরগী গলা নিচু করে বললো, তুমি যা বললে তা খুব সত্যি। কিন্তু বন্ধু মনে করে দেখতো, তুমি কোনদিন আগুনের মধ্যে ঝলসানো বাজপাখি দেখেছ কিনা। আমরা যে নিত্যদিন অনেক অনেক মুরগীকে আগুনে ঝলসাতে দেখেছি।

সরাসরিভাবে বলা এই অনন্য গল্পটির অনুরূপ গল্প পাওয়া না গেলেও 'বিচার' নামক গল্পের সঙ্গে পিল্‌পের একটি গল্পের অনেকটা মিল রয়েছে। এর নাম 'দয়ালু রাজা'। এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব নিষ্ঠুর। একদিন ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, বনের

একটা শেয়াল তাড়া করেছে একটা মুরগীকে। ঠিক সেই সময়ে একটা কুকুর তাড়া করলো সেই শেয়ালটাকে, কামড়ে ধরলো শেয়ালের পা। শেয়াল কোনোরকমে বেঁচে গেল, কিন্তু খুঁড়িয়ে চলতে লাগলো। সে তার গর্তে ঢুকে গেল। কুকুর অন্য পথে হাঁটা দিলো। এমন সময় একটা লোক কুকুরকে দেখতে পেয়ে পাথর ছুঁড়লো, পাথর লাগলো কুকুরের মাথায়, মাথা গেল ফেটে। এমন সময় সেখান দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল একটা ঘোড়া, মানুষটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল, মাড়িয়ে দিল মানুষটার পা। একটু পরে ঘোড়ার পা পড়ল একটা পাথরের উপরে, পিছলে গেল পেছনের পা, ঘোড়ার পা গেল ভেঙে।

রাজা বলে উঠলেন, 'হায়! এসব ঘটল যেন আমায় শিক্ষা দিতে। বুঝলাম তাদের কপালেই বিপদ ঘটে যারা অন্যায় করে'।

এই গল্পটির মধ্যে সূত্রমূলক অভিপ্রায়টি (Chain motif) রয়েছে। 'বিচার'-এও একই অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র এই গল্পের নীতিকথাটির জন্য এটি একটি অন্যমাত্রা পেয়েছে। "বিচারে" রাজা অন্যায়কারীকে দুষ্কর্মের জন্য সাজা দেন। 'ব্যাঙের কোমর ভাঙ্গা কেন' বা 'ব্যাঙ কেন সোজা হয়ে হাঁটতে পারেনা' এই প্রশ্নের উত্তরও 'বিচার'-এ পাওয়া যাচ্ছে। পিলপের নীতিকথায়ও এরকম সৃষ্টিমূলক কাহিনী রয়েছে। 'বাঘের মুখে কালো কালো দাগ কেন'-র উত্তরে গল্পটি বলা হয়েছে।

এক বনে গাছের নিচে বসে ছিল এক খরগোশ। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক বাঘ। তাকে বসে থাকতে দেখে বাঘ বলল, এখানে বসে কি করছো? খরগোশ বললো, দাদুর ঘন্টা পাহারা দিচ্ছি, বসে রয়েছি যাতে কেউ চুরি করে পালাতে না পারে। বাঘ বললো, কোথায় সেটা? খরগোশ চোখ তুলে পাশের একটা গাছের ডাল দেখিয়ে দিল। সেখানে ঝোলানো রয়েছে লম্বা মতন কালো একটা কি যেন। খরগোশ বাঘকে বললো যে সে ইচ্ছে হ'লে ঘন্টাটা বাজাতে পারে। তবে তার আগে খরগোশ উঠে দূরে চলে যাবে। ঘন্টা বাজালে খুব শব্দ হয়। কানে তালা লেগে যায়, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। বাঘের ঘন্টা বাজাবার খুব শখ হল। সে যেই গাছে উঠলো, খরগোশ দূরে চলে গেল। গায়ের জোরে বাঘ থাবা বসালো ঘন্টায়। ওটা ছিল একটা মৌচাক। শত শত মৌমাছি বাঘকে কামড়াতে লাগলো। হুল ফোটাতে লাগলো। বাঘ ব্যাথায় কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে নিচে পড়ে গেল। বাঘের মুখে মৌমাছির কামড়ে কালো কালো দাগ হয়ে গেল (১৩)।

সৃষ্টিকথার সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও পিলপের নীতিকথায় যেমন পরীকথা রয়েছে, ত্রিপুরার লোককথার তেমন কোনো কাহিনী নেই। কাহিনীটি এমন ঃ

গাছে গাছে থাকতো পরীরা। কিন্তু রোদে বৃষ্টিতে বড় কষ্ট হয় বলে তারা বাসা তৈরী করলো গভীর বনের শক্ত মজবুত গাছে। কিন্তু কয়েকটি পরী গভীর বনে না গিয়ে গাঁয়ের পাশে ফাঁকা মাঠের গাছে বাসা বাঁধলো। একদিন প্রবল ঝড়ে মাঠের পরীদের বাসা ভেঙ্গে

গেলে তারা গৃহহীন হয়ে গেল। বনের পরীদের বাসা ভাঙ্গেনি। ওরা বললো, সবার উচিত বনভূমির মতো একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা। একা থাকলেই বিপদ।

পিল্‌পের নীতিকথার মূল শিক্ষাই হ'ল ভালোবাসা। বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাই শক্তি জোগায়। ত্রিপুরা'র উপজাতি লোককথায় এই অভিব্যক্তিটি অন্যান্য সব অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলেমিশে আছে।

রামায়ণ ঃ রামায়ণের মধ্যেও এমন কিছু কাহিনী রয়েছে যেগুলো লোকসমাজের কাহিনী বলেই মনে করা হয়। লৌকিক অভিপ্রায়গুলোর সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার অভিপ্রায়গুলোর সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। "চাঁদের ছেলে" লোককথায় চন্দ্রকুমার রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে প্রজাদের পিতার মতো লালন-পালন করতে লাগলেন। তিনি "ফা" উপাধি গ্রহণ করেন। "ফা" অর্থ 'পিতা'। তাঁর রাজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগলো। তিনি দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন। 'চন্দ্রকুমার'-এর এই বর্ণনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় রামায়ণে দশরথ তনয় রামচন্দ্রের যে বিবরণ রয়েছে, তাকে। ঐ মহাত্মা নিয়ত পুত্রের ন্যায় প্রজাদের প্রতিপালন করতেন। তাঁর রাজত্ব সময়ে কোনো কামিনীই অনাথ বা বিধবা ছিল না। মেঘ সময়মত বারিবর্ষণ করাতে তাঁর রাজ্যে প্রচুর ফসল হ'ত, কখনই দুর্ভিক্ষ হয়নি। অকালমৃত্যু অগ্নিদাহ বা রোগভয়ের সম্পর্কও ছিল না। প্রজারা ছেলেপিলে নিয়ে হাজার বছর পর্যন্ত সুস্থদেহে বেঁচে থাকতো। ঐ মহাত্মা অযোধ্যার অধিপতি হয়ে একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য প্রতিপালন করেন। (শান্তিপর্ব, রামায়ণ ঃ একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়)

যজ্ঞীয় হুতাশন থেকে আবির্ভূত দিব্যপুরুষের দেওয়া পায়েস খেয়ে দশরথমহিষীদের অলৌকিকভাবে গর্ভধারণের মেটিফ 'রামায়ণে' রয়েছে। চন্দ্রদেবতার সঙ্গে মিলনে অলৌকিকভাবে গর্ভধারণের মেটিফ রয়েছে 'চাঁদের ছেলে' লোককথাটিতে।

রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার করার পর অগ্নিপরীক্ষায় তিনি জয়ী হলেও অযোধ্যানগরীর জনগণের সন্দেহজনক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হ'লেন। সীতা মহর্ষি বাল্মিকীর আশ্রমে আশ্রয় পান এবং সেখানে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হয়। এরা মহর্ষির কাছে শিক্ষা পেয়ে ধনুর্বিদ্যা, সঙ্গীত এবং বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠে।

"চাঁদের ছেলে" তে-ও লক্ষ্য করা যায় যে, গর্ভবতী কুফুরকে গ্রামবাসীদের নিন্দার ভয়ে মামা-মামী অরণ্যের পরিত্যক্ত 'জুমে' রেখে আসতে বাধ্য হয়। সেখানে চন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। চন্দ্রকুমারও সীতার পুত্রদের মতোই মায়ের কাছে পিতৃপরিচয় জানতে চায় এবং পরবর্তী সময়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

মোটিফের দিক থেকে দুটো কাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে। বোঝা যায় লোকসমাজে এই ধরণের কাহিনী জনপ্রিয় ছিল। লোকসমাজ কথকের কাছে 'বিদিত' বা 'শ্রুত' বিষয়ই আকাঙ্ক্ষা করে। মনে হয়, রামায়ণের এ কাহিনী অংশটি কোনোভাবে উপজাতি লোককথার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হয়ে গেছে।

পুত্রশোকে কাতর অন্ধমুনি তাঁর পুত্রকে হত্যার জন্য রাজা দশরথকে অভিশাপ দেন যে, তিনিও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করবেন। পরবর্তীকালে রাজা দশরথ পুত্রশোকেই প্রাণত্যাগ করেন। রামায়ণের এই অংশটির সঙ্গে উপজাতি লোককথা 'ধনেশপাখির গল্পের' পুত্রশোকাতুরা ছাম্পারি পুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী তার স্বামী কচাক রায়কে অভিশাপ দেয় যে, সে পরজন্মে ধনেশপাখি হয়ে জন্মাবে এবং সারাদিন ঘুরে ঘুরে স্ত্রী ও ছেলেদের খাবার এনে খাওয়াবে।

মহাভারত ঃ মহাভারতেও কিছু কিছু লোককথা সংকলিত হয়েছে যেগুলো অত্যন্ত প্রাচীন। এই কাহিনীগুলোর মোটিফের সঙ্গে উপজাতি লোককথার মোটিফেরও সাদৃশ্য দেখা যায়। 'রক্তপিপাসু দেবতা'য় দেবতারা রাণীমার পুত্র কিশোর ত্রিলোচনকে পাঁঠায় রূপান্তরিত করে বলি দেয় এবং পরে তার রক্তপান করে। তারপর মন্ত্র পড়ে কিছুটা জল ছিটিয়ে দিতেই সে আবার মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মৃতের পুনরুজ্জীবনের এই অভিপ্রায়টি লক্ষ্য করা যায় মহাভারতের কাহিনীতেও। 'শকুন ও শেয়ালের কথা' কাহিনীটিতে (শান্তিপর্বে) আছে একটি ছেলে অল্পবয়সে মারা গেলে তার মা-বাবা, পড়শীরা সকলেই শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে থাকে। এমন সময় একটি শকুন এসে তাদের মানবজীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে উপদেশ দিলে তারা বাড়ীর পথে ফিরে যায়। পথে একটা শেয়াল তাদের বললো যে দুর্বল, অভিযুক্ত ও শ্মশানে মৃত ব্যক্তির কাছে যদি আত্মীয় স্বজন থাকে, তবে কেউ তাদের আক্রমণ করতে সাহস পায় না। একথা শুনে সবাই মৃত ছেলেটির কাছে ফিরে আসে। আবার শকুন এসে আগের মতো উপদেশ দেয়। এমনি করে ক্রমান্বয়ে শকুন ও শেয়ালের উপদেশ শুনে ওরা ঠিক করলো শ্মশানেই বসে থাকবে ছেলেটির পাশে। এতে পার্বতীর মনে খুব দয়া হল। তিনি শিবকে পাঠিয়ে দিলেন। পড়শীদের অনুরোধে দেবতা ছেলেটিকে জলের ছিটে দিয়ে বললেন "শতায়ু হও"। ছেলেটিও পুনর্জীবন পেলো।

মহাভারতে সূর্যের সঙ্গে মিলনের ফলে কুন্তী অলৌকিকভাবে পুত্রের জন্ম দেন। কুন্তীপুত্র কর্ণ জন্মলগ্ন থেকেই কবচকুণ্ডলের অধিকারী ছিলেন।

উপজাতি লোককথায় চাঁদের সঙ্গে মিলনে কুফুরের পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্র ব্যাঙ রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তার খোলায় এক লৌকিক দেবতা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। টোটেম ভাবনার দিক থেকে দুটো কাহিনীতেই মিল রয়ে গেছে। অলৌকিকভাবে যাদের জন্ম হয় তারা অসাধারণ গুণের অধিকারী হয়, এই ব্যাপারটিও দুটো চিত্রেই দেখা যাচ্ছে।

বন্ধুত্বের মধ্যেও শত্রুতা সৃষ্টি হলে, তখন একের অপরকে কোনোরকমই বিশ্বাস করা উচিত নয়। বিষয়টি মহাভারতের কাহিনীতে যেমন রয়েছে, তেমনই উপজাতি লোককথায়ও পাওয়া যায়। মহাভারতের কাহিনীটি শান্তিপর্বের, 'ব্রহ্মদত্ত-পূজনী বৃত্তান্ত'।

অনেককাল আগে ঝম্পিল্যনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর অন্তঃপুরে একটি পাখি অনেকদিন ধরেই বাস করতো। পাখির নাম পূজনী। পূজনী সর্বজ্ঞ ছিল। যেদিন পূজনীর

একটি ছানা হ'ল সেদিন রানীরও একটি ছেলে হ'ল। পাখি রানীর ছেলেকে নিজের ছেলের মতোই যত্ন করতো। রোজ সে দুটো ফল এনে একটি নিজের ছানাকে, অন্যটি রানীর ছেলেকে খাওয়াতো। একদিন পাখি ফল নিয়ে এসে দেখে পাখির ছানাকে রাজকুমার উপর থেকে ফেলে মেরে ফেলেছে। পাখি কাঁদতে কাঁদতে রাজকুমারের চোখ দুটো উপড়ে ফেললো। রাজকুমার অন্ধ হয়ে গেলো। তারপর সে অন্যত্র চলে যেতে চাইলে ব্রহ্মদত্ত তাকে বারবার সেখানেই থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু পূজনী বললো 'বন্ধুর সঙ্গেও যদি শত্রুতা ঘটে যায়, তাহলেও তাকে বিশ্বাস করতে নেই'। বলে সে উড়ে চলে গেল।

"মুরগীর পিঠে" গল্পটি লক্ষ্য করলেও এই অভিপ্রায়টিই নজরে পড়ে। বিড়াল ও মুরগীর বন্ধুত্ব থাকা সত্বেও শত্রুতার সৃষ্টি হয় সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বিড়াল, মুরগী ও তার ছানাদের হত্যা করার ফন্দি আঁটে। মুরগী তা বুঝতে পারে এবং বুদ্ধির সাহায্যে বিড়ালকে হত্যা করে ও বিপদ থেকে মুক্তি পায়।

দুটো কাহিনীতেই পূজনী ও বিড়াল অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়ে কোনো অন্যায় করেনি। পূজনীর ছানা যেমন রাজকুমারের খেলার সাথী, উপজাতি লোককথার "প্রতিজ্ঞা" গল্পেও বাছুরও রাজকুমারীর খেলার সাথী হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে 'কুকুর ও শরভের" কথাটি পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন। এক মুনির আশ্রমে একটি গেঁয়ো কুকুর ছিল। একদিন একটি ছোট বাঘ তাকে খেতে এলে সে ভয় পেয়ে মুনির কাছে আশ্রয় চাইলে মুনি তাকে ছোট বাঘ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে বনের একটি বড় বাঘ খিদের যন্ত্রণায় ছোট বাঘের সামনে লাফ দিয়ে এলে মুনি তাকে বড় বাঘ করে দিলেন। এরপর একদিন একটা বড় হাতি এলে বাঘ ভয় পেয়ে মুনির কাছে গেলে মুনি বাঘকে বড় হাতি করে দিলেন। একদিন এক পাহাড়ী গুহার বিরাট সিংহ হাতির সামনে এলো। হাতি ভয়ে আবার মুনির কাছে গেলে মুনি তাকে সিংহ করে দিলেন। সিংহ মুনির আশ্রমেই থাকে। এরপর একদিন এক শরভ এলো। সিংহ ভয় পেলে মুনি তাকে শরভ করে দিলেন। কুকুর হল শরভ। এরপর শরভ মুনিকে মেরে তাঁর মাংস খাবে বলে ভাবলো। মুনি তখন অকৃতজ্ঞ শরভকে আবার কুকুর করে দিলেন।

রূপান্তরের এই মোটিফটি উপজাতি লোককথায় নানাভাবে পাওয়া যায়। যেমন উইপোকা থেকে (দ্রঃ উইপোকা স্বামী) রাজকুমার, ব্যাঙ থেকে অনিন্দ্যসুন্দর রাজকুমার (দ্রঃ চাঁদের ছেলে) মানুষ থেকে পাঁঠা, পাঁঠা থেকে মানুষ (দ্রঃ রক্তপিপাসু দেবতা) তাছাড়া "গুল্মকুমারী" নামক লোককথাটিতে যে ক্রমিক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়, তার সঙ্গে মহাভারতের কাহিনীটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে দুটো কাহিনীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে এই যে, মহাভারতের কাহিনীতে একটি রূপ থেকে অন্যরূপে সরাসরি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং উপজাতি লোককথায় রূপান্তরটি ঘটছে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের দ্বারা। মহাভারতে শকুন্তলা পক্ষীমাতা দ্বারা পালিতা।

"অজগর সাপের গল্পে" ছোটরানীর ছেলেমেয়েরা জলের নিচে অজগরের পুরীতে অজগর স্ত্রী দ্বারা পালিত হয়।

পৌরাণিক কাহিনী ঃ 'কথা বলোনা' লোককথাটিতে 'কথা বলা পাখি'র যে মোটিফটি ত্রিপুরার লোককথায় পাওয়া যাচ্ছে তা একটি পৌরাণিক কাহিনীকে মনে করিয়ে দেয়। ব্যাসদেবের শিষ্য জৈমিনি মহাভারত পাঠ শেষ করার পর কিছু কিছু অংশ বুঝতে না পেরে ব্যাসদেবের শরণাপন্ন হ'ন। তিনি সময়াভাববশতঃ জৈমিনিকে বিন্ধ্যপর্বতে পাঠালেন। সেখানে চারজন মুনি শাপগ্রস্ত হয়ে পাখিরূপে বসবাস করছিলেন। তারা হলেন পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ। এরা পাখি হলেও মানুষের ভাষায় কথা বলতেন। জৈমিনীকে তাঁরা প্রথমে সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্পর্কে বলে পরে চণ্ডীমাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

"রক্তপিপাসু দেবতায়" চৌদ্দজন দেবতা এক প্রকাণ্ড মোষের তাড়া খেয়ে রানী হীরাবতীর রাজ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তাঁরা অন্য জায়গা থেকে এখানে আসেন। এই কাহিনী অংশটি শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বর্ণিত মহিষাসুর দ্বারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবতারা যখন পৃথিবীতে মানুষের মতো বিচরণ করেছিলেন সেই কাহিনীকে মনে করায় (১৪)। রানীমা যখন বললেন যে তিনি একজন সামান্য নারী, তিনি কিভাবে মোষকে বশ করবেন? দেবতারা বললেন তিনি সতী নারী তার অসাধ্য কিছুই নেই এটি প্রকারান্তরে রানীর স্তুতি। তুলনীয় (শ্রীশ্রীচণ্ডী) ঃ "অসাধারণ তেজ, অসামান্য মহিমা ও শক্তি দেখিয়া মুনিগণ ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইলেন। ভক্তিভরে তাঁহাদের নিজের দেহ নত হইল। নতশিরে তাহারা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন" (১৫) রানীমা তাঁর ব্যবহৃত রিছা মোষটির পিঠে ফেলে তাকে বশ করলেন এবং পরে তাঁর অনুগত লোকজন মোষটিকে বলি দিল। তুলনীয় (শ্রীশ্রীচণ্ডী) "দেবী কর্তৃক মহাতরবারী দ্বারা তাহার মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইল (১৬)। দেবীর বিজয়ে দেবতাদের পরম আনন্দ হইল।" বৈসাদৃশ্য এটুকুই যে, পৌরাণিক কাহিনীতে দেবী স্বয়ং মহিষাসুর বধ করেন, কিন্তু উপজাতি কাহিনীতে রানীমা মোষকে বশে আনেন ও অন্যেরা বলি দেয়।

নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজের এক বিশেষ স্তরে ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ের প্রচলন ছিল। পুরাণাদিতে এর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যেমন, বিভিন্ন লোককথায়ও তা রয়েছে। ত্রিপুরার লোককথা "ছাতিম গাছের কাহিনী" তারই সাক্ষ্য বহন করে। পৃথিবীর আদি মানব ও মানবী বলা হয় যম ও তাঁর বোন যমীকে। যমই প্রথম মানুষ যিনি মৃত্যুকে প্রথম বরণ করেছিলেন। ঋগ্বেদে দেখা যাচ্ছে বোন যমী ভাই-যমকে নির্জন দ্বীপে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। যমী যমকে বলছেন, "বিস্তীর্ণ সমুদ্র মধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন, যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মিবে।" (ঋগ্বেদ ১০/১০/১)(১৭)

বিষ্ণু, কূর্ম ব্রহ্মাণ্ড ও গরুড় পুরাণে আছে, মনুর অন্যতমা কন্যা কাকুতি। কাকুতির গর্ভে জাত যজ্ঞ নামে পুত্র কন্যা দক্ষিণাকে বিয়ে করেন।

দ্বাপরযুগের অবসানে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ থেকে জাত অধর্মের পুত্র দম্ভ কন্যা মায়াকে, অর্থাৎ আপন বোনকে বিয়ে করে (১৮)।

সমাজে ভাইবোনের বিয়ে প্রচলিত না থাকলে লোককথায় বা পুরাণ ইত্যাদিতেও এর সমর্থন পাওয়া যেতোনা।

জাতক ঃ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত জাতকের নির্মিতকাল বলে মনে করা হয়। এর কিছু কাহিনী বুদ্ধজন্মের আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। ভারতের প্রাচীনতম গল্প সংগ্রহ বলে আখ্যাত জাতকের কাহিনীর সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার একটি অন্তর্লীন সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়।

'চুল্লশ্রেষ্ঠী জাতকে' রয়েছে, একদিন শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাচ্ছেন এমন সময় পথে একটি মৃত মূষিক দেখে গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান গণনা করে বললেন যে কোনো সদ্বংশজ ব্যক্তি এই মৃত মূষিকটি নিয়ে গেলে ব্যবসা দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জনে সমর্থ হবে। একটি ভদ্রবংশীয় যুবক একথা শুনে মূষিকটি নিয়ে গেল। একজন দোকানদার এক পয়সা মূল্যে মূষিকটি কিনে নিল তার পোষা বেড়ালের জন্য। যুবক এক পয়সা দিয়ে গুড় ও এক কলসী জল নিয়ে, যে পথে মালাকারেরা বন থেকে ফুল নিয়ে ফেরে, সেখানে বসে রইলো। ক্লান্ত মালাকারেরা সেখানে এলে সে তাদের একটু গুড় ও জল খেতে দিল। ওরা খুশী হয়ে যুবককে একমুঠো ফুল দিয়ে গেল। সেই ফুল বিক্রী করে সে যে পয়সা পেল, তা দিয়ে পরদিন আরো বেশী গুড় কিনে মালাকারদের জল ও গুড় খাওয়াল। মালাকারেরা তাকে সেদিন কতগুলো ফুটন্ত ফুলগাছ দিয়ে গেল। এভাবে ফুল ও ফুলগাছ বিক্রী করে দু-চারদিনের মধ্যেই যুবকের আটকাহন পুঁজি হ'ল। এরপর একদিন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে একটি বাগানের গাছের ডালপালা ভেঙ্গে পড়লে সেগুলো বিক্রী করেও যুবক অনেক টাকা পেলো। তারপর সে নতুন ফন্দী বের করলো। ঘেসেড়ারা ঘাস নিয়ে যাবার সময় পথে সে তাদের জল খাওয়াতো। একদিন সে তাদের কাছ থেকে এক এক আঁটি ঘাস চেয়ে নিয়ে পাঁচশো আঁটি ঘাস বিক্রী করে হাজার কাহন মূল্য পেল। এই সময়ে এক জলপথ বণিক ও এক স্থলপথ বণিকের সঙ্গে যুবকের বন্ধুত্ব জন্মায় এবং জলপথবণিকের কাছে সংবাদ পায় যে, পট্টনে একটি বড় জাহাজ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রী করবে। পরবর্তী সময়ে সে বুদ্ধিবলে জাহাজের সমস্ত দ্রব্য বিক্রী করে দুলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা নিয়ে পট্টন থেকে বারাণসীতে ফিরে গেল। যুবকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে বোধিসত্ত্ব তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন। বোধিসত্ত্বের মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তিরও অধিকারী হল এই যুবক (১৯)।

এই কাহিনীটির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ত্রিপুরার লোককথার "একটি মাছির গল্পে"র। সেখানে একটি ছোট্ট মাছির সাহায্যে একটি যুবক সর্বশেষে একটি স্ত্রী লাভ করে এবং পরবর্তী সময়ে তার একটি ছেলে হয়। স্ত্রী-পুত্র সহ সে দেশান্তর থেকে নিজ গ্রামে ফিরে এল।

আদিবাসী গল্প "অজগর সাপের গল্পে" মাতৃত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাসিত রাণীকে রাজা চিনতে পারেন। রাজা সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে সহ রানীকে ফিরে পান।

"কাষ্ঠহারিজাতকে" দেখা যায় বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত উদ্যানে এক কাষ্ঠসংগ্রহকারিণীকে দেখতে পেয়ে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই মুহূর্তেই তাকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করলেন। রমণী গর্ভবতী হলে স্বনামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরী দিয়ে বললেন যে, কন্যাসন্তান জন্মালে যেন অঙ্গুরী বিক্রী করে তাকে প্রতিপালন করা হয় এবং পুত্র সন্তান জন্মালে অঙ্গুরীসহ সে যেন ব্রহ্মদত্তের কাছে পুত্রকে নিয়ে যায়। যথাসময়ে পুত্র এবং অঙ্গুরীসহ রমণী ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে দেখা করলো। কিন্তু রাজা তাকে চিনতে পারলেন না। তখন রমণী আত্মপরীক্ষা দেবার জন্য বললো যে এই পুত্র যদি সত্যিই মহারাজের পুত্র হয় তবে সে মধ্যাকাশে স্থির হয়ে থাকবে, আর যদি তা না হয় তবে মাটিতে পড়ে মারা যাবে। একথা বলেই রমণী পুত্রকে আকাশে ছুঁড়ে দিল এবং পুত্রটি আকাশে স্থির হয়ে বীরাসনে বসে ধর্মকথা শুরু করলো। তখন রাজা স্বয়ং এবং শত শত মানুষ বোধিসত্ত্বকে কোলে নেবার জন্য আকাশের দিকে হাত তুললো। বোধিসত্ত্ব রাজার কোলে নেমে এলে রাজা তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন ও রমণীকে মহিষী হিসেবে গ্রহণ করলেন (২০)।

পরীক্ষার ধরণ শুধু আলাদা। দুটো কাহিনীর আঙ্গিকেই সাদৃশ্য রয়েছে। তবে জাতকের কাহিনী সংক্ষিপ্তাকার, আদিবাসী কাহিনী জটিল ঘটনাবিন্যাসের ফলে দীর্ঘায়তন।

প্রকৃতির রাজ্যে দৈহিক আকার ও আয়তনে সকলে সমান নয়। কিন্তু প্রকৃতির সমতারক্ষার জন্য সকলেরই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। মহাবলশালী যেমন দীর্ঘকায় হয় তেমনি পরাক্রমদ্বারা কার্যসিদ্ধি করে। হীনবল ক্ষুদ্রকায় ঠিক সেভাবে কর্মসম্পাদনে সক্ষম হয়না বলে তার মধ্যে বুদ্ধির প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। এটি আদিবাসী লোককথার "সজারুর বুদ্ধি"তে যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি 'ভীমসেন জাতকে'ও (২১) পাওয়া যায়। জাতক কাহিনীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য একজন ভীমসেন নামক মহাকায় তন্তুবায়কে সংগ্রহ করে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। বোধিসত্ত্ব নিজে খর্বকায় ছিলেন বলে ভীমসেনকে শিখিয়ে দিলেন যেন সে নিজেকে ধনুর্দ্ধর হিসেবে পরিচয় দেয়। জীবিকা সংগ্রহ হ'লে বোধিসত্ত্ব জীবিকা নির্বাহে সর্বপ্রকার সহায়তায় করবেন বললেন। ব্রহ্মদত্ত ভীমসেনকে রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত করলেন এবং ভীমসেন বোধিসত্ত্বের বুদ্ধির সহায়তার সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করে প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হ'ল। কিন্তু ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে একসময় সে বোধিসত্ত্বকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে। কিছুদিন

পর ভীমসেনকে রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন। সেখানে শত্রুভয়ে ভীত হয়ে ভীমসেন হস্তীপৃষ্ঠে মলত্যাগ করলে বোধিসত্ত্ব তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন ও শত্রু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করে বারাণসীরাজের কাছে নিয়ে যান।

ত্রিপুরার লোককথাটিতেও দেখা যায় বলগর্বে গর্বিত হাতি সজারুকে অবজ্ঞা করলেও পরে সে নিজেও ভীত হয়ে পলায়ন করে। ভীমসেন ও হাতি একই মানসিকতার প্রতীক।

বধিরতা যে কত অসহায় করে তোলে মানুষকে তার প্রমাণ ত্রিপুরার 'সব কালাদের এক ঘর' কাহিনীটি। এখানে একটি পরিবারের সকলেই একে অন্যের কথা বুঝতে না পেরে ঝগড়া করে ও পরে প্রতিবেশীদের সহায়তায় ঝগড়ার অবসান হয়। এমনই একটি বধিরতাকেন্দ্রিক কাহিনী "কল্যাণ ধর্মজাতকে" পাওয়া যায়। কাহিনীটি এই রকম ঃ শ্রাবস্তীবাসী এক ভূম্যধিকারী একদিন উপদেশ গ্রহণের জন্য জেতবনে গিয়েছেন। এমন সময় তাঁর শ্বশ্রু মাতা কন্যাকে দেখার জন্য বাড়ীতে এলেন। তিনি ছিলেন বধির। বৃদ্ধা কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে তার স্বামীর সঙ্গে নির্বিবাদে ঘরকন্না করছে কিনা। কন্যা জবাবে বললো যে, প্রব্রাজকদের মধ্যেও তার স্বামীর মতো শীলবান ও সদাচারসম্পন্ন লোক দুর্লভ। বৃদ্ধা 'প্রব্রাজক' শব্দটিই শুধু বুঝতে পারলেন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, কি বলছিস? জামাই প্রব্রাজক হ'ল কেন?

চিৎকার শুনে বাড়ীর অন্যেরাও চিৎকার করে বলতে লাগলো যে, এ বাড়ীর কর্তা প্রব্রাজক হয়েছেন। এমনি করে অনেক অনেক লোক জমে গেল বাড়ীর দরজায়। ইতিমধ্যে ভূম্যধিকারী ধর্মকথা শুনে নগরে প্রবেশ করামাত্রই একজন ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি নাকি প্রব্রাজক হয়েছ? তোমার পুত্রকলত্র পরিজন বিলাপ করছে'। একথা শুনে ভূমধ্যকারী মনে মনে ভাবলো কল্যাণজনক শব্দ উপেক্ষা করা অনুচিত। সুতরাং সে ফিরে গেল আবার জেতবনে এবং সত্যিই সত্যিই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলো (২২)।

'পলায়ি জাতকে'র একটি কাহিনী ঃ বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত তক্ষশীলা জয় করার আকাঙ্খায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক সেনা নিয়ে তক্ষশীলা নগরদ্বারে পৌছুলেন। দ্বারকোষ্ঠক দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি তক্ষশিলারাজের প্রাসাদ' কিন্তু যখন শুনলেন এটি নগরকোষ্ঠক মাত্র, তখন তিনি ভাবলেন নগরকোষ্ঠকই যদি এমন হয়, তবে প্রাসাদ না জানি কেমন হ'বে। এমন ঐশ্বর্যশালী রাজার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করতে অসমর্থ জেনে দ্রুত পলায়ন করলেন (২৩)।

এই কাহিনীটি সজারুর একটি কাঁটাকে লোম ভেবে ভীত হাতির পলায়নের কথা মনে পড়ায়। (সজারুর বুদ্ধি দ্রঃ) বলবানও যে বুদ্ধিভ্রমে দুর্বলের কাছে অথবা প্রতিপক্ষের কাছে পরাজিত হয় তারই প্রমাণ গল্প দুটো।

আদিবাসী লোককথা "বানর বর"-এ বানর মেয়েটিকে প্রবঞ্চনা করে গাছের ডালে উঠিয়ে নিয়ে যায় ও একসঙ্গে থাকতে বাধ্য করে। পরবর্তী সময়ে মেয়েটিই বানরকে প্রবঞ্চনা করে। বানর অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'উডুম্বর' জাতকে' দেখা যায় একটি বানর অন্য বানরকে

প্রবঞ্চনা করে। একদিন একটি রক্তমুখ বানর তার গুহার সামনে বসে আছে এমন সময় একটি কৃষ্ণমুখ বানর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ও শীতে কাঁপতে কাঁপতে তার কাছে এলো। রক্তমুখকে সেই গুহা থেকে তাড়াবার উদ্দেশ্যে কোথায় আহারের উপযোগী ফল পাওয়া যায় তা বললো। রক্তমুখ লোভের বশবর্তী হয়ে ফলের সন্ধানে এদিক ওদিক গেলে কৃষ্ণমুখ বানর গুহায় ঢুকে বসে থাকে। পরে রক্তমুখ বানর সেখানে ফিরে এলো কোথাও কিছু না পেয়ে। সেও এসে কৃষ্ণমুখকে প্রবঞ্চনাসূচক কিছু গাথা শোনালো। কিন্তু কৃষ্ণমুখ এতে কর্ণপাত না করাতে রক্তমুখ বানর নিরূপায় হয়ে চলে গেল (২৪)।

আপন অধিকার রক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রত্যেকেই যেনতেন প্রকারেণ চেষ্টা করে। এটিই প্রকাশিত হয় গল্পদুটোর মাধ্যমে। ত্রিপুরার কাহিনীতে বানর ও মানবী স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্বটি প্রকাশিত হয়েছে। জাতকে দুই বানরের মধ্যেকার গুহা অধিকারের সংঘাতটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'স্বর্গের ফুল রান্না' লোককথায় স্বামীর নিষেধ বাণী না শোনার পরিণতি স্বরূপ স্বামী ও স্ত্রী দুজনকেই প্রকৃতিদত্ত শাস্তি পেতে দেখা যায়। 'ফলজাতকে'-র 'বিষফল' নামক কাহিনীটি লক্ষ্য করা যাক্। বোধিসত্ত্ব বাণিজ্যে যাচ্ছেন। সঙ্গে পাঁচশো শকট ও বহু লোকজন। যেতে যেতে তাঁরা এক মহা অরণ্যে উপস্থিত হয়েছেন। বোধিসত্ত্ব অনুচরদের বললেন যে, ঐ বনে বিষবৃক্ষ আছে, সুতরাং কেউ যেন কোনো গাছের ফুল, ফল, পাতা কিছুই না খায়। বনের শেষে একটি গ্রামে ছিল একটি কিম্ফল গাছ। তার ফল, কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল সবই আম গাছের মতো, অথচ আম হল অমৃত ফল আর কিম্ফল হলাহলে ভরা। অগ্রগামী অনুচরদের মধ্যে অনেকে সেখানে পৌঁছেই আমফল মনে করে কিম্ফল খেলো এবং অসুস্থ হয়ে পড়লো। বোধিসত্ত্ব সেখানে পৌঁছেই তাদের বমি করিয়ে চর্তুমধু খাইয়ে সুস্থ করে তুললেন।

এই কাহিনীটিতেও দেখা যায় বোধিসত্ত্বের নির্দেশ অমান্য করে অনুচররা অসুস্থ হয়। তবে বোধিসত্ত্বেরই সহায়তায় তারা আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। ত্রিপুরার লোককথায় পুনর্বার মনুষ্যজীবন প্রাপ্তির কোনো প্রসঙ্গ নেই। ''ছাতিম গাছের কাহিনী''তে ভাইবোনের বিয়ের প্রসঙ্গটি 'দশরথজাতকে'র রামসীতার প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয়। সেখানে রয়েছেঃ পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয় এই চার রকমের অগতি পরিহার করতেন। তাঁর ষোলহাজার অন্তঃ-পুরচারিণী ছিলেন, তার মধ্যে অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বড় ছেলের নাম রামপণ্ডিত, ছোট ছেলের নাম লক্ষ্মণকুমার ও কন্যার নাম সীতাদেবী।'' ...রামপণ্ডিত বন থেকে ফিরে এসে বারাণসীর উদ্যানে গেলেন। সেখানে তিনি সীতাকে অগ্রমহিষী পদে বরণ করেন (২৫)। ভাইবোনের বিয়ে যে একসময় সমাজে প্রচলিত ছিল এই কাহিনীগুলো তার পরিচয় দেয়।

বহির্ভারতীয় লোককথা ও ত্রিপুরার লোককথা ঃ

মোটিফ, কাহিনী বা কাহিনীপরম্পরার বিশ্বজনীন রূপটি ত্রিপুরার লোক কথায়ও সাঙ্গীকৃত হয়ে আছে বলেই, পৃথিবীর নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোককথাগুলোর সঙ্গে এদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-নাগরিক জীবনচর্যায়, মানুষের চিন্তা-ভাবনায় কোথাও না কোথাও যেন একটা মিল বা আনুরূপ্যের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়।

যেমন 'ছিপিংতুই মাইরুংতুই' গল্পের সঙ্গে একটি ইউরোপীয় লোককথা 'টোডস্ এণ্ড ডায়মণ্ডস্'-এর অনেকটাই মিল রয়েছে (২৬)। এই গল্পে দেখা যায়, এক বিধবার দু মেয়ে। বড় মেয়েটি তার মায়ের মতোই খুব ভাল ছিল না। ছোট মেয়েটি দেখতেও সুন্দর এবং স্বভাবও ভালো। ছোট মেয়েটিকেই বাড়ীর সব কাজ করতে হ'ত, এমনকি অনেক দূরের ঝর্না থেকেও তাকেই জল বয়ে আনতে হ'ত। আর বড় বোন বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন কাটাতো আলসেমি করে। একদিন ছোট বোন দূরে জল আনতে গেলে এক বৃদ্ধা এসে জল খেতে চাইলো। মেয়েটি তাকে খুব যত্ন করে জল খাওয়ালো। বৃদ্ধা ছিল আসলে এক পরী। মেয়েটির প্রতি খুশী হয়ে বৃদ্ধা তাকে বললো, এখন থেকে মেয়েটি কথা বলামাত্রই তার মুখ থেকে ফুল ও মণিমাণিক্য ঝরবে। মেয়েটি এতে বিশ্বাস না করলেও বাড়ী ফিরে এলে সত্যি সত্যিই তাই ঘটলো। বড় মেয়েকে মা বেশী ভালোবাসতো। ওর মুখ থেকে এরকম ফুল ও মণিমাণিক্য না ঝরাতে ছোট-র প্রতি মা খুব রেগে গিয়ে বড় মেয়েকে পাঠালো জল আনতে। বৃদ্ধা বড় মেয়ের কাছে জল চাইলে সে দিতে অস্বীকার করলো। আসলে মেয়েটি বুঝতে পারেনি এই বৃদ্ধাই যে আগের বৃদ্ধা। এতে বৃদ্ধা রেগে গিয়ে বললো, এখন থেকে তুমি কথা বললেই মুখ থেকে ব্যাঙ বেরোবে লাফিয়ে লাফিয়ে। এই ঘটনাতে মেয়েদের মা এতো রেগে গেল যে দুই মেয়েকেই বাড়ী থেকে বের করে দিলো চিরদিনের মত। কিছুদিনের মধ্যেই ছোট মেয়েটিকে এক রাজকুমার বিয়ে করলো এবং ওরা সুখে দিন কাটাতে লাগলো। অন্যদিকে বড় মেয়েটি মুখ থেকে ব্যাঙ বেরোবার লজ্জায় গভীর অরণ্যে চলে গেল।

'ছিপিংতুই ও মাইরুংতুই' দু'বোন। এখানে বড় বোন ছিপিং সব কাজ করতো। কিন্তু ছোট বোন আলসে। জুমের কাজ, ঘরকন্নার কাজ সবই সে করতো। এই গল্পেও আছে তৃষ্ণার্ত রাজার লোকেরা জল খেতে চেয়েছিল দু'বোনের কাছে। মাইরুংতুই-এর দেওয়া জলে দুর্গন্ধের জন্য রাজার লোকেরা খেতে পারলো না। কিন্তু বড় বোনের দেওয়া জল খেয়ে এবং এর ব্যাবহারে রাজার লোকেরা সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। পরে রাজা ছিপিংতুই এর কথা শুনে ওকে বিয়ে করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে ওকে দেখতে গেলেন। ওদিকে মাইরুংতুই রাজার ভয়ে যেদিকে পথ পেলো, পালিয়ে গেল। পরে রাজা ছিপিংতুইকে বিয়ে করলেন।

ত্রিপুরার কাহিনীটির এই অংশটি পর্যন্ত বিদেশী রূপকথাটির কাঠামো, কাহিনীপরম্পরা এবং মোটিফের মধ্যে একটি সাদৃশ্য দেখা যায়। পার্থক্য দেখা যাচ্ছে বিদেশী গল্পে দু'বোন একই

মায়ের সন্তান। এখানকার গল্পে দু'বোন পরস্পর সৎ-বোন। বিদেশী গল্পে বৃদ্ধারূপী পরী জল খেতে চায়, এখানকার গল্পে রাজার লোক তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চায়। দুটো গল্পেই দুই বোনের আচরণে সাদৃশ্য দেখা যায়।

পশু ও মানুষের বিয়ের যে সূত্র পাওয়া যায় "বানরবর" কাহিনীটিতে, তা-ও অন্যান্য দেশের লোককথায় পাওয়া যায়। আদিমকাল থেকেই মানুষ নিজেকে কোনো না কোনো পশুর বংশধর রূপে কল্পনা করেছে। মান্‌ডান্ রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এমনই একটি লোককথা (২৭) রয়েছে। "যার বউরা ছিল পাখি" গল্পে একটি লোক পশ্চিমদিকে রওনা হয়ে গিয়ে পৌঁছালো একটি বিলের ধারে। ইচ্ছে ফাঁদ পেতে পাখি ধরা। কিন্তু ওর কোনো বাড়ী নেই। তাই বাড়ী করার জন্য কাঠের খোঁজে জঙ্গলে ঢুকলে দেখা হ'ল একটি মেয়ে সজারুর সঙ্গে। তাকে বিয়ে করলো সে। বৌকে বললো — 'আমি অনেক পাখির ঝাঁক দেখে এসেছি। এবার ফাঁদ পেতে ওদের ধরবো'। বাড়ী তৈরী হ'লে বিলের ধারে দেখা হল একটি মাদী রাজহাঁসের সঙ্গে। সে তাকেও না খেয়ে বিয়ে করে ফেললো। এমনি করে একে একে সাদা রাজহংসী, মেয়ে সারস, লাল সারস, বালি হাঁস, পানকৌড়িকে একে একে ধরে না খেয়ে লোকটি বিয়ে করে ফেললো। সজারু বৌ বিরক্ত হল এতে। ছোট্ট হলুদরঙা পাখি, বিরাট মাপের পাখি সবাইকেই ও বিয়ে করলো। একদিন যখন সমস্ত পাখি বৌ-দের রাজহংসী নৃত্যকলার সঙ্গে লোকটি চোখ বুঁজে গান গাইছিলো, সুযোগ বুঝে সব পাখি বৌরাই পালিয়ে গেল প্রাণ বাঁচাতে।

ত্রিপুরার লোককথায় বর পশু, বউ মানবী। রেড ইণ্ডিয়ান গল্পে বর মানব, বউরা পাখি। গল্পের শেষ অভিপ্রায়টিও সমগোত্রীয়। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দুটো কাহিনীতেই বৌ-রা পালিয়ে যায়। ত্রিপুরার লোককথায় অজগরের সঙ্গে মানবীর বিয়ের যে প্রসঙ্গ পাওয়া যায় 'উইপোকা স্বামী' ও 'অজগর সাপের গল্প' নামক লোককথা দুটোতে, তারই সাদৃশ্যমূলক কাহিনী রয়েছে ওয়্যারাউ রেড ইণ্ডিয়ানদের লোককথায়। 'কোরোবোনার গল্প' কাহিনীতে (২৮) দেখা যায় কোরোবোনা আর কোরোনা নামে দু'বোন একটি হ্রদের পাশে পাহাড়চুড়ায় থাকতো। দু'বোনেরই হ্রদের জলে স্নান করার ইচ্ছে হ'ত। কিন্তু ওদের ভাইদের একেবারেই সমর্থন ছিল না এতে। একদিন দুবোন ঝাঁপ দিল জলে। যেমনি বড় বোন হ্রদের মাঝখানে গেল অমনি একটি কাঠ ওর গায়ে লাগলো। হাত দিয়ে কাঠটি ধরামাত্র তা হয়ে গেল একটি জোয়ান লোক। কোরাবোনাকে সে নিয়ে গেল জলের তলায়। কোরাবোনাকে সে অবশ্য বেশীক্ষণ সে আটকে রাখলো না, সে ফিরে এলো। কয়েকদিন পর আবার তার ইচ্ছে হ'ল হ্রদে স্নান করার। ইতিমধ্যে সে শুনেছে ওই হ্রদে বাস করে এক বিরাট সাপ। সে আবার কখনো পুরো মানুষের চেহারা ধরে দেখা দেয়, আবার কখনো অর্দ্ধেক মানুষ, অর্দ্ধেক সাপের রূপ ধরে। সত্যি পরখ করার উদ্দেশ্যে কোরোবোনা হ্রদের পাশে গেলে সাপটি ওকে দেখতে পেয়ে ওর কাছাকাছি চলে এলো। সাপের ফণাটিকে কোনো ফলের বীজ ভেবে যেই মেয়েটি ধরেছে, অমনি সে একটি লোক হয়ে মেয়েটিকে জলার

তলায় নিয়ে গেল। ওখান থেকে বাড়ী ফিরে যেতে খুব ভয় হল মেয়েটির। তাই বনেই কাঠকুটো দিয়ে ঘর বানিয়ে সে রয়ে গেল। কদিন পর তার একটি ছেলে হ'ল। সুন্দর হলেও সাপের সঙ্গে বাচ্চাটার চেহারায় মিল আছে। একদিন কোরোবোনার ভাইরা গিয়ে বাচ্চাটাকে মেরে ফেললো। কোরোবোনা জাদু দিয়ে ছেলেকে বাঁচিয়ে তুললেও ওরা ওকে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেললো। শোকে-দুঃখে ছেলের শরীরের সব টুকরো এক জায়গায় জড়ো করে লাল ফুল আর পাতা দিয়ে ঢেকে দিলো জায়গাটা। একটু পরেই ফুলপাতার স্তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো তার জোয়ান ছেলে এবং এই হল ওয়্যারাউদের আতঙ্ক ক্যরিব্‌দের আদি পুরুষ।

দুটো গল্পেরই শুরু দু'বোনকে ঘিরে। দুটো গল্পেই সাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় বড় বোন। জাদু অভিচার দুটো গল্পেরই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মৃতের দেহাবশেষ থেকে ত্রিপুরার লোককথাতে জন্ম নেয় খুম্পুই ফুল এবং রেড ইণ্ডিয়ান গল্পে জন্ম নেয় পূর্ণবয়স্ক যুবক। দুটো গল্পেই সাপের আবাস জলের নিচে, যেখানে মেয়েরা যায়। এখানে অজগরকে কেটে ফেলে মেয়েটির বাবা (অচাই) এবং কোরোবোনার গল্পে সর্পাকৃতি ছেলেটিকে কেটে ফেলে মেয়েটির ভাইয়েরা। ত্রিপুরার লোককথা এবং ওয়্যারাউ রেড্ ইণ্ডিয়ান লোককথা দুটোতেই সাপ, টোটেম ভাবনার উপকরণ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

''উইপোকা স্বামী'' গল্পে নাখুতি নামের মেয়েটির উইপোকাকে স্বামীরূপে বরণ এবং 'চাঁদের ছেলে' কাহিনীতে চন্দ্রকুমারকে রাজকুমারীর স্বেচ্ছায় বরণের মধ্যে বিখ্যাত বিদেশী একটি লোককথা 'বিউটি এণ্ড দ্য বীষ্ট' নামক কাহিনীর মিল লক্ষ্য করা যায়। সেই কাহিনীতে দেখা যায় এক রাজকুমার কোনো একটি ডাইনী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে পশুজীবন যাপন করছিলো। বউটি দয়াপরবশ হয়ে স্বেচ্ছায় তাকে বিয়ে করার সম্মতি দিলে ছেলেটি স্ব-রূপ ফিরে পায় এবং জানা যায় যে, সে এক রাজকুমার। উপজাতি লোককথায় মেয়েরা উইপোকাকে এবং ব্যাঙকে বিবাহে স্বীকৃতি জানাতেই রাজকুমারদের স্ব-রূপ প্রকাশিত হয়েছে (২৯)। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিদেশী রূপকথার কথা মনে পড়ে। 'স্নো হোয়াইট এণ্ড রোজ্ রেড্' (৩০) নামক কাহিনীতে ও দেখা যায় স্নো হোয়াইট এবং রোজ রেড্ নামে দু'বোনের বাড়ীতে শীতের রাতে একটি বিরাট ভালুক খাবার ও আশ্রয়ের জন্য আসে। দু'বোনের মা তাকে খুব আদরযত্ন করে। ভালুক প্রতিটি দিন বাইরে কাটিয়ে রাতে ওদের বাড়ীতে ফিরে আসতো। গরমের দিন এলে সে যেন কোথায় চলে গেল। অনেকদিন পর এই ভালুক একটি বামনের হাত থেকে মেয়েদুটোকে বাঁচায় ও বামনকে মেরে ফেলে। বামনের অভিশাপেই সে ভালুক হয়ে গিয়েছিল। বামনকে মেরে ভালুকের অভিশাপ কেটে যায় এবং সে তার পূর্বের রাজকুমার রূপ ফিরে পায় ও স্নো হোয়াইটকে বিয়ে করে। ত্রিপুরার এবং বিদেশী কাহিনীগুলোর মধ্যে অভিপ্রায়জনিত একটি মিল খুবই লক্ষ্য করার মত। রূপকথার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই এই যে, অভিশাপের ফলে রূপপরিবর্তন। প্রতিটি গল্পেই দেখা যাচ্ছে , যে অভিশপ্ত মানুষগুলো সকলেই এক একজন

রাজকুমার। বিবাহের মাধ্যমে অথবা বিবাহের স্বীকৃতির মাধ্যমেই অধিকাংশের শাপমোচন হচ্ছে। বামনকে মেরে অবশ্য ভালুকের শাপমুক্তি ঘটেছে।

'চাঁদের ছেলে' লোককথাটির সঙ্গে বিখ্যাত 'দ্য ফ্রগ প্রিন্স' লোককথাটির সাদৃশ্য পাওয়া যায় (৩১)। প্রথম গল্পটিতে এক দেবতার অভিশাপে চন্দ্রদেবতার ছেলে ব্যাঙরূপ ধারণ করে ও অন্য গল্পটিতে ডাইনীর অভিশাপে রাজকুমার ব্যাঙরূপ ধারণ করে। 'দ্য ফ্রগ প্রিন্স' গল্পে মেয়েটি খেলার বল হারিয়ে ব্যাঙের সাহায্যে তা ফিরে পায় এবং ব্যাঙের দেয়া শর্তে রাজী হয়। পরবর্তী সময়ে ব্যাঙকে বিয়ে করতে রাজী হলে তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ তার রূপ ফিরে পায় ও পরে উভয়ের বিয়ে হয়। 'চাঁদের ছেলে' গল্পে রাজকুমারীর সঙ্গে ব্যাঙের বিয়ের পর ব্যাঙ মানুষরূপ ফিরে পায়। দুটো গল্পেই কুমারেরা পরে মানুষরূপ পেয়ে সিংহাসনে আরোহন করে। 'দ্য ফ্রগ্ প্রিন্সে'র রাজকুমার বহুদিন রাজ্যশাসন করে এবং 'চাঁদের ছেলে'র চন্দ্রকুমারও চন্দ্রদেবতার কাছ থেকে অর্দ্ধচন্দ্রবাণ আর্শীবাদ পেয়ে চন্দ্রবংশীয় প্রথম নৃপতি হিসেবে পিতার মত (ফা) রাজ্যশাসন করে। দুটো গল্পেই কাঠামো ও অভিপ্রায়গত মিল রয়েছে।

ত্রিপুরার লোককথা 'ছিপিংতুই' মাইরুংতুই পৃথিবীবিখ্যাত কাহিনী 'সিণ্ডারেলা'কে মনে করিয়ে দেয়। সিণ্ডারেলার মতই ছিপিংতুই-ও সৎমা ও সৎবোনের সব ফাইফরমাস খেটে দুঃখময় জীবনযাপন করেছে এবং পরে রাজার সঙ্গে তার বিয়ে হয় (৩২)। দুটো গল্পেই দেখা যায় মেয়েদুটো সুখী পিতার কন্যা। দুই মেয়ের মা-ই কঠিন অসুখে মারা যাবার পর বিমাতা সংসারে এলে এদের জীবনে বিপর্যয় নামে। সিণ্ডরেলাও সারাদিনই সৎবোন ও সৎমায়ের ফাইফরমাস খাটতো। পরবর্তী সময়ে এক রাজকুমার তাকে বিয়ে করে এবং তারা সুখে জীবনযাপন করে। দুটো কাহিনীই একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য বহন করে।

'কথা বলা আংটি' কাহিনীটি পারস্যের রূপকথা 'আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ'কে মনে করিয়ে দেয় (৩৩) দুটো গল্পই বিধবার ছেলেকে ঘিরে। বিধবার ছেলে 'কথা বলা আংটি'তে একটি আংটি কুড়িয়ে পায় দেবতার নির্দেশে জুমের পাশে বাঁশঝাড়ে। অন্যদিকে আলাদীনও একটি আংটি পায় জাদুকরের কাছ থেকে। দুটো কাহিনীতেই আংটি নায়কদের সহায়কের কাজ করেছে। আংটির মধ্যেকার জিন এসে আলাদীনকে গুহার বাইরে বের হ'তে সাহায্য করে আর 'কথা বলা আংটি'র গৃহহীন ছেলেটিকে আংটি টংঘর বানিয়ে দেয়। আলাদীনকে যেমন জিন খাদ্যদ্রব্য এনে দেয় নিমেষে, আংটিও ছেলেটিকে শাকসব্জী, ফসল, ঘর-গেরস্থালীর সব জিনিষপত্র যোগাড় করে দেয়। এক সময় দুই গল্পের নায়কই ধনীব্যক্তি হয়ে উঠে। আলাদীন একদিন সুলতানের সুন্দরী মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় আর উপজাতি গল্পে 'চক্দ্রির (গাঁয়ের সর্দার) মেয়ে ছেলেটিকে দেখে আকৃষ্ট হয়। সুলতানের মেয়ে এবং চক্দ্রির মেয়েকে বিয়ে করা দুই নায়কের পক্ষেই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এই প্রসঙ্গে উপজাতি লোককথা 'বিগ্রাছা'র প্রসঙ্গটিও লক্ষ্যণীয়। সেখানেও 'ছিরংগতি' (আংটি) সব সমস্যার সমাধান করতে সহায়ক হয়। নায়কদের

সবাইকেই রাজকন্যা ও সুলতানকন্যাকে বিবাহের জন্য যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আলাদীনকে সুলতানের কাছে মহামূল্য রত্ন মণিমাণিক্য দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হ'ল যেখানে উপজাতি লোককথা 'কথা বলা আংটি'-তে নায়ককে 'ছিক্রা পত্লকে'র (বিয়ের সময় শক্তি বা বুদ্ধির পরীক্ষা দেয়া হয় যার দ্বারা) সাহায্যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। 'বিগ্রাছা'তে নায়ককে রাজার কথামত একরাতের মধ্যে রাজবাড়ীর মত প্রাসাদ, দীঘি ইত্যাদি তৈরী করতে হয়েছিল পরীক্ষাস্বরূপ। তিনটি কাহিনীতেই পরীক্ষা দ্বারা নায়কদের নিজেদেরকে যোগ্য প্রাত্র হিসেবে প্রমাণিত করতে হয়। পারস্যের লোককথাটির প্রথমার্দ্ধ ত্রিপুরার লোককথায় যেন ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে।

'একটি মাছির গল্পে' দেখা যায় একটি যুবক বৌদিদের কথায় বুদ্ধির সাহায্যে মাছির বদলে একটি বৌ নিয়ে বাড়ী ফেরে। এই গল্পটি একটি বিদেশী রূপকথা 'জ্যাক এণ্ড দ্য বীন ষ্টক্' - কে মনে করিয়ে দেয় (৩৪)। সেখানে বিধবা মা সবকিছু কিক্রী করেও যখন আর খাবারের জোগাড় করতে পারলো না, তখন ছেলেকে বললো একমাত্র গরুটিকে বাজারে গিয়ে বিক্রী করে আনতে। পথে যেতে যেতে সে ক্রমে ক্রমে গরুর বদলে শূয়োর, শূয়োরের বদলে মুরগী, মুরগীর বদলে এক ব্যাগ শিম কিনলো। বাড়ী ফিরে এলে মা শিম দেখে খুব রাগ করলো এবং জানালা দিয়ে শিমগুলো ফেলে দিলো। পরদিন ভোরে দেখা গেল শিম থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আকাশছোঁয়া গাছে পরিণত হয়েছে। সেই গাছে চড়ে সে মেঘের রাজ্যে এক দৈত্যের প্রাসাদে গিয়ে পৌছায় এবং একটি সোনার ডিম দেওয়া রাজহংসীকে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে এই সোনার হাঁসের দেওয়া সোনার ডিমের সাহায্যে ছেলেটি ও তার মায়ের সব দৈন্য দুর হয়ে যায় এবং ছেলেটি যে বোকা নয় তা-ও প্রমাণিত হয়।

ঠিক একই কাঠামো বিন্যাস ও অভিপ্রায়গত সাদৃশ্য দেখি 'একটি মাছির গল্পে'-ও। ছেলেটিকে সকলে অকর্মণ্য বলে মনে করলেও সে যে আদৌ তা নয়, তা সে প্রমাণ করে মাছির বদলে চুউান, চুউান-এর বদলে মোরগ, মোরগের বদলে ছাগল, ছাগলের বদলে গরু এবং গরুর বদলে গেরস্তের যুবতী মেয়েকে পেয়ে। পরে সে তাকে বিয়ে করে গাঁয়ে ফিরে এলো। দুটো গল্পেই দেখা যায়, ছেলে দুটো অন্য জায়গায় গিয়ে এই বিনিময় করেছে অর্থাৎ ভাগ্যের সন্ধানে তারা অন্যত্র যায়।

শিম গাছের আকাশে উঠে যাওয়া এবং ছেলেটির মেঘের রাজ্যে চলে যাবার কাহিনী এখানকার 'ছাতিম গাছের কাহিনী'-কে মনে পড়ায়। ভাইয়ের লোভাতুর দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বোন আকাশছোঁয়া ছাতিম গাছে চড়ে মেঘের রাজ্যে চলে গিয়েছিল।

লোকসমাজ লোককথায় নিজেদের মনের অনেক প্রশ্ন বা সংশয়ের সমাধান করেন নিজেদের মতো করেই 'কি করে হ'ল বা কেমন করে হ'ল' ইত্যাদি গল্পের মাধ্যমে। সমস্ত পৃথিবীতেই এই ধরণের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ত্রিপুরার 'বিচার' নামক লোককথায় দেখা

যাচ্ছে ব্যাঙ কেন সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না, তার কাহিনী। অন্যদিকে জামবিয়ার থোংগা আদিবাসীদের একটি পশুকথায় দেখা যাচ্ছে 'কচ্ছপের পিঠে ফাটা ফাটা দাগ কেন' এই প্রশ্নটিকে ঘিরেই এদের কাহিনী। মিষ্টি জলের এক মস্ত ঝিলে থাকতো এক কচ্ছপ আর তার বৌ। তাদের এক শকুন বন্ধু দূর পাহাড় থেকে প্রায়ই উড়ে আসতো এদের ঝিলে। তিনজন মিলে খুব গল্প-গুজব করে। কিন্তু কচ্ছপের ভারী দুঃখ যে, তাঁর ডানা নেই বলে সে শকুনের বাড়ী যেতে পারে না। একদিন সে ঝুড়িতে চড়ে শকুনকে না জানিয়ে শকুনেরই ঠোঁটের সাহায্যে চললো পাহাড় ডিঙিয়ে শকুনের বাড়ী। পথে এক সময় নিজের বোকামিতেই সে শকুনের ঠোঁট থেকে পড়ে যায় নীচে। এর ফলে তার মৃত্যু হয় ও কচ্ছপের শক্ত খোলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই কচ্ছপের পিঠে ফাটা ফাটা দাগ (৩৫)। অন্যদিকে 'বিচারে' পাওয়া যাচ্ছে ব্যাঙ কেন সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না তার কাহিনী। বিধবার জুমের ধান শূয়োর খেয়ে ফেলেছিল বলে বিধবা রাজার কাছে নালিশ করে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে ব্যাঙ দায়ী। এজন্য রাজা বন্দুকের বাট দিয়ে মেরে ব্যাঙের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। তখন থেকে ব্যাঙ সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না।

'স্বর্গের ফুল রান্না' মনে করিয়ে দেয় ওরুবার ইফে (৩৬) আদিবাসীদের একটি লোকপুরাণকে। রান্না যেমন স্বর্গের দেবতাদের ব্যবহারের ফুল এবং মর্ত্যমানবের কাছে নিষিদ্ধ, তেমনি ইফে আদিবাসীদের "নিষিদ্ধ ফল" নামক কাহিনীতে দেখা যায় দেবতা মানুষ সৃষ্টি করার সময় মানুষকে তাহু গাছের ফল খেতে বারণ করে দিলেন। সবাই সে নিষেধ মানলেও একটি বৌয়ের খুব ইচ্ছে হল সেই ফল খেতে। সে তার স্বামীকে বারবার বলাতে স্বামী তাকে ফলটি দিল। দেবতা সব জানতে পেরে মৃত্যু দিয়ে এদের শাস্তি দিলেন। দুটো কাহিনীই একরকম। রান্নার কাহিনীতে স্বামী শাস্তি পেয়েছে হুলক্-এ পরিণত হয়ে এবং বৌটি মরে যায়। অবশ্য পরে তার জন্মান্তর হয় গোধিকারূপে। রান্নাও মর্ত্যমানবের কাছে নিষিদ্ধ ফুল, তবু স্ত্রীর অনুরোধে স্বামী সে ফুল পাড়তে বাধ্য হয়।

পৃথিবীর দুই সুদূর প্রান্তের আদিবাসীদের মধ্যে একই লোককথার এমন সাদৃশ্য আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

রান্নার কাহিনীটি আমাদের বাইবেলের 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল'-এর কাহিনী মনে করিয়ে দেয়। আদম ও ইভ নিষিদ্ধ ফল খেয়ে অভিশপ্ত হয়েছিল।

বহু সমাজেই এক একটি বিশেষ ফল বা ফুল বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে ট্যাবু হয়ে আছে।

দেবতার সঙ্গে মর্ত্যমানবীর বিয়ে, যা 'চাঁদের ছেলে' গল্পে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে সাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি কাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে (৩৭)। সেখানে তারার সঙ্গে মানবীর বিয়ের কাহিনী আছে। চাঁদের আলোয় বসেছিল দুটো মেয়ে। একটি মেয়ে সুন্দরী। জ্যোৎস্নায় বসে গল্প করতে করতে হঠাৎ সাঁঝের তারার দিকে চেয়ে সুন্দরী মেয়েটি বান্ধবীকে বলে উঠলো, যদি

তারাটি তার বর হতো, কি ভালোই না হতো। পরদিন তার পথ জুড়ে দাঁড়ালো সুপুরুষ একটি যুবক। সেই সাঁঝের তারা। বললো, মেয়েটিকে সে বিয়ে করে নিয়ে যাবে তার আকাশের বাড়ীতে। বান্ধবী ফিরে এলো বাড়ীতে এবং মা-বাবাকে সব কিছু জানালো। ওদিকে সাঁঝের তারার সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী চলে গেল আকাশে। ওখানে ওদের একটি ছেলে হল।

'চাঁদের ছেলে'-তেও দেখা যায়, রোজ আকাশে চাঁদ উঠে অস্ত যায়। চাঁদ উঠলেই কুফুরতি চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে। কি সুন্দর চাঁদ। চাঁদের দিকে তাকাতেই কে একজন সুন্দর পুরুষ চাঁদের ভেতর থেকে কুফুরতিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। পুরুষটি খুব সুন্দর।

এই লোকটিই চন্দ্রমাদেব। পরে চন্দ্রমাদেবের সঙ্গে মিলনে কুফুরের একটি ছেলে হয়। গ্রহ-নক্ষত্রের বাসিন্দাদের সঙ্গে মর্ত্যমানব-মানবীর বিয়ের ঘটনা রেড ইণ্ডিয়ান গল্পের একটি অতি প্রচলিত উপাদান। এটি আমরা ত্রিপুরার লোককথায়ও দেখতে পাচ্ছি। আসলে মানুষ নিজের সামাজিক-অর্থনৈতিক ছকেই দেবতাকে কল্পনা করেছে, এটি তারই চিত্র। দুটো গল্পে পার্থক্য হিসেবে দেখা যায় যে, রেড্ইণ্ডিয়ান গল্পে মেয়েটিকে তারা নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়, কিন্তু ত্রিপুরার গল্পে মেয়েটি প্রথমে মামা-মামীর কাছে ও পরে একটি পরিত্যক্ত টংঘরে থাকতে বাধ্য হয়। দুটো ক্ষেত্রেই পুত্র জন্মানোর মধ্যে আদিম মানুষের কাছে পুত্রসন্তান যে একান্ত কাম্য বিষয় ছিল তা প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কাহিনীর সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেল। এই মিলগুলো থেকে এটাই মনে হয় যে, মানুষ কতগুলো সর্বজনীন অভিজ্ঞতা অর্জন করেই সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছে। এই অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে সর্বদেশের, সর্বসমাজের ও সর্বকালের এক অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। হয়তো এজন্যই দুর্গম অঞ্চলের লোককথার সঙ্গেও মিল পাওয়া যায় দূর দেশের কোনো লোককথার।

সূত্র উল্লেখ পঞ্জী

(১) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ আদিবাসী লোককথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ঘ

(২) তীর্থপতি দত্ত, সম্পাদক ঃ সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স্, পৃঃ ২৬১

(৩) তীর্থপতি দত্ত, সম্পাদক ঃ সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স্, পৃঃ ৩১৫

(৪) তীর্থপতি দত্ত, সম্পাদক ঃ সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স্, পৃঃ ৩২২

(৫) তীর্থপতি দত্ত, সম্পাদক ঃ সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স্, পৃঃ ৩৫৫

(৬) 'বানর বর'-এ বানর 'দং দরং' বাজিয়ে পথে যেতে যেতে গায় ঃ অ-দনি দং দরং দনি দং
আনি ততেমা বিয়াং থাংজালাং?
দনি দং দরং দনি দং।

বছা ততেন বামতিরই
লাংগা ছুকাইতাং হরতিরই
দাছা দাবুড়া ঔইতিরই
আনি ততেমা বিয়াং থাংজালাং?
দনি দং দরং দনি দং
দনি দং দরং দনি দং .....?

(অর্থ ঃ দনি দং দরং দনি দং আমার ততের মা কোথায় চলে গেল ছেলে ততেকে কোলে করে। গিলা বীচির মতো মসৃণ খাড়া মাথায় নিয়ে হাতে একখানা দা নিয়ে— আমার ততের মা কোথায় চলে গেল?)

(ত্রিপুরার রূপকথা ঃ গবেষণাধিকার। উপজাতি ও তপশীলি জাতি কল্যাণ বিভাগ, ত্রিপুরা ১৯৮০, পৃঃ ১১)

'অজগর সাপে'র গল্পে -

'রাজার রানী না হই যদি আমি নারী নই
সাত সন্তানের মা না হলে আমি নারী নই।
(ত্রিপুরার রূপকথা ঃ গবেষণাধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৮০, পৃঃ ১০৫)

'ছাতিম গাছে'র কাহিনীতে মেয়েটি গায় ঃ

ফুংছা তাংখিনি ফুংবা বারিদি;
লগ চেথুয়াং লগ।
দাদাবাই আং বাই কাইনানি হিনাই
লগ্ চেথুয়াং লগ্।

(অর্থ ঃ ওগো ছাতিম গাছ, তোমাকে এক কোপে যতটুকু কাটছে, তার পাঁচগুণ বড় হও তুমি। তুমি বেড়ে চলো। দাদার সঙ্গে আমাকে বিয়ে দিতে চাইছে - তাই ওগো ছাতিম, তুমি আরও বড় হ'তে থাকো।)

(ত্রিপুরার রূপকথা ঃ উপজাতি ও তপশীলি জাতি কল্যাণ বিভাগ, ত্রিপুরা, ১৯৮০, পৃঃ ৮৯)

(৭) কথাসরিৎসাগর ঃ সম্পাদনা তীর্থপতি দত্ত; সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স্ পৃঃ ৪৫১

(৮) কথাসরিৎসাগর ঃ সম্পাদনা তীর্থপতি দত্ত; সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স্ পৃঃ ৪৬১

(৯) কথাসরিৎসাগর ঃ সম্পাদনা তীর্থপতি দত্ত; সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স্ পৃঃ ৪৭০

(১০) কথাসরিৎসাগর ঃ সম্পাদনা তীর্থপতি দত্ত; সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স্ পৃঃ ৪৭৫

(১১) কথাসরিৎসাগর ঃ সম্পাদনা তীর্থপতি দত্ত; সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স্ পৃঃ ৪৮৪

(১২) কথাসরিৎসাগর ঃ সম্পাদনা তীর্থপতি দত্ত; সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স্ পৃঃ ৪৯৭
(১৩) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ লোককথার ঐতিহ্য, পৃঃ ১৩০-১৩৪
(১৪) "স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা।
(মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী, ২য় অধ্যায় ৭ম শ্লোক)
(১৫) "জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্।
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনাম্রত্মমূর্ত্তয়ঃ।।
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ২য় অধ্যায়, ৩৫তম শ্লোক)
(১৬) "তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ।।"
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৩য় অধ্যায়, ৩২তম শ্লোক)
(১৭) "ও চিৎসখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরুচিদর্ণবং জগম্বান্
পিতুর্ণপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ।।
(ঋগ্বেদ ১০/১০/১, হরফ প্রকাশনী)
(১৮) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ লোককথার ঐতিহ্য, পৃঃ ৮৩
(১৯) ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনূদিত) ঃ জাতক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪
(২০) ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনূদিত) ঃ জাতক, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬
(২১) ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনূদিত) ঃ জাতক, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৩
(২২) ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনূদিত) ঃ জাতক, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪০
(২৩) ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনূদিত) ঃ জাতক, ২য় খণ্ড পৃঃ ২২৯
(২৪) ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনূদিত) ঃ জাতক, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৭৯
(২৫) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ লোককথার ঐতিহ্য, পৃঃ ১৪৩
(২৬) Walt Disney : Giant Book of Fairy Tales, P. 90
(২৭) পল্লব সেনগুপ্ত ঃ রেড ইণ্ডিয়ান রূপকথা, পৃঃ ৩৯
(২৮) পল্লব সেনগুপ্ত ঃ রেড ইণ্ডিয়ান রূপকথা, পৃঃ ১০৫
(২৯) Walt Disney : Giant Book of Fairy Tales, P. 147
(৩০) Walt Disney : Giant Book of Fairy Tales, P. 186
(৩১) Walt Disney : Giant Book of Fairy Tales, P. 103
(৩২) Walt Disney : Giant Book of Fairy Tales, P. 71
(৩৩) Walt Disney : Giant Book of Fairy Tales, P. 66
(৩৪) Walt Disney : Giant Book of Fairy Tales, P. 85
(৩৫) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ আদিবাসী লোককথা ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬
(৩৬) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ আদিবাসী লোককথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩
(৩৭) পল্লব সেনগুপ্ত ঃ রেড্ ইণ্ডিয়ান রূপকথা, পৃঃ ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়
ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা ও ঐতিহাসিক উপাদান।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় নিহিত সমাজের জাতিগত ঐতিহাসিক উপাদান ঃ

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথাগুলো উপজাতি সমাজের দৈনন্দিন সুখ, দুঃখ, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার এক প্রত্যক্ষ চিত্র উপহার দেয়। কল্পনাশ্রয়ী হয়ে কখনো কখনো এই লোককথাগুলো বাস্তব-অবাস্তবের সীমানাও ছাড়িয়ে যায়। সমাজ মানসও বেশ গভীর ভাবে ধরা পড়ে। বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে রচিত হয় বলে লোককথা কখনোই পরিপূর্ণভাবে কোনো সমাজের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তবু লোককাহিনীগুলোতে জাতিগত ঐতিহাসিক উপাদান অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও বেশ কিছু বিধৃত হয়েছে।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় উপজাতি সমাজের জাতিগত ঐতিহাসিক উপাদান তেমন প্রত্যক্ষভাবে কিছু পাওয়া যায় না। অপ্রত্যক্ষভাবে যে সমস্ত উপাদান পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো এই অধ্যায়ে যথাসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় যে সমাজের কথা নিহিত রয়েছে, তাঁদের জাতিগত ঐতিহাসিক উপাদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তা একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর সংহত জীবনধারার ইতিহাস।

এখানকার জনগোষ্ঠী ইন্দোমঙ্গোলয়েড (লৌহিত্যবংশজ - শব্দটি রাজমালায় ব্যবহৃত) অথবা কিরাত জাতির অন্তর্ভুক্ত।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "রাজমালা"-য় বলা হয়েছে, "কামরূপ ও রাক্ষিয়াং (রাক্ষিয়াং অর্থ রাক্ষসের নিবাস ভূমি। পাশ্চাত্য বণিকরা একে আরাকান করেছেন - পৃঃ ১০) দেশের মধ্যবর্তী স্থানকে প্রাচীন আর্যগণ সুহ্ম আখ্যা দান করেন। ইহার অন্য নাম কিরাত দেশ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভারতের "পূর্বদিকে কিরাতের বাস"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লৌহিত্যবংশীয় মানবদিগকে আর্য ঋষিগণ, কিরাত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। তদনন্তর কিরাতভূমি (একসময় ভারতবর্ষের সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং হিমালয়ের পূর্বাংশস্থিত নেপাল, ভূটান, ব্রহ্মদেশ ও চীন সমুদ্রের তীরবর্তী কম্বোজ পর্যন্ত স্থান "কিরাতভূমি" হিসেবে অভিহিত হইত। এরিয়ান, ভিওডোরাস, টলেমী প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গ্রন্থে "কিরাদিয়া" প্রদেশের উল্লেখ আছে। (রাজমালা, পৃঃ ১০) ইহা তৃপুরা" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই "তৃপুরা" শব্দ হইতে ক্রমে "ত্রীপুরা" এবং ত্রীপুরা হইতে ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি"। (পৃঃ ৮)

'তুই' ও 'প্রা' দুটি শব্দযোগে 'তুইপ্রা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 'তুইপ্রা' থেকে তিপ্রা এবং তিপ্রা থেকে ক্রমে তৃপরা, ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি। ত্রিপুরী ভাষায় 'তুই' বলা হয় জলকে। সংস্কৃত 'তোয়' (জল) শব্দের অপভ্রংশও মনে করেন অনেকে

'তুই'-কে। 'প্রা' শব্দের অর্থ 'সমুদ্র'। অর্থাৎ কিরাতগণ কর্তৃক সমুদ্র তীরবর্তী বিস্তৃত স্থলভূমি অর্থে 'তুইপ্রা' (ত্রিপুরা) আখ্যা দেওয়া হ'তে পারে।

ত্রিপুরা রাজ্যের নামকরণের ব্যাপারে নানামত প্রচলিত রয়েছে। কথিত হয় যে, চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য ত্রিপুরা রাজবংশের আদিপুরুষ। এই বংশের পঞ্চদশ রাজা ত্রিপুর পরাক্রমশালী হ'লেও অত্যন্ত অধার্মিক ছিলেন। তাঁর অনাচারে প্রজাগণ সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকতো। রাজ্যে অমঙ্গল দেখা দিল। এ সময় রাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে প্রজারা রাজাকে হত্যা করে। মতান্তরে, স্বয়ং শিব ত্রিপুরকে হত্যা করেন বলেও কথিত হয়। অহংকারী রাজা ত্রিপুর নিজের নামেই জাতির ও রাজ্যের ত্রিপুরী ও ত্রিপুরা নামকরণ করেছিলেন বলে সাধারণের বিশ্বাস।

এছাড়া পৌরাণিক কাহিনীকেও টেনে আনা হয়েছে 'ত্রিপুরা' নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে.....

"সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে।
ত্রিপুরাসুন্দরী খ্যাতি ত্রিপুর ভূমিতে।।
ত্রিপুরেশ নামে শিব ত্রিপুরা রাজ্যেতে।
তার বরে ত্রিলোচন ত্রিপুর পত্নীতে
সেই সে কারণে ক্ষত্রী ত্রিপুর জাতি বলে।
(রাজমালা)

'রাজমালা' নির্ভরযোগ্য ইতিহাস না হ'লেও প্রাচীণ ত্রিপুরা সম্পর্কে তথ্যের জন্য আমাদের এর উপরই নির্ভর করতে হয়।

প্রাচীণ সুহ্ম বা ত্রিপুরার আয়তন ৭৫০০০ বর্গমাইলের কম ছিলনা বলেই মনে করা হয়। সেই সময়ে সমগ্র কুকি প্রদেশ, মিতাই (মণিপুর) রাজ্য, কাছাড়, শিলহট্ট (শ্রীহট্ট) চট্টগ্রাম, নওয়াখালী এই সুহ্ম বা ত্রিপুরার অন্তর্গত ছিল (পৃঃ ৫৫)। মহারাজ ধর্মমাণিক্যের সভাপণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরকৃত "রাজমালা"-য় প্রাচীণ ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হয়েছে এভাবে —

"কিরাত নগরে রাজা বিধির গঠন।
রাজ্যের সীমানা কহি শুনহ বচন।।
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে রসাঙ্গ।
পূর্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কাচরঙ্গ।।
ত্রিবেগ স্থানেতে রাজা করিল এক পুরী।
নানামত নির্মাইল পুরীর চত্তারি।

'তৈরঙ্গ' শব্দটি তুই উঙ্গ > তোয় অঙ্গ > তৈরঙ্গ, এভাবে নিষ্পন্ন। যার অর্থ বিস্তৃত ও পবিত্র জলরাশি বা নদী। উত্তরে তৈরঙ্গ নদী, দক্ষিণে রসাঙ্গ (আরাকান), পূর্বসীমা মেখলী (মণিপুরী) ও পশ্চিমে কাচরঙ্গ অর্থাৎ পশ্চিমে এই রাজ্যের সীমা বঙ্গের সহিত সংলগ্ন।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে অনুসরণ করলে দেখা যায় "কবিচুড়ামণি কালিদাস রঘুবংশে সুহ্মদেশকে মহাসাগরের "তালিবনশ্যাম উপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত "সি-উ-কি" গ্রন্থে কমলাঙ্গ (কুমিল্লা) সাগর তীরবর্তী দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় অনার্য কিরাতগণ এই জল অর্থাৎ সমুদ্রের তীরবর্তী দেশকে 'তুইপ্রা' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। (অখণ্ড রাজমালা, পৃঃ ৮)

এছাড়া ত্রিপুরার সীমা নিয়ে যে লুপ্তপ্রায় প্রবাদটি সংগৃহীত হয়েছে সেটি হল —

"উতুর পার অ রো আগাং ছেরা
পছিম পার অ ব ছিপাই ছমতরি,
পূব পার্ অ ব বথাই ছাই কুরুং,
দক্ষিণ পার্ অ ব বরমা পান্‌জিৎ
বীয়াং তাই কলি হাপ ফাই?

অর্থাৎ ত্রিপুরার উত্তরসীমান্তে "রো আগাং" নামে একটি ছোট্ট নদী ছিল, পশ্চিম সীমান্তে থাকতো সৈন্যসামন্ত, পূর্ব সীমান্তে এমন একটি জাতির বাস যারা কাপড়ের পাড়ে নক্সা আঁকতে দক্ষ আর দক্ষিণ সীমান্তে বার্মার পর্বতশ্রেণী। এর মধ্যে কি করে কলিযুগ ঢুকলো?

রো আগাং কোন্ নদীর নাম তা চিহ্নিত করা যায়নি তবে পশ্চিম সীমানা বোঝাচ্ছে পদ্মা মেঘনার পূর্বতীরকে। ওখানে নবাবী সৈন্য এবং ত্রিপুর সৈন্য যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কায় সবসময়ই মোতায়েন থাকতো। পূর্বসীমানায় যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা মণিপুরী। কারণ এরাই কাপড় বোনায় এবং রকমারী নক্সা অংকনে দক্ষ। দক্ষিণসীমা বার্মা হিল রেঞ্জ।

(উপজাতি ও ত্রিপুরারাজ্য ঃ মহেন্দ্র দেববর্মা পৃঃ ১৬)

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে এটুকু পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রাচীন সুহ্ম অর্থাৎ বর্তমান ত্রিপুরারাজ্য কিরাত শাসিত হয়েছিল। এই কিরাতরা পাহাড়ে, বিশেষতঃ হিমালয়ের অরণ্যে বসবাসকারী অনার্য জাতিগোষ্ঠী যারা ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাস করে। এরা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত।

Kirat-Jana-Kriti গ্রন্থে ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী বলেছেন —

"It is the consensus of opinion among Indologists that in Sanskrit the term Kirata indicated the wild non-Aryan tribes living in mountains, particulary the Himalayas and in the North-Eastern areas of India, who were Mongoloid in origin. These Kiratas were connected with the Cinas or the Chinese, the Bhotas or the Tibetans, and other Mongoloid Peoples. They were distinguished from the wild or primitive tribes of Austric origin, who were Known specifically as Nisadas, Sabaras, Pulindas, Bhillas and Kollas." (p. 161)

কিরাতদের কথা প্রথম পাওয়া যায় যজুর্বেদে। শুক্লযজুর্বেদ, বাজসনেয়ি সংহিতার ত্রিংশ অধ্যায়ে পুরুষমেধ যজ্ঞ প্রসঙ্গে 'কিরাত'-দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"স্বর্নেভ্যঃ পর্ণকং-গুহাভ্যঃ কিরাতং সানুভ্যো জম্ভকং পর্বতেভ্যঃ কিম্পুরুষম্"।

অর্থাৎ স্বর্নের উদ্দেশ্যে ভিল্লকে, গুহার উদ্দেশ্যে কিরাতকে, সানুর উদ্দেশ্যে হিংসককে এবং পর্বতের উদ্দেশ্যে কিম্পুরুষদের যুক্ত করছি" ১৬।

যজুর্বেদ পরবর্তী সময়ে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত, বিশেষতঃ হিমালয় অঞ্চল কিরাতদের বাসভূমি বলেই বিবেচিত হ'তে থাকে। হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তে যে কিরাতদের বসবাস তা মহাভারতেও পাওয়া যাচ্ছে। বিদেহ পরিভ্রমণ শেষে ভীম পূর্বপ্রান্তে এসে কিরাতদের দেখা পেয়েছেন বলে 'সভাপর্বে' উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতেরই 'বনপর্বে'র কৈরাত পর্ব অধ্যায়ে অর্জুন কিরাতবেশী 'শিব' ও কিরাত রমনীরূপে 'উমা'-র দর্শন পেয়েছিলেন। কিরাতদের অর্থাৎ মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্তদের প্রকৃত বর্ণনা সেখানে এভাবে দেয়া হয়েছে — "কাঞ্চনদ্রুমসন্নিভম্"। অর্থাৎ এদের গায়ের রঙ মনোরম স্বর্ণবৃক্ষ সদৃশ। দ্রাবিড়, নিষাদ বা আর্যদের মতো নয়। রামায়ণেও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কিরাতদের সর্ম্পকে বলা হয়েছে স্বর্ণাভ ও প্রিয়দর্শন। "কিরাতদের চুল চুড়ো করে বাঁধা মাথার উপর, দর্শনীয়, সোনার বরণ গায়ের রঙ, জলের নিচে চলাফেরায় (সাঁতার?) দক্ষ ও নর-ব্যাঘ্র রূপে খ্যাত"।

মহাভারতে (সভাপর্বে) আছে, পূর্বের পাহাড়ে পর্বতে বসবাসকারী কিরাতরা বন-সম্পদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদি খনিজ সম্পদের এবং পাহাড় থেকে সংগৃহীত মুল্যবান রত্নাদির অধিকারী ছিল এবং বিভিন্ন ধরণের কাপড় তৈরী করতে পারতো।

"এই মোঙ্গলীয়রা ছিল বলিষ্ঠ ও সাহসী মানুষ, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে কুশলী এবং নির্মম। ভেষজ, গাছগাছড়ার ব্যবহার এদের জানা ছিল। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাগজ্যোতিষপুরের ম্লেচ্ছরাজ ভগদত্ত যোগ দেন এবং তিনি ছিলেন সমুদ্রতীরবাসী কিরাত"।

(ডঃ মহেশ্বর নেওগ ঃ পূর্ব ভারতের সংস্কৃতির সংহতি)

উল্লেখ্য, এই ভগদত্ত দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর পিতা। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের হাতে নিহত হন।

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস বহু মানুষের মিলিত জীবনধারার ইতিহাস হলেও সুপ্রাচীন তথা প্রাগৈতিহাসিক তথ্যাবলী ততখানি দৃঢ়নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়নি বলেই অনেক ক্ষেত্রেই অনুমাননির্ভর হ'তে হয় আমাদের। 'কিরাত-জন-কৃতি' গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী বলেছেন —

" The part played by the Mongoliod peoples was confined to the distant eastern and northem frontiers of India - in Central and Eastern Nepal, in North Bihar, in North and East Bengal and in Assam,.....The

mongoliod elements, again, because of their late arrival (they were possibly later than even the Aryans) could not penetrate far into the interior plains of India, and were not in a position to leaven the whole of India, So to say, in the way that the Austrics, the Dravidians and the Aryans did.....Their earlier history was already obscure at that time, and still remains obscure....."

মোঙ্গলীয়দের ভরতে আগমনের সময়সীমা খ্রীঃ পুঃ ১০০০ অব্দ বলে মোটামুটি ধরা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় —

"The Mongoloid tribes speaking dialects of - the Tibeto-Burman branch of the Sino-Tibetan speech family would appear to have found a centre of dispersion in some tract to the east of Tibet and North-East Assam, from where they began to spread into India and Tibet; and the movement started, as suggested before, before 1000 B.C. at least .....The original Mongoliod incomers were a very primitive people, being mostly hunters and food gatherers who also used caves for habitation."

(Kirat-Jana-Kriti, p. 170)

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বৎসর আগে সাইবেরীয়া, মোঙ্গলীয়া থেকে এরা ক্রমশঃ চীনের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের হোয়াং হো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী উপত্যকায় সমৃদ্ধ উন্নত সভ্যতার স্পর্শ নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে আশ্রয় নেয় এবং ধীরে ধীরে আসাম, খাসিয়া-জয়ন্তীয়া, মণিপুর, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুতঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের বিশেষভাবে আবদ্ধ রেখেছিল। পরবর্তী সময়ে আর্যাবর্তের সঙ্গে মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর পরিচয় বাড়তে লাগলো।

কিরাতদের পূর্বে এই অঞ্চলে অষ্ট্রিক মানবগোষ্ঠী বসবাস করতো। পরবর্তী সময়ে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা এই অঞ্চলে বসবাস করে ও অষ্ট্রিকদের ভাষা, সংস্কৃতি কিছু কিছু গ্রহণ করে। যদিও এই বিষয়ে তেমন বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়না। মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত খাসিয়াদের ভাষা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোল, মুণ্ডারীদের সঙ্গেও সাদৃশ্য রয়েছে।

পূর্বভারতে মোঙ্গলসম্ভূত জাতিদের মধ্যে সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বোড়োরা....তাদের সমগোত্রেরা বঙ্গদেশ ও বিহারের উত্তর অঞ্চলেতো ছড়িয়ে আছেই, এমন কি টিপরাই জাতি হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্য তাঁরাই স্থাপন করেছিল। বাংলাদেশের শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলায় টিপরাইদের দেখা মেলে। হয়তো এককালে তারা কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। চীন তিব্বতীয় ভাষা সমূহের অন্তর্গত তিব্বত-বর্মী ভাষা গোষ্ঠী থেকে বোড়ো ভাষার উদ্ভব। মেচ, রাভা, গারো ও কাছাড়ি ভাষা এই বোড়ো ভাষারই শাখা।.... বলা হয় মোঙ্গলজাতি হিসেবে বোড়োরা প্রথমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে এবং পরবর্তীকালে এই উপত্যকার ধারে কাছে কিংবা দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে যায়।

(আসামের লোকসংস্কৃতি ঃ যোগেশ দাশ পৃঃ ৩-৫)

ত্রিপুরায় আদিম অরণ্যচারী পার্বত্য উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা কবে থেকে বসবাস শুরু করেছিল তার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না। কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত রাজমালায় প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে প্রাচীণকালে ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশে শ্যানবংশীয়দের দ্বারা পরিচালিত 'পোয়াং' নামক রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল "মাগুয়াং" নগরী। এই বংশীয়দেরই একটি শাখা কামরূপের পূর্বাংশে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের অধিপতিগণ 'ফা' উপাধি ধারণ করতেন। পার্বত্য মানবদের দ্বারা 'ফা' বংশীয়গণ কামরূপ থেকে বিতাড়িত হয়ে নাগাপর্বতে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। এটিই প্রাচীণ কাছাড় রাজ্য। দিমাপুর তাহার আদিম রাজধানী। সেই হৃতরাজ্য কামরূপপতির কনিষ্ঠ পুত্র কাছাড় প্রদেশের উত্তরাংশে দ্বিতীয় রাজ্যস্থাপন করেন। এটি প্রাচীন 'তৃপুরা' বা 'ত্রীপুরা' রাজ্য। এই ত্রীপুরা থেকেই আধুনিক ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি (২য় ভাগ, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ৫৪)।

কাছাড়ীদের সঙ্গে ত্রিপুরীদের যে যোগসূত্র ছিল, উৎস যে এক, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ধর্ম, আকৃতি ইত্যাদিতেও যে সাদৃশ্য বর্তমান, তা অনেক বিদগ্ধজনই স্বীকার করেছেন (১)।

ভাষাতাত্বিক দিক থেকে কাছাড়ী ও ত্রিপুরীরা 'বোড়ো' শাখার। অন্যভাবেও বলা যায় যে, আসামের দক্ষিণ-সীমান্তের ত্রিপুরাতে যে বোড়োরা বাস করে, তাদের রাজ্যের নামানুসারে তাঁদের ত্রিপুরী বলা হয় (২)।

মঙ্গোলয়েড বা কিরাত মানবগোষ্ঠীর ভাষা Tibeto-Burman ভাষাগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত। বৃহত্তর ভাবে এই ভাষাগোষ্ঠী চারভাগে বিভক্ত। তিব্বতি, হিমালয়, উত্তর-পূর্ব ও আসাম-বর্মী শাখা। আসাম-বর্মী শাখা সংখ্যা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসাম-বর্মী শাখা আবার চারভাগে বিভক্ত।

১) কুকীচীন - লুসাই, মেইতেই
২) মিকির -
৩) নাগা - আও, সেমা, আংগামী প্রভৃতি
৪) বড়ো - ত্রিপুরী, কাছাড়ী, রাভা, কোচ, মেচ, গারো

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভাষাতাত্বিক দিক থেকেও ত্রিপুরীদের ককবরক ভাষা (প্রধান ভাষা) মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বড়ো ভাষা একসময়ের সমৃদ্ধতম ভাষা। আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'কিরাত জন কৃতি' গ্রন্থে বোড়োদের সম্পর্কে বলেছেন —

"The Bodos, who spread over the whole of the Brahmaputra valley and North Bengal as well as East Bengal, forming a solid bloc in North-Eastern India, were the most important Indo-Mongoloid people in Eastern India and they form one of the main bases of the present day population of these tracts. Judging from the wide range of extension of their language,

the Bodos appear first to have settled over the entire Brahmaputra valley and extended west into North Bengal (in Koch Bihar, Rangpur and Dinajpur Districts); they may have pushed into North Bihar also and the Indo-Mongoloids who penetrated into North Bihar might equally have been either Bodos or 'Himalayan' tribes allied to the Newars. They Skirted the southern bend of the Brahmaputra and occupied the Garo Hills, where, as Garos they form a bloc of Bodo speech. South of the Garo Hills they spread in Northern Maimensing, where the Semi-Bengalised Haijung tribe is of Bodo origin. From Nowgang district in Assam their area of occupation extended to Cachar district)Particularly in the North Cachar Hills) and into sylthet and from Cachar and sylhet they extend further to the south, to Tripura State, where there is till a Bodo-speaking bloc in the shape of the Tipra tribe which founded the State, and from Tripura they spread into Comilla and possibly also Noakhali districts; and thus they occupied the mouths of the Ganges by the Eastern Sea." (P. 172-173)

Dr. W. C. Smith নামক একজন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী তথা খ্রীষ্টান মিশনারী তাঁর Ao Naga Tribes of Assam : a Study in Ethnology and sociology (London 1925) গ্রন্থে Tibeto-Burman গোষ্ঠীর মানুষদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছেন, ত্রিপুরার উপজাতি মানুষদের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

১) মুণ্ডশিকার
২) অবিবাহিত যুবকদের জন্য সাধারণ শোবার ঘর, যেখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।
৩) বাসস্থান হিসেবে খুঁটির সাহায্যে নির্মিত টংঘর।
৪) যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিবাহপূর্ব স্বাধীনতা।
৫) পান খাওয়ার অভ্যাস।
৬) পানীয় হিসেবে দুগ্ধ গ্রহণে অনীহা।
৭) উল্কির ব্যাবহার।
৮) শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের অভাব।
৯) কাপড় বোনার জন্য সাধারণ তাঁতের ব্যবহার।
১০) চতুষ্কোণ বা ষড়ভুজ বিশিষ্ট ঢালের ব্যবহার।
১১) পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসে স্পৃহা ও আদিম চাষ পদ্ধতি ইত্যাদি।

বর্তমানকালে উপজাতি জীবনযাত্রায় এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, প্রামাণ্য তথ্য স্বরূপ কোনো ইতিহাসও আমাদের হাতে নেই। Indo-Mongoloid গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত সকলেই যে এইসমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল তা-ও মনে হয় না, তবে ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে যে এই অভিজ্ঞানগুলো ছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ

সুপ্রাচীণ লোককাহিনীগুলোর মধ্যে রয়েছে। অবিবাহিত যুবকদের জন্য সাধারণ শোবার ঘর, পান খাওয়ার অভ্যাস ইত্যাদি মঙ্গোলয়েডরা ব্রহ্মদেশ ও আসামে বসবাসকারী তাঁদের পূর্ববর্তী অষ্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে আয়ত্ত করেছে বলে মনে করা হয়।

আরো পরবর্তীকালে উপজাতীয় সমাজে মনুষ্যবলির প্রসঙ্গের কথা জানা যায়। এটিও অষ্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর অবদান বলেই মনে হয় (৩)।

মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের স্বভাবগত কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। এদের সদাপ্রফুল্ল মেজাজ এবং স্বভাবের সরলতা উল্লেখনীয় বিষয়। এরা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং সাহসী হয়। অতিসহজেই অপরকে বিশ্বাস করে যেমন, তেমনই অতি সহজেই মানুষ ও পশু-পাখীর প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা অথবা দার্শনিকতাপূর্ণ মনোভাবেরও বিশেষ অভাব দেখা যায় এদের মধ্যে। এরা খুবই সৌন্দর্য্যপ্রিয়, বিশেষতঃ এদের পরিধেয় বস্ত্রদিতে রঙের ব্যবহার খুবই মনোরম। উজ্জ্বল লাল, কালো, হলুদ ও নীল রঙের প্রতি এদের আসক্তি দেখা যায়। সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদির প্রতিও রয়েছে গভীর ভালোবাসা। চারুশিল্পে রয়েছে দক্ষতা।

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে আধুনিক জীবনযাত্রায় এই বৈশিষ্ট্যসমূহের কিছু অভাব বা পরিবর্তন দেখা গেলেও, লোককথায় তাঁদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পূর্ণভাবেই লক্ষ্য করি (৪)।

'রাজমালা' — নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ না হলেও এর থেকে কিছু কিছু সংকেত গ্রহণ করা চলে। ত্রিপুরার কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ না থাকার ফলে সুপ্রাচীণ কাল সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না। মোটামুটিভাবে দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ের ত্রিপুরার ইতিহাসের কিছু পাথুরে প্রমাণ, প্রাচীণ লিপি, তাম্রশাসন ও মুদ্রায় পাওয়া যাচ্ছে। ঐতিহাসিকদের হাতে এর পূর্ববর্তী সময়কার কোনো সংবদ্ধ প্রত্ন প্রমাণ নেই। তাই পূর্ববর্তী সময়টিকে প্রাগৈতিহাসিক বা আদিযুগ বলা যেতে পারে। তবে বিদ্বজ্জনেরা অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রাচীণ ত্রিপুরার একটি বৈচিত্রময় সমাজ মানস ও সংস্কৃতির মূল ধারাটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন।

"ত্রিপুরার ইতিহাসের রূপরেখা"-য় ডঃ জগদীশ গণ চৌধুরী বলেছেন —

'এ অঞ্চলে ত্রিপুরা নামে কোনো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিই এজন্য অনেকাংশে দায়ী। সমতলের অধিবাসীরা বাঙালী। জীবিকা চাষাবাদ ও ব্যবসা বাণিজ্য। পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীরা কিরাতজাতির শাখা প্রশাখা। জীবিকা বন্য ফলমূল আহরণ, শিকার ও জুমচাষ। সমতলের রাজনৈতিক চিত্র নাটকীয় ও দ্রুতগামী। পার্বত্যাঞ্চলের পট আদিম ও মন্থর। সমতলভাগেই প্রথম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পাহাড়ে তখন উপজাতীয় গোষ্ঠীপতি। আসাম, ব্রহ্মদেশ ও আরাকান হ'তে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সঞ্চরণশীল কতগুলি সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দলে এসব এলাকায় বসতি বিস্তার

করে। এদের মধ্যে তখনো বোঝাপড়ার একান্ত অভাব ছিল। প্রতি সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা প্রশাসন ছিল। প্রশাসনের নিম্নতম কেন্দ্র ছিল পাড়া"।

সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণে এসে সমতট ও আসামে গিয়েছিলেন। তাঁর বৃত্তান্তে সমতটের (বাংলাদেশ) কথা উল্লেখ করলেও ত্রিপুরার কথা উল্লেখ করেননি বলে অনেকে মনে করেন যে সপ্তম শতাব্দীতে ত্রিপুরার কোনো অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। উপরন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক অংশ তখন সমতটের রাজাদের অধিকারে ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

৫০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গুপ্তবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। জানা যায় মহারাজ বন্যগুপ্ত সেসময়ে সমতটে রাজত্ব করতেন। বন্যগুপ্ত এবং পরবর্তী কয়েকজন রাজার রাজধানী ত্রিপুরা রাজ্যের কাছাকাছি কোথাও ছিল।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমতট অঞ্চলে খড়্গ বংশের আবির্ভাব ঘটে। সেই বংশের চার পুরুষের নাম পাওয়া যায় যথাক্রমে খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ দেবঘড়্গ ও যুবরাজ রাজরাজভট্ট।

জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক সেংচি সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে রাজরাজভট্টকে রাজ্য শাসন করতে দেখেন সমতটে।

খড়্গদের পরে অষ্টম শতাব্দীতে একটি দেবরাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। শ্রীহট্টের দক্ষিণ দিকে, কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ অংশে, কাছাড় জেলার কিছু অংশে এবং ত্রিপুরা জেলার কিছু অংশে তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

ত্রিপুরার নরপতিগণ নিজেদের চন্দ্রবংশজ বলে দাবী করতেন। পূর্ববঙ্গেও 'চন্দ্রবংশী'-য় রাজারা রাজত্ব করেছেন। এই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজধানী কুমিল্লার নিকটবর্তী 'লালমাই' পাহাড় অঞ্চলে ছিল — এমন তথ্যাদি পাওয়া যায়। তবে এই চন্দ্ররাজারাই ত্রিপুরায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় 'পাটিকেরা' নামে একটি ছোট্ট রাজ্যের কথা জানা যায়, যাদের ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এই রাজ্যের মুদ্রায় ষাঁড় ও ত্রিশূল চিহ্ন লক্ষ্য করা গেছে। যার দ্বারা এই রাজ্যের শাসকগণ শৈব ছিলেন বলে মনে হয়।

"It is quite conceivable that pattikera during the second half of the first millenium A. D. was a fully Hinduised Indo-Mongoloid Kingdom and outpost of Indian Culture in the farthest east of India"(৫)

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে সুপ্রাচীণকাল থেকেই যে 'কের' পুজোর প্রচলন রয়েছে সেই 'কের' শব্দের সঙ্গে অনেকে 'পাটিকেরা' শব্দের 'কের' অথবা 'কেরা'-র সংযোগ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন (৬)।

রাজমালার মতে দ্বাদশ শতকের পর ছেংথুংফা গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করে মেহেরকুল (কুমিল্লা) দখল করেন। এর অল্পকাল পরেই "চট্টলাচলে" ত্রিপুর রাজপতাকা উড়ানো হয়।

মহারাজ ছেংথুংফার পুত্র আচংফা এবং তাঁর পুত্র খিচোংফার পরবর্তী সময়ের ত্রিপুরার প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়।

ত্রিপুরারাজ্যের শাসকগণ যদিও ত্রিপুরবংশীয় তবুও এখানে বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। যার ফলে এখানকার উপজাতি সমাজ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠীর সম্মিলনে। এই রাজ্যের অধিবাসীদের সম্পর্কে গবেষকদের ধারণাটুকু এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় —

"The various groups and subgroups of tribals spread over the territory have near identity in culture and social treats. Besides having similar ethnological features who are infact extending from the Northern spurs of patri to the southern tips of the China, hills of Burma, forms a single ethnical unit closely nit in race and culture. The tribe that occupy it are the Kukis, the Lushais, the hill Tiperas, the Chakmas and the Mogs."(৭)

বিভিন্ন দেবদেবী

যে কোনোও মানবগোষ্ঠীর সমাজমানস ও জীবনধারাকে বোঝা যায় তাঁদের উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে। ত্রিপুরার উপজাতিরা নানা দেবদেবীর পুজো করে। এদের মধ্যে চর্তুদশদেবতার পুজোই প্রধান। পুজো পদ্ধতি এবং দেবতাদের হিন্দু নামকরণের মধ্যে হিন্দু প্রভাব থাকলেও উপজাতিদের নিজস্ব আচার, পদ্ধতিও বর্তমান রয়েছে। উপজাতি প্রধান পুরোহিত চন্তাই ও দেওড়াইদের দ্বারা এগুলো অনুষ্ঠিত হয়। চর্তুদশ দেবতার পুজো (যা খার্চি পুজো নামেও খ্যাত) ছাড়াও কের পুজোও প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এদের মধ্যে প্রচলিত 'তুইবুক্ মা' বা 'তুইমা' পুজো খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই পুজো আসলে জলদেবী বা মা গঙ্গার পুজো যিনি সমস্ত জীব ও জগতের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ এবং উৎপাদন ও উর্বরতার সঙ্গেও যুক্ত বলে মনে করা হয়।

রাজমালায় চর্তুদশদেবতার নাম নিম্নরূপ পাওয়া যায়।

মতই কতর - মতই-দেব, কতর-শ্রেষ্ঠ, বৃহৎ যৌগিক অর্থ — মহাদেব, কিরাত জাতির প্রধান উপাস্য দেবতা।

তুইমা — আদিবাসীরা শূয়োর ছাড়া অন্যান্য জীব, যেমন মুরগী, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি বলি দেয় কঠিন রোগাক্রান্তদের আরোগ্য কামনায়। তুইমা, জলের দেবী।

লাম্ প্রা — আকাশ ও সমুদ্র, এই দুই দেবতার পুজো সবরকম মাঙ্গলিক কার্য্যেই অনুষ্ঠিত হয়।

সাংগ্রামা — হিমালয়। চর্তুদশ দেবতার মধ্যে সর্বদা লাম্ প্রা ও সাংগ্রামার পুজো অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য দেবতারা প্রায়ই নিদ্রিত থাকেন।

মাইলুমা — ধান্যের দেবতা

খুলুমা — তুলোর দেবতা

বুড়া-ছা বা বুড়া দেবতা — রোগশান্তির জন্য এই দেবতার পুজো হয়।

বনিরাও ও থনিরাও — এই দুইভাই বুড়াছার পুত্র।

বুড়িরক — ৭ বোন পরী। ৬ বোন বিবাহিতা। প্রেমের দেবী বলে গণ্যা। ডাকিনী, যোগিনী নামেও খ্যাত।

গরইয়া, কালাইয়া — এরা দুইভাই। মূলতঃ ফসলের দেবতা।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এদের পুজো হয়। এই সময়ে উপজাতি সমাজে ভাত থেকে প্রস্তুত মদ্যপানের রেওয়াজ আছে।

চর্তুদশ দেবতার পুজোয় শুধু চৌদ্দটি দেবতার মুণ্ডপুজো হয়ে থাকে। আদিম অরণ্যচারী সমাজের নরমুণ্ড শিকারের অভিপ্রায়ের একটি জ্বলন্ত দলিল বলে মনে হয় এই চৌদ্দ দেবতাকে।

এই মুণ্ডপুজোর উৎসে অষ্ট্রিকরীতি রয়েছে বলে মনে করা হয়। (৮) পূর্বে খার্চি পুজোয় (চৌদ্দ দেবতার পুজো) নরবলি দেয়া হত।

আর্থ-সামাজিক কারণে ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের প্রেক্ষিতে কিরাত জনগোষ্ঠীর দেবদেবীরাও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যার ফলে এই চর্তুদশ দেবতাকে নিম্নলিখিত চর্তুদশ হিন্দু দেবতার সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়।

হরোমা হরিমা বাণী কুমারগণকো বিধি ঃ
ক্ষাব্ধি গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চর্তুদশাঃ।।

(রাজমালা, অখণ্ড পৃ ৬৬)

ত্রিপুরার এই চৌদ্দদেবতা গ্রীসদেশীয় চৌদ্দদেবতার কথা মনে করিয়ে দেয়। (৯)

Zeus, Hērē, Lris, Dēmēter, Dionusos, Hērmēs, Athēnē, Hēphaistos, Posēidon, Appolon, Artēmis, Eros, Aphrodite, Arēs

দ্বাদশ রোমান দেবতার কথাও মনে পড়ে।

Juno vesta Minerva Ceres Diana Venus Mars mercurius Jovi Neptunus Volcanus Apollo. (10)

কের পুজো ঃ

খার্চি পুজোর ১৪ দিন পর এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় পুজোর নির্দিষ্ট সীমানায় বসবাসকারী ত্রিপুরাবাসীগণকে একদিন ও দুইরাতের জন্য গৃহে আবদ্ধ থাকতে হয়। কের পুজোয় প্রাচীণ সর্বপ্রাণবাদী ধারণার "বৃক্ষপূজা"-র ধারণাটি বিদ্যমান রয়েছে।

গড়িয়া পুজো ঃ

গড়িয়া পুজো উপজাতি সমাজের এক অনন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উপাদান। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া, কলই, রূপিনী এবং

কাইপেং সম্প্রদায়ের লোকেরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে এই দেবতার উপাসনা করেন। এই পুজোই তাদের প্রধান উৎসব। তিনি বীরত্ব, মঙ্গল ও আনন্দের প্রতীক। তিনি ধনরাজও। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া জাগতিক কল্যাণ, সুখশান্তি, ভোগ, বিলাস ও অস্তিত্ব কোনোটিই সম্ভব নয় — এটাই উপজাতিদের ধারণা। সারা বছরের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনায় তাঁর কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেয়া হয়। পুজো অন্তে দেবতা বিসর্জনের পর জুমে ধান ও অন্যান্য ফসল লাগানো হয়। তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়েই জুমের কাজ আরম্ভ করা হয়, যাতে দেবতা সন্তুষ্ট থাকেন।

ত্রিপুরায় গড়িয়া পুজোর উৎপত্তি নিয়ে নানা মত পোষণ করা হয়। গড়িয়া পুজো মহাবিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ হয় এবং বৈশাখের প্রথম সাতদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। কেউ কেউ গড়িয়া পুজোকে শিবপুজো, মতান্তরে "গণেশ পুজো"-ও বলেন। গড়িয়া পুজোর অধিকার সকলের হয় না। এটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়।

প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যায় যে, গড়িয়া পুজোর সময়টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। সে সময় একাধারে বাঙালী হিন্দুদের নববর্ষের আমেজ ও ব্যবসায়ী মহলে সিদ্ধিদাতা গণেশের নামে নতুন খাতার মহরত, শিবের গাজন। আসামের রঙালী বিহু, যার অন্য নাম বহাগ বিহু। ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে নতুন জুমে চাষের প্রস্তুতি ইত্যাদি লক্ষ্য করে অনেকে মনে করেন গড়িয়া গণেশেরই নামান্তর। আবার কারো কারো মতে গড়িয়া বোড়োদের 'বুইসু' সংস্কৃতির ফসল যা পরবর্তীকালে থাইল্যাণ্ড থেকে আগত আহোম রাজাদের দ্বারা বিহু উৎসবে পরিণত হয়েছিল।

অন্যদিকে একটি কিংবদন্তী এমন যে, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের সেনাবাহিনী কুকি দেশ বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ তাঁদের কুলদেবতাকে ছিনিয়ে নিয়ে এলে ত্রিপুরায় এ পুজোর প্রচলন হয়।

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে পদ্ধতিতে এই পুজো করেন কিংবা গড়িয়া দেবতাকে কেন্দ্র করে যে নাচ-গান হয় তাতে বিজয়ের পর সৈনিকদের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসই প্রকাশ পায়। এদের পুজো প্রাঙ্গনে এখনো একদল লোক সৈনিকের বেশ ধারণ করে। জমাতিয়াদের বিশ্বাস, সোনার তৈরী দেবতার মুখমণ্ডলকে তারা কুকি রাজার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল। সেনাবাহিনীতে তাদের মুখ্য ভূমিকা ছিল বলে তারা মুখমণ্ডল পেয়ে যায়।

এসমস্ত বিচার করে অনেকে বলেন যে গড়িয়া ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের নিজস্ব দেবতা নন।

তবে গড়িয়া দেবতাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরায় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির যথেষ্ট বিকাশ হয়েছে। তৈরী হয়েছে নানা ধরণের নাচ, গান, ছড়া, শ্লোক ইত্যাদি। নাচ ও গানের মধ্যে এসেছে এক নব জোয়ার। প্রাচীন ত্রিপুরায় নাকি একশ আট রকমের নাচ প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে গড়িয়াকে কেন্দ্র করেই বত্রিশ রকম নাচের কথা জানা যায়। এই নৃত্যকে "খেবেবাই মোছাংমু" বলা হয়।

গড়িয়া নাচে জুম পোড়া, জুম বোনা, জুম বাছাই, জুম কাটা, জুম তোলা, হাতির চলন, বনের সহজ ধারা, আকাশের বুকে পাখির উড়ে যাওয়া, জুম পাহারা দেওয়া ইত্যাদি ভঙ্গি

অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। অনেকে গড়িয়া নৃত্যে নাগা ও মিজোদের প্রভাবও দেখতে পান। সে যাই হোক বোড়োদের আদি দেবতা 'সিব্রাই' কিংবা তাঁদের 'বুইসু' দেবতার প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়।

উপজাতি লোককথাগুলোতে এই পুজোকে ঘিরে উপজাতি মানুষের মনে যে আনন্দের বিচ্ছুরণ ঘটে, তার হদিশও পাওয়া যায়। " স্বর্গের ফুল রাস্না" তে তার প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। "পুজোর সময় কয়েকদিন ধরে ঘরে ঘরে চলবে হৈ হুল্লোড়, পানভোজনের ছড়াছড়ি....."। (দ্রঃ স্বর্গের ফুল রাস্না।)

নকছু মীতায় ঃ

শুধু গড়িয়া পুজোই নয় উপজাতি সমাজের সঙ্গে ওতঃ প্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে সমস্ত অন্যান্য পুজো অনুষ্ঠান সেগুলোর কথাও লোককথার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। "নকছু মীতায়" (চাঁদের ছেলে গল্পে) অর্থাৎ গৃহদেবতা। এর অধিষ্ঠান ঘরের কোণায় হ'লেও যে কোনো কোণে হ'তে পারেনা। এই দেবতার অধিষ্ঠান হয় ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। তিনি ঘরদোর পাহারা দিয়ে গেরস্থকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন। গৃহকোণ দেবী মতান্তরে মনসাদেবী। ঘরের এই কোণটি বিশেষ মর্যাদাসূচক। 'নকছু মীতায়' -এর প্রতীক 'য়্যামফ্রা' (ছোট ছোট আকারে ফাঁক ফাঁক করে তৈরী করা বাঁশের চতুষ্কোণ) ঘরের কোণের বেড়া অথবা চালের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়।

গড়িয়া পুজোর আগে 'নকছু মীতায়' - এর পুজো অবশ্য কর্তব্য। এই পুজো চলাকালীন সময়ে অচাই ঘরের দরজার সামনে তিনটি কাঁচা বাঁশের সরু কাঠি পুঁতে রাখেন। এরদ্বারা পুজো চলাকালীন সময়ে সেই ঘরে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ সূচিত হয়। পুজো শেষ হ'লে মন্ত্র পড়ে অচাই (পুরোহিত) কাঠিগুলো তুলে দ্বিখণ্ড করে জলে ফেলে দিয়ে আসেন। এই কাঠি পোতাকে 'খং কাই অ' বলা হয়। নিন্দুক ও অহিতাকাঙ্ক্ষীদের অভিসম্পাত যাতে ঐ ঘরের লোকদের কোনও ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য 'খং' দেয়া হয়। 'নকছু মীতায়'-এর পুজোয় 'চুয়ারাক' ও 'চুয়াক্মা' (মদ) দরকার হয়। পুজোর আগে 'বারুয়া' (অচাইয়ের সহকারী) দুই ধরণের মদ বাঁশের চোঙায় ভরে দেয়। পুজোর আগে ও পরে পাতার উপর রাখা চালের উপর কয়েক ফোঁটা মদ ঢেলে দেয়। এরপরে অচাই 'পাত্কারণা' করে দেখেন। তারপর 'নকছু মীতায়' এর পাদমূলে মুরগী উৎসর্গ করা হয়।

শ্রুতি-স্মৃতি-বিস্মৃতি ঃ

অতীতের কোনো সামাজিক বা ঐতিহাসিক উপকরণ যেহেতু লিখিত রূপের ভেতর দিয়ে বর্তমানের জন্য সংরক্ষিত হয় নি আলাদাভাবে, লোককথার মধ্য থেকেই সেই প্রচ্ছন্ন ইতিহাসকে তাই বের করে নিতে হয়। শ্রুতি-স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য দিয়েই সেই ইতিহাস কোনো না কোনো

ভাবে ধরা থাকে লোককথার অবয়বে। লোকজীবনে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা আনুষ্ঠানিক রীতিগুলোর মধ্যে সমষ্টিগত জীবনচর্চার কোনো না কোনো স্মৃতি জড়িত থাকে।

'রক্তপিপাসু দেবতা, কাহিনীতে চৌদ্দজন দেবতা রানীমার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই চৌদ্দদেবতা 'চতুর্দশদেবতা মন্দিরে' চতুর্দশ মস্তকরূপে পুজিত হয়।

মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর কিছু শাখায় পৃথিবীর আদিমতম সামাজিক প্রথা head hunting বা মুণ্ডশিকারী স্বভাবের ইতিহাস প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। দেবতারা ত্রিলোচনের (নর) রক্ত পান করেনি। পশুতে রূপান্তরিত করে সেই রক্ত পানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ ঐন্দ্রজালিক বস্তুর উপস্থিতি দেখা যায়। মোষের পিঠে রিছা ছুঁড়ে বশ মানানো, আদিম কোনো সেক্স রিচ্যুয়ালের অনুষঙ্গবাহী। রক্তপানের প্রতি লোভ দেবতাদের রাক্ষস হিসেবেই প্রতিপন্ন করে। লোকপ্রথার প্রবর্তন কি করে হ'ল তার হদিশ দেবার জন্য এটি myth বা লোক পুরাণের গুণসম্পন্ন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যেই totem পশু বা পাখীর উপস্থিতি আছে। নব্যভারতীয় সমাজেও কিছু কিছু উপাধিতে এই পশু প্রতীকটি উপস্থিত।

'বানর বর' গল্পে বানরকে (তার পুত্রের নাম ততে) সহজ স্নেহশীল পিতারূপে দেখানো হয়েছে। এখনো কোনো কোনো জনজাতি সমাজে বিবাগী পুরুষকে 'ততের বাপ' বলে ঠাট্টা করা হয়। কোনো ভুলে যাওয়া সুদূর অতীতে বানরের সঙ্গে মানবীর বিয়ের কাহিনী এখনো জনজাতি জীবনে সন্দেহাতীত ভাবে সত্যি বলে বিবেচিত হয়।

'পুরোহিত' -এ জুমে আগুন দেবার আগে দেবতার বন্দনা উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারা থেকে এসেছে। আগুন দিয়ে গাছ পোড়ানো হয় জুম চাষ করার আগে। তাই দেবদেবীর বন্দনা করতে হয়। এখানে আদিম সর্বপ্রাণবাদের ধারণাটিও প্রচ্ছন্ন আছে।

মানবসংস্কৃতির একটি স্তরে মৃত পূর্ব পুরুষের আত্মাতে দেবকল্পনার যে ভিত্তি রচিত হয়েছিল, তাও ফুটে উটেছে 'বুড়াদেবতা'কে 'মামা' সম্বোধনের মধ্যে। মামা, মায়ের ভাই। ভাই-বোনের বিবাহের ধারাটি যে একদিন এখানকার জনজাতি জীবনে প্রচলিত ছিল, প্রচ্ছন্নভাবে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমাজ বিবর্তনের পথে প্রথাটি নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হলে এতে দৈবপ্রভাব আরোপিত হয়েছিল। সুষ্ঠুভাবে উচ্চারিত মন্ত্রও যে মানুষেরই মত হুকুম তামিল করতে পারে, তারই প্রমাণ কলাপাতা সাতটুকরো করে কাটার সঙ্গে সঙ্গে সাপের সাতটুকরো হয়ে কেটে যাওয়া। প্রয়োগবিধিতে দক্ষ প্রতাপান্বিত 'পুরোহিত' বা 'অচাই' দের আদিবাসী জীবনে উদ্ভবের সূত্রটি এখানে রয়েছে।

'উইপোকা স্বামী' কাহিনীটিতে মানব ও মানবেতর প্রাণীর বিবাহের সূত্রটি পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের প্রভাব যে জনজীবনে যথেষ্ট ছিল তারও প্রমাণ রয়েছে 'জাদুকরের অভিশাপ' ইত্যাদির মধ্যে। সর্পমাংস ভক্ষণের প্রাচীন ইতিহাসটিও এখানে উদ্ঘাটিত।

ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রতি বিশ্বাসের আরেকটি উদাহরণ, 'এ পালকটিই একটি রাজহাঁস হয়ে যাক'— বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজহাঁসের সৃষ্টি। চাল, কলা, গুড়, দুধ ইত্যাদি পুজোর উপকরণ

অস্ট্রিক প্রভাবজাত। পুজোয় উলুধ্বনির প্রসঙ্গটি মানবসভ্যতার আদিমস্তরের আভাস বয়ে আনে। শিকার কেন্দ্রিক জীবনে মানুষ প্রাণীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে তার আচরণে সেই অভিজ্ঞতাকে মূর্ত করে তুলেছিলো একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে। প্যাঁচার অন্য নাম উলূক। উলু করে যে, সে-ই উলূক। এই ধ্বনি হিন্দুর উৎসবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে প্যাঁচার আচরণের প্রত্যক্ষ চিত্র পেঁচকবাহিনী দেবীর পুজোর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে গেছে এক সময়। আদিম মানুষের জীবনে সমস্ত বস্তুর মধ্যে (আকাশ, মাটি, পর্বত, নদী সবকিছুই) সত্তার অস্তিত্ব কল্পনাই ছিল ধর্মচেতনার প্রাথমিক পর্যায়। পরবর্তীস্তরে পশুকে, পিতৃপুরুষের আত্মাকে দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। আজ আমরা যে সমস্ত পশুপাখিকে দেবদেবীর বাহন হিসেবে দেখতে পাই (ইঁদুর, ময়ূর, প্যাঁচা, সাপ, সিংহ ইত্যাদি) একদিন এরা নিজেরাই দেবতা হিসেবে পূজিত হয়েছিল আদিম মানুষের দ্বারা। ছাক্‌লক দেবীর পুজো প্রচারের পেছনে রাজহাঁসের কাহিনী এবং এর ব্রতকথা প্রচার আদিবাসী জীবনের সেই প্রত্নযুগের চিত্রই তুলে ধরে।

"গুল্মকুমারী" কাহিনীতে নারকেল নরমুণ্ডের প্রতীকরূপে নরমুণ্ড শিকারের ইঙ্গিতবাহী হ'তে পারে। এ ছাড়াও উর্বরতা কেন্দ্রিক ধর্মধারার চিহ্নরূপেই বিভিন ধরণের গাছগাছালি এবং ফল জন্মাচ্ছে। পানের পাতা যৌন প্রতীক এবং পানের পিক্ লকইয়ের কাপড়ে মুছে দেবার ব্যাপারটি যৌনক্রিয়ার বাসনাসূচক। ছিলাইকুমারীকে আগে চিরদিনের মত মাটি চাপা দিয়ে পরে গুল্মকুমারীকে বিয়ে করার মধ্যে তৎকালীন সমাজবিধির প্রকাশ রয়েছে। পুরুষের এক পত্নী গ্রহণের ব্যবস্থাটিই এখানে প্রকটিত। কাহিনীটিতে সর্বপ্রাণবাদের ধারণা প্রকাশিত হয়েছে, বিভিন্ন গাছপালা-লতা-মাছ, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। এর দ্বারা আদিমতম মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ মানসের বিবরণ ফুটে ওঠে যখন মানুষ বিশ্বপ্রপঞ্চের সবকিছুতেই জীবন ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আদিম সর্বপ্রাণমূলক (animistic) সমাজ মানসের অসংখ্য স্মৃতি চিত্রে পূর্ণ রয়েছে এখানকার লোককথা। মানব ও মানবেতর প্রাণীর বিবাহের দ্বারা বোঝা যায়, আদিম মানবের কতখানি প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল এদের সঙ্গে।

মানুষের চৈতন্যের নির্জ্ঞান স্তরটি আলো-আঁধারিতে ভরা। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন বাসনাগুলো প্রকাশ পায়। দেবতা সম্পর্কিত ধারণায় দেখা যায় স্বপ্নের একটা স্থান রয়েছে (রাজহাঁসের কাহিনী)। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের এবং মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতে মিথ্ বা লোকপুরাণ মানুষের বিস্ময়বোধ বা স্বপ্ন থেকে উদ্ভূত হবার ধারণাটি এখানেও প্রতিষ্ঠিত।

লোককথায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয়। এদের উপস্থিতি দুইভাবে দেখা যায়। প্রথমতঃ পরিবারস্থ বয়স্ক সদস্য হিসেবে এদের উপস্থিতির দ্বারা সংহত জীবনের ছবিটি ধরা পড়ে। দ্বিতীয়তঃ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা দেবতা হিসেবেও উপস্থিত লোককথায়। 'পুরোহিত' কাহিনীতে 'বুড়াদেবতা' ও 'রাজহাঁসের কাহিনী'তে 'বৃদ্ধা দেবী'র উপস্থিতিতে লোকপুরাণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

'আদিম মানুষ অরণ্য, নদী, পর্বতে এক "বৃদ্ধ" লোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। বাল্টিক দেশগুলোর নদ-নদী, মাঠ-ঘাট ইত্যাদির মধ্যে বৃদ্ধব্যক্তির অস্তিত্বের বিশ্বাসের কথা সর্বত্র পাওয়া গেছে।" (১১) লোককথায় এই বৃদ্ধ দেবদেবীদের উপস্থিতি আদিম মানুষের পূর্বপুরুষ পুজোর বিস্মৃত অধ্যায়েরও স্মৃতি জাগায়। "পুরোহিত" গল্পে বানর বুড়াদেবতাকে 'মামা' 'মামা' বলে ডাকামাত্রই তিনি সাড়া দেন, যথাযথ নির্দেশও দেন সুস্থশরীরে জীবনধারণ করার জন্য। আবার বৃদ্ধ স্ত্রীলোক স্বপ্নের ভেতর দিয়ে বিধবাকে বিপন্মুক্তির নির্দেশ দেন। (দ্রঃ রাজহাঁসের কাহিনী)

আচরনের দ্বারা এদেরকে পরিচিত পৃথিবীরই মানুষ বলে মনে হয়। পরিচিত পৃথিবীর মানুষদের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি প্রচণ্ড বিশ্বাস ও ভক্তি লোকমানসে এক অতিলৌকিক ভাবনার জন্ম দেয়। মানুষের সঙ্গে দেবতার একত্বের এই বোধ দেখা যায় "চাঁদের ছেলে" কাহিনীতেও। সেখানে চন্দ্রমাদেবের ঔরসে কুফুরের ছেলে হয়। এই প্রসঙ্গটি সূর্যের ঔরসে কুন্তীপুত্র কর্ণের জন্মের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজকের আধুনিকমনস্কতায় যুক্তিতর্ক-প্রশ্ন-সন্দেহের ঘেরাটোপে পড়ে মানুষ আর দেবতার মাঝে রচিত হয়েছে অসীম দূরত্ব। কিন্তু এইসব কাহিনীর মধ্য দিয়ে জ্বলন্ত এক চিত্র বেরিয়ে আসে বিস্মৃত দিনের, যখন মানুষ আর দেবতার মাঝে রচিত হয়েছিল এক নৈকট্য। ভয় ভীতি শ্রদ্ধার স্তরকে পেরিয়ে দেবতাকে আপনজন করে তোলার এক বিস্মৃত আদিম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এই কাহিনীগুলোতে। "রক্তপিপাসু দেবতা"য় সতীনারী সম্পর্কে একটি দৃঢ়বিশ্বাস ফুটে ওঠে যেখানে সতীনারীর তিরস্কারে দেবতারাও লজ্জিত হয়। এই প্রসঙ্গে যমের প্রতি সাবিত্রীর আচরণ, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ইত্যাদি আমাদের স্মৃতিতে জেগে ওঠে। মনে পড়ে মহীয়সী নারী গান্ধারীর কথা, যিনি "কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান"— ভগবানস্বরূপ কৃষ্ণকে পর্যন্ত যদুবংশ নির্বংশ হবার ও তাঁকে সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যুবরণ করার অভিশাপ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অভিশাপ সত্য হয়ে ওঠে বলে জনশ্রুতি।

ভাইবোনের বিয়ে একসময় জনসমাজে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। লোকস্মৃতিতে ধরে রাখা বিস্মৃতদিনের এই ইতিহাসটি একটি ছোট্ট বীজের আকারে ধরা পড়েছে "ছাতিম গাছের কাহিনী"তে।

অসুস্থতা অশুভশক্তির প্রভাবজাত এবং এজন্য সহায়ক শক্তির আরাধনা (দ্রঃ, পুরোহিত) আদিম সর্বাত্মবাদেরই স্মৃতি জাগায়। দারিদ্র্য দূরীকরণে ছা-কলক দেবীর পুজো প্রচলনের মধ্যেও একই দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষিত হয়।

দৈবনির্ভরতায় একটি বিশেষ মানসলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতিনির্ভর কৃষকজীবন তার ফসল-ধনজন রক্ষার জন্য ছিল সদা সচেষ্ট।

প্রাগৈতিহাসিক জীবন থেকে আধুনিক সভ্য মানুষে উত্তরণের হাজার হাজার বছরের দীর্ঘ পথের বিভিন্ন পর্যায়ের ভাবনাচিন্তার পরিচিতি সম্পূর্ণরূপে বা সরাসরি আমরা পাই না। অতীতের অন্ধকারে অবগুণ্ঠিত সেই লোকমানস ফুটে ওঠে লোককথায়। ব্যাঙের কোমর ভেঙে যাওয়ার কাহিনী (দ্রঃ, বিচার), শকুনের ডিম খেয়ে মানুষের শকুন হয়ে যাওয়ার ঘটনায় (দ্রঃ,কথা

বলা আংটি) অথবা ছাতিম গাছের মাথায় চড়ে মেয়েটির আকাশের বুকে বিলীন হয়ে যাওয়ার (দ্রঃ, ছাতিম গাছের কাহিনী) ঘটনার ভেতর দিয়ে। জুমের ক্ষেতে গিয়ে পাখির ডিম (দ্রঃ কথা বলা আংটি) খেয়ে ফেলার মধ্য দিয়ে আদিম শিকারজীবনের স্মৃতি ধরা পড়ে।

শ্বশুরের পরিবারে জামাই হচ্ছে অপহারক। ফলে সে প্রচ্ছন্নভাবে শত্রু। মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সমাজস্বীকৃত প্রথারূপে এখনো রয়েছে। বাংলা প্রবাদ, "জন-জামাই-ভাগিনা-তিন না হয় আপনা" এই ভাবনাটিরই সমার্থক। প্রচ্ছন্ন শত্রুতা বা প্রতিহিংসার ভাব অবগুণ্ঠিত রূপে রয়ে গেছে— "অজগর সাপের গল্পে" মেয়েটির স্বামীরূপে বৃত অজগরকে হত্যার মধ্যে।

আদিম মানুষের কাছে তার জন্ম ও মৃত্যুসম্পর্কিত ঘটনাগুলো ছিল অসীম রহস্যে ভরা। এ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস থেকেই পরবর্তীকালে জন্মান্তরবাদ, পরলোকতত্ত্ব, আত্মা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণার জন্ম হয়েছে। অতৃপ্ত আত্মার প্রতিশোধস্পৃহা, অন্যবস্তুতে লুকোনো আত্মার ক্রিয়াকলাপ (দ্রঃ, গুল্মকুমারী) ইত্যাদির পাশাপাশি প্রেতবিদ্যা, ওঝা ইত্যাদির সৃষ্টি। আদিবাসী সমাজের লোককথায় স্মৃতি, শ্রুতির মধ্যদিয়ে জন্মান্তরবাদী চিন্তাধারাগুলো এভাবেই ফুটে উঠেছে।

যে 'দাস-প্রথা' একদিন অতিপ্রচলিত ছিল, আজ তা রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে তিরোহিত। কিন্তু তার দুঃখময় যন্ত্রণার স্মৃতি ধরা রয়েছে খুব সূক্ষ্মভাবে এখানকার লোককথায়। এখানকার জনজাতি গোষ্ঠীও যে এর দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েছিল, বিশেষ করে শাসককুল সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতো এবং প্রজাকুলের ভাগ্যে নির্দ্ধারিত ছিল যাবতীয় দুঃখময় পরিণতি, তারই আভাস দেয় কিছু কিছু কাহিনী (দ্রঃ, কথা বলো না)।

এই সব আভাস প্রত্যক্ষভাবে না থেকে প্রতীক ও রূপকের আড়ালে থেকে উপহার দেয় অবিচার, বেদনা, অত্যাচার আশা আকাঙ্খার রূঢ় বাস্তব ছবি, সামাজিক ইতিহাস ও রীতিনীতির খণ্ড চিত্র। আদিবাসী সমাজে বর্ণপ্রথার কোনো স্থান না থাকায় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর উপস্থিতি (দ্রঃ, প্রতিজ্ঞা) প্রতিবেশী বাঙালী সমাজের প্রভাবের স্মৃতি বহন করে। রাজপুত্র রাঙিয়া অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সাদাহাতি ও রাক্ষসী চাকবাইয়ামাকে হত্যা করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে। তারপর রাজকন্যাকে বিয়ে করে অর্দ্ধেক রাজত্ব সহ সেখানেই সুখে দিন যাপন করতে লাগলো। অর্থাৎ সে আর পিতার রাজ্যে ফিরে গেলো না। এটা হয়তো ত্রিপুরার মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই ভুলে যাওয়া একটি চিত্র। রাজকন্যা পিতার সম্পদ পেলো। রাজপুত্রের বোন হয় তো তার পিতার সম্পদ পাবে, তাই-আর তার ফেরা হল না।

বিবাহপূর্ব মাতৃত্ব এক সময় খুবই স্বাভাবিক ঘটনা বলে স্বীকৃত হলেও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা অনভিপ্রেত বলে বিবেচিত হয়ে নিন্দিত হ'ল। দেবত্ব আরোপের ফলে তা আর নিন্দিত হয় না এবং অতিলৌকিক একটি ছবিও ধরা পড়ে। (দ্রঃ, চাঁদের ছেলে)
।

আদিম আদিবাসীজীবনে নরমাংসাহারের যে রীতি প্রচলিত ছিল, তারই অবশিষ্ট স্মৃতিটুকু ধরা পড়ে "ছিপিংতুই মাইরুংতুই" গল্পে, রাজবাড়ীতে মাইরুং-এর মা ও ভাই কর্তৃক মাইরুং-এর মাংস খাওয়ার মধ্যে।

আরণ্যক জীবনে বেঁচে থাকাটাই জীবনের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বাঁচার তাগিদেই দুর্বল সবলের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। কিন্তু সবলের জন্য দুর্বলের জীবন বিপন্ন হলে বন্ধুত্ব মুহূর্তে শত্রুতায় পর্যবসিত হয়েছে। অসম দ্বন্দ্বে বুদ্ধিই দুর্বলের জীবন রক্ষার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের স্মৃতিই চিত্রিত "মুরগীর পিঠে" তে মুরগী কর্তৃক বিড়াল হত্যার মাধ্যমে। আদিম শিকার জীবন স্থায়ী জীবনের অন্তরালে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তারই আভাস বয়ে আনে কিছু কিছু আচরণ। এক হাতে বলশালী শূয়োর মেরে চেঁছে-ছুলে রান্না করে খাওয়ানোর মধ্যে যে শক্তি পরীক্ষার প্রসঙ্গটি (দ্রঃ, কথা বলা আংটি) তা এখানকার মানুষের আদিম শিকার জীবনেরই ঐতিহ্যাশ্রিত।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় অন্যান্য লোককথার প্রভাব

লোককথা প্রচরণশীল বলেই বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও একই ধরণের লোককথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। সংস্কার, বিশ্বাস, জীবনযাপন পদ্ধতির সাদৃশ্য ফুটে ওঠে লোককথাগুলোর মধ্য দিয়ে। কখনো একেকটি লোককথা ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও একইভাবে প্রচলিত দেখা যায়, কখনোবা এদের মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য থাকে। ত্রিপুরার লোককথার সঙ্গেও অন্যান্য লোককথার এমন সাদৃশ্য থাকার ফলে মনে হ'তে পারে যে এখানকার কাহিনীগুলো অন্যান্য লোককথার প্রভাব বহন করছে।

বিশেষতঃ সাদৃশ্যসূচক বাংলা লোককথাগুলোর ক্ষেত্রে বলা যায়, দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙালী জনজীবনের সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতি মানুষের যোগাযোগের ফলে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় বাংলা লোককথার প্রভাব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

রাজন্য ত্রিপুরার তৎকালীন রাজধানী "পুরাতন হাবেলী" তে এখনো চতুর্দশ দেবতার পুজো হয়ে থাকে প্রতি আষাঢ় মাসে। সেখানে কোনো প্রতিমা পুজো হয় না। পরিবর্তে চতুর্দশ মুণ্ড প্রতীক হিসেবে পুজো পান। লোকবিশ্বাস, চতুর্দশ দেবতা কোনো কারণে অভিশপ্ত হ'বার ফলে এক দুর্ধর্ষ মোষের হাত থেকে নিস্তার পাবার উদ্দেশ্যে এই রাজ্যের সতীরাণীর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন। এই সম্পর্কিত কাহিনীটিই "রক্তপিপাসু দেবতা"য় পাওয়া যায়। মোষটিকে বধ করার পর রানীমা দেবতাদের রাজবাড়ীতে স্থান দিলেন এবং নিজ হাতে প্রতিদিন দেবার্চনা করতে লাগলেন। দুপুরবেলা ভোগনিবেদন শেষে প্রসাদ গ্রহণ করেন মা ও ছেলে। ইতিমধ্যে শিশুপুত্রটি দিনদিন রুগ্ন হয়ে যেতে লাগলো। পরে দেখা গেল যে দেবতারা তাঁদের রক্তপিপাসা মেটান ছাগলে রূপান্তরিত রাজপুত্রের শরীরের রক্ত চুষে খেয়ে। ঘটনাটি স্বচক্ষে

দেখে রাণীমা দেবতাদের তিরস্কার করেন ও এতে দেবতারা লজ্জিত হন। পরে রানীমা রোজ দেবতাদের রুধির ভোগের জন্য পাঁঠাবলির ব্যবস্থা করেন।

এই লোককাহিনীটিতে বাংলায় উপাসিত লৌকিক দেবতাসম্পর্কিত একটি কাহিনীর সাদৃশ্য দেখা যায়। (১২)

বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী বরাকরের কাছে কল্যাণেশ্বরী দেবীর থানেও ত্রিপুরার চর্তুদশ দেবতার মতোই কোনো প্রতিমা নেই। তবে তিনি বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রস্তরে পূজিতা হ'ন। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস অনুযায়ী সেখানে প্রতিদিন একটি করে পশুবলি দিয়ে পূজো করা হ'ত। একদিন কেউ বলির পশু নিয়ে না আসায় পুরোহিত বিনা পশুবলিতেই পুজো সম্পন্ন করলো। দেবীর রক্তপিপাসা সেদিন মিটলো না।

দেবীর পুরোহিত সপরিবারে মন্দির প্রাঙ্গনেই বাস করতো। তাঁর একটি আটবছর বয়েসী সুস্থসবল মেয়ে ছিল। মেয়েটি দুপুরবেলা নিয়মিত প্রসাদ খেতে মন্দিরে যেতো। সেদিনও গেছে মন্দিরে। ওর নধরকান্তি দেখে দেবীর রক্তপিপাসা বেড়ে গেল এবং কিছুতেই লোভ দমন করতে না পেরে তাকে গিলে ফেললো। দুপুর পেরিয়ে গেলেও মেয়েটির সন্ধান না পেয়ে পুরোহিত মন্দিরে এসে দেখলো শাড়ীর অগ্রভাগটি দেবীপ্রতিমার মুখে লেগে আছে। পুরোহিত সবই বুঝে ফেললেন। দেবী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এখানে দুটো কাহিনীতেই দেবতাদের রক্তের প্রতি পিপাসা এবং ছোট শিশুর (বাংলায় কন্যা, ত্রিপুরায় পুত্র) রক্তপান রয়েছে। যদিও এই ধরণের লোককথা খুবই কম পাওয়া যায়, তবু সাদৃশ্যটি লক্ষ্যনীয়।

ত্রিপুরার "বানরবর" গল্পটিতে একটি বাংলা লোককথার (চানপুর, বড়িশা থেকে সংগৃহীত) ছায়া দেখা যাচ্ছে। সেখানেও বানর এক বামুনের মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে বিয়ে করে। বানর ও মানবীর ছেলে হয়। পরে সে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে শ্যালকের হাতে নিহত হয়। দুটো কাহিনীতেই বানরের দুঃখের সঙ্গে সকলের একাত্মতা রয়েছে। গল্পটির নাম "বানরের বউ"। (১৩)

ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুরের একটি লোককথায় দেখা যায় এক বাড়ীতে তিনটে মোরগ তাদের শেয়ালমামাকে রাতে থাকতে দেয়। কিন্তু শেয়াল পরপর দুই রাতে চালাকি করে দুই ভাগ্নেকে খেয়ে নেয়। শেষ মোরগকে যেদিন খেতে গেল শেয়াল, সে বললো, "মামা, তুমি চোখ বোজ। আমি তোমার মুখে ঢুকছি"। শেয়াল চোখ বোজার সাথেই মোরগ উড়ে পালালো। এখানে বুদ্ধির সাহায্যে মোরগ বেঁচে গেল। ত্রিপুরার "মুরগীর পিঠে" তেও এভাবে মুরগী বাচ্চাদের নিয়ে বুদ্ধির সাহায্যে বিড়ালের হাত থেকে রক্ষা পায়। তবে পূর্ববর্তী গল্পের মতো এই গল্পে বিড়ালের ভাগ্যে একটি শিকারও জোটেনি। আদিবাসীদের অতি পরিচিত জীব মুরগী, দুর্বল জীব। তার পক্ষে বুদ্ধিমান হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বেড়াল চতুর জীব হলেও মুরগীর কাছে মৃত্যুর মাধ্যমে তার পরাজয় ঘটে। মনে হয় এটা কোনো বর্হিপ্রভাবের ফল।

মানুষের পাখি হয়ে যাবার যে কাহিনী পাই, "নাঐ পাখির গল্পে" ও "কথা বলোনা"তে, তারই একটি চিত্র দেখি বাংলাদেশের এক অতিপ্রচলিত কাহিনীতে। পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের কাহিনীটি এরকম ঃ এক গৃহস্থের বাড়ীতে আত্মীয় এলে শ্বাশুড়ী বধূকে ভালো করে রান্না করতে বললো। কিন্তু বধূর রান্নায় তেমন দক্ষতা না থাকায় সে তরকারীতে বেশী পরিমাণে হলুদ দিয়ে ফেললো। তরকারীর রঙ ফেরাতে না পেরে বধূ বিরক্ত হয়ে তরকারীশুদ্ধ হাঁড়িটি নিজের মাথায় ভেঙে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সে হলুদবর্ণ বিশিষ্ট একটি পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে গেল। হাঁড়ির তলার কালি মাথায় লেগেছিল বলে পাখিটির মাথার রঙ হল কালো। কুটুম্বের জন্য তার এই অবস্থা হ'ল বলে সে কুটুম্বের কথা কোনোদিন ভুলতে পারলোনা এবং আজো সে 'ইষ্টিকুটুম' 'ইষ্টিকুটুম' বলে ডেকে যায়। (১৪)

"কথা বলোনা" পাখিটিও তার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের কথা ভুলতে পারেনি বলেই এখনো এভাবে ডেকে যায়। 'নাঐ পাখির গল্পে"র অনুরূপ একটি কাহিনী নাগাল্যাণ্ডের জেমি-নাগা আদিবাসীদের মধ্যেও রয়েছে। (১৫)

এদের গল্পটি এইরকম ঃ অনেক অনেকদিন আগে একটি ছোট্ট ছেলে তার সৎমায়ের নির্দয়তার শিকার হয়ে ভালোভাবে খেতেও পেতোনা। উপরন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হ'ত। ওর অন্য বন্ধুরা যখন পাহাড়ী ঢালে খেলা করে বেড়াতো, তখন ওকে ঘরে বন্দী থাকতে হত। এছাড়া মায়ের বকুনি তো ছিলোই। কিছুদিন পর জুমচাষ করতে যেতে হলো তাকে। সারা দুপুর কাজে ব্যস্ত থেকে ইঁদুর ইঁদুর গন্ধওয়ালা ভাত তরকারী বন্ধুদের সামনে খেতে তার ভারী লজ্জা করতো। বন্ধুরা ওকে একসঙ্গে খেতে ডাকলেও সে খেতোনা। একদিন বিকেলে বাড়ী ফিরবে ওরা, এমন সময় ও বন্ধুদের কাছে ওদের সুন্দর জামা চাইলো। ওরতো সুন্দর জামাকাপড় নেই, তাই বন্ধুদের সুন্দর জামাকাপড় পরে দেখবে কেমন লাগে তাকে দেখতে। বন্ধুরা খুশী হয়ে ওকে ওদের পোষাক দিলে সেটা গায়ে দিয়ে একটু উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে দুদিকে দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে ও বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, "অনেক দূরে উঁচুতে, সাদা মেঘের দেশে সবুজ বনের গভীরে ধনেশ পাখি হয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। আর পাখি হয়ে যাবার পর যদি তোমাদের সঙ্গে দেখা নাও হয়, যদি পৃথিবীর মানুষের খুব কাছাকাছি না-ও থাকি, তবু আমি তোমাদের মনে রাখবো"। একথা শুনে বন্ধুরা কষ্ট পেলো খুব। সে আবার বললো, "কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কিছুদিন পর আবার গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে যাবো। তখন আমার ডানাদুটোর আওয়াজ পাবে, মিষ্টি গানের মতো ডানার শব্দে মিষ্টি গান ভেসে আসবে"।

ছেলেটি সুন্দর পোষাকে ঢাকা দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিলো ডানার মতো করে। মিলিয়ে গেল মেঘের রাজ্যে। সে হয়ে গেল দূর আকাশের, সবুজ বনের পাখি।

বেশ ক'বছর কেটে গেলে একটি ধনেশ পাখি উড়ে এলো সেই গাঁয়ের আকাশে। তাঁর শরীর থেকে একটি পালক ঘুরে ঘুরে নেমে এলো নীচে, তার বন্ধুদের মাঝখানে। উপরে

ডানার শব্দে তখন মিষ্টি গান ভাসছে। ছেলেটির সৎ-মাও এসেছিলো। সে একটা পালক চাইলে ধনেশ পাখি উপর থেকে নোংরা ফেলে দিলো আর মা চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে গেল।

ত্রিপুরার লোককথাটিতেও সৎমা ও পরিবারের অন্যদের নির্দয়তার ফলেই মেয়েটি (খুমতি) খাঁচাবদ্ধ অবস্থায় নীল আকাশে উড়ে বেড়ানো নাঐ পাখিদের কাছে নখ, পালক ইত্যাদি চেয়েছিল, নাঐ পাখির মত আকাশে উড়ে যাবার জন্য। অত্যাচার ও বন্ধনমুক্তির স্পৃহা দুটো কাহিনীতেই ছেলে ও মেয়েটিকে পাখি হয়ে উড়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছে। দুটো গল্পেই দেখা যাচ্ছে নাঐ এবং ধনেশ অত্যাচারী সৎমায়ের এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের উপরে উপর থেকে নোংরা ফেলে দিয়েছে। জনশ্রুতি নাঐ পাখিরা বৎসরে একবার আসে। পরিযায়ী পাখি হ'তে পারে। আকৃতিতে ছোট বাজপাখির মতো। কাহিনীর গঠন অভিপ্রায় দুই অঞ্চলেই অভিন্ন বলে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হ'তে পারে।

বাংলাদেশেরই ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত "বিচার" নামক একটি কাহিনীতে দেখা যায় ত্রিপুরার উপজাতি কাহিনী "বিচারে"র সাদৃশ্য। একটি জলায় পানিখাউরী খাবার জোগাড় করে এবং বাচ্চাদের জন্য জমায়। ওদিকে পরখাউরী সব মাছ খেয়ে নেয়। বিচারের জন্য অবশেষে রাজার কাছে যাওয়া হ'লে রাজা সব কিছু জেনে নিয়ে প্রকৃত দোষীকে শাস্তি দেন। (১৬) নীতিপরায়ণ শাসকের সুবিচার দুটো কাহিনীরই উপজীব্য বিষয়। সরলপ্রাণ খেটে খাওয়া মানুষেরই প্রতিনিধি ত্রিপুরার লোককথার আদিবাসী বিধবা ও পানিখাউরী পাখি। সমাজমানসের চিত্রও যেন অভিন্ন। এছাড়া পান্তাবুড়ীর গল্পের সঙ্গেও মেটিফ ও ঘটনাপ্রবাহে মিল রয়েছে। সেই কাহিনীটি এরকম ঃ (১৭) এক পান্তাবুড়ী পান্তাভাত খেতে ভালোবাসতো। চোর রোজ ভাত খেয়ে যায় বলে বুড়ী রাজার কাছে নালিশ করতে গেল। পথে শিঙমাছ, বেল, গোবর, ক্ষুর সবাই ওকে বাড়ী ফেরার সময় ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললো। রাজাকে না পেয়ে বাড়ী ফেরার পথে এদের নিয়ে এসে পান্তাবুড়ী ক্ষুরকে ঘাসে, গোবরকে সিঁড়িতে, মাছকে পান্তাভাতে ও বেলকে উনুনে রেখে দিলো। ওদিকে রাতে চোর এসে ভাতে হাত দিতেই মাছের খোঁচা খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে গেল উনুনের কাছে। সেখানে বেল ফেটে চোখেমুখে লাগলো। ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে সিঁড়িতে পিছলে গিয়ে চোর গোবরে বসে পড়লো। ওদিকে ক্ষুরে পা কেটে গেল। তখন সবাই এসে চোরকে খুব মারলো।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে 'বিচার' গল্পটিরই অনুরূপ আরো একটি গল্প রয়েছে। কাহিনীটির গঠন কাঠামো একেবারেই অভিন্ন। সেই গল্পটিতে দ্বন্দ্বের শুরু 'কচ্ছুয়া ব্যাঙ' ও 'সুদতটুপী'র মধ্যে। পরবর্তী সময়ে একইভাবে দুটো কাহিনী একই পাত্র-পাত্রীকে ঘিরে এগিয়ে চলে শেষ পর্যন্ত।

আসামের একটি প্রচলিত লোককথার নাম, "ব্যাঙের পিঠে দাগ কেন?" (১৮) এখানে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় একটি জিনিষ যে, দু জায়গার কাহিনীতেই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। গল্পটি এরকম ঃ একদিন একটি বাদুড় গাছে বসে ফল

খাচ্ছিল। এমন সময় একটি ব্যাঙ ডেকে উঠলো। ভয়ে বাদুড় হঠাৎ উড়ে গেলে কাঠবেড়ালী ভয় পেলো ও তার হাত থেকে একটি ফল গিয়ে পড়লো হরিণের গায়ে। হরিণ দৌড়ে পালাতে গেলে ধাক্কা লাগলো বাঁশের গায়ে। বাঁশ গিয়ে লাগলো কাঁকড়ার গায়ে। ওর পা গেল ভেঙে। ব্যাথায় সে একটি সাপের লেজে কামড়ে দিলো। সাপ রেগে বাসায় গিয়ে ডিমগুলো সব খেয়ে ফেললো। এবার পাখি জনতার আদালতে এর বিচার চাইলো। সাপ বললো যে, সে নির্দোষ, কাঁকড়ার জন্যই সে ডিম খেয়েছে। কাঁকড়াকে ডেকে আনা হ'লে সে বাঁশকে দায়ী করলো। এমনি করে করে ব্যাঙই যে আসল দোষী সবাই তা বুঝলো। সবাই তখন গরম ছাই এনে ব্যাঙের গায়ে ঢেলে দিলো শাস্তিস্বরূপ। এইজন্যই ব্যাঙের গায়ে এমন উঁচুনিচু দাগ।

ত্রিপুরার 'বিচার' গল্পেও ব্যাঙই প্রকৃত দোষী বলে বিবেচিত হওয়ায় সাত্রীরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে ব্যাঙের কোমর ভেঙে দিয়েছে। সেই থেকে ব্যাঙ আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারেনা। একই কাহিনী মিকির ও কুকী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরই মধ্যে এই কাহিনীটির বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়।

ত্রিপুরার লোককথা 'ছাতিম গাছের কাহিনী'র সঙ্গে আসামের মিরি উপজাতিগোষ্ঠীর লোককথা "বিদ্যুৎ ও বজ্র" নামক কাহিনীর যেমন মিল রয়েছে, তেমনই মিল রয়েছে কাছাড়ী লোককথা রওনা-রাওনির। মিরি ও কাছাড়ী লোককথা দুটোতেই ত্রিপুরার লোককথাটিরই মতো ভাইয়ের মনে বোনের প্রতি অবৈধ কামনার জন্ম হয়েছে। যার ফলে অনিচ্ছুক বোন নীল আকাশে চলে গিয়ে মুক্তি পায়। সুন্দর বোনের পালিয়ে যাওয়ার মুহূর্তটিই এদের কাছে বিদ্যুতের চমকানি এবং বোনের জন্য ভাইয়ের কান্নাই, বাজ পড়ার আওয়াজের মত শোনায়। এই কাহিনীটি পশ্চিমভারতেও প্রচলিত রয়েছে। (১৯)

দৈহিক দিক থেকে দুর্বল যে তাকে শক্তিমান সব সময়েই দম্ভ দেখিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। অপমান করে। দুর্বলের আত্মাভিমান আহত হ'লে বুদ্ধির সহায়তায় সে জয়ী হয়। এই ভাবনাটিই "সজারুর বুদ্ধি" নামক লোককথাটিতে পাওয়া গেছে। এরই সঙ্গে সাযুজ্য পাওয়া যাচ্ছে নোয়াখালি, বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত "হাতি ও কোলাব্যাঙ" নামক কাহিনীতে। (২০)

একটি ব্যাঙ একদিন নদীর পাড়ে বসে মাছরাঙার সঙ্গে সুখদুঃখের কাহিনী বলছিলো। এমন সময় একটি হাতি তাকে ডিঙিয়ে গেল। রেগে ব্যাঙ তাকে বললো, "কুলা কানি মূলা দাঁতী ডেঁই গেলি মোরে"। এতে হাতি তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, "চুপ করে হেচ্ছেইর্‌গা হেন্দি (ছেঁচড়ে চলে যে), ধর্মে বাঁচাইছে তোরে"।

ব্যাঙ এতে অপমানিত হয়ে হাতিকে সাজা দেবার কথা চিন্তা করলো। অবশেষে অন্যদের সহায়তায় ব্যাঙ হাতীকে দেশছাড়া করলো। দুটো গল্পেই সবলের প্রতিভূ হাতি। এই গল্পটিতে হাতি দেশছাড়া হয় ও সজারুর বুদ্ধি'তে হাতি যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই পালালো। আদিবাসী গল্পে সজারু শক্ত কাঁটা দেখিয়ে হাতিকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। দুটো গল্পেরই উৎস মনে হয় খুবই কাছাকাছি অঞ্চলে।

প্রাচীনকালে 'গারো'রা নিজেদের 'আচিক্' নামে অভিহিত করতো (২১) প্রাচীনকালে আচিক্ আসোংদের মধ্যে এক ধনী সর্দার বাস করতো। তাঁর একটিই মেয়ে ছিল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অনুসারে পিতার সব সম্পত্তি মেয়েটি পেলো এবং সঙ্গে কোনো দেবীর কাছ থেকে পূর্বপুরুষের পাওয়া একটি রেশমী যাদুকাপড়ও পেলো। দেবীর নির্দেশ ছিল কাপড়টি যেন মন্ত্রপাঠ করে ছোঁয়া হয়। নয়তো যে ছোঁবে সে পাখি হয়ে যাবে। একদিন বাবার দিকের এক খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। নতুন বর এটি জানতোনা। একদিন মেয়েটি বেরোবার আগে কাপড়টি রোদে দিয়ে বরকে বলে গেল যেন সে এটি বৃষ্টি এলেও না তোলে।

ওদিকে সত্যিই বৃষ্টি এলো। জলে কাপড়টি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে বর যেমনি এটি তুলতে গেল, ছোঁয়ামাত্রই সে একটি বিরাট সুন্দর পাখিতে পরিণত হয়ে গেল। ময়ূর। তার দেহের রঙের কি বাহার। ওদিকে মেয়েটি বাড়ী ফিরে এসে স্বামীর বদলে দেখলো পাখিকে। এতে সে সব কিছু ভুলে মন্ত্র না পড়েই কাপড়টা ছুঁয়ে ফেললো, আর সেও হয়ে গেল একটি ময়ূরী। আজও যখন আকাশে কালো মেঘ ঘনায়, ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে, মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকায়, ময়ূর-ময়ূরী উতলা হয়ে চীৎকার করে উঠে, গলা তুলে ডেকে উঠে।

"স্বর্গের ফুল রান্না" গল্পটিতেও আমরা এই কাহিনীর মিল খুঁজে পাই। দেবতার ফুল রান্না, দেবতাকে নিবেদন না করে মানুষের ব্যাবহার করা উচিত নয়। তাছাড়া সে ফুল স্বর্গের ফুল। দেবতার ফুল, জেনেও স্ত্রী স্বামীকে গাছ থেকে ফুল তুলতে বাধ্য করে এবং ট্যাবুভঙ্গ করে মাথায় ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্বামী হুলক্ হয়ে যায়। পরে স্ত্রীও 'মুফুক' (গোধিকা) হয়ে যায়। মানুষের মানবেতর প্রাণীতে পরিণত হওয়ার এই অভিপ্রায়টি দুটো গল্পেই রয়েছে। দুটো কাহিনীর কাঠামোতেও সাদৃশ্য রয়েছে।

অন্যদিকে খাসিয়াদের একটি লোককথায়ও 'ময়ূর কি করে সুন্দর পালক পেলো', তার কাহিনী রয়েছে। (২২)

"কথা বলোনা" কাহিনীতে বাংলার "ইষ্টিকুটুম" কাহিনীটির সাদৃশ্য রয়েছে। সেখানে এক চাষীবউ ইষ্টিকুটুম পাখি হয়ে আকাশে উড়ে যায়। কথা বলোনা পাখির মতো সেও আজো মানুষের দ্বারে দ্বারে "ইষ্টিকুটুম, ইষ্টিকুটুম" বলে ডেকে যায় কোনো অতিথি আসার আগে।

"ছাতিম গাছের কাহিনী"তে সাঁওতালী লোককথার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। ভাই-বোনের বিয়ের প্রসঙ্গে এই সাদৃশ্যটুকু লক্ষ্যনীয়। এককালে ভাইবোনের বিয়ের রীতিটি প্রচলিত থাকলেও সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অনেক লোককথায় তার একটি স্মৃতি রয়েও গেছে। সাঁওতালদের (২৩) আদি পিতামাতা পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ী। নিজেরা হাঁসীর ডিম থেকে জাত দুই ভাইবোন বলে, তারা ঠিক করলো যে, তাদের ছেলেমেয়েরা যেন এরকম অসামাজিক কাজ না করে। এই উদ্দেশ্যে মা তার সাত মেয়েকে ও বাবা তাঁর সাত পুত্রকে নিয়ে দুই বনে চলে গেল। কিন্তু পরে দেখা যায় পুত্রেরা বাবার নিষেধ অমান্য করে

বোনেরা যে বনে থাকে, সেই বনে গিয়ে বোনদের সঙ্গে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। পরে সম্পূর্ণ ঘটনা জেনে এই ছেলেমেয়েদের মা এদের বিয়ে দেয়।

ত্রিপুরার "ছাতিম গাছের কাহিনী"তে ছেলেটির ইচ্ছানুক্রমে বিয়ের সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ ছিলো। তবে এই রীতি নিষিদ্ধ হ'বার আভাস পাওয়া যায় মেয়েটির মুক্তি পাবার ইচ্ছের মধ্যে। অবশেষে সে আশ্রয় পায় ছাতিম গাছের মাথায়। বৃক্ষের আশ্রয়দানের কাহিনীটির সঙ্গে একটি খাসিয়া গল্পেরও সাদৃশ্য রয়েছে। (২৪) "ইউ কংগউয়িংগ" গল্পে রিতেং গাছ রাইকে আশ্রয় দেয়।

এই প্রসঙ্গে ঋকবেদের দশম মণ্ডলের দশমসূক্তের যমজ ভ্রাতা ভগিনী যম-যমীর প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা যায়। সেখানে বোন যমী নির্জন দ্বীপে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য যমকে আহ্বান জানাচ্ছেন ঃ

ও চিৎসখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরুচিদর্নবং জগম্বান।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ।।

(ঋগ্বেদ ১০/১০/১)

((যমী যমকে বলছেন) — বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার সুন্দর এক নাতি জন্মিবে।)

হিমালয় অঞ্চলে বসবাসকারী অনেক ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি অটুট রাখার জন্য এই প্রথা চালু রয়েছে।

খাসিয়া গল্প "ইউ কংগউয়িংগে" আছে একটি অবিবাহিত যুবক তাঁর বিবাহিত বোনের অঙ্গহানি করলে মেয়েটি লজ্জায় পরিবার পরিজনদের কাছে আর ফিরে যেতে চাইলো না। অবশেষে অরণ্যের রিতেং গাছ নিজের বুক চিরে মেয়েটিকে আশ্রয় দিলো। এই গল্পটিতেই দেখা যায় মেয়েটির স্বামী মেয়েটির দুঃখে ময়ূরে পরিণত হয়ে যায় এবং ময়ূর হয়ে গাছে মেয়েটির সঙ্গেই বসবাস করতে থাকে। খাসিয়াদের এই কাহিনীটির শেষ অংশটির সঙ্গে ত্রিপুরার "স্বর্গের ফুল রাস্না"র শেষাংশের যেমন মিল রয়েছে তেমনই "ছাতিম গাছের কাহিনী"তেও ছাতিম গাছ মেয়েটিকে সহায়তা করেছে মেঘের রাজ্যে চলে যেতে।

'ছিপিংতুই মাইরুতুই' গল্পে নোয়াখালি (বাংলাদেশ) অঞ্চলের "তিলসুন্দরী চালসুন্দরী" নামক লোককথাটির মিল দেখা যাচ্ছে। (২৫)

এক চাষী বউ একটি মেয়ে রেখে মারা গেলে চাষী বিয়ে করে। সেই বৌয়েরও আবার একটি মেয়ে আছে। সতীন মেয়ের থাকার জায়গা হ'ল তিলের ডোল যাতে দেখতে সে কালো হয়, আর নিজের মেয়েকে রাখলো চালের ডোলে। তাই সতীন মেয়ের নাম হ'ল তিলসুন্দরী আর নিজের মেয়ের নাম হ'ল চালসুন্দরী। ছোট মেয়ে চালসুন্দরী খায় দায় ঘুরে ফেরে, দেখতে

সুন্দর স্বাস্থ্য ভালো, আর বড় মেয়ে তিলসুন্দরীকে খেতে দেয়া হয় পোড়া ভাত, পচা তরকারী। তাকে পাঠানো হয় দূরে কাঠ কুড়াতে, ছাগল চরাতে। তাঁর আর দুঃখের শেষ নেই। একদিন এক রাজকুমার শিকারে গিয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হ'ল। তিলসুন্দরী রাজকুমারকে তাঁর খাবারটুকু খেতে দিলো। রাজকুমার ওর দুঃখের কাহিনী শুনে ওকে বিয়ে করে নিয়ে যায় রাজবাড়ীতে। ওদিকে সৎমা ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরছে। একদিন রাজকুমার তিলসুন্দরীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে বেড়াতে এলে সৎমা মেয়েটির চুলে হলুদপাখির খুলির হাড় গুঁজে দিলে সে হলুদপাখি হয়ে উড়ে যায়। ওদিকে চালসুন্দরীকে তার মা সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলো রাজকুমারের সঙ্গে। রাজকুমার যাচ্ছে চালসুন্দরীকে নিয়ে আর তিলসুন্দরী বারবার সামনে এসে বলছে।

"এরণ রাজা ভেরণ হইছে, হালী (শালী) লই হাগল (পাগল) হইছে....." ইত্যাদি।

একসময় রাজকুমার পাখিকে ধরে ফেলে মাথায় হাত বোলালে মাথায় লাগানো খুলির হাড় খুলে পড়ে যায় ও তিলসুন্দরী সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে যায়। তারপর রাজকুমার সবকিছু জেনে চালসুন্দরীকে কেটে হাঁড়িতে ভরে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলো। হরিণের মাংস ভেবে মা খুব খুশী হয়ে রান্না করে খেলো। পরে রাজকুমার এসে সত্যি ঘটনা জানালে মা মেয়ের শোকে কাঁদতে কাঁদতে মরে গেলো।

'তিলসুন্দরী চালসুন্দরী' ও 'ছিপিংতুই মাইরুংতুই' কাহিনী দুটোর মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য চোখে পড়ার মত। মনে হয় একই গল্প দুটো জাতিগোষ্ঠীর জীবনে ভিন্ন আবহে সম্প্রচারিত হয়েছিল।

নিয়তির দুর্নিরীক্ষ্য গতিতে রানীকেও হতভাগ্য জীবন যাপনকরতে হয় "ছিপিং তুই মাইরুংতুই"- এ। রানীর বিড়ম্বনা দূর করতে এগিয়ে আসে রাজার পোষা হরিণ। হরিণের কাছে রানীর দুর্ভাগ্যের কথা শুনে রাজা মাইরুংকে তলোয়ার দিয়ে দুখান করে ফেললেন।

বাংলা লোককথা "কাজলরেখা"তেও দেখা যায় কাজলরেখা রানী হয়েও ভাগ্যবিড়ম্বনায় দাসীর মত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। পরে ধর্মমতি শুকপক্ষী কাজলরেখার পরিচয় প্রকাশ করে দিলে রাজপুত্র নকল রানীকে দণ্ড দেন। বাংলা লোককথাটির স্পষ্ট ছায়া যেন দেখা যায় ত্রিপুরার লোককথায়। আরেকটি কাহিনী "চাঁদের ছেলে"তে দেখা যায় চন্দ্রকুমার একটু বড় হয়েই বহিঃপৃথিবীর আকর্ষণ অনুভব করে। এখানে ওখানে যেতে চায়, বাজার হাটে যেতে চায়। সেও অভিশপ্ত জীবনের জন্যই কোথাও যেতে পারেনা। অবশেষে মায়ের অনুমতি এবং বাবা চন্দ্রমাদেবের কাছ থেকে কিছু টাকা আর ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে একদিন সে এক রাজকুমারীর দেখা পায়। দুজন দুজনকে দেখে মুগ্ধ হ'ল, ভালোবাসলো। বাড়ী ফিরে এল, কিন্তু চন্দ্রকুমার ভারী আনমনা থাকে। মায়ের খুব চিন্তা হয় ছেলের জন্য। ওদিকে কুমারীকে নিয়েও মা-বাবার চিন্তার অন্ত নেই। একদিন ওদের বিয়ে হল ধুমধাম করে। হাতি-ঘোড়া সাজিয়ে, বাদ্যি-বাজনা বাজিয়ে। তারপর জামাই চন্দ্রকুমারকে রাজ্যভার হস্তান্তর করে রাজকুমারীর বাবা অর্থাৎ রাজা ও রাণী ভগবানকে ডাকার জন্য মনুনদীর তীরে মায়ানি

পর্বতে চলে গেলেন। স্বয়ং চন্দ্রমাদেব চন্দ্রকুমারকে বলে গেলেন, "তোমার বংশের রাজাগণ যুগ যুগ ধরে গৌরবের সঙ্গে প্রজাপালন করবে"।

বাংলা লোককথা 'মধুমালা'-র মদনকুমারও জন্মের পর (২৬) বারোবছর বন্ধ ঘরের ভেতর কাটিয়ে বহিঃ পৃথিবীর আহ্বান শুনতে পায়। চাঁদসূর্য দেখার অদম্য আকাঙ্খায় একদিন সেও লোক-লস্কর সঙ্গী-সাথী নিয়ে উজীরপুত্তুরকে সঙ্গী করে নদী-বন-পাহাড় পেরিয়ে পাহাড়বনে তাঁবু ফেললো। নিদ্রাপরী আর কালপরীর সাহায্যে মধুমালার সঙ্গে দেখা হ'ল তার। দুজন দুজনের জন্য উদাসী হয়ে উঠলো। দুজনের আংটি বদল হ'ল, হ'ল পালঙ্ক বদল। কিন্তু পরীরা রাত ভোর না হতেই মদনকুমারকে নিয়ে এল বনপাহাড়ের তাঁবুতে। দুজনে ঘুম থেকে উঠে একে অন্যকে না দেখে হাহাকার করে উঠলো। আহার নেই, নিদ্রা নেই মধুমালার মুখে শুধু কুমার, কুমার। ওদিকে মদনকুমারেরও আহার নেই, নিদ্রা নেই মুখে শুধু মধুমালা, মধুমালা। অবশেষে রাজা মেয়ের কান্না দেখে দেশে দেশে খবর পাঠালেন। এলো মদনকুমার। রাজারাণীর আনন্দ ধরেনা। সবকিছু উজাড় করে দিলেন মেয়ে জামাইকে। রাজ্যে পড়ে গেল ধূমধাম। বাদ্যি বাজনা বাজলো। রাজপুরী গমগম করে উঠলো। রাজা দণ্ডধর চারযুগে অমর হয়ে পুত্র, পুত্রবধূ নাতি, নাতকুড় নিয়ে রাজত্ব করলেন।

দুটো কাহিনীরই অন্তর্নিহিত রস বা ভাবব্যঞ্জনায় এক অনন্য সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

এখানকার " উইপোকা স্বামী" লোককথাটির অনুরূপ একটি লোককথা রয়েছে বাংলায়, 'কাছিম-মা' নামে। (২৭) সেখানে দেখা যায় সৎমা সতীনমেয়েকে দূর করার জন্য ব্যাঙের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। ব্যাঙ আসলে ছিল এক অভিশপ্ত রাজকুমার। মেয়েটি তাকে বিয়ে করার ফলে সে পরে তার আসল রূপ ফিরে পায়। এই রূপান্তর দেখে সৎ-মা হিংসেয় জ্বলেপুড়ে বন থেকে একটি ব্যাঙ ধরে এনে নিজের মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলো, সে-ও রাজরানী হবে এই লোভে। বনের ব্যাঙ ছিল আসলে এক সাপ, সে মেয়েটিকে খেয়ে ফেলে। মা তখন কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল। ত্রিপুরার গল্পে দেখি সতীন মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয় উইপোকার সঙ্গে যে ছিল আসলে অভিশপ্ত রাজকুমার। আর চাষী বৌয়ের নিজের মেয়ের বিয়ে হয় সাপের সঙ্গে। সে মেয়েটিকে খেয়ে ফেলে।

দুটো লোককথার অভিপ্রায়গত ও গঠনগত মিল দেখে একের অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হ'বার সম্ভাবনার কথা মনে হ'তে পারে।

অন্যদিকে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল আদিবাসীদের রূপকথা "সাবাই ঘাসের জন্মকথা"র সঙ্গে 'অজগর সাপের গল্প' লোককথাটির একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় আদিবাসী লোককথার মধ্যে সাঁওতালী লোককথাকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ (২৮) লোককথা বলে অনেকে মনে করেন। এদের উন্নত ও সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভারতের পূর্বাঞ্চলের অনেক জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করা হয়। "অজগর সাপের গল্পে" দেখা যায় অজগর সাপের স্ত্রী ঝরনার জলে নেমে গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'খুম্পুই' ফুলগুলো ফুটলো এবং গানের সঙ্গে

সঙ্গে জলও বাড়তে লাগলো। পায়ের গোড়ালিতে পড়ে থাকা জল মেয়েটির কোমর ছাপিয়ে উঠলো। আবারও গাইলো যখন, তখন জল গলা ছাপিয়ে উঠলো। তারপর একসময় মেয়েটি জলের তলায় তলিয়ে গেল। অচাই অজগরকে কেটে যেখানে ফেলেছিলো, সেখানেই 'খুম্পুই' (দোলনচাঁপা) ফুটেছিলো।

'সাবাই ঘাসের জন্মকথা' কাহিনীতেও (২৯) দেখা যায় সাতভাই এক যোগীর কথায় টলটলে জলভরা পুকুরের আশায় তাদের একমাত্র ছোটবোনকে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে নতুন মাটির লোটা নিয়ে পুকুরে নামতে বললো। উঁচু পাড়ে উঠতেই পুকুরের তলার মাটি থেকে জল উঠতে লাগলো। জলের কিনারে যেতেই জল এসে লাগলো তার পায়ের পাতাতে। লোটা হাতে নীচু হয়ে জল তুলতে গেল। তবু লোটা ডুবলোনা। আদরের বোন মিষ্টি সুরে পুকুরের মাঝখান থেকে গান গেয়ে উঠলো। ওদিকে গানের সঙ্গে সঙ্গে জল বাড়তে লাগলো। হাঁটু ডুবিয়ে জল এবার বোনের কোমর ডুবিয়ে দিল। তবু লোটা ভরলোনা। আবার বোন গান গাইলো। এবার জল গলা ডুবিয়ে দিল বোনের। লোটা তবু ভরলোনা। আবার সে গান গাইলো। শেষকালে জল বেড়ে বোনের চোখ কপাল চুল ডুবিয়ে মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল। আর তখুনি নতুন মাটির লোটা জলে ভরে উঠলো। আদরের বোন এবার জলের তলায় হারিয়ে গেল।

দুটো কাহিনীর এই সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। মনে হয় সাঁওতালী লোককথাটির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে ত্রিপুরার লোককথাটি।

দুটো কাহিনীতেই অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির সমাধি স্থল থেকে ফুলের জন্ম দেখা যায়।

''অজগর সাপের গল্পে''র দ্বিতীয় অংশটির সঙ্গে একটি বাংলা লোককথা ''সাতভাই চম্পা''র সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। (৩০)

অজগরের গল্পে ছোটরানী সন্তানসম্ভবা হ'লে অন্য সাতরানী মিছিমিছি ছোটরানীর ঘরের শিকল টেনে দিতো। ওদিকে রাজা এসে দেখতেন কিছুই নেই। এভাবে বারবার এসে বিরক্ত হয়ে আর এলেন না। ওদিকে ছোটরানীর ঘরে ফি-বছরে একটি মেয়ে আর সাতটি ছেলে হ'ল। রাজা কোনো খবরই পেলেন না। অন্যরাণীরা ছোটরানীকে পাথরকুচি, বাঁশের টুকরো ইত্যাদি জড় করে এনে দেখিয়ে বলতো এরাই তার ছেলেমেয়ে।

হুবহু এই কাহিনীটিই আমরা লক্ষ্য করি ''সাত ভাই চম্পা''তে। বড়রানীরা সেখানে ইঁদুর-বাদুড়ের ছানা এনে রাজাকে দেখিয়ে বলতো এরাই ছোটরানীর সন্তান।

রাজা রেগে গিয়ে ছোটরানীকে রাজ অন্তঃপুর থেকে বের করে দিতে বললেন। ছোটরানী ঘুঁটেকুড়ুনী দাসী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। ওদিকে বড়রাণীরা ছোটরানীর সাতটি ছেলেও একটি মেয়েকে জন্মের পর ছাইগাঁদায় পুঁতে দিয়েছিলো। রাজার ছেলে নেই, তাই রাজার বাগানে ফুল ফোটেনা। একদিন মালী দেখলো ছাইগাঁদার উপর এক পারুল গাছে সাতটি চাঁপা

ও একটি পারুল ফুল ফুটে আছে। মালীর কাছে খবর পেয়ে রাজা সেই ফুল পেড়ে আনতে বললেন।

মালী ফুল আনতে গেলে সাত চাঁপা মালীকে দেখে উপরে উঠে গেল ও বললো "আগে রাজা আসুক, তবে ফুল দিব"। রাজাকে দেখে ফুলেরা আরো উপরে উঠে গিয়ে বললো, "আগে বড়রানী আসুক, তবে ফুল দিব"। রাজা বড়রানীকে ডাকিয়ে আনলেন। এমনি করে একে একে ছয়রানী এলো। তখন ফুলেরা বললো, "আগে ঘুঁটেকুড়ুনী দাসী আসুক তবে ফুল দিব"। অনেক খোঁজ করে ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা গোবর মাখা হাত ঘুঁটেকুড়ুনী দাসীকে এনে হাজির করা হ'ল। আর তখনই সাতটি চাঁপা আকাশ থেকে নেমে এলো সাত রাজপুত্র হয়ে আর পারুল ফুলটির ভিতর থেকে এলো একটি রাজকন্যা। রাজা সবকিছু বুঝতে পারলেন। গর্ত করে কাঁটা বিছিয়ে বড়রানী সহ সবাইকে পুঁতে ফেলার আদেশ দিয়ে রাজা ছোটরানীসহ ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দে বাস করতে লাগলেন।

ত্রিপুরার গল্পটিতে দেখা যায় সাতটি ছেলে ও মেয়েরা বলেছিল যে - মা নদীর পাড় থেকে স্তনদুগ্ধ দিয়ে ছেলেমেয়েদের পেট ভরাতে পারবে সে-ই তাদের মা।

এই পার্থক্যটুকু ছাড়া অজগর সাপের গল্পে'র দ্বিতীয় অংশটির সঙ্গে "সাত ভাই চম্পা" কাহিনীর হুবহু মিল রয়েছে। আবহমানকাল ধরে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ত্রিপুরার আদিবাসীদের নিবিড় এক ঐক্যসূত্র স্থাপিত হ'বার ফলে মনে হয় বাংলা লোককথাটিই এখানে প্রভাব বিস্তার করেছে।

ত্রিপুরার 'বিগ্রাছা' নামক লোককথাটির সঙ্গে মিল রয়েছে হিমাচল প্রদেশের রূপকথা "একটি দয়ার কাজের ফল" এর (৩১)। বিষয়গত এবং কাহিনীগত দিক থেকে উভয় কাহিনীতেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুটো কাহিনীতেই আংটি চুরি যাবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ানগরী উধাও হয়ে যায়।

হিমাচল প্রদেশের রূপকথাটি এইরকম ঃ প্রাচীনকালে গাড়োয়াল প্রদেশের একরাজার দুই স্ত্রী ছিল। প্রথম স্ত্রীর ছয়টি পুত্র এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি পুত্র ছিল। বড়রানীর ছেলেরা ছোটরানীর ছেলের সঙ্গে একেবারেই মিশতো না। একদিন ছয়ভাই এর সঙ্গে ছোটরানীর ছেলেও বেড়াতে বেড়াতে একটি সুন্দর জায়গায় গেল। জায়গাটি দেখে সেখানে ওর নগরপত্তন করার ইচ্ছে জাগলো। সেকথা শুনে ছয়ভাই ওকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে বাড়ী চলে গেল। ওদিকে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে ছেলেটি একটি ইঁদুরকে স্মরণ করলো। এই ইঁদুরটিকে একবার সে প্রাণে বাঁচিয়েছিল রাজার লোকেদের হাত থেকে। তাই সে ছেলেটিকে বিপদে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এবার ইঁদুর এসে বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিল তাঁকে। মুক্তি পেয়ে সে বাড়ী না গিয়ে একটি অশত্থ গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়লো। শিব ও পার্বতী তখন যাচ্ছিলেন সেই পথ দিয়ে। তাঁদের কথোপকথন থেকে সে জানলো যে একটি পাখি রাতে এসে বসবে সেই গাছের ডালে। তার পেটে একটি আংটি থাকবে। তীর দিয়ে পাখিটিকে মেরে সেই আংটি থেকেই ওর

ভাগ্যোন্নতি হ'বে। তারপর মাঝরাতে সত্যিই একটি পাখি এসে গাছে বসলো। সে তাকে মেরে আংটি পেলো এবং হরপার্বতীর প্রার্থনা করলো। সঙ্গে সঙ্গে চারজন দৈত্যাকার লোক এসে সেখানে একটি বিরাট প্রাসাদ, অনেক অট্টালিকা ও পথঘাট নির্মাণ করলো মুহূর্তে। ক্রমে একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হ'ল সেই নগরী। আর ছেলেটি হ'ল তার রাজা। এক রাজকুমারীকে বিয়ে করে সে সুখে বসবাস করতে লাগলো। একদিন বড় রানীর ছয় ছেলে এই নগরপত্তনের খবর পেয়ে ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো এবং এক বিশ্বস্ত নারীদূতকে পাঠালো নগরপত্তন করার আনুষঙ্গিক খবর সংগ্রহ করার জন্য। মেয়েটির ছলনায় বশীভূত হয়ে রানী রাজার কাছ থেকে জেনে নিলেন যে আংটিই এর উৎসে রয়েছে। তারপর মেয়েটি রানীর কাছ থেকে আংটি হস্তগত করে ছয়ভাইএর বড়ভাইকে সেটি দিল। ওদিকে আংটি চুরি হবার সাথে সাথে মায়ানগরী উধাও হয়ে গেল চোখের নিমেষে। ছোটকুমার দেখলো রাজ্য ও রাজকন্যা কোথাও নেই। সে একা সেই শূন্যপ্রান্তরের মাঝে বাঁধা আছে একটা গাছের সঙ্গে।

ছোটকুমার বুঝলো যে তার নিজের ভুলেই এমনটি ঘটেছে। সে আবার ইঁদুরকে স্মরণ করলো। সে এসে বড়ভাইয়ের কাছ থেকে আংটি উদ্ধার করে। ছোটকুমার আবার আগের মতো আংটি সামনে রেখে হরপার্বতীর ধ্যান করতে থাকে। অবশেষে সেখানে গড়ে উঠলো আগের মতো মায়ানগরী। রাজা হয়ে কুমার ইঁদুরকে মন্ত্রী করলো ও তার কথামতো রাজ্যশাসন করতে লাগলো।

ত্রিপুরার "বিগ্রাছা" নামক লোককথাটিতে দেখা যায় "ছিরংগতি'র (আংটি) সাহায্যেই বিগ্রাছাও রাজপ্রাসাদের অধিকারী হয় ও রাজকন্যাকে বিয়ে করে। রাজকন্যা পরবর্তীকালে ছিরংগতি নিয়ে পালিয়ে গেলে ইঁদুরের সাহায্যেই বিগ্রাছা তা আবার ফিরে পায়। দুটো কাহিনীতেই এক অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

"মুরগীর পিঠে" লোককথাটির অনুরূপ কাহিনী আংগামী নাগা, আও-নাগা, অসমীয়া ও কাছাড়ীদের মধ্যেও রয়েছে। (৩২) কোনো ব্যাক্তিও বস্তুর বিভিন্ন রূপান্তরের যে চিত্রটি পাওয়া যায় এখানকার 'গুল্মকুমারী', 'অজগর সাপের গল্প' ইত্যাদিতে, তার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে আসামের লোককথা 'তেজিমালা' ও অঙ্গামী-নাগা লোককথা "Hunchbili"র। (৩৩) আঙ্গামী গল্পে দেখা যায় একটি স্ত্রীলোককে জলে ফেলে দিলে সেখানে একটি বাঁশগাছ জন্মায়। সেই বাঁশগাছের কড়ুল হলে সেটি কেটে রান্না করার সময় করুলটি রান্নার পাত্রের মধ্যেই চিৎকার করে উঠে। ত্রিপুরার 'অজগরের গল্প'-তেও দেখি অচাই অজগরকে কেটে যে ঝর্নার ধারে ফেলে সেখানে ফুটে ওঠে "খুম্পুই ফুল"। আবার 'গুল্মকুমারী" কাহিনীতে দেখা যায় গুল্ম কেটে যেখানে ফেলা হল সেখানে গাজিয়ে উঠলো লেবু গাছ, তারপর লেবু কেটে যেখানে খোসা ফেলা হ'ল সেখানে গজিয়ে উঠলো মস্ত লাউ গাছ।

"তেজিমালা"-র কাহিনীতে তেজিমালাকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে দেয়া হলে সেখানে গজিয়ে উঠলো একটি লাউগাছ। (৩৪) কাছাড়ীদেরও একটি লোককথা রয়েছে যেখানে একটি হাঁস সুন্দরী রাজকুমারীতে পরিণত হয়ে যায়।

"বানরবর" কাহিনীতে বানর মেয়েটিকে ছলনা দ্বারা অপহরণ করে। নেপালের লোককথায়ও অনুরূপ একটি কাহিনী পাওয়া যায়। (৩৫) কাহিনীতে রয়েছে এক দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন বানরের কথা। বানর একদিন এক কৃষকের বাড়ীতে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কৃষকের একটি মেয়ে ও কয়েকটি গরু ছিল। একদিন লোকটি যখন পাহাড়ের ঢালে ঘাস কাটছিলো তখন বানর এসে লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেলো। এতে লোকটি মারা যায় বানর মেয়েটিকে চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বানর নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যই মারা যায়।

ত্রিপুরার লোককথায় পশুপাখির মাধ্যমে কিছু প্রতারণামূলক কাহিনী রয়েছে। সজারুর বুদ্ধি, মুরগীর পিঠে, বানরবর ইত্যাদি কাহিনীগুলো এর মধ্যে অন্যতম। এই ধরণের কাহিনী উত্তর পূর্বাঞ্চলে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই কাহিনীগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অথবা আকারে ছোট প্রাণীর কাছে যথাক্রমে সবল এবং বৃহদাকার প্রাণীরা প্রতারিত হয়।

আসলে সমাজে কেউই, যে কারু চেয়ে ছোট নয় এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বক্ষেত্রে বিরাজমান, এই বোধটিই পশুপাখির মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের মানুষ বলতে চেয়েছে। তাদেরই অতি পরিচিত পশুপাখির মাধ্যমে সে কথা বলা হয়েছে। আসামের বিভিন্ন লোককথায়, নাগা, মিকির উপজাতিগোষ্ঠী এবং অরুণাচলের অধিবাসীদের লোককথায় এই ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়। কাছাড়ীদের মধ্যেও এর প্রচলন রয়েছে। অনেকে মনে করেন এই কাহিনীগুলো মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর অবদান। সেমা-নাগাদের একটি লোককথার নাম 'হাতি ও সজারু'। সেখানেও সজারুর কাঁটার ভয়ে হাতি পালাতে বাধ্য হয়। (৩৬) একই চিত্র আমরা ত্রিপুরার কাহিনীতেও দেখি। এই গল্পেরই সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে আসামের 'শেয়াল ও বানর' লোককথাটির (৩৭)। যে গল্প কাছাড়ীদের মধ্যে প্রচারিত বানর ও খরগোস নামে। আবার মিরি লোককথায়ও অনুরূপ কাহিনী রয়েছে "বানর ও বাঘ" নামে (৩৮)। ত্রিপুরার "উইপোকা স্বামী" ও "অজগর সাপের গল্প" ইত্যাদিতে সাপের সঙ্গে মানবীর বিয়ের কাহিনীর সাদৃশ্যমূলক একটি অসমীয়া লোককথা পাওয়া যায়। সেখানে দুটো সাপ দুটো মেয়েকে বিয়ে করে। প্রথম সাপ প্রথম মেয়েকে সুখী রাখে কিন্তু দ্বিতীয় সাপটি দ্বিতীয় মেয়েটিকে খেয়ে ফেলে। "উইপোকা স্বামী" গল্পেও দ্বিতীয় সাপ দ্বিতীয় মেয়েটিকে খেয়ে ফেলে।

"স্বপ্ন" প্রসঙ্গটি ত্রিপুরার লোককথায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অনেকগুলো কাহিনীতেই 'স্বপ্ন দর্শনের' সাহায্যেই মূল কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যেমন "রাজহাঁসের কাহিনী"তে স্বপ্নে এক বৃদ্ধা এসে বিধবাকে দুঃখমোচনের পথনির্দেশ দিয়ে যায় এবং রাজাকেও বৃদ্ধাই স্বপ্নে দর্শন দেয়।

"কথা বলা আংটি" নামক কাহিনীতে ছেলেটি স্বপ্নের মাধ্যমেই দেবতার কাছ থেকে দারিদ্র্যমোচনের ইঙ্গিতসহ নির্দেশলাভ করে এবং পরবর্তীসময়ে দেবতার নির্দেশমত মাটি খুঁড়ে আংটি পায়।

''ছাতিমগাছের কাহিনী''তেও মেয়েটি ভাইয়ের অন্যায় কামনার হাত থেকে মুক্তির সন্ধান পায় স্বপ্নে দেবতার কাছ থেকে।

''চাঁদের ছেলে'' লোককথাটিতেও কুফুর রাতে চন্দ্রমাদেবকে স্বপ্নে দেখে। দেবতা যেন ওকে বলছেন—'কুফুর আমি এসেছি, আমাকে গ্রহণ করো'।

স্বপ্নের মাধ্যমে পথনির্দেশ বা কোনো সংবাদ জানার ব্যাপারটি মনিপুরী এবং কাছাড়ী লোককথায়ও রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং এর তাওয়াং গুম্ফার কাহিনীর পেছনেও রয়েছে স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে পথনির্দেশ।

মণিপুরের কিংবদন্তীমূলক উপাখ্যান খাম্বা থৈবীর কাহিনীতে দেখা যায় রাজার ভাগ্নী থৈবী খাম্বার প্রেমে আসক্তা। কিন্তু রাজার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কংইয়াম্বা খাম্বার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে ও থৈবীকে লাভ করার উদ্দেশ্যে খাম্বার বিরুদ্ধে রাজার কান ভারী করে। অবশেষে খাম্বাকে প্রচণ্ড অত্যাচার করার পর হাতির পায়ের সঙ্গে বেঁধে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয় গভীর অরণ্যে। দেবী পাংথৈবী স্বপ্নে থৈবীকে এই ঘটনা জানান ও থৈবী তার প্রেমিকের সাহায্যার্থে যায়। (৩৯)

কাছাড়ী লোককথাটি এইরকম ঃ অনেকদিন আগে একজন কাছাড়ী রাজা ছয় পুরা (প্রায় আট একর) জায়গায় ধানের চারা রোপন করে। একদিন সকালে আশ্চর্য হয়ে রাজা দেখতে পান যে চারা রোপন করা জায়গায় গভীর জঙ্গল সৃষ্টি হয়ে গেছে ও চারাগুলো একটু দূরে অন্য জায়গায় রোপিত হয়ে আছে। সেই রাতেই রাজা স্বপ্ন দেখলেন কেউ একজন তাঁকে উপর থেকে বলছেন ঃ ''আমি বুড়ী গোসানি। যেখানে ধানের চারা আছে সে জমি আমার। আমি সেখানেই থাকবো। তুমি নরবলি দিয়ে আমার পুজোর ব্যবস্থা কর''। রাজা দেবীর কথামতো পুজোর আয়োজন করলেন। সবাই দেবীকে শ্রদ্ধা করতো, ভয়ের চোখেও দেখতো। বুড়ী গোসানির পুজো যারা করতো, তাদের সকলকে তিনি রক্ষা করতেন এবং কোনোরকম অসুস্থতা, বিপদ বা দুর্বিপাক তাদের জীবনে প্রবেশাধিকার পেতো না। ত্রিপুরার ''পুরোহিত'' লোককথায় বুড়াদেবতা এবং বুড়ী গোসানিকে এই আলোকে কেমন অভিন্ন মনে হয়। আবার ''রাজহাঁসের কাহিনী''তে ছা-কলক দেবীর পুজো প্রচলনের পেছনে এক বৃদ্ধা দেবী কর্তৃক বিধবাকে স্বপ্নে নির্দেশদানের প্রসঙ্গের সঙ্গেও বুড়ী গোসানির প্রসঙ্গের সাদৃশ্য রয়েছে। (৪০)

অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং গুম্ফা সৃষ্টির পেছনে স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে পথনির্দেশ লাভ করার ঐতিহাসিক কাহিনীটি এরকম ঃ পূর্বভূটানের একজন মেরা লামা একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁকে উত্তর দিকে এগিয়ে এসে একটি 'বিহার' তৈরী করতে হবে। কোন পথে এগিয়ে যেতে হবে তা তিনি জানতেন না বলে নিজের সাদা ঘোড়াটিকে পথ দেখানোর দায়িত্ব দিয়ে ছেড়ে দিলেন। ঘোড়া এসে অবশেষে একটি জায়গায় থামলো এবং লামা সেই জায়গাটিকেই 'বিহার' তৈরী করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মনে করে কাজে নেমে পড়লেন। দীর্ঘ বারোবছর পর মঠ তৈরী শেষ হলে প্রায় ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাসায় গিয়ে ষষ্ঠ দলাইলামাকে অনুরোধ করেন মঠে আসার জন্য। (৪১)

মঙ্গোলয়েড জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের লোককথায় "স্বপ্ন" উপাদানটি বেশী চোখে পড়ে।

ত্রিপুরার লোককথায় অন্যান্য লোকবিশ্বাসের প্রভাব ঃ

সংহত জনসমষ্টি যে বিশেষ আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে এবং যেগুলোর সঙ্গে তাদের শুভ-অশুভ বোধ জড়িত, তাই হল লোক বিশ্বাস। এর মূলে প্রধানতঃ কাজ করে ঐহিক শুভাশুভবোধ। ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ব্যক্তির নিজস্ব আবিষ্কার এবং তার স্থায়ীত্ব ব্যক্তিরই উপর নির্ভরশীল কিন্তু লোকবিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয়। লোকবিশ্বাসের মূলটি নিহিত থাকে বিশেষ কার্য বা ক্রিয়ার একটি সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে বের করার মধ্যে।

কবে থেকে যে লোকবিশ্বাসের উৎপত্তি সে সম্বন্ধে কিছু বলা না গেলেও এটা বলা যায় যে, এটি মানুষের আদিম অবস্থা থেকেই তার জীবনের অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে চলে আসছে।

বর্তমানের আধুনিক জনসমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। আদিম যুগের মানুষ সবকিছুর মধ্যেই একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করতে শিখে এটুকু বুঝেছিল যে, কোনো কিছুই অকারণে ঘটে না। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য শিকারের সন্ধান ও শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা এই দুটো প্রধান ব্যাপারে সবসময় তাকে সতর্ক থাকতে হ'ত। একটু অসতর্কতার জন্য তার শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল, নয়তো সম্ভাবনা ছিল মৃত্যুমুখে পতিত হবার। এজন্য আদিম মানবের ইন্দ্রিয়গুলো সচেতন থাকতো সব ব্যাপারেই। এভাবেই হঠাৎ কোনো পাখির স্তব্ধ হওয়া, আকাশের শকুন দেখা, যাত্রাপথের উপর দিয়ে খরগোশের চলে যাওয়া, প্রবহমান বাতাসের দিক পরিবর্তন-ইত্যাদি অসংখ্য সঙ্কেতের সঙ্গে মানুষ ক্রমে ব্যক্তিগত শুভাশুভ জড়িয়ে ফেলে এবং সমসাময়িককালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সঙ্গে এই সমস্ত ইঙ্গিতকে মিশিয়ে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক কল্পনা করে নেয়। এভাবেই আবহাওয়া, মৃত্যু, শস্য উৎপাদন বা রোগে আক্রান্ত হ'বার মতো ব্যাপারের সঙ্গে বিভিন্ন শক্তিকে দায়ী বলে বিশ্বাস করে নেয়। আদিমমানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ হিসেবেই জীবনধারণ করতো। বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তার গোষ্ঠীচেতনাই কাজ করছে।

পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যাদের মধ্যে কোনো লোকবিশ্বাস নেই।

ত্রিপুরার লোককথার মধ্য দিয়েও এখানকার মানুষের মধ্যে প্রচলিত লোকবিশ্বাসের ছায়াটুকু ধরা যায়। এই লোকবিশ্বাস অনেকসময়ই পৃথিবীব্যাপী অন্য সব লোক বিশ্বাসেরই সঙ্গে অভিন্ন মনে হয়।

এখানকার লোককথায় লোকবিশ্বাসের প্রভাব কিভাবে পড়েছে দেখা যাক। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দান সর্বত্রই কর্তব্যকর্ম বলেই বিশ্বাস করা হয়। "রক্তপিপাসু দেবতা'য় চৌদ্দজন দেবতা রানীমার রাজ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। নানারকম বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে রানীমা দেবতাদের আশ্রয় দেন ও তাঁদের নিত্যসেবার ভোগ নিজে তৈরী করে দেন। আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, ব্যক্তির জীবন দেহমধ্যস্থ আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আর অন্যদিকে বস্তুবিশ্বের

ঘটনাবলী আত্মপ্রকাশ করে আত্মাসম্পন্ন দেবদেবী বা কোনো বিশেষ শক্তির কারণে। এই উপলব্ধি থেকেই সৃষ্টি হয় বিশেষ শক্তিকে আরাধনা করা। এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই সর্বাত্মবাদের ধারণাটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল আদিম মানুষের মনে। এই বিশ্বাসই প্রতিফলিত চৌদ্দদেবতার পূজার মধ্য দিয়ে।

জলের জীবনীশক্তির প্রতি আদিম মানুষের বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এই একই কাহিনীতে মন্ত্রপুতঃ জলের দ্বারা জীবনপ্রাপ্তির বিশ্বাসটি ধরা (৪২) পড়েছে পাঁঠার মানুষে রূপান্তরের মধ্যে।

সৎভাবে জীবনযাপনকারী মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়। এই বিশ্বাসটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে 'সতী নারী' বলে খ্যাত রানী হীরাবতীর ব্যবহৃত রিছার দ্বারা দুরন্ত মোষকে বশীভূত করার মধ্যে। "তাছাড়া 'রিছা' বা বক্ষাবরণী ত্রিপুরার পার্বত্য আদিবাসীদের কাছে হৃদয়ের শাশ্বত ভালোবাসার প্রতীক এবং শুভ্রতার প্রতীক হিসেবেও পরিগণিত। অমঙ্গলের বিনাশকল্পে, কালদুঃখহরণেও এর ক্ষমতা অপরিসীম বলে একটা অদম্য বিশ্বাস পার্বত্যাঞ্চলে বিদ্যমান।.....

আদিবাসী সমাজের প্রবীণ ও জ্ঞানীরা বলে থাকেন নিজ আরাধ্য দেবতাকে মনে প্রাণে হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে অর্চনার প্রতিভূরূপেই রিছার ব্যবহার পূজাপার্বণে হয়"। (গড়িয়া পূজা, উপজাতি গবেষণা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার পৃঃ ৩-৪)।

সুদীর্ঘ অতীতকাল থেকেই যে সমস্ত উপকরণকে যাদুশক্তিসম্পন্ন বলে মনে করা হয়েছে "সংখ্যা" তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্বাস, বিশেষ বিশেষ সংখ্যার শুভ অথবা অশুভ করার ক্ষমতা। 'সাত' সংখ্যাটি প্রায় সর্বত্রই শুভ সংখ্যারূপে গৃহীত। পাশ্চাত্যদেশেও দেখা যায় সবরকম অশুভশক্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গৃহে ঘোড়ার সাতটি নাল লাগানো হয়ে থাকে।

এই বিশ্বাসটিই ধরা পড়েছে সাতগণ্ডা বেগুন, সাতধাপ সিঁড়ি ('বানরবর' গল্পে) ইত্যাদিতে। সাতজুমের মাটি, সাতপুকুরের জল, সাতটা মশাল, সাত পাক ('পুরোহিত' গল্পে)। সাত ভাই (গুল্মকুমারী), সাতবার কলাপাতা কাটা ('পুরোহিত'-এ) ইত্যাদি।

গর্ভবতী নারীর কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে হ'লে তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে হয় বলে যে লোকবিশ্বাসটি প্রচলিত, তারই প্রকাশ দেখা যায় বানরচরিত্রে। সে মানবী স্ত্রীর জন্য 'থাসতুই' আনতে মানুষের দূরগাঁয়ে যায়।

অন্য একটি লোকবিশ্বাস আছে যে, ষষ্ঠীদেবীর বাহন বিড়ালকে মারতে নেই। মারলে দুর্ভাগ্য আসে। এজন্যে প্রায়শ্চিত্তের বিধানও আছে। কিন্তু বানরবর পোষা বেড়াল মেরেও এসব কিছুই করে নি। পরিণতিতে তারই মৃত্যু হয়।

সংখ্যা সম্পর্কে যে লোকবিশ্বাস তাতে এক থেকে ত্রয়োদশ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রেই অলৌকিক ক্ষমতার কল্পনা করা হয়ে থাকে। সংখ্যায় বিশ্বাসী ত্রিপুরার উপজাতি সমাজমননের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে লোককথাগুলোর ভেতর দিয়ে তাঁদের বাসস্থান

সম্পর্কিত সংখ্যায়। যেমন 'দশ' ও 'ছয়' সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে গ্রাম ও গৃহ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি লোককথায়। (১) 'দশ গাঁয়ের সেরা ছ কুড়ি ছ ঘরের গাঁ — এটি অনেকগুলো লোককথায় ব্যবহৃত হয়ে একটি বিশেষ মোটিফে পরিণত হয়ে গেছে। পুরোহিত, উইপোকা স্বামী, গুল্মকুমারী, কথা বলা আংটি, ছিপিংতুই-মাইরুংতুই, অজগর সাপের গল্প ইত্যাদিতে কাহিনীগুলো শুরু হচ্ছে এই বিশেষ শব্দবন্ধ দিয়ে।

'পুরোহিত' নামক কাহিনীটিতে পূজোর নৈবেদ্যেও দেখা যায় ছয়টি দ্রব্যের উপস্থিতি। কালোমোরগ, খই, হলুদ, মদ, দা ও কলাপাতা। কালোরঙের মোরগ পুজোর উপকরণ হবার পেছনে কালো রঙের যাদু ক্ষমতায় মানুষের গভীরতর বিশ্বাসটি প্রতিফলিত। অন্যত্র বলির ক্ষেত্রে দেখা যায় কালোপাঁঠার ব্যবহার। এই উপকরণগুলো কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস।

অশুভশক্তি, ভূতপ্রেত ইত্যাদি অশরীরী অস্তিত্বের হাত থেকে রক্ষাকারী দ্রব্য হিসেবে লোহা সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। আদিম যুগের মানুষের কাছে এক স্বর্গীয় উপাদান হিসেবে এটি গৃহীত হয়েছিল। মানুষের প্রথম ধারণা হয় যে, উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম লোহার আবির্ভাব ঘটে। তাই এই ধাতু অতিলৌকিক গুণসম্পন্ন। এই বিশ্বাস থেকেই লোহা হিন্দু বিবাহিতা নারীর হাতে 'নোয়া' হিসেবে, ইংলণ্ডবাসীর গৃহে অশুভশক্তিহারক হয়ে ঘোড়ার খুর হিসেবে, গুজরাটের বর-কনের হাতের আঙ্গুলে লোহার আংটি হিসেবে ব্যবহৃত হয় (৪৩)। এমনই নানা ব্যবহার রয়েছে লোহার, নানা দেশে। ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের পুজোয় লৌহনির্মিত 'দা' এর ব্যবহার এই বিশ্বাসেরই ফসল। আগুন ও লোহা অশুভশক্তির বিনাশকারী বলেই বিধবা মা ছেলের হাতে তা তুলে দিয়েছিল ('পুরোহিত' গল্পে)। 'সাতজুমের মাটি', 'সাতপুকুরের জল' — উর্বরতাতান্ত্রিক লোকবিশ্বাস অনুযায়ী জুমের জমিকে উর্বর করে তুলবে বলে বিশ্বাস।

ধর্মচেতনার প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বপ্রাণবাদী সত্তার ধারণার সৃষ্টির পরের পর্যায়ে পিতৃপুরুষের আত্মাকে দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মাকেও দেবতারূপে চিন্তা করা হয়েছে। ঈশ্বরকে কোথাও কোথাও "বড়োভূত" হিসেবে ভাবা হয়েছে। (৪৪)

অসুস্থতা দূরীকরণে পূর্বপুরুষের আত্মার পুজো আদিম জীবনের অন্যতম অঙ্গ ছিল। ত্রিপুরার 'বুড়া-ছা' বা "বুড়া দেবতার" পুজোর প্রচলন হল অসুস্থতা উপশমের উদ্দেশ্যেই। তাই মনে হয় আফ্রিকার নীলনদ অঞ্চলের প্রচলিত লোকপুরানে Great Sprit বা 'বড়ো ভূত' যাকে বলা হয় ত্রিপুরার (৪৫) আদিবাসী জীবনে "বুড়াদেবতা" তারই সমার্থক হতে পারে।

টোটেম ভাবনার লোকবিশ্বাসটি ধরা পড়ে উইপোকা, অজগর, ব্যাঙ ইত্যাদির সঙ্গে আদিবাসী মেয়েদের বিবাহের ঘটনার মধ্য দিয়ে 'উইপোকা স্বামী', 'অজগর সাপের গল্প', চাঁদের ছেলে' ইত্যাদিতে।

দৈব ও অলৌকিকতার উপর মানুষের বিশ্বাস ও নির্ভরতার চিত্রটি ফুটে উঠেছে ব্রতকথাধর্মী লোককথা "রাজহাঁসের কাহিনী"তে। 'দেবতার আশীর্বাদে ধনেজনে পূর্ণ হয় সংসার' — সমাজ

মানসের এই সক্রিয় ভাবনাটিই এখানে প্রতিফলিত। যদিও লৌকিক দেবী 'ছা-কলক' এখানে উপস্থিত, তা দৈবেরই রূপক। দৈবের ক্রিয়া মানব জীবনেই প্রত্যক্ষ হয়।

সুগন্ধি গুল্ম থেকে লেবু, লেবু থেকে লাউ, লাউ থেকে ন্যাটা মাছ, মাছ থেকে নারকেল — এই রূপান্তর (গুল্মকুমারী)— এর মধ্য দিয়ে গাছপালা মাটি, পাথর ইত্যাদিতে সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা (সর্বপ্রাণবাদ) ও টোটেম বিশ্বাসটি দেখা যাচ্ছে। পানের পিক রক্তের প্রতীক। লকই এর কাপড়ে পানের পিক মুছে দেওয়া যৌনক্রিয়ার সূচক। সুলক্ষণা নারী সংসারে লক্ষীমন্ত, অন্যদিকে কুলক্ষণা স্ত্রী অপয়া হয়, এই লোকবিশ্বাসটির ফলেই ছিলাইকুমারীকে লখই গর্তের নিচে মাটি চাপা দেয়। Taboo বা বিধিনিষেধ অমান্য করলে যে শাস্তি পেতে হয়, সেই বিশ্বাসটিই ধরা আছে "কথা বলোনা" লোককথাটিতে, যেখানে বাবা মায়ের কথা অমান্য করে দুবোন কথা বলেছিল বলে রাজার লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

রাজাকে মনে করা হতো ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত। তিনি কোনো ভুল করতে পারেন না। তিনি সর্বদাই প্রজাদের কল্যাণকামী এবং দয়ালু ব্যক্তি। তিনি রাজ্যশাসন করেন নিশ্চয়ই ইশ্বরের কোনো শক্তি বা প্রভাব দ্বারা। সেইজন্যই তিনি একজন সার্বভৌম রাজা হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেন। ব্যাঙের জন্য বিধবার জুমের ধানের ক্ষতি হলে রাজা বন্দুকের হাতল দিয়ে মেরে তাকে শাস্তি দেন। যার ফলে তার কোমর ভেঙ্গে যায়। রাজার দেয়া শাস্তি ঈশ্বরেরই দেয়া — তাই আর কোনোদিন ব্যাঙ সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না।

একটি লোকবিশ্বাস আছে যে, আগুন ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই। মুরগী বুদ্ধির সাহায্যে বিড়ালকে বধ করে নিজের ছেলেমেয়েদের জীবনের নিরাপত্তা দেয় (মুরগীর পিঠে)।

পাখির ডিম খেয়ে মানুষও পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতো আদিমকালে। এই বিশ্বাসটিই প্রতিফলিত "কথা বলা আংটি"তে শকুনের ডিম খেয়ে বড় ভাইয়ের শকুন হয়ে যাওয়াতে।

ম্যাজিক বস্তু বা ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে বিশ্বাস আদিম জনজীবনের অঙ্গ। কথা বলা আংটি এবং তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সেই বিশ্বাসের দ্যোতক।

বীজবপনের আগে জুম পোড়ানোর সময় যেমন সাতজুমের মাটি, সাতপুকুরের জল ও সাতটা মশাল নিয়ে দেবদেবী এবং জুমে বসবাসকারী অন্যদের (প্রাণীকুল এবং আত্মা) বন্দনা করার রীতি, তেমনি শস্য তোলার আগেও দেবতার আরাধনা অবশ্য কর্তব্য। এই সবই উৎপাদন ও উর্বরতার সঙ্গে জড়িত লোকবিশ্বাস।

আদিবাসী সমাজে গৃহনির্মিত 'মদ' একটি অন্যতম অপরিহার্য ও প্রিয় পানীয়। সামাজিকতা রক্ষায় এর উপযোগিতা যেমন অনন্য তেমনি পুজো পার্বণেও।

জলের শুভকারিনী শক্তির প্রতি লোকবিশ্বাসটি লক্ষ্যণীয়। পৃথিবীর সব আদিম সমাজের মতো এদেরও বিশ্বাস যে পবিত্র জল থেকেই জীবজগতের উদ্ভব। জলের অন্তরালের পালয়িত্রী ও রক্ষাকারী মাতৃদেবীর পুজো (তুইমা), তারা আবহমানকাল ধরে করে আসছে। বিবাহ কার্যেও পবিত্র জল ছিটিয়ে দেয়া হয়। জল এদের জীবনপ্রতীক। (৪৬)

সেদ্ধ হওয়া কচু কখনো সোনায় পরিণত হতে পারে না। অভাবী আদিবাসী জীবনে বনের কচু, ওল ইত্যাদিই জীবনধারণে সহায়ক হয়। অন্যদিকে মনের কোনে লালিত হয় দুঃসহ জীবনযাপন থেকে উত্তরণের আকাঙ্খা। যার কেউ নেই, তার দেবতাই সহায় হন—এরকমই একটা বিশ্বাসের ফলে দেখা যায় দুঃখিনী বড়বোন দেবতার কৃপায় একতাল সোনা পায় (একফালি লাউয়ের গল্প)।

মনে দুঃখ পেয়ে কাউকে অভিসম্পাত দিলে তা ফলে-এই লোকবিশ্বাসের ফলেই দেখা যায় "ধনেশ পাখির গল্পে" ছাম্পারীর স্বামী পরজন্মে স্ত্রীর অভিশাপে ধনেশ পাখি হয়ে জন্মায়।

'কারও আকাঙ্খার জিনিষ তাকে না দিয়ে খেলে বা পরলে অনিষ্ট হয়'— এই লোকবিশ্বাসটি প্রতিফলিত হয়েছে "স্বর্গের ফুল রান্নায়"। দেবতার ভোগ্য ফুল দেবতাকে উৎসর্গ না করে স্ত্রী মাথায় দিয়েছিলো বলেই তার স্বামী "হুলক" হয়ে যায়। শক্তি প্রয়োগে যেখানে কার্যসিদ্ধি সম্ভবপর নয়, সেখানে বুদ্ধির প্রয়োগে অনায়াসে কার্যে সফল হবার বিশ্বাসটিই ধরা পড়ে ছোট প্রাণী সজারুর হাতিকে পরাস্ত করার মধ্যে (সজারুর বুদ্ধি)।

অতিথির সেবা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। এই অতিথিপরায়ণতা আদিবাসী সমাজের পালনীয় ধর্ম রূপেই বিবেচিত হয়। অজানা অচেনা অতিথিকেও সাধ্যানুসারে আপ্যায়ণ করা হয় (একটি মাছির গল্প)।

মন্ত্রশক্তিতে এরা অত্যন্ত বিশ্বাসী। রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ ইত্যাদিতে এর উপকারিতায় এরা বিশ্বস্ত। "প্রতিজ্ঞা" লোককথাটিতে মন্ত্রশক্তির প্রভাবেই "সাকাই" (ঘিলালতা) মাটিতে পুঁতে দেওয়া মাত্রই জীবন্ত হয়ে উঠে ও লতা গজায়।

ঐন্দ্রজালিক শক্তি ও দৈবশক্তিতে বিশ্বাস আদিবাসী জীবনের মজ্জাগত। মানুষের সহায়তা যখন দুর্লভ হয়ে যায়, তখন শেষ আশ্রয় হিসেবেই মানুষ দৈবনির্ভর হয়ে উঠে। ভাইয়ের অসামাজিক আকাঙ্খার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য স্বপ্নে দৈবনির্দেশে মেয়েটি (ছাতিম গাছের কাহিনীতে) ছাতিম চারা মাটিতে পুঁতে দিয়ে পুজো করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা বড় হতে থাকে। মেয়েটি যতো সুর করে গান গেয়ে ছাতিমকে বড় হ'তে বলে, ততই সে বড় হয় এবং একসময় গাছটি মেয়েটিকে নিয়ে আকাশে উঠে যায়। এরমধ্যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার প্রয়োগগত দিকের উপর লোকসমাজের বিশ্বাস যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি গানের সুরের সাহায্যে গাছের বৃদ্ধির ব্যাপারটি যা বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নির্ণীত সত্য বলে প্রমাণিত, তাও ধরা পড়ে। সংগীতের সুরের ম্যাজিক্যাল শক্তিও এখানে স্বীকৃত।

লোভ করতে নেই। 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'— এমন বিশ্বাস সকলের মাঝেই দেখা যায়। 'ছিপিংতুই মাইরুংতুই' লোককথাটিতে মাইরুংতুই এবং তার মা ঈর্ষা ও লোভের জন্যই প্রাণ হারালো।

কাউকে কথা দিলে কথা রাখতে হয়— এই বিশ্বাসটি ত্রিপুরার আদিবাসীদের জীবনে এক পরম সত্যের মতো। (৪৭) আদিবাসী জনজীবনে 'মুখের কথাই শেষ কথা'। সে কথা মনে মনে

বলা হলেও তা রক্ষিত হয়। এই বিশ্বাস থেকেই অচাই-য়ের মেয়ে (অজগর সাপের গল্প) অজগরই গীয়রিঙ বানিয়ে দিয়েছে ভেবে অজগরকে বিয়ে করতে প্রতিশ্রুত হয়।

অজগরকে কেটে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জুমে কর্মরত মেয়েটির গলার মালা হঠাৎ খসে যাওয়া এবং মালাগুলো উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনার মধ্যে অলৌকিকতার আভাস বর্তমান।

শিশুর জন্ম সময়ে প্রসূতিকে আতুঁড় ঘরে রাখার একটি লোকপ্রথা রয়েছে। তাকে বাসস্থানে রাখা হয় না অমঙ্গলের ভয়ে। এই বিশ্বাসটিরই ছায়া পড়েছে ছোটরানীমাকে প্রসবের সময় নদীর পারে নিয়ে যাবার মধ্যে। গর্ভবতী রমণী এবং সদ্যোজাত সন্তানকে রক্ষা করতে নানারকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সেই উদ্দেশ্যেই রাজা দরবার থেকে অন্দরমহল পর্যন্ত দড়ি টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করলেন।

দুঃখদুর্দশা দূরীকরণ, দেবতার আশীর্বাদে অসাধ্যসাধন ইত্যাদি ভাবনাই লোকজীবনে দেবকল্পনার সঙ্গে জড়িত। বনদেবী ও চন্দ্রদেবতা কর্তৃক দুটো 'গীয়রিং' তৈরী করে দেবার যে ঘটনা পাই "অজগর সাপের গল্প" ও "চাঁদের ছেলে" তে, তা এই বিশ্বাস থেকেই জাত।

'ফা' শব্দের অর্থ পিতা।

সূর্য এবং চন্দ্রের সঙ্গে আদিমমানব নিজেদের একাত্ম করে নিয়েছিল সভ্যতার উন্মেষের একটি পর্বে। মহাভারতের সূর্যবংশীয় রাজারা তার প্রমাণ। ত্রিপুরার আদিবাসী রাজন্যকুল নিজেদের চন্দ্রবংশীয় বলেই বিশ্বাস করেন। এদের 'গড়িয়া' দেবতা মহাদেব বা শিব। অর্দ্ধচন্দ্র শিব সম্পর্কিত চিহ্ন। চাঁদের ছেলে চন্দ্রকুমার দেবগুণসম্পন্ন বলেই বিশ্বাস। চন্দ্রকুমার ব্যাঙরূপী। ব্যাঙ প্রায় প্রত্যেক দেশেই দেবদেবীতে রূপান্তরিত। মধ্যপ্রাচ্যের দেবী হেকেৎ ব্যাঙমুখী। (৪৮)

তারপর প্রজা পালনেও তিনি পিতৃসম। অন্যদিকে রাজা ছিলেন প্রজার কাছে দেবতাসদৃশ। এই সমস্ত বিশ্বাসই চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বলে খ্যাত ত্রিপুররাজ চন্দ্রকুমারকে 'ফা' রূপে প্রতিষ্ঠিত করে একটি পৌরাণিক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে 'চাঁদের ছেলে' লোককথাটিতে। কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পর ঈশ্বরা সাধনাই জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত (স্মর্তব্য, পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ)। প্রাচীন লোকবিশ্বাসটিই ফুটে উঠেছে বুড়ো রাজারানীর ভগবানকে নীরবে ডাকার জন্য মায়ানি পর্বতে চলে যাওয়ার মধ্যে।

কৃষ্ণবর্ণকে খুব একটা সুনজরে দেখা হয় না কখনো। যা কিছু অশুভ বা ক্ষতিকারক তার সঙ্গে কালো রঙের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এমনকি বিয়ের পাত্রপাত্রী নির্বাচনেও কালো রঙকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। একটি অজানা আশঙ্কা কাজ করে। "নাঐ পাখির গল্প" কাহিনীটিতে এই লোকবিশ্বাসটি ফুটে উঠেছে। বড়বোন খুমতির গায়ের রঙ ছিল কালো। মনটাও ছিল খারাপ। ছোটবোনকে হিংসে করতো।

অন্যদিকে শ্বেতবর্ণের পশুপাখির প্রতি পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রদ্ধাবোধের অস্তিত্ব আছে। শ্বেতবর্ণ পশুপাখি ঐন্দ্রজালিক (৪৯) শক্তিসম্পন্ন বলে যে বিশ্বাস রয়েছে তা-ই 'প্রতিজ্ঞা' নামক লোককাহিনীতে ফুটে উঠেছে। শ্বেতহস্তী ব্রহ্মদেশে পূজিত হয়।

সূত্র উল্লেখ ঃ

(১) D Debbarman : Treatise on Traditional social Institutions of the Tripuri commumity, P. 4.

(২) Do P. 4.

(৩) Dr. Suniti Kr. Chatterjee : Kirat-Jana-Kriti P.179.

(৪) Do P. 177

(৫) Do P. 214.

(৬) Do P. 215.

(৭) Tripura a portrait of population, 1971. (উদ্ধৃতি, রঞ্জিৎ দে ঃ ত্রিপুরার লোকজীবন ও সংস্কৃতি, পৃঃ ৭৮)

(৮) Dr. S. K. Chatterjee : Kirat Jana Kriti P. 219.

(৯), (১০) Do P. 220.

(১১) আশরাফ সিদ্দিকী ঃ লোক-সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯।

(১২) বরাকরের কাহিনী, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯৩।

(১৩) ডঃ ননীগোপাল চক্রবর্তী ঃ পূর্ব দক্ষিণ বঙ্গের লোককাহিনী।

(১৪) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৯২।

(১৫) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ আদিবাসী লোককথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০।

(১৬) ডঃ ননীগোপাল চক্রবর্তী ঃ পূর্ব দক্ষিণ বঙ্গের লোককাহিনী, পৃঃ ২১।

(১৭) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ঃ চিলড্রেন ক্লাসিকস, পৃঃ ৮৫।

(১৮) Prafulla Datta Goswami : Essays on the Folkore and Culture of North Eastern India - P. 39.

(১৯) Prafulla Datta Goswami : Essays on the Folkore and Culture of North Eastern India - P. 41.

(২০) ডঃ ননীগোপাল চক্রবর্তী ঃ পূর্ব দক্ষিণ বঙ্গের লোককাহিনী, পৃঃ ৭।

(২১) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ আদিবাসী লোককথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪।

(২২) Folktales of the Khasis, P. 10-17.

(২৩) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ লোককথার ঐতিহ্য, পৃঃ ৭৮।

(২৪) Muses, Journal of NEHU SHILLONG U KONGWIENG (the Cicada) tr. by D. L. Kha-rmaphlong Vol. I, No. 1, August 1991.

(২৫) ডঃ ননীগোপাল চক্রবর্তী ঃ পূর্ব দক্ষিণবঙ্গের লোককাহিনী।

(২৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৭।

(২৭) ডঃ ননীগোপাল চক্রবর্তী ঃ পূর্ব দক্ষিণবঙ্গের লোককাহিনী।
(২৮) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ আদিবাসী লোককথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬।
(২৯) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ আদিবাসী লোককথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩২।
(৩০) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৯৪।
(৩১) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ঃ চিলড্রেন ক্লাসিকস্, পৃঃ ১৫২।
(৩২) Prafulladatta Goswami : Essays on the Folklore and Cutlure of North Eastern India - P - 47.
(৩৩) Do Do Do P. 48
(৩৪) Do Do Do P. 48
(৩৫) Do Do Do P. 87.
(৩৬) Prafulladatta Goswami : Essays on the Folklore and Culture of North Eastern India - P. 46.
(৩৭) J. Barooah : Folktales of Assam, 1915, P 8-10.
(৩৮) Prafulladatta Goswami : Essays on the Folklore and Culture of North Eastern India - P. 39.
(৩৯) Do Do Do P. 53.
(৪০) Do Do Do P. 141.
(৪১) Do Do Do P. 68.
(৪২) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থখণ্ড, পৃঃ ৭৬।
(৪৩) ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী ঃ লোকবিশ্বাস লোকসংস্কার, পৃঃ ৪৫।
(৪৪) ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত ঃ লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি - পৃঃ ২৫৪।
(৪৫) ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২০৪
(৪৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।
(৪৭) কৈলাসচন্দ্র সিংহ ঃ রাজমালা, অখণ্ড, ১ম ভাগ ৩য় অধ্যায় বর্ণমালা প্রকাশনী, পৃঃ ২০।
(৪৮) ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত ঃ (সম্পাদক) লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি, পৃঃ ৪০।
(৪৯) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।

চতুর্থ অধ্যায়

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার শ্রেণীবিন্যাস ঃ

ত্রিপুরার উপজাতিদের যে লোককথাগুলো আমরা পাচ্ছি সেগুলো তাদের জীবন ও সমাজের বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করছে। কয়েকটি কাহিনী ছাড়া অধিকাংশ কাহিনীতেই দেখা যায় একাধিক মূল অভিপ্রায় রয়েছে। যার ফলে কিছু কিছু কাহিনী ছাড়া অনেক কাহিনীর ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে শ্রেণীবিভাগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পশুপাখির কাহিনী ঃ আদিম জনজীবনে অরণ্যের পশুপাখিই ছিল তার একমাত্র প্রতিবেশী। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এখনো মানুষের খুব কাছাকাছি বাস করে পশুপাখিরাই। লোকজীবনের সর্বত্র পশুপাখির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বলেই লোককথায়ও এরা একটি মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। তবে লোককথায় এরা নিছক পশুপাখি হয়েই থাকে নি। ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় পশুপাখিকে তাদের আচরণে ও চিন্তায় মানুষের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখি। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকাশ দেখা যায় তাদের চরিত্রে।

লোককথার আদিমস্তরে পশুকথাগুলোই বোধহয় সৃষ্টি হয়েছিল। তাই দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে একই ধরণের পশুকথা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চালু রয়েছে। বানরবর, উইপোকাস্বামী, রাজহাঁসের কাহিনী, অজগর সাপের গল্প, চাঁদের ছেলে, নাঐ পাখির গল্প ইত্যাদিতে পশু ও মানুষ একে অন্যের কাছাকাছি। বিচার, মুরগীর পিঠে, সজারুর বুদ্ধি ইত্যাদি কাহিনীগুলোকে পশুপাখির কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই কাহিনীগুলো পশুপাখিকে ঘিরে রচিত হলেও মানুষের নির্ভূল অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রকাশ ঘটে এদের চরিত্রে। কূটবুদ্ধি মানুষ, অন্যের সরলতায় সুযোগ সন্ধানী ধূর্ত, অন্যকে পীড়ন করে উল্লাসবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলো পশুকথাকে রূপকথায় পরিণত করেছে। এছাড়াও এক সুগভীর মনস্তাত্বিক সম্পর্ক এবং লোক সমাজের আদলটি পশুপাখির কাহিনীগুলোতে ধরা পড়ে।

ত্রিপুরার উপজাতি মানুষদের অতি পরিচিত পশুপাখি যেমন, বাঁদর, কুকুর, সাপ, পাখি, মুরগী, শূকর, ব্যাঙ, হরিণ, বিড়াল, হাতি, সজারু, মাছি, গরু, উইপোকা, মাছ ইত্যাদি হয়ে উঠেছে অতি প্রয়োজনীয় চরিত্র।

নীতিকথা ঃ লোককথার ভেতর দিয়ে নীতিকথার প্রকাশ একটি অন্যতম অভিপ্রায়। ত্রিপুরার লোককথায় সম্পূর্ণভাবে নীতিকথা মূলক আখ্যান থাকলেও এমন কয়েকটি কাহিনীও রয়েছে যেখানে অন্যান্য অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গে নীতিকথাও প্রকাশিত হয়েছে।

সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের স্মৃতি বহনকারী "পুরোহিত" গল্পে প্রকাশিত হচ্ছে "দৈবকার্যে অবহেলা না করার" নীতিটি। অবহেলার ফল হিসেবে নাগরাজা জুম যে পুড়িয়েছে, সেই যুবকটির ঘরটিকে সাতপাকে বন্দী করে রাখে। "বড়দের কথা শুনে চলা"র নীতিশিক্ষাটি পাওয়া যায় "কথা বলো না" লোককথাটিতে। শিক্ষাটি অনুসৃত না হওয়ার ফলেই যে দু'বোন

পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তা-ও এখানে প্রকাশিত। "অকারণে কারো ক্ষতি করা খুবই গর্হিত কাজ" — এই নীতিকথাটি "বিচার" গল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

"সজারুর বুদ্ধি" লোককথাটি "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" এই নীতিকথার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ছোট্ট প্রাণী সজারু অতিকায় হাতিকেও বুদ্ধিতে পরাজিত করে। একই ভাবনা প্রকাশিত হচ্ছে মাছির সাহায্যে যুবকের সংসারী হয়ে উঠার কাহিনীতে (দ্রঃ একটি মাছির গল্প)।

"স্বর্গের ফুল রাম্নাতে" দেবতার ফুল দেবতাকে উৎসর্গ করে পরতে হয়', এই নীতিকথাটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে 'কথা বলো না' কাহিনীটিও নীতিকথার উপর ভিত্তি করে রচিত বলে এদের নীতিকথা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ভাই ও বোনের মধ্যে যে কোনোওরকম অবৈধ সম্পর্ক থাকা উচিত নয় সেই নীতিকথাটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে ছাতিম গাছের কাহিনীতে। প্রায় একই ধরণের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে "কাঞ্চনমালা" নামক কাহিনীর কাঞ্চনমালার চরিত্রে।

ভাইবোনের বিবাহের আদিম প্রথাটি প্রচলিত ছিল নানা জায়গায়। ত্রিপুরার উপজাতি সমাজও তার সঙ্গে অপরিচিত ছিল না বলেই মনে হয়। কারণ, এরই উপর ভিত্তি করে "ছাতিম গাছের কাহিনী"র নির্মিতি।

"ঈর্ষা করা মহা পাপ" এবং এরজন্য ঈর্ষাকারীকে ফলভোগ করতে হয়। "ছিপিংতুই মাইরুংতুই" গল্পে এই আভাসটিও ফুটে উঠেছে। অজগর সাপের গল্পে" ও দেখা যায় হিংসার কি পরিণতি হয় তার উত্তর দেয়া হল সাতরাণীকে মাটি চাপা দিয়ে।

উর্বরাশক্তিমূলক কাহিনী ঃ আদিম জীবনে শস্য ও সন্তানের আকাঙ্ক্ষাই ছিল মানুষের একমাত্র চাওয়া। তখন জীবন আবৃত্ত হ'ত এই চাওয়া পাওয়াকে কেন্দ্র করেই। শস্যের মঙ্গলকামনায় যতরকম ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ও আচার সংস্কারকে মানুষ অনুষ্ঠেয় কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছে। দৈব অনুগ্রহ, ম্যাজিক, ট্যাবু ইত্যাদি উর্বরতা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়। এখানে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় সেগুলোও প্রাণময় বলেই মনে করা হয়। প্রকৃতিনির্ভর জুমিয়া জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, লোকবিশ্বাস মূর্ত হয়ে উঠে এই কাহিনীগুলোতে।

উর্বরাশক্তিমূলক কাহিনী হিসেবে স্পষ্টভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না কোনো গল্পকেই। তবু কয়েকটি গল্পে অন্যান্য অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলেমিশে আছে উর্বরাশক্তিমূলক অভিব্যক্তিটি। এদের মধ্যে "পুরোহিত" — এ জুম পোড়া দেবার দিনের পালনীয় রীতিগুলো উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করে। "গুল্মকুমারী" ঐন্দ্রজালিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে উর্বরাশক্তির কথাও প্রকাশ করছে। "কথা বলা আংটি"র সাহায্যে জুমের বাড়বাড়ন্ত ও উর্বরাশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। "প্রতিজ্ঞা" গল্পে সাকাই (ঘিলা) লতা মাটিতে মন্ত্র পড়ে পুঁতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে লতা গজিয়ে ওঠার মধ্যেও উর্বরাশক্তিমূলক অভিপ্রায় পাওয়া যায়। "ছাতিম গাছের কাহিনীতে"ও দেখা যায় ছোট ছাতিমের চারা জল ঢেলে পুজো করতে করতেই একসময় বড় হয়ে যায় ও পরে আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। এই আখ্যানেও একই অভিপ্রায়ের পুনরাবৃত্তি। "অজগর

সাপের গল্পে'' সাপ সৃষ্টিপ্রতীক। ঝর্ণার জলে অচাই অজগরের মাথা ফেলেছিল। সেখানে পরে জন্মায় অজস্র খুম্পুই ফুল। এটিও উর্বরাশক্তিমূলক অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

''ব্যাঙ লোকাচারে (বর্ষণ সংক্রান্ত) এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করে, যা প্রকারান্তরে উর্বরতার প্রতীক। ''চাঁদের ছেলে'' কাহিনীতে ব্যাঙরূপী চন্দ্রকুমারের রাজ্যের শ্রী ও গৌরববৃদ্ধি উর্বরতাশক্তির প্রতীক বলে গণ্য হতে পারে। ''পুরোহিত''-এ কলাপাতা মাটিতে বিছিয়ে বাঁশগুলো মাটিতে পুঁতে তাতে মদ ঢেলে দেয়া, উর্বরতা শক্তিমূলক কাহিনীরই অঙ্গ।

গোষ্ঠীগত কাহিনী ঃ ''রক্তপিপাসু দেবতা'' গল্পে একযোগে চৌদ্দজন দেবতার রানী হীরাবতীর রাজ্যে আগমন এবং আশ্রয় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দেবতাদের গোষ্ঠী ভাবনার চিত্রই ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে দেবতাদের তাড়া করে নিয়ে এসেছে যে মোষটি, সেও একটি গোষ্ঠীরই প্রতীক। এতোজন দেবতার (দেবতাদের যথেষ্ট ক্ষমতাবান বলেই ধরা হয় জনমানসে) বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে যে একেবারে একা, সেও নিশ্চয়ই প্রচণ্ড শক্তিধর। অন্যদিকে রাণীমাও সাধারণ জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত শক্তির প্রতীক।

এই কাহিনী গোষ্ঠী জীবনেরই কাহিনী।

''কথা বলো না'' কাহিনীতেও পাওয়া যায় প্রচ্ছন্নভাবে জুমিয়া গোষ্ঠীর বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও অসহায় জীবনের ছবি। সেখানে রাজার উপর কথা বলার কোনো ক্ষমতাই নেই সাধারণ জনগোষ্ঠীর। তাদের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার দায়ভার যেন একা তাদেরই।

''মুরগীর পিঠে'' তেও পাওয়া যাচ্ছে সুযোগ সন্ধানী বা অত্যাচারী গোষ্ঠী এবং অত্যাচারিত গোষ্ঠীর একটি দ্বন্দ্বের চিত্র। অত্যাচারিত গোষ্ঠীর প্রতীক মুরগীর জয়লাভের ভেতর দিয়ে গোষ্ঠী ভাবনার চিত্রটি পরিষ্কার এখানে ফুটে উঠেছে। দৈহিকভাবে সবল প্রতিপক্ষের কাছে একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল অথচ সংহত জনগোষ্ঠী কিভাবে নিজেদের প্রাধান্য প্রমাণ করে তারই প্রমাণ এই কাহিনী। মানবগোষ্ঠী ও পশুগোষ্ঠী উভয়ের প্রতিই এইকথা সমতুলভাবে প্রযোজ্য। দুর্বল ডানার অধিকারী মুরগী চিরকাল বিড়ালের ভক্ষ্য, কিন্তু এখানে তা নয়।

''সজারুর বুদ্ধি'' লোককথাটিতেও গোষ্ঠী ভাবনাটি লক্ষ্য করা যায়। হাতি, প্রভুশ্রেণীর প্রতীক। অন্যদিকে সজারু দরিদ্রগোষ্ঠীর প্রতীক। আকারে, আয়তনে, প্রকৃতিতে হাতি ও সজারু প্রকৃতির পশুরাজ্যেও দুই ভিন্ন প্রজাতির। প্রভুশ্রেণীকে সাধারণশ্রেণী সর্বদাই সর্বতোভাবে অতিক্রম করে যাবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এখানেও সেই ভাবনাটিই লক্ষ্য করা যায় সজারুর আচরণে। শরীরের একখানা কাঁটা তুলে হাতির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে যখন সে বলে, ''এ লোমখানা মেপে দেখ দিকিনি, তা হলেই আমাকে বুঝতে পারবি, ''এখানেও দেখা যায় সাধারণ গোষ্ঠীর প্রতিভূ সজারু জয়ী হচ্ছে। এখানে প্রতিবাদী গল্পের সুরও শোনা যাচ্ছে।

সাংসারিক কাহিনী ঃ 'বানরবর' কাহিনীটি পশু ও মানবীর কাহিনী হলেও এখানে সাংসারিক কাহিনীর আভাস প্রকট। বানরের স্ত্রী হিসেবে বাধ্য হয়েই মেয়েটি বানরের বাড়ীতে রয়েছে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর জন্য ''থাসতুই'' আনতে বানরের দূরে মানুষের গাঁয়ে যাত্রা, উনুনে চাপানো

সাপের গল্পে'' সাপ সৃষ্টিপ্রতীক। ঝর্ণার জলে অচাই অজগরের মাথা ফেলেছিল। সেখানে পরে জন্মায় অজস্র খুম্পুই ফুল। এটিও উর্বরাশক্তিমূলক অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

''ব্যাঙ লোকাচারে (বর্ষণ সংক্রান্ত) এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করে, যা প্রকারান্তরে উর্বরতার প্রতীক। ''চাঁদের ছেলে'' কাহিনীতে ব্যাঙরূপী চন্দ্রকুমারের রাজ্যের শ্রী ও গৌরববৃদ্ধি উর্বরতাশক্তির প্রতীক বলে গণ্য হতে পারে। ''পুরোহিত''-এ কলাপাতা মাটিতে বিছিয়ে বাঁশগুলো মাটিতে পুঁতে তাতে মদ ঢেলে দেয়া, উর্বরতা শক্তিমূলক কাহিনীরই অঙ্গ।

গোষ্ঠীগত কাহিনী ঃ ''রক্তপিপাসু দেবতা'' গল্পে একযোগে চৌদ্দজন দেবতার রানী হীরাবতীর রাজ্যে আগমন এবং আশ্রয় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দেবতাদের গোষ্ঠী ভাবনার চিত্রই ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে দেবতাদের তাড়া করে নিয়ে এসেছে যে মোষটি, সেও একটি গোষ্ঠীরই প্রতীক। এতোজন দেবতার (দেবতাদের যথেষ্ট ক্ষমতাবান বলেই ধরা হয় জনমানসে) বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে যে একেবারে একা, সেও নিশ্চয়ই প্রচণ্ড শক্তিধর। অন্যদিকে রাণীমাও সাধারণ জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত শক্তির প্রতীক।

এই কাহিনী গোষ্ঠী জীবনেরই কাহিনী।

''কথা বলো না'' কাহিনীতেও পাওয়া যায় প্রচ্ছন্নভাবে জুমিয়া গোষ্ঠীর বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও অসহায় জীবনের ছবি। সেখানে রাজার উপর কথা বলার কোনো ক্ষমতাই নেই সাধারণ জনগোষ্ঠীর। তাদের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার দায়ভার যেন একা তাদেরই।

''মুরগীর পিঠে'' তেও পাওয়া যাচ্ছে সুযোগ সন্ধানী বা অত্যাচারী গোষ্ঠী এবং অত্যাচারিত গোষ্ঠীর একটি দ্বন্দ্বের চিত্র। অত্যাচারিত গোষ্ঠীর প্রতীক মুরগীর জয়লাভের ভেতর দিয়ে গোষ্ঠী ভাবনার চিত্রটি পরিষ্কার এখানে ফুটে উঠেছে। দৈহিকভাবে সবল প্রতিপক্ষের কাছে একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল অথচ সংহত জনগোষ্ঠী কিভাবে নিজেদের প্রাধান্য প্রমাণ করে তারই প্রমাণ এই কাহিনী। মানবগোষ্ঠী ও পশুগোষ্ঠী উভয়ের প্রতিই এইকথা সমতুলভাবে প্রযোজ্য। দুর্বল ডানার অধিকারী মুরগী চিরকাল বিড়ালের ভক্ষ্য, কিন্তু এখানে তা নয়।

''সজারুর বুদ্ধি'' লোককথাটিতেও গোষ্ঠী ভাবনাটি লক্ষ্য করা যায়। হাতি, প্রভুশ্রেণীর প্রতীক। অন্যদিকে সজারু দরিদ্রগোষ্ঠীর প্রতীক। আকারে, আয়তনে, প্রকৃতিতে হাতি ও সজারু প্রকৃতির পশুরাজ্যেও দুই ভিন্ন প্রজাতির। প্রভুশ্রেণীকে সাধারণশ্রেণী সর্বদাই সর্বতোভাবে অতিক্রম করে যাবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এখানেও সেই ভাবনাটিই লক্ষ্য করা যায় সজারুর আচরণে। শরীরের একখানা কাঁটা তুলে হাতির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে যখন সে বলে, ''এ লোমখানা মেপে দেখ দিকিনি, তা হলেই আমাকে বুঝতে পারবি, ''এখানেও দেখা যায় সাধারণ গোষ্ঠীর প্রতিভূ সজারু জয়ী হচ্ছে। এখানে প্রতিবাদী গল্পের সুরও শোনা যাচ্ছে।

সাংসারিক কাহিনী ঃ 'বানরবর' কাহিনীটি পশু ও মানবীর কাহিনী হলেও এখানে সাংসারিক কাহিনীর আভাস প্রকট। বানরের স্ত্রী হিসেবে বাধ্য হয়েই মেয়েটি বানরের বাড়ীতে রয়েছে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর জন্য ''থাসতুই'' আনতে বানরের দূরে মানুষের গাঁয়ে যাত্রা, উনুনে চাপানো

মানুষ যে তার নিজস্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ছকেই দেবতাকে কল্পনা করে, তারই বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে "চাঁদের ছেলে" তে, চন্দ্রদেবতা ও কুফুরের মিলনের মধ্য দিয়ে। এও আদিম কোন প্রথারই স্মরণিকা মনে হয়।

নিষিদ্ধ জীবনচর্যা ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিবাদী সুর ঃ বন্যজীবন থেকে সভ্যতায় উত্তরণের পথে মানুষ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করেছে। আদিম কৌম জীবনে যখন নৈতিকতার প্রশ্ন ছিলো না, তখন তার জীবনধারা বয়েছে যেভাবে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর চিন্তা ও চেতনায় নানা পরিবর্তনের ফলে সেই জীবনধারায়ও পরিবর্তন এসেছে এবং গৃহীত হয়েছে সমাজ অনুসারী নিয়মকানুন। প্রাচীন রীতি নিষিদ্ধ হয়ে গেলেও সমাজ দেহের অভ্যন্তরে তার স্মৃতি কিছু না কিছু থেকে গেছে।

এককালে প্রচলিত ও পরে সমাজ অনুশাসনে, নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া একটি প্রথা 'ভাইবোনের বিবাহ'। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজের এক বিশেষ স্তরে পৃথিবীর বিভিন্ন কৌমের মধ্যে ভাইবোনের বিবাহরীতির চল ছিল।

ভারতের সাঁওতাল আদিবাসীদের লোকপুরাণে আছে খেরোয়াল বংশের আদি পিতামাতা পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ীর সাত ছেলে তাদের সাতবোনকে বিয়ে করে।

এছাড়া এস্‌কিমো ও আমেরিকার দক্ষিণ পূর্ব ও ম্যাকেঞ্জি এলাকার রেড ইণ্ডিয়ান আদিবাসীদের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্রকে ঘিরে যে লোককথা রয়েছে, তাতে সূর্য ও চন্দ্র ভাই ও বোন। এদের মধ্যে বিয়ে হয়েছিল।

আফ্রিকার ন্‌গোমবে আদিবাসীদের পৃথিবী বিখ্যাত সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণে মা ম্‌বোক্‌মু নিজেই তার ছেলে ও মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সম্পত্তি অন্যের হাতে চলে না যায়।

নৃবিজ্ঞানী ফ্রেজারের মত হল যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ভাইবোনের বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল

এই নিষিদ্ধ জীবনচর্যার আকাঙ্ক্ষার ও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুরটি ধরা পড়ে ত্রিপুরার লোককথা 'ছাতিম গাছের কাহিনী'র মধ্যে। এই কাহিনীর মূল অভিব্যক্তিই এটি। নিষিদ্ধ জীবনচর্যার আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে ভাইয়ের আচরণে এবং প্রতিবাদের সুরটি পাওয়া যায় বোনের আচরণের মাধ্যমে।

একই মনোভাব ব্যক্ত হয় 'কাঞ্চনমালা' নামক গল্পে। কাঞ্চনমালার ভাসুরকে নিষিদ্ধ জীবন হাতছানি দেয়, কিন্তু প্রতিবাদ প্রচ্ছন্ন হয়ে জাগ্রত থাকে কাঞ্চনমালার চরিত্রে।

নির্বোধের কাহিনী ঃ আদিম মানব তার তুলনায় দৈহিকভাবে বেশী বলশালী পশুকে বুদ্ধির সাহায্যেই বশ করেছে বা হত্যা করেছে। লোককথার পশুরাজ্যেও দেখা যায় বিরাটাকার প্রাণী ক্ষুদ্র প্রাণীর বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়ে নির্বোধরূপেই প্রতিভাত হচ্ছে। এমনকি বনের

পশুরাজ বলে অভিহিত প্রাণীদেরও এমন পরিণতি দেখা যাচ্ছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যারা দৈহিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী থাকে, প্রকৃতিতে তাদেরই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বেশী থাকে। এদিক থেকে 'সজারুর বুদ্ধি'র হাতি, 'মুরগীর পিঠে'র বিড়াল জ্বলন্ত উদাহরণ। সন্তানের সুরক্ষার প্রশ্ন মানব ও মানবেতর প্রাণী সকলেরই মধ্যে খুব প্রবল লক্ষ্য করা যায়। "ধনেশ পাখি"র গল্পে কচাক রায়ের শিশুপুত্রের মৃত্যু হয় পিতার অসাবধানতার জন্য। এটিও বুদ্ধিহীনতারই পরিচায়ক। নির্বোধের কাহিনী সাধারণতঃ হাস্যরসের উদ্রেক করলেও এখানে পরিণতিটি করুণ। অন্যদিকে "একটি মাছির গল্পে" একটি মাছির সাহায্যে যুবকটি যেভাবে প্রত্যেক গৃহস্থের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে চুউান, (মদ বানানোর জন্য যে পিঠে তৈরী করা হয়), মোরগ, ছাগল, গরু এবং অবশেষে স্ত্রী সংগ্রহ করে, তাতে যুবকটি নিজেকে বুদ্ধিমান প্রতিপন্ন করলেও গৃহস্থদের আচরণে বোকামির পরিচয় রয়ে গেছে।

ভৌতিক গালগল্প ঃ আদিম মানুষের কাছে তার নিজের জীবন এবং প্রকৃতির সবকিছুই অসীম রহস্যে আবৃত ছিল। বিশেষ করে মৃত্যুকে ঘিরে নানা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তার মনে। যার ফলে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একটি বিশ্বাস দেখা যায় যে, মৃতব্যক্তি অশরীরী আত্মারূপেই হোক, কি অন্য যে কোন রূপেই হোক জীবিতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। আদিবাসী সমাজেও এই ধারণা বর্তমান। এই ধারণা থেকেই তাদের মধ্যে পরলোক সম্পর্কিত ভূত-প্রেত এবং জন্মান্তরবাদী ধারণার সৃষ্টি। আদিম সমাজের বিশ্বাস এই যে, প্রেতাত্মারা অনেকসময় রোগ জ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিকারের নির্দেশও এরাই বলে দেয়। খাদ্য, পানীয় দ্বারা এদের তৃপ্তি সাধিত হয়। উপজাতি লোককথাগুলোর মধ্যে ভৌতিক গাল গল্প বলে বিশেষ কোনো কাহিনীকে নির্দিষ্ট করা না গেলেও কয়েকটি কাহিনীর মধ্যে ভৌতিক অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়। 'গুল্মকুমারী' গল্পে গুল্ম থেকে সকলের অলক্ষে একটি স্ত্রীলোক বের হয়ে আসে এবং প্রতিরাতে ঘরদোর পরিষ্কার করে নানারকম রান্নাবান্না করে রাখে। তাকে কেটে ফেলা হলেও তার পুনর্জন্ম হয় লেবুরূপে এবং আবারও আগের মতো লেবুর ভেতর থেকে স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে সব কাজকর্ম করে। এভাবে বারবার জন্মান্তরের মাধ্যমে অদৃশ্য নারীর কাজকর্মের মধ্যে ভৌতিক ধারণার প্রকাশ রয়েছে। রোগ মুক্তির জন্য পূর্ব পুরুষের প্রেতাত্মার পুজোর যে ধারণাটি আদিবাসী সমাজে রয়েছে তাই প্রকাশিত হয়েছে পুরোহিত গল্পে 'বুড়াদেবতার' পুজোর মাধ্যমে। ভূতপ্রেত কোনো আকৃতি ধারণ না করেও অদৃশ্য থেকে কথা বলে ব্যাঙের খোলা আশ্রয় করে (দ্রঃ চাঁদের ছেলে) নকছুমৌতায় (গৃহদেবতা) দেবতা হিসেবে আদিবাসীদের গৃহকোণে থেকে যাতে পুজো পায় তার জন্য রাজকুমারীকে নিজের পরিচয় দেয়। পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাই এভাবে কালক্রমে নানারকম দৈবচরিত্র ও নৈসর্গিক বস্তুর প্রাণপুরুষ বলে কল্পিত হয়। কয়েকটি কাহিনী, যেমন 'রাজহাঁসের কাহিনী', 'কথা বলা আংটি', 'এক ফালি লাউয়ের গল্প', 'ছাতিম গাছের কাহিনী' ইত্যাদিতে স্বপ্নে একজন দেবী এসে সংকট ত্রাণের পথ বলে দিয়ে যান। সংশ্লিষ্ট

মানুষেরা এর ফলে সংকট থেকে উদ্ধারও পায়। পূর্বপুরুষের যে সকল প্রেতাত্মা পরিবারের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁরাই এই সমস্ত নির্দেশাবলী দেন। এগুলো আসলে ভৌতিক অভিপ্রায়েরই প্রকাশ।

হাস্যকৌতুক ঃ হাস্যরসাত্মক লোককথা সাধারণতঃ নির্বোধ চরিত্র ইত্যাদিকে ঘিরেই রচিত হয়। কাউকে নির্বোধ মনে করে অন্যে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করে তাতে অনেকসময় প্রচ্ছন্ন থাকে প্রতিহিংসা সফল করার মনোভাব। সামান্য বিনোদন হিসেবেও হাস্যকৌতুকাশ্রিত কাহিনী দেখা যায়। 'একটি মাছির গল্পে' সামান্য একটি মাছি ধরা নিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। অলস ছেলেটি, সকলে কাজ করা সত্বেও বসে থেকে শুধু একটি মাছি ধরে। যেহেতু তার কর্মে অনীহা, তাই বৌদিরা তাকে কৌতুক করে মাছির সাহায্যেই বিয়ে করতে বলে। ছেলেটিও এতে রাজী হয়। কৌতুকরসাশ্রিত কাহিনীটির মধ্য দিয়ে অন্যদিকে শ্রমময় জীবন ও শ্রমবিমুখতার মধ্যেকার বিরোধের সূত্রদুটোও তুলে ধরা হয়েছে। অনেকসময় এই ধরণের কাহিনীতে নির্বোধ বা ভাঁড়ের বুদ্ধির কাছে রাজমন্ত্রী, রাজপরিষদ ইত্যাদিকে নাস্তানাবুদ হ'তে দেখা যায়। এগুলো একদিকে জনগণের প্রতিবাদেরই প্রতীক।

নিরাধার কাহিনী ঃ যে কাহিনীতে কোনো নিটোল আখ্যান পাওয়া যায় না তাকেই নিরাধার কাহিনী বলে। 'সব কালাদের এক ঘর' নামক উপজাতি লোককথাটিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। দৈহিক দিক থেকে অক্ষম মানুষেরা যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে কত অসহায় হয়ে পড়ে এবং সমাধানহীন জটিলতার আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খায়, তারই প্রমাণ এই কাহিনীটি। জটিলতার সৃষ্টি হয় বধিরতার জন্য। এই কাহিনীর অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নেই। পড়শীদের সহায়তা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার সামাজিক উপাদান ও তার দ্বান্দ্বিক সূত্র

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার মোটিফ ঃ

একটি লোককথার কাহিনী ব্যবচ্ছেদ করলে যে এক বা একাধিক কাহিনী অংশ পাওয়া যায় তাকেই মোটিফ বলা হয়। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক, বিভিন্ন ঘটনার নানারকম বিশিষ্টতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এই মোটিফগুলো গড়ে উঠে। সাধারণতঃ এগুলোর মধ্যে অসাধারণত্ব থাকে। খণ্ড খণ্ড এই কাহিনী-অংশগুলো নিয়েই একটি সমগ্র কাহিনী গড়ে উঠে। ষ্টীথ টমসনের ভাষায় মোটিফ-এর সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে এভাবে— "A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it." (১)

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'নর ও নারীতে বিবাহ' একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র। এটি কোনো motif নয়। তেমনি 'কথা বলা মানুষ'ও কোনো motif নয়। কিন্তু 'পশু মানুষে বিবাহ' এবং 'কথা বলা পাখি' মোটিফ। বৃষ্টিতে নদী, পুকুরের জল বৃদ্ধি পাওয়া সাধারণ ঘটনা। কিন্তু সতীস্ত্রীর অশ্রয়দানার্থে 'ঝর্ণার জল ফুলে উঠা' একটি মোটিফ। এই ধরণের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই মোটিফের চরিত্রকে চিহ্নিত করে।

প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানী ষ্টীথ টম্‌সন তাঁর ছয় খণ্ডে সমাপ্ত Motif Index of Folk Literature গ্রন্থে Motif বা অভিপ্রায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং অসংখ্য মোটিফকে প্রণালীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জীবন ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত বলে লোককথার আলোচনায় এই তালিকা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। (২)

চরিত্র বা ঘটনার মোটিফকে অবলম্বন করে এক একটি কাহিনীরও মূল মোটিফ সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ কোনো সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার মানসেই গল্পের মধ্যে মূল অভিপ্রায়কে চিহ্নিত করা হয়। লোককথার একটি বিশেষত্ব এই যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট মৌলিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে মোটিফ রচিত হয়। মৌলিক বিষয়বস্তুগুলো দেশে দেশেও প্রায় অভিন্ন। মোটিফ-এর এই অভিন্নতার জন্য দেশ দেশান্তরে কাহিনীর প্রচারও সহজসাধ্য হয়। তবে প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব স্থানীয় আচার আচরণ, জীবনধারা পদ্ধতি এবং সমস্যাবলী থাকার ফলে এই অভিন্নতার মধ্যেও মোটিফ-এর ক্ষেত্রে কিছু নবতর সংযোজন বা পরিবর্তনের সম্ভাবনাও থাকে। তাছাড়া প্রত্যেক জাতিরই সংস্কার অনুযায়ী এক একটি অভিপ্রায় গুরুত্ব লাভ করে থাকে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য থেকেই দেখা যায় যে পশুর সঙ্গে মানুষের বিয়ে, সৎমায়ের নির্দয়তা জাতীয় উপাদানগুলো ত্রিপুরার লোককথায় একটি বিশেষ মোটিফে পরিণত হয়েছে।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকগুলো কাহিনীতেই 'দশ গাঁয়ের সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের গাঁ'— এই শব্দবন্ধটি রয়েছে। এক একটি 'পাড়া' গঠনে "ছ'কুড়ি ছ'ঘরের" অবস্থানটি বোঝানো হচ্ছে এই শব্দ বন্ধটি দিয়ে। এই বিশেষ সংখ্যাটি অনেকগুলো লোককথার শুরুতেই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, পুরোহিত, উইপোকা স্বামী, গুল্মকুমারী, কথা বলা আংটি, ছিপিংতুই মাইরুংতুই, অজগর সাপের গল্প ইত্যাদি। বহুল ব্যবহারের ফলে "ছ কুড়ি ছ'ঘরের গাঁ" একটি Motif-এ পরিণত হয়েছে। (৩)

একটি কাহিনীতে যে একটিমাত্র অভিপ্রায় থাকে, তা নয়। অনেকগুলো অভিপ্রায় থাকতে পারে এবং বিভিন্ন অভিপ্রায় বিভিন্নমুখীও হ'তে পারে। (৪) মোটিফ লোককথার একটি বিষয়মাত্র। প্রত্যেক জাতিই নিজের দিক থেকে এক একটি বিষয়ের উপর জোর দেয়। প্রতিটি লোককথা একটি উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। এই উদ্দেশ্য সকল জাতির কাছে এক নয় বলেই প্রত্যেক জাতির লোককথায়ই পার্থক্য থাকে। তাই দেখা যায় ত্রিপুরার লোককথায় কাহিনীর বর্ণনা কখনো দীর্ঘ কখনো সংক্ষিপ্ত। সরল সংক্ষিপ্ত কাহিনীগুলোতে মোটিফের সংখ্যা যেমন কম, তেমনই দীর্ঘ ও জটিল কাহিনীগুলোতে অভিপ্রায়ের সংখ্যাও বেশী। তবে মূল অভিপ্রায় সাধারণতঃ একটি বা দুটি রয়েছে।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার মোটিফ নির্ণয়ের মাধ্যমে এখানকার উপজাতি জনমানসের স্বরূপটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। এই অভিপ্রায় বিন্যাসের অন্তরালে এখানকার মানুষদের মনটিও যেন দেখা যায়।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী লোককথার মোটিফগুলো অভিন্ন। কাহিনীবিন্যাস যেমনই হোক, মোটিফগুলো অভিন্ন থেকে কাহিনীকে এক নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। লোককথার একটি সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, এতে কনিষ্ঠপুত্র, কনিষ্ঠাকন্যা কিংবা কনিষ্ঠা পুত্রবধূ অসাধ্যসাধন করে। পাশ্চাত্য লোকশ্রুতিবিদগণ একে Successful youngest son (daughter or daughter in law) মোটিফ বলেছেন। এটি একটি অসাধারণ চরিত্র (৫)। ত্রিপুরার লোককথায়ও মোটিফ্ বিচারে এই অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। 'বানরবর' কাহিনীতে দেখা যায় ছয়টি মেয়ে একে একে বানরের হাত থেকে মুক্তি পেলেও ছোট মেয়েটি বানরের খলত্বের শিকার হয়ে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধির সাহায্যে ছেলে সহ 'বানরবর'-এর হাত থেকে সে মুক্তি পায়। এই কাহিনীতে একদিকে রয়েছে এই বিশ্বজনীন অভিপ্রায়টি অন্যদিকে 'খলের শাস্তি' অভিপ্রায়টিও রয়েছে। দুটো অভিপ্রায়ই এখানে মুখ্য অভিপ্রায়।

জয়ী কনিষ্ঠাকন্যা মোটিফটি পাওয়া যাচ্ছে 'উইপোকা স্বামী', 'ছাতিম গাছের কাহিনী' এবং 'অজগর সাপের গল্প' লোককথা গুলোতে। 'উইপোকা স্বামী'তে বড়ো বোন অজগর দ্বারা ভক্ষিত হয়। ছোটবোন শাপগ্রস্ত উইপোকাকে বিয়ে করেও পরে শাপমুক্তির ফলে রাজরাণী

হয়। এই কাহিনীটিতে অন্যান্য মোটিফের সঙ্গে দুটো মূল মোটিফ লক্ষ্য করা যায়। একটি হ'ল অভিশাপের দ্বারা রূপান্তর ও অন্যটি বিজয়িনী কনিষ্ঠা কন্যা। অভিশাপের দ্বারা রূপান্তরটি Magic রূপান্তরের অন্তর্গত Motif D 525। বিজয়িনী কনিষ্ঠা কন্যা মোটিফটি ভাগ্যের খেলা' মোটিফের অন্তর্গত। Motif L 50। আবার কুমার রূপে রূপান্তরিত হওয়ার মোটিফটি এসেছে কোনো নারী কর্তৃক স্বামীরূপে বৃত হবার ফলে। এর Motif D 789 । 'ছাতিমগাছের কাহিনীতে'ও বিজয়িনী কনিষ্ঠা কন্যা মোটিফটি পাওয়া যাচ্ছে। ভাইয়ের অন্যায় কামনার হাত থেকে দৈবী সহায়তায় মেয়েটি মুক্তি পায় ও নীলাকাশে মেঘের রাজ্যে চলে যাওয়ার ভেতর দিয়ে এই মোটিফ্‌টি এসেছে। আবার 'অজগর সাপের গল্পে' ছোটবোনের অনেক দুর্বিপাক ও দুর্ভাগ্য অতিক্রম করে রাজরানী হয়ে সুখে সংসার করার ভেতর দিয়ে এই মোটিফ্‌টি প্রকাশিত হচ্ছে। রাজার অন্য সাত রানীর ঈর্ষার শিকার হয়ে কষ্টভোগ করে অবশেষে ছোটরানী তার সাত ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে রাজবাড়ীতে রাজা সহ সুখে বসবাস করার মধ্যে পরিত্যক্ত নারীর পুনরুদ্ধার এবং দাম্পত্য জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠাও অন্যতম অভিপ্রায়। তবে 'সুযোগ ও ভাগ্য (chance and Fate) মোটিফটিই এই কাহিনীর সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই মোটিফটি বাংলাদেশের কোনো কোনো রূপকথায় পাওয়া যায়। যেমন "সাত ভাই চম্পা" ইত্যাদি।

লোককথায় নারীর 'সতীত্ব' একটি অতি পরিচিত মোটিফ। বিশেষ করে সতীনারী কতগুলো অলৌকিক শক্তির অধিকারিনী হয়। (৬) এই শক্তির বলেই সে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। রামায়ণে "সীতার অগ্নিপরীক্ষা" এর নিদর্শন। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে জয় নিশ্চিত হবার ফলে 'সতীত্ব' মোটিফটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ত্রিপুরার লোককথায়ও। অজগর সাপের গল্পে এই মোটিফটি T 300।

"রক্ত পিপাসু দেবতা" কাহিনীতে দেখা যায় যে, দেবতাদের অসাধ্য কিছু না থাকা সত্ত্বেও দেবতারা একটি দুরন্ত মোষের হাতে পড়ে অসহায় অবস্থায় প্রাণ বাঁচাতে গাছে চড়েছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তারা সতীনারী হীরাবতীর শরণাপন্ন হয়েছেন। অবশেষে মহারানী হীরাবতীর রিছা (বক্ষবন্ধনী) মোষটির পিঠে ফেলে তাকে বশ মানানো হয়। মোষটিকে বশ মানানোর এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ভেতর দিয়ে রাণীমার সতীত্বের ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই সতীত্বের জোরেই রানীমা দেবতাদেরও তিরস্কার করতে পারেন। একই অভিপ্রায় দেখা যায় "অজগর সাপের গল্পে"ও। বড়বোন অজগরের স্ত্রী অলৌকিক শক্তিসম্পন্না। তার গানে ঝর্ণা ফুলে ফেঁপে উঠে এবং সে জলপুরীতে তার স্বামী অজগর সাপের সঙ্গে বাস করার জন্য চলে যায়।

'চাঁদের ছেলে' গল্পেও রাজকুমারী মানসিক স্থৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়ে অভিশপ্ত সোনাব্যাঙকে পতিরূপে বরণ করে। পরে শাপমোচনের ফলে সোনাব্যাঙ প্রকৃত রূপ ফিরে পায়। বিদেশী রূপকথায়ও এই ব্যাপারটি রয়েছে। Frog prince নামক কাহিনীটি উল্লেখ্য। বানর ও সাপের সঙ্গে মানবীর বিবাহ ইত্যাদির দ্বারা পশু ও মানবের বিবাহের মোটিফ ও রূপান্তরের বিশ্বজনীন মোটিফ্‌ দুটোই ত্রিপুরার লোককথায় এভাবে পাওয়া যায়।

'সর্পের প্রতিহিংসা' মোটিফটিও লোক সাহিত্যের একটি সর্বজনীন বিষয়। একে Revengeful Serpent Motif বলা হয়। (৭) "পুরোহিত" নামক লোককথাটিতে দেখা যায় এই মোটিফটি। বিধবার ছেলে জুমপোড়া দিলে নাগরাজার ছেলেমেয়েরা সেই আগুনে পুড়ে মারা গেল। রাগে দুঃখে নাগরাজা ছেলেটিকে সাজা দেবার জন্য ওদের ঘরটাকে সাতপাকে জড়িয়ে ধরে ভীষণ আক্রোশে ফুঁসতে লাগলো। " অজগর সাপের গল্প"তেও এই অভিপ্রায় প্রকাশিত। বড়বোনের অজগরস্বামী অচাইয়ের হাতে হ'ত হয়েছিলো ছোটবোনের কারণেই। এজন্যই পরে অজগর (পুনর্জন্ম পেয়ে) ছোটবোনকে অভিসম্পাত দেয় যে, সে কখনো সুখী হতে পারবে না। Revengeful Serpent Motif টি "অজগর সাপের গল্পে" বেশী প্রকট। "পুরোহিত"— এ নাগরাজাকে প্রত্যক্ষভাবে শারীরিক আঘাত করা হয় নি। ছেলেমেয়েরা পুড়ে মারা যাওয়াতে সে মানসিকভাবে আহত হয়েছে। এখানে Injured snake Avenges মোটিফটিও প্রকাশিত।

"পুনর্জন্মলাভ"ও ত্রিপুরার লোককথার একটি মূল মোটিফ। অনেকগুলো কাহিনীতেই এই মোটিফটি নানাভাবে দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন লোককথায় দেখা যায় যে মানুষের দেহ ধ্বংস হয়ে গেলেও তার আত্মা ক্ষুদ্রতর কোনো জীব বা জন্তুর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে (৮) কখনো তা পাখি, প্রজাপতি, ইঁদুর, কখনো বা অন্যকিছু।

এখানকার "গুল্মকুমারী" কাহিনীতে গুল্মের মধ্যে কুমারীর অবস্থান। দিনের বেলায় সে সুগন্ধি গুল্মকুমারী, কিন্তু রাতে সকলের অগোচরে বেরিয়ে এসে গৃহস্থালীর সকল কাজ সম্পন্ন করে রাখে। "ছিলাইকুমারী" কর্তৃক গুল্মটি কেটে ফেলার পর সেটি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হ'ল লেবুরূপে। এভাবে লেবু থেকে লাউ, লাউ থেকে ল্যাটা মাছ, ল্যাটা মাছ থেকে নারকেল-এ ক্রমাগত তার পুনর্জীবনপ্রাপ্তি ঘটতে থাকে। " পুনঃপুনঃ জন্মান্তর" এই মোটিফটিতে সর্বপ্রাণবাদের আভাসও পাওয়া যায়। পুনর্জীবনপ্রাপ্তির মোটিফটি পাওয়া যায় "কথা বলো না" গল্পেও। দু'বোনকে রাজার লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়ে দাসী করে রাখার ফলে এরা কেঁদে কেঁদে একদিন মরে গলে। পরবর্তী জীবনে আবার দুবোন পাখি হয়ে জন্মালো।

এই মোটিফটির কারণেই কাহিনীটিতে মিথ্-এর ছোঁয়া পাওয়া যায়।

এই মোটিফ্ দেখা যায় "কথা বলা আংটি" কাহিনীতেও। বড় ভাই শকুনের ডিম খেয়ে শকুনে রূপান্তরিত হয়ে গেল। পাখিরূপে জন্মান্তর বিষয়টি 'ধনেশ পাখির গল্প'তেও দেখা যায়। স্ত্রীর অভিশাপে স্বামী পরজন্মে ধনেশপাখী রূপে জন্মগ্রহণ করে। "স্বর্গের ফুল রান্না"তে স্ত্রীর জন্মান্তর ঘটে "মুকুফ্" রূপে। "অজগর সাপের গল্পে" অজগর এর পুনর্জন্ম হয় মানুষরূপে। 'প্রতিজ্ঞা' গল্পে গেরস্তের মেয়ে মৃত্যুর এক বছর পর আবার জন্মগ্রহণ করে রাজার মেয়েরূপে। এই মোটিফটিও বিশ্বজনীন। প্রসঙ্গক্রমে বিদেশী "স্নো হোয়াইট এণ্ড রোজ রেড্" গল্পের (৯) উল্লেখ করা যায়। একটি বামনের অভিশাপে এক রাজপুত্র ভালুকে পরিণত হয়। পরে বামনকে মেরে ভালুক তার 'রাজপুত্র' রূপটি ফিরে পায়। এইরকম আরো অসংখ্য কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে দেশবিদেশের লোককথার ভাণ্ডারে।

ছেলেমেয়েদের উপর সৎমায়ের ঈর্ষা ও নির্যাতন একটি বিশ্বজনীন সাধারণ অভিপ্রায়। "উইপোকা স্বামী", "ছিপিংতুই মাইরুংতুই", "নাঐ পাখির গল্প" ইত্যাদিতে এই মোটিফ্‌টি দেখা যায়। সৎ-মায়ের এবং সৎ-বোনের ঈর্ষার এই রূপগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিশ্ববিখ্যাত "সিণ্ডেরেলা" অথবা "স্নো হোয়াইট এণ্ড দ্য সেভেন ডোয়ার্ফস্‌" নামক রূপকথাগুলো অথবা কংগোর ম্‌পোংগোয়ে আদিবাসীদের "যাদু আয়না ও সুন্দরী মেয়ে" লোককথাকে (১০) সবগুলো বিদেশী কাহিনীতেই যেমন নির্যাতিতা মেয়েটির জয় হয় কোনো না কোনোভাবে, তেমনি ত্রিপুরার কাহিনীতেও সৎমায়ের নির্যাতন শেষে জয় সূচিত হয় সপত্নীকন্যাদেরই।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা "উইপোকাস্বামী" "ছিপিংতুই মাইরুংতুই" ইত্যাদিতে এই ঈর্ষার প্রকাশ দেখা যায়। "নাঐ পাখির গল্পে" ও দেখি বিমাতার দেয়া যন্ত্রণার কথা। এখানে বাবা ঠাকুমাও জড়িত। যার ফলে মেয়েটি নাঐ পাখিরূপে উড়ে যায় মুক্তজীবনের সন্ধানে। "মানুষের পাখিতে রূপান্তর" রূপকথার এক অনন্য মোটিফ।

"খলের শাস্তি"র চিরন্তন মোটিফটি পাওয়া যাচ্ছে "বানর বর", "মুরগীর পিঠে", "ছিপিংতুই মাইরুংতুই" "অজগর সাপের গল্প" ইত্যাদিতে।

"অনেক আদিম জাতির মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, স্ত্রীলোকের সন্তানলাভের পুরুষ সংসর্গের প্রয়োজন নেই। স্ত্রীলোক যদি চাঁদের দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকে তাহলে সে জন্য গর্ভবতী হয়।" (১১) মধ্যযুগে লিখিত শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের চন্দ্রকরচে আছে—

সোমবারে মহেশানি কৃত্বোপবসনং মুদা
সায়ং সোমং সমভ্যর্চ্য কবচং দ্বি পঠেৎ যদি
মাসমধ্যে মহেশানি পুত্রবান স ভবেৎ ধ্রুবম।।

সোমদেবের কৃপায় মানুষ পুত্রবান হয়, এই ধারণাটিই এখানে প্রতিষ্ঠিত। এই বিশেষ মোটিফটি লক্ষ্য করা যায় ত্রিপুরার লোককথা "চাঁদের ছেলে"তে। সেখানেও চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়েই কুফুর সন্তানসম্ভবা হয়। পুরুষের সাহচর্য ছাড়া নারীর সন্তান হ'তে পারে, এই বিশ্বাস আদিযুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষদের মধ্যেও ছিল। এই কারণেই যীশুমাতা মেরী কুমারীমাতা হিসেবে পরিচিতা।

মহাভারতের কর্ণের জন্মকাহিনীও অনুরূপ। এই চাঁদের ছেলে কাহিনীরই আরেকটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ, নারী কর্তৃক ব্যাঙের জন্মদান। এটিও রূপকথারই একটি অভিপ্রায়। নারী — জননীর গর্ভে ব্যাঙের জন্মের কারণ হিসেবে রয়েছে কোনো এক দেবতার অভিশাপ।

"পশুপক্ষীরূপী সন্তানেরা নরনারীরূপী জনকজননীকে নানাভাবে সহায়তা করে এবং তারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে অসাধ্যসাধন করে"। (১২) এই দুটো মোটিফই "চাঁদের ছেলে" লোককথাটিতে পাওয়া যাচ্ছে।

বিভিন্ন চরিত্র ও দ্বন্দ্বের স্বরূপ ঃ

সমাজ পরিবেশে একত্রে বসবাসকারী সকলের মধ্যেই যেমন একটি পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব থাকে, তেমনিই প্রত্যক্ষগোচরতার অন্তরালেও থাকে একটি প্রতিকূল মনোভাব, যা সমান্যতম প্ররোচনাতেও একে অপরকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। এই মনোভাবই সমাজে দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। দ্বন্দ্ব যদিও কখনোই বাঞ্ছিত বলে বিবেচিত হয় না, তবু সমাজ জীবনে এটি নিত্য সহচর রূপেই বর্তমান থাকে। বলা যায় সমাজব্যবস্থার মধ্যেই দ্বন্দ্বের বীজ সুপ্ত থাকে। চিন্তায়, ভাবনায়, বিচারে এবং মূল্যায়নে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেলেই দ্বন্দ্ব বা বিরোধের সূচনা হয়। (১৩) লোককথা যেহেতু সমাজমানসেরই চিত্র তুলে ধরে, তাই দ্বন্দ্বের চিত্রটিও সেখানে স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত থাকে। ত্রিপুরার লোককথার বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে এই দ্বান্দ্বিক পরিবেশের আভাস লক্ষ্য করা যায়।

"রক্তপিপাসু দেবতা'য় মোষ ও চৌদ্দজন দেবতার দ্বন্দ্বে দেবতাদের প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা জাতিগত দ্বন্দ্বের পরিচায়ক। লোককথার এই দ্বন্দ্বের চিত্র শুধু মানুষে মানুষে অথবা পশুতে পশুতে সীমাবদ্ধ নয়। তা কখনো মানুষে পশুতে, কখনো মানুষে দেবতায়ও লক্ষ্য করা যায়। এই একই কাহিনীতে রানীমা ও দেবতাদের মধ্যেও দ্বন্দ্বের চিত্র দেখা যায়। এটি গড়ে উঠেছে অনবধানবশতঃ রানী কর্তৃক দেবতাদের রুধিরভোগের আয়োজন না করার জন্য। এখানে অধিকার প্রতিষ্ঠার ভাবনাটি যেমন কার্যকরী, অপরদিকে চৌদ্দজন দেবতার রক্তপানজনিত স্বার্থপূরণ না হওয়াতে এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। অন্যদিকে রানীমা নিজ কর্তব্যকর্মে অবিচল এবং তন্নিষ্ঠ থাকার প্রচেষ্টা রেখেও দেবতাদের অবিচারের (স্বীয় পুত্রের রক্ত পানের দ্বারা) শিকার হওয়ায় তাঁর মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বন্দ্বটির মূলে রয়েছে পদমর্যাদা ও আত্মজের অহিতকরণ। রাজাকে (রানী) ঈশ্বরের প্রতিভূ বলেই মনে করে জনসমাজ। সুতরাং রানী কর্তৃক দেবতাদের তিরস্কারের মধ্যে সেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রকাশ হয়েছে বলেই মনে করা হয়। "বানর বর" কাহিনীতে এই দ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট হয়েছে মেয়েটির মাধ্যমে। "পশুর সঙ্গে ঘর করা" অসহনীয় হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। এই দ্বন্দ্বকে মানব ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা যেতে পারে। বানর যেহেতু অরণ্যচারী, তাই এই দ্বন্দ্বকে অরণ্যচারী গোষ্ঠীর সঙ্গে উন্নত গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব বলেও মনে করা যেতে পারে। অন্যদিকে দ্বন্দ্বের অন্য একটি চিত্র ফুটে উঠেছে 'উইপোকা স্বামী", নামক কাহিনীটিতে। সপত্নীকন্যা রাজরানী হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত ঈর্ষা থেকে ব্যক্তিস্বার্থজনিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে" চাষী বৌয়ের মনে।

"গুল্মকুমারী" কাহিনীতে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে ছিলাইকুমারীর মনে, গুল্মকে ঘিরে। এখানে দ্বন্দ্বের মূল কারণ গুল্ম। লকই গুল্মকে ভালোবেসে ফেলায় স্বামীর উপর অধিকার হারানোর ভাবনা থেকেই ছিলাইকুমারীর মধ্যে এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। বারবার গুল্ম রূপান্তরিত জীবন পেলেও সে তাই তাকে কেটে ফেলে। এখানে দ্বন্দ্বের স্বরূপটি ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক।

সংঘাতের চিহ্নটি আবার অন্তর্লীন হয়ে আছে "কথা বলোনা" কাহিনীতে। রাজা সর্বশক্তিমান বলে তার নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ মুখ খোলার অধিকার বা সাহস পায় না। এই অন্তর্লীন শ্রেণীস্বার্থসম্পর্কিত দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে জুমিয়ার মেয়ে দুটি।

'বিচার' কাহিনীতে দেখা যায়, সেখানে ব্যাঙ আর চামচিকের মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও সাধারণ দু-একটি কথা থেকে যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'ল তা-ই প্রমাণ করে দেয় যে দ্বন্দ্বের বীজ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার ভিতরেই নিহিত থাকে। পশুসমাজের এই দ্বন্দ্বময় চিত্রই আমাদের সমাজজীবনেও একইভাবে চিত্রায়িত হ'তে দেখা যায়। পারস্পরিক ঈর্ষা ও অসন্তুষ্টিই এই ধরণের দ্বন্দ্বে ক্রিয়াশীল থাকে।

"মুরগীর পিঠে" কাহিনীতে বিড়াল ও মুরগীর দ্বন্দ্ব ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কিত হলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দ্যোতক। মুরগী দুর্বলতর গোষ্ঠীর প্রতিভূ হয়ে বুদ্ধিবলে এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে।

"কথা বলা আংটি" গল্পে দাদু-দিদিমাও নাতিদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তা দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা উদ্ভূত হ'লেও সেটা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। অসমবয়সী নাতিদের প্রতি দাদু-দিদার এই মানসিকতা স্বার্থপরতারই নামান্তর। অন্যদিকে "একফালি লাউ" কাহিনীতে দুইবোনের মধ্যেকার দ্বন্দ্বময় অবস্থাকে অর্থনৈতিক অসাম্যজনিত দ্বন্দ্ব হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। ধনী ও দরিদ্রের এই দ্বন্দ্ব আধুনিক সমাজ ব্যবস্থারই অঙ্গবিশেষ। অর্থবান সবসময়ই মনে করে দরিদ্র চোর ও প্রবঞ্চক হয় যার ফলে দরিদ্রের প্রতি ধনীর অবিশ্বাসের ব্যাপারটা জন্মলব্ধ ধারণার মতো হয়ে উঠে। এই ভাবনাটিই প্রতিফলিত হচ্ছে বড়বোনের প্রতি ছোটবোনের আচরণে। দু'বোন এখানে সমাজের দুটো স্তরের প্রতিনিধি।

"ধনেশ পাখির গল্পে" কচাক ছাম্পারিকে সামান্য কারণেই বকুনি দিতো অথচ ছাম্পারি তাকে ভালোই বাসতো। এখানে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপসারণ ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার ফলে উদ্ভূত এক মানসিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছে। স্ত্রীর উপর আপন অধিকার বিস্তারের মোহটিই কচাকের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

"সজারুর বুদ্ধি" গল্পে অসম আকৃতির দুই প্রাণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। বনের পশুরাজ হাতি ও ছোট প্রাণী সজারু উভয়েই আপন মর্যাদার প্রতি সচেতন। পশুর রূপকের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় যে এটি সমাজে শাসকশ্রেণী ও শাসিতশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্বল শাসিত শ্রেণীর এটি এক প্রতিবাদ বিশেষ। আদিম কৌমজীবনে দ্বন্দ্ব ছিলো না। পরবর্তী শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির চিত্র এটি। বশ্যতা স্বীকার নয়। প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। হাতির প্রতি সজারুর ব্যবহারে সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নিচের তলার মানুষের বিদ্রোহ ও সংগ্রামী মনোভাব প্রকাশিত।

"সব কালাদের একঘর" কাহিনীতেও একটি পরিবারের সকলে কানে শুনতে পায় না বলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও তা থেকে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। বধিরতা মানুষের জীবনের এক মস্ত বড় অভিশাপ।

সুযোগসন্ধানী মানুষ এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে দৈহিকভাবে অক্ষম মানুষকে নানাভাবে বিরক্ত করে। তার ফলে জন্ম নেয় হীনম্মন্যতাবোধ। যা পরবর্তীকালে অক্ষম মানুষের মনে জন্ম দেয় ক্রোধ ও দ্বন্দ্বের।

"প্রতিজ্ঞা" নামক লোককথায় রাঙ্গিয়ার সঙ্গে সাদা হাতি ও রাক্ষসী চাক্‌বাইয়ামার যে সংগ্রাম তা-ও আসলে সামগ্রিক দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি। দ্বন্দ্বের পরিধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েই যুদ্ধের আবহ সৃষ্টি করেছে। ভুতুয়ার মধ্যে লোভ, স্বার্থপরতা ইত্যাদিও রাঙ্গিয়ার প্রতি তার দ্বন্দ্বমূলক মনোভাবের পরিচায়ক।

অন্যদিকে "ছাতিমগাছের কাহিনী"তে রয়েছে ভাইয়ের নিষিদ্ধ কামনার প্রতি বোনের প্রতিবাদ। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে পুরনো মূল্যবোধের সঙ্গে নতুন মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব। এছাড়াও মনে হয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অপসারণ ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে উদ্ভূত এক মানসিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বও এখানে প্রকটিত।

ছিপিংতুই মাইরুংতুই-এ দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে উঠেছে দুই বোনের মধ্যে। মা-মরা ছিপিংতুই গৃহকর্মে দক্ষতা প্রকাশ করায় ছোটবোন মাইরুংতুই-এর মনে তা ঈর্ষার উদ্রেক করে। ঈর্ষা থেকেই সে বড়বোনকে ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে। এখানে দ্বন্দ্বের স্বরূপটি ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক।

"অজগর সাপের গল্প" নামক কাহিনীতে প্রাথমিকভাবে দ্বন্দ্ব দেখা যায় অচাইয়ের মনে। অজগরকে তার মেয়ে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করায় অচাই ক্রোধান্বিত হয়ে অজগরকে হত্যা করে। সমাজ পারিপার্শ্বিকে জামাই কখনো শ্বশুরের কাছে "আপনজন" বলে গৃহীত হয় না।

এখানেও কন্যাকে হস্তান্তর করার মধ্যে পিতার অধিকার হারানোর মর্মবেদনাটিই দ্বন্দ্বমূলক মনোভাবের সৃষ্টি করে। এই কাহিনীটিতেই সাতরানী ছোটরানীকে ঈর্ষা করে। যেহেতু রাজা সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন ছোটরানীকে, ছোটরানীর উপর অন্যরানীদের প্রভূত্ব করার ইচ্ছা থেকে এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

"চাঁদের ছেলে" কাহিনীটিতেও দ্বন্দ্বের একটি অন্তর্লীন চিত্র দেখা যায় গ্রামবাসীরা কুফুরকে গ্রাম থেকে নির্বাসিত করার মধ্যে। চন্দ্রমাদেবের ঔরসে কুফুর সন্তানসম্ভবা হলে গাঁয়ের সকলেই তা অবিশ্বাস করে। এখানেও পুরনো মূল্যবোধ ও নতুন মূল্যবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় পুরাকাহিনীতে দেবতার সঙ্গে মানুষের মিলন ছিল একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। গৃহে "নক্‌ছুমীতায়" এর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দেবতা ও লৌকিক দেবতার দ্বন্দ্বের ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। এখানেও লৌকিক দেবতার পুজো প্রচলন তথা আপন অধিকার বিস্তারের প্রসঙ্গটি লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন উপজাতি সমাজে সব প্রজাকেই যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধে যোগ দিতে হ'ত বাধ্যতামূলকভাবে। রাজার আদেশ অমান্য করার কোনো সুযোগ ছিল না। শ্রেণীস্বার্থবিরোধী দ্বন্দ্বমূলক মনোভাব লক্ষ্য করা যায় স্বামীর সঙ্গে কাঞ্চনমালার কথোপকথনের মধ্যে।

সমাজে একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদনে ভাগ বসিয়ে বিনাশ্রমে অনেক সুখসুবিধা ভোগ করতে চায়। এর প্রতীক বড়ো বোন খুম্‌তি। অন্যদিকে পরিশ্রমী মানুষও তার আয়াসলব্ধ অংশ ছাড়তে রাজী নয়। পারস্পরিক স্বার্থ ব্যাহত হবার ফলেই "নাঐ পাখির গল্প" কাহিনীতে দুই বোনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

কল্যাণ ও অকল্যাণের ধারণা ও শুভ অশুভের দ্বন্দ্বময় ক্রম পরিণতি ঃ

মানুষ বিধিশাসিত সমাজে বাস করে বলে তার পক্ষে যথেচ্ছ আচরণ করা সমাজের পক্ষে গর্হিত হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘ জীবনচর্যার অভিজ্ঞতায় মানুষ শিখেছে কোন্‌টা তার কাছে গ্রহণীয়, কোনটা বর্জনীয়। এই বিধিনিষেধ ও অনুশাসনগুলোই মানুষের জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। (১৪)

প্রকৃতি ও আপন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যে জীবন পরিক্রমা করতে করতে এবং প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই আদিম মানুষ কল্যাণ-অকল্যাণ, শুভ ও অশুভের ধারণা গড়ে নিয়েছে। এই ধারণা বা মূল্যবোধ জীবনপ্রণালীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ত্রিপুরার লোককথার মধ্য দিয়েও এই বিষয়গুলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

আশ্রয়প্রার্থী ও অতিথি সর্বত্রই বিশেষ সম্মানের অধিকারী হন। গৃহস্থ সর্বতোভাবে তাঁর পরিচর্যার চেষ্টা করে। কোনো কোনো সমাজে অতিথি হন দেবতাতুল্য। তাঁর সেবায় যেন কোনো ত্রুটি না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। অতিথিসেবায় ত্রুটি হলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। এই ধারণাটিরই প্রকাশ দেখা যায় "রক্তপিপাসু দেবতা"য়। রানীমা সেখানে নিজে প্রতিদিন গৃহাশ্রিত চৌদ্দজন দেবতার ভোগ নিবেদন করেন স্বহস্তে রান্না করে। প্রতিদিন দেবসেবা অবশ্য কর্তব্য বলে গ্রহনীয়। এই কল্যাণজনক ধারণাটিও এখানে প্রকাশিত।

"জুমে"র কল্যাণ কামনায় বনজঙ্গল পুড়িয়ে দেবার আগে বনের সব দেবদেবীদের পুজো দেওয়া হয়। এর মধ্যে (দ্রঃ 'পুরোহিত') কল্যাণের ধারণাটি প্রকাশিত। সর্বপ্রাণবাদী ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতির সমস্ত কিছুতে প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়ায় উপজাতি সমাজ জুম পোড়াবার আগে বনের সব দেবদেবীকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে পুজো দেয়। পুজো না দেওয়ার জন্য শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্যেই সাপ কর্তৃক সাতপাকে ঘর জড়িয়ে রাখার ধারণাটি প্রকাশিত। সাত জুমের মাটি, সাত পুকুরের জল, সাতটা মশাল — এগুলো মঙ্গলসূচক। বিশেষতঃ সাত সংখ্যাটি সৌভাগ্যসূচক সংখ্যা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। (১৫)

স্ত্রীর কাছে পতিই দেবতা। সমাজ মানসে এই ধারণাটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী যদি অযোগ্য হয়, তবুও পতির কল্যাণেই স্ত্রীর কল্যাণ। তাই স্বামী উইপোকা হলেও (দ্রঃ উইপোকা স্বামী) অথবা অজগর হলেও স্বামী হিসেবে এদের বরণ করে নিতে বাধ্য হয় চাষীর দুই মেয়ে।

"রাজহাঁসের কাহিনী'তে পুজো শেষে সকলকে ব্রতকথা শোনানোর মধ্যে মঙ্গলের ধারণাটি নিহিত রয়েছে।

সংসারের সৌন্দর্যের চাবিকাঠি থাকে গৃহকর্ত্রীর হাতে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটি লক্ষ্য করা যায়। রমণীয়তা, পরিচ্ছন্নতা, সদাচার ইত্যাদি দ্বারা নারী সংসারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সংসারের কল্যাণময় রূপটি এভাবেই প্রকাশিত হয়। "গুল্মকুমারী" কাহিনীতে এই ধারণার বিপরীত আচরণের ফলে ছিলাইকুমারীর মধ্যে অকল্যাণের রূপটি ফুটে ওঠে। ফলে তাকে এখানে "জ্যান্ত রাক্ষসীর" সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

পাঁচ তরকারী ও ভাত রাঁধার জন্য শ্রীময়ীর লক্ষণ ফুটে উঠেছে গুল্মকুমারীর মধ্যে। সে থালাবাসন ধুয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখে সকলের অলক্ষ্যে।

কৃষির কল্যাণকামনায় যেমন জুম পোড়ানোর আগে বনের বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পুজো দেবার প্রচলন রয়েছে, তেমনি শস্যের কল্যাণ কামনায় "বালাকামাদি" পুজোর প্রচলন রয়েছে। ধানকাটার পূর্বে এই পুজো দিতে হয় (দ্রঃ কথা বলা আংটি)।

বড়বোন (দ্রঃ একফালি লাউয়ের গল্প) ছোট বোনকে একফালি লাউ দিয়েও সেটি কেড়ে নেয়। কাউকে কিছু দিয়ে ফেরৎ নিলে অমঙ্গল হয়—এই ধারণাটির জন্যই বড়ো বোন ছোটবোনকে সামনের দরজা দিয়ে বেরোতে না দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিল।

"স্বর্গের ফুল রাস্না" দেখা যায় দেবতার ফুল দেবতাকে উৎসর্গ করে মেয়েটি খোঁপায় পরেনি বলে মেয়েটি গোধিকাতে রূপান্তরিত হয় এবং ফুল তোলার অপরাধে যুবকটি হুলক হয়ে যায়। এখানে অকল্যাণের ধারণাটি এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

আপন ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ সমাজে রীতিসিদ্ধ নয়। এরূপ আচরণ অমঙ্গলদায়ক বলে বিবেচিত হয় বলেই তা নিষিদ্ধ। "ছাতিম গাছের কাহিনী'তে ভাইয়ের এই অকল্যাণকারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদই ঘোষিত হয়েছে বোনের আচরণের ভেতর দিয়ে। তৃষ্ণার্তকে জলপান করানো অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে ধরা হয়। "ছিপিংতুই মাইরুংতুই" কাহিনীতে ছিপিংতুই যত্ন আত্তি করে রাজার লোকদের জল খাওয়ায়। ছিপিংতুই-এর চুলে রাজার গুঁজে দেয়া ফুলটির মধ্যে কল্যাণকারী শক্তির ধারণা নিহিত রয়েছে।

"অজগর সাপের গল্পে" বড়ো মেয়ে রোজ খাবার সময় হলে অজগররূপী স্বামীকে ডেকে খাওয়ায় ও নিজে না খেয়ে থাকে। এর ভেতর দিয়েও কল্যাণী নারীর রূপ ফুটে উঠেছে। সংসারে সকলকে খাইয়ে তবেই গৃহকর্ত্রী আহার্য্য গ্রহণ করে। একেই পূণ্যকর্ম বলে বিবেচনা করা হয়।

এই কাহিনীতেই অজগর বৌ পড়শীর জুমে কাজ করার সময় তার গলার মালা ছিঁড়ে যায়। কুড়িয়ে নিতে গিয়ে সে একটাও পেলো না। অজগরকে কেটে ফেলার সঙ্গে এর কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও অবচেতন মনে কোনো পরোক্ষ সংযোগ মেয়েটির মনে এক অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগিয়ে দেয়।

কল্যাণ অকল্যাণের ধারণাটি যে উপজাতি সমাজে কত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত তার প্রমাণ 'নকছুমৌতায়'-এর পুজোর প্রচলন। গৃহস্থের মঙ্গলকামনায় নকছুমৌতায় - এর প্রতিষ্ঠা করা হয় ঘরের এককোণে (দ্রঃ চাঁদের ছেলে)।

"কাঞ্চনমালা" কাহিনীতে কাঞ্চনমালার স্বামীর "পশ্চিম দিকে যাচ্ছি, এই সময় চোখের জল ফেলো না" কথার মধ্যে অমঙ্গলের একটি ইঙ্গিত যেন পাওয়া যাচ্ছে।

বিষ্ঠা ইত্যাদি অপবিত্র বস্তু। নাঐ পাখিরা যে খুমতির মা-বাবার উপর মলত্যাগ করে, তা তাঁদের অকল্যাণের সূচক (দ্রঃ নাঐ পাখির গল্প)।

শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে শুভের জয় লোককথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সূত্রটি ত্রিপুরার লোককথায় বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মোষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে দেবতাদের জয় (রক্তপিপাসু দেবতা), বুড়াদেবতার পুজোর সাহায্যে অশুভ শক্তির নাশ (পুরোহিত), প্রতারক বানর ও মানবী স্ত্রীর দ্বন্দ্বে বানরের মৃত্যু (বানরবর), ছিলাইকুমারী ও গুল্মকুমারীর মধ্যে দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতিতে অশুভশক্তির প্রতীক (গুল্মকুমারী) ছিলাইকুমারীর নিধন, ব্যাঙ ও চামচিকের দ্বন্দ্বে দোষী ব্যাঙের সাজা (বিচার), বিড়াল ও মুরগীর মধ্যে অশুভশক্তির প্রতীক বিড়ালের মৃত্যু (মুরগীর পিঠে) ইত্যাদি এই সূত্রটিতেই প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়াও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিতর দিয়েও শুভশক্তির জয়ই লক্ষ্য করা যায়"কথাবলা আংটি" ও "এক ফালি লাউয়ের গল্প" নামক কাহিনীতে।

"ধনেশ পাখির গল্প" কাহিনীতে অশুভ শক্তির প্রকাশক ধনেশ পাখি। সে-ও অভিশপ্ত হয় স্ত্রীর অভিশাপে। "সজারুর বুদ্ধি"তে প্রভুত্ব কায়েমকারী শোষক, অর্থাৎ অশুভ শক্তির প্রতীক হাতি। অন্যদিকে দুর্বলতর শ্রেণীর প্রতীক সজারু। কাহিনীর অন্তে দুই পক্ষের দ্বন্দ্বময় পরিণতি হিসেবে প্রভুত্বকামী শোষকেরই পরাজয় ঘটে। "প্রতিজ্ঞা" গল্পে শুভশক্তির প্রতীক হিসেবে রাঙ্গিয়াকে একাধিকবার লড়তে হয়েছে অশুভশক্তির বিরুদ্ধে। সহোদর ভ্রাতা ভুতুয়াও রাঙ্গিয়ার বিরুদ্ধে খলত্বের প্রকাশ করে। সাদা হাতি ও রাক্ষসী চাকবাইয়ামা উভয়েই দীর্ঘযুদ্ধের পর বীর রাঙ্গিয়ার হাতে মৃত্যুবরণ করে। ভুতুয়াও খলত্বে জয়ী হতে পারে না। এভাবেই অশুভশক্তির পরাজয় ঘটে।

"ছিপিংতুই-মাইরুংতুই" য়ে শুভাশুভের দ্বন্দ্বটি প্রকাশিত হচ্ছে দুইবোনের মধ্য দিয়ে। কাহিনীর অন্তে অশুভশক্তির প্রতীক মাইরুংতুই রাজার হস্তে মৃত্যুবরণ করে। রাজা একদিকে শাসক, অন্যদিকে দুষ্টের দমনকর্তা। এখানেও শুভের জয় ঘটে পরিণতিতে।

"অজগর সাপের গল্প" কাহিনীতে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব ঘিরেই প্রায় সমগ্র ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। অশুভশক্তি নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে কাহিনীতে। যেমন কাহিনীর প্রথমাংশে অচাই বিনাকারণে অজগরকে হত্যা করে। দ্বিতীয়াংশে অন্য রানীরা সকলে মিলে ছোটরানীকে নানাভাবে হেনস্তা করে ও তাঁর ছেলেমেয়েদের জলে ফেলে দিতো। কিন্তু পরিণতিতে দেখা গেল অশুভশক্তিগুলোই পরাজিত হয়েছে। এই কাহিনীতে ছোটরানীকে হিংসা করতো যে সমস্ত রানীরা, তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ তাদের প্রত্যেককে একটি গর্ত করে একতাল কাঁটা বিছিয়ে তাতে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দেয়া হল।

"কাঞ্চনমালা" তেও এই দ্বন্দ্বটি প্রকাশিত। মেয়েটির ভাসুর এখানে অশুভশক্তির প্রতীক। সে কাঞ্চনমালাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যেই ভাইকে যুদ্ধে পাঠায় বিরিন্দিয়াদের সাহায্যে। কিন্তু প্ররোচনা সত্বেও মেয়েটি তার সত্যে অটল থাকে, সে তার স্বামীর পথ চেয়েই দিন কাটায় এবং এভাবেই অশুভ শক্তির পরাভব ঘটে।

"নাঐ পাখির গল্প" কাহিনীতে দেখা যায় মাতৃপিতৃহীন খুমতির গায়ের রঙ কালো এবং মনটাও ছিল খুব খারাপ। কালো গাত্রবর্ণের মেয়েদের প্রতি অনীহা যে সব সমাজমানসেই বর্তমান থাকে তার প্রমাণ এটি। কালো রঙের মেয়েদের মন ভালো হয় না, এটি একটি বিচারবোধহীন ধারণা। আচার আচরণেও স্বার্থপরতাবোধ ইত্যাদি প্রথম থেকেই তার প্রতি একটা অশুভ ইঙ্গিত রয়ে গেছে কাহিনীতে। অপরদিকে করমতি ফর্সা রঙ, কাজে পটু ইত্যাদি কারণে সে সকলের সহমর্মিতা পায়। সমগ্র কাহিনী জুড়ে খুমতির উপর লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পরিণতিতে সহায়ক শক্তির সাহায্যে খুমতি নীলাকাশে মুক্তির স্বাদ নিয়ে উড়ে যায়। যদিও এখানে সামান্য অপরাধে অপরাধী খুমতি, তবু পরিবারের অন্যরা তাকে গুরুদণ্ড দিয়ে আরো বেশী অপরাধী হয়ে উঠে। সুতরাং এদেরকেই অশুভশক্তির প্রতীক হিসেবে ধরতে হবে। এবং সবশেষে এদের গায়ে পাখিদের দ্বারা মলত্যাগ করানোর মাধ্যমে অশুভের শাস্তি হয়।

"চাঁদের ছেলে"তে ব্যাঙরূপী চন্দ্রকুমার চন্দ্রদেবতার ছেলে হয়েও অন্য দেবতার অভিশাপে ব্যাঙ হয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে "নকছুমৌতায়" তার পুজোর প্রচলনের স্বীকৃতি আদায় করে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এখানে দ্বন্দ্বের চিত্রটি এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যে পুরনো প্রতিষ্ঠাবান দেবতাদের প্রভাবকে ক্ষুন্ন করে অপরিচিত স্থানীয় দেবদেবীরা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বেঁধেছেন। একই ব্যাপার ছাক্‌লক দেবীর পুজোর ব্যাপারেও (দ্রঃ রাজহাঁসের কাহিনী) লক্ষ্য করা যায়।

উপজাতি লোককথায় সামাজিক উপাদানের দ্বান্দ্বিক সূত্র ঃ

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সমাজে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার প্রবণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই প্রবণতার জন্যই সমাজ গঠিত হয়েছে। একদিকে এই সহযোগী

মনোভাব, অন্যদিকে আবার সহযোগিতা বিরোধী মনোভাবও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন একে অপরকে অতিক্রম করে যেতে চায় এবং এর ফলে দ্বন্দ্বমূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয় ও একসময় তারা দ্বন্দ্বসংঘাতে লিপ্ত হয়।

দেখা গেছে, একে অপরের সহযোগিরূপে কোনো অভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণ করতে সচেষ্ট হলেও স্বার্থবোধ প্রধান হয়ে উঠলে একে অন্যকে ডিঙ্গিয়ে যেতেও দ্বিধা করে না। এভাবেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মানবচরিত্র পরস্পরবিরোধী মনোভাবের আকর বলে এমনও দেখা যায় যে, যারা সহযোগী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করে, তাদের মনের মধ্যেও অবদমিত ইচ্ছা উদ্ভুত এক দ্বন্দ্বমূলক মনোভাব বিরাজ করে। এই লোককথাগুলোতে যে দ্বন্দ্বময় পরিবেশের চিত্র দেখা গেল তার দ্বান্দ্বিক সূত্রগুলো এভাবেই লোককথার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বন্দ্বের মূল নিহিত রয়েছে সমাজজীবনের মধ্যে।

শত অবমাননা, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা সত্বেও লোকসমাজ সুন্দর জীবনের যে স্বপ্নময় দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখে, তা আঘাতপ্রাপ্ত হলেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। (১৬)

"রক্তপিপাসু দেবতা'য় দেবতাদের সঙ্গে মোষের দ্বন্দ্বের মূল কারণ হ'ল অভিশপ্ত দেবতাদের অস্তিত্বের সংকট। "বানর বর"-এ মেয়েটির মানসিক দ্বন্দ্বের মূল কারণ হল আপন সমাজ বা গোষ্ঠী থেকে নির্বাসিত হওয়ার ফলে মেয়েটির মানসিক যন্ত্রণা।

"উইপোকাস্বামী" কাহিনীতে সপত্নীকন্যা রাজরানী হওয়াতে চাষী-বৌয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে গুল্মকুমারীকে ঘিরে ছিলাইকুমারীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় স্বামীর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। গুল্মের প্রতি লকইয়ের আকর্ষণ ছিলাইয়ের মধ্যে ঈর্ষার সূত্রপাত করে।

"মুরগীর পিঠে" কাহিনীতে মুরগী ও বিড়াল পারস্পরিকভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। কিন্তু নিজস্বার্থ ব্যাহত হবার ফলেই দ্বন্দ্ব জেগে উঠে। "বিচার" গল্পে ব্যাঙ আর চামচিকের বন্ধুত্বের মধ্যেও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে। "এক ফালি লাউয়ের গল্পে" ছোটবোন বড়বোনকে অবিশ্বাস করে এবং এর ফলে ছোটবোনের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক মনোভাবে সৃষ্টি হয়। তাছাড়াও সমাজে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য যে দ্বন্দ্বের একটি মূল কারণ তা ও এই কাহিনীতে প্রমাণিত। বধিরতা মানুষের জীবনে এক মস্ত বড় অভিশাপ। এর থেকে মুক্তি পাওয়াও সহজসাধ্য নয়। এভাবেই পারস্পরিক অবিশ্বাসপ্রসূত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় পরিবারস্থ সকলের মধ্যে। (দ্রঃ সব কালাদের একঘর)।

"ছাতিম গাছের কাহিনী"তে ভাই ও বোনের বিয়েকে কেন্দ্র করে যেভাবে বোনের মনে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা অবক্ষয়িত পুরনো মূল্যবোধের প্রতি ভাইয়ের আকর্ষণ থেকেই জাত। মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলে যাওয়া ও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন জনিত মানসিক দ্বন্দ্ব।

"ছিপিংতুই মাইরুংতুই" গল্পে দুবোনের যে দ্বন্দ্ব তা আসলে ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কিত।

"কাঞ্চনমালা" কাহিনীতে মেয়েটির মধ্যে যে মানসিক অবস্থার পরিচয় পাই তাতে দ্বান্দ্বিক সূত্র হিসেবে কাজ করছে একদিকে ভাসুরের অনৈতিক মনোভাব, অন্যদিকে তার নববিবাহিত স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা।

"চাঁদের ছেলে"তে প্রতিষ্ঠাবান দেবতাদের সঙ্গে পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবীদের প্রাধান্য লাভের দ্বন্দ্বটি প্রকাশিত হচ্ছে। "নাঐ পাখির গল্পে" খুমতির মানসিক দ্বন্দ্বের মূল কারণ হিসেবে লঘুপাপে গুরুদণ্ড ভোগের প্রতি বিদ্রোহের মনোভাবকে গ্রহণ করা যায়।

প্রভু শ্রেণীর বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রেণীর ক্ষোভ, বিদ্বেষ ইত্যাদি (সজারুর বুদ্ধি, কথা বলো না), বড়ো বোনের প্রতি ছোটবোনের প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার সাহায্যে অচাইয়ের অজগরকে কেটে ফেলা (অজগর সাপের গল্প) ইত্যাদি দ্বান্দ্বিক সূত্র হিসেবে লোককথাগুলোতে কাজ করে।

সূত্র উল্লেখ

(১) Stith Thompson : The Folk tale P. 415.
(উদ্ধৃতি দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ অনুষ্টুপ, ১৩৯৫ শারদীয়া সংখ্যা, পৃঃ ১৬০)
(২) আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৬।
(৩) আশরাফ সিদ্দিকী ঃ লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪। (শিকলি মোটিফ্, জেড্ ৭১.১৬ সংখ্যা ঃ বিভিন্ন)
(৪) আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৫৬
(৫) ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৭
(৬) ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২০
(৭) ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২১
(৮) ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৮
(৯) Walt Disney : Giant Book of Fairy Tales, 1985 edn. P. 186.
(১০) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ আদিবাসী লোককথা, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৯।
(১১) সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ঃ ধর্ম ও কুসংস্কার, পৃঃ ৫৭।
(১২) আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৯৩।
(১৩) পরিমলভূষণ কর ঃ সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, পৃঃ ৯৯।
(১৪) ঐ ঐ ঐ ঐ
(১৫) আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০৫।
(১৬) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঃ মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি পৃঃ ৫১।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার রূপগত বৈশিষ্ট্য ও তার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঃ ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীকরণ, কাহিনীর কাঠামোগত গতিপ্রবাহ — ক্রিয়াশীলতা, মোটিফ্ এবং বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ

লোকসংস্কৃতির সাম্প্রতিক আলোচনার ক্ষেত্রে রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিই বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নের লোকসংস্কৃতিবিদ্ ভ্লাদিমির জে প্রপ্ "মরফোলজিয়া স্কাজ্‌কি" নামক গ্রন্থে লোককথার রূপতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন। প্রপ্-পূর্ববর্তী গবেষকগণ লোকসংস্কৃতির ইতিহাস ও সমাজমন বিশ্লেষনেই বেশী আগ্রহী ছিলেন।

প্রপ্ বললেন, লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণে অন্য পদ্ধতি তেমন বিজ্ঞান নির্ভর নয়। এসব পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চরম অভাব রয়েছে। লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানকে প্রথমে সুসংবদ্ধভাবে সাজাতে হ'বে। তারপর প্রয়োজন যথার্থ শ্রেণীকরণ। আর এই শ্রেণীকরণে শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর না করে কাহিনীগুলোর মৌলিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে হ'বে। লোককথার অন্তর্নিহিত ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথমেই ওয়াকিবহাল হ'তে হ'বে (১) এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

"If a division into categories is unsuccessful, the division according to theme leads to total chaos. The division of fairy tales according to themes is, in general impossible. Tales possess one special characteristic : components of one tale can without any alteration whatsoever, be transferred to another." (২)

এরও অনেক আগে বিশ্বের লোককথার বিপুলভাণ্ডারের শ্রেণীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'বার ফলেই অ্যান্টি আর্নে লোককথার টাইপ ইনডেক্স' তৈরী করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকসংস্কৃতি গবেষক ষ্টীথ টমসন্ অ্যান্টি আর্ণের তালিকার পরিবর্ধন ও সম্পূর্ণতা দান করেন। ১৯২৮ সালে 'দ্য টাইপ্‌স্ অব্ দ্য ফোকটেল্' প্রকাশিত হয় আর্ণে-টমসনের যুগ্ম নামে।

আর্ণে-টমসনের এই বিজ্ঞানভিত্তিক টাইপ-ইনডেক্স প্রকাশিত হবার ফলে পৃথিবীর নানাস্থানের লোককথার টাইপ-ইনডেক্স প্রকাশিত হয়। আর্ণে-টমসন টাইপের সংজ্ঞা হিসেবে বললেন,

A Type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on anyother tale, It may indeed happen to be told with another tale, but the fact that it may appear alone attests its independence. It may consist of

only one motif or of many. Most animal tales and jokes and anecdotes are types of one motif." (৩)

লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই লোককথার মেজাজ ও চরিত্র নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন এবং এই বিচারেই লক্ষ্য করা যায় যে এক একটি লোককথা এক একটি টাইপ বা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এক একটি নির্দিষ্ট টাইপ বেছে নিয়ে জানা সম্ভব বিশ্বের আর কোথায় কোথায় এই লোককথাটি প্রচলিত রয়েছে, কিভাবে কাহিনীটি পরিবর্তিত হয়েছে অথবা কোন্ কোন্ বাড়তি অংশ যুক্ত হয়েছে, তা-ও বের করা সম্ভব।

একটি লোককথা সরল বা জটিল হ'তে পারে, কিন্তু কথক যখন লোককথাটি বলেন, তখন একটি নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মেজাজ-এর মধ্যে থাকে, এটিই টাইপ।

আর্ণে-টমসন লোককথার শ্রেণীকরণ করলেন টাইপ-ইনডেক্সের মাধ্যমে। এই তালিকাটি সাজানো হয়েছে এইভাবে ঃ

(১) পশুকথা

টাইপ ঃ ১-৯৯-জীবজন্তুর গল্প

৭০-৯৯- শেয়াল ছাড়া অন্য জীবজন্তু।

১০০-১৪৯ বন্যজন্তু ও গৃহপালিত জন্তু।

১৫০-১৯৯ মানুষ ও বন্যজন্তু।

২০০ - ২১৯ গৃহপালিত জন্তু।

২২০-২৪৯-পাখি।

২৫০ - ২৭৪- মাছ।

২৭৫ - ২৯৯-অন্যান্য জন্তু ও বস্তু।

(২) সাধারণ লোককথা

(ক) টাইপ ঃ ৩০০-৭৪৯ - ম্যাজিক ও ঐন্দ্রজালিক

৩০০ - ৩৯৯ - অলৌকিক বাধা

৪০০ - ৪৫৯ - অলৌকিক বা মোহময় স্বামী (মোহময়ী স্ত্রী) ও অন্যান্য আত্মীয়।

৪৬০ - ৪৯৯ - অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কার্য ও অসাধ্যসাধন।

৫০০-৫৫৯ - অলৌকিক সাহায্যকারী ও সাহায্যকারিণী।

৫৬০ - ৬৪৯ - যাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু।

৬৫০ - ৬৯৯ - অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান।

৭০০ - ৭৪৯ - অন্যান্য অলৌকিক কাহিনী।

(খ) ৭৫০ - ৮৪৯ - ধর্মীয় বা নীতিমূলক কাহিনী।

(গ) ৮৫০ - ৯৯৯ - রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক কাহিনী।

(ঘ) ১০০০ - ১১৯৯ - বোকা রাক্ষসের কাহিনী।

(৩) হাসি ও পারিবারিক কাহিনী

১২০০ - ১৩৪৯ - বোকার গল্প।

১৩৫০ - ১৪৩৯ - স্বামী-স্ত্রীর গল্প।

১৪৪০ - ১৫২৪ - একজন নারীর (বালিকা) কাহিনী।

১৫২৫ - ১৮৭৪ - একজন পুরুষের (বালকের) কাহিনী।

১৮৭৫ - ১৯৯৯ - মিথ্যাবাদীর কাহিনী বা বাগাড়ম্বর গল্প।

২০০০ - ২৩৯৯ - সূত্রমূলক কাহিনী বা শিকলি গল্প।

২৪০০ - ২৪৯৯ - অশ্রেণীভূক্ত কাহিনী।

এই টাইপ-ইনডেক্সকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন প্রপ্। প্রপ্ নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে লোকসংস্কৃতির যে বিশ্লেষণ, তা-ই রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নামে পরিচিত। লোককথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ বলেই বিবেচিত হয়।

তিনি দেখিয়েছেন যে, কাহিনী পরিভ্রমণের সময় অনেকক্ষেত্রে বিষয়ের হেরফের ঘটলেও, তার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। কাহিনীর এই পরিবর্তনীয় শক্তিকে তিনি Variables এবং অপরিবর্তনীয় শক্তিকে Constants বলেছেন। তাছাড়াও একটি বাক্যের মধ্যে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, কারক ইত্যাদি যেমন ক্রম অনুসরণ করে আসে, একটি কাহিনীর মধ্যেও এক একটি 'মোটিফ' ক্রম অনুসরণ করেই আসে। এলোমেলোভাবে কখনোই আসেনা। syntax বা বাক্যের রীতি ধরে এই মডেলের প্রবর্তন বলে এর নাম Syntagmatic model বা বাক্ প্রবাহ ক্রমিক পদ্ধতি। (৪)

রূপতত্ত্বগত বা কাঠামোগত দিক থেকে একটি কাহিনী হলো একটি ঘটনাচিত্র বা কাহিনী।

যার অঙ্গগঠনে প্রথম দিকে খলত্ব (আ) অথবা অভাব (অ) এবং কতগুলো ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে ও ক্রিয়াশীলতার সুসংবদ্ধ সক্রিয়তার ফলে সেই কাহিনী বিবাহে বা মিলনে সমাপ্ত হয়, কিংবা সংকটমুহূর্ত পার হয়ে যাবার পরে কাহিনীটির গল্পরহস্য উন্মোচিত হয় এবং কাহিনী পরিণতির দিকে ক্রমশঃ গতিলাভ করে (৫)

একটি কাহিনীর মূল উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করলে ক্রিয়াশীলতা (function) লাভ করা যায় এবং তাঁদের সহায়ক গতিপ্রবাহ তাদের অনুগামী হয়। একটি বাক্যে যেমন কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া থাকে, তেমনি লোককথার বিশেষ্য বা কর্তা যা করে, তাকেই ক্রিয়াশীলতা বলে। কাহিনীর পূর্বাপর সঙ্গতি ঘটে ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে।

কাহিনীর শ্রেণীকরণের উপর প্রপ্ বেশী জোর দিয়েছেন এবং সেই শ্রেণীকরণকে বিজ্ঞান সম্মত করে তোলার কাজ ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

'Correct classification is of the first step in a scientific descripiton.

The accuracy of all further study depends upon the accuracy of classificattion' (৬)

প্রপ্ লোককথার পাত্রপাত্রীদের ক্রিয়াশীলতাকে ৩১টি ভাগে ভাগ করেছেন। এই একত্রিশটিই হ'ল মূল ক্রিয়াশীলতা। লোককথার প্রতিটি গল্পেই প্রাথমিক অবস্থা অবশ্যই বর্তমান থাকবে। প্রথমেই থাকবে নায়কের পরিচয়, সমাজে তাঁর স্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি।

প্রপ্‌ের প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যকে আদর্শ হিসেবে ধরলে ত্রিপুরার লোককথায় এই উপাদানটি হ'বে এরকম।

যেমন,—"আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগেকার কথা। ত্রিপুরা ভূমির এক রাজার নাম ত্রিলোচন। মা হীরাবতী। কিশোর ত্রিলোচন মা হীরাবতীর নয়নের মণি। হীরাবতী রাণী হ'লে কি হ'বে। ঘরকন্নার সমস্ত কাজ নিজ হাতেই করেন।" (রক্তপিপাসু দেবতা)

প্রাথমিক অবস্থা যদিও ক্রিয়াশীলতা নয়, তবু ফোকলোরের সমস্ত উপাদানেই তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাথমিক অবস্থার পর প্রপ্ লোককথার কুশীলবদের ক্রিয়াশীলতাকে পর পর সাজিয়ে একত্রিশটি ভাগে ভাগ করেছেন। এদের প্রতিটিরই এক একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন রয়েছে। সাঙ্কেতিক চিহ্নসহ ক্রিয়াশীলতাগুলো এখানে দেওয়া হ'ল। মূল ক্রিয়াশীলতাগুলোর যে অন্যান্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে, তাদের ক্রমপরম্পরা রক্ষিত হয়েছে সাঙ্কেতিক চিহ্নের সঙ্গে সংখ্যার ব্যবহারের সাহায্যে (৭)

ভ্লাদিমির প্রপ্ এই একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতার জন্য যে সাংকেতিক চিহ্নসমূহ ব্যবহার করেছেন, প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ মযহারুল ইসলাম সেই চিহ্নগুলোর স্থানে সমার্থক বাংলা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। এই গবেষণা নিবন্ধের বাংলা সাঙ্কেতিক চিহ্ন মযহারুল ইসলামকে অনুসরণ করেই দেয়া হয়েছে। নিচে প্রপের সংকেত চিহ্ন ও পাশে মযহারুল ইসলামকৃত বাংলাচিহ্ন দেওয়া হ'ল।

প্রপ্ - মযহারুল ইসলাম

a----------ঙ

B----------ছ

y----------ঞ

∂----------ঙ

ε----------ঐ

ζ----------ফ

n----------ন

θ----------জ

X----------x

A----------আ

a----------অ

B----------ব
C----------চ
↑ ↑
D----------. ঢ
E----------এ
F----------ভ
G----------গ
H----------হ
I----------ই
J----------য
k----------অঅ
↓ ↓
Pr.----------পর
Rs.----------রস
O.----------ও
L.----------ল
M.----------ম
N.----------স
Q----------শ
Ex----------ঘ
T----------ট
U----------উ
W----------ঊ
X----------X — অস্পষ্ট বা অপরিচিত গঠন বা ধরণ।

প্ররো-প্ররোচনা অর্থে ব্যবহৃত।

< - রাস্তায় চিহ্ন দেখে ছাড়াছাড়ি অর্থে ব্যবহৃত।

γ - সংকেতদানকারী কৌশলের হস্তান্তর।

† ক্রিয়াশীলতার জন্য ইতিবাচক ফল। কখনোবা (ইতি) দিয়েও দেখানো হ'তে পারে।

– – ক্রিয়াশীলতার জন্য নেতিবাচক ফল, কখনোবা (নেতি) দিয়েও দেখানো হ'তে পারে।

§ - সংযোগকারী

. সংযোগকারীদের জটপাকানো অবস্থা

X - প্রতারণামূলক চুক্তির ফলে প্রাথমিক দুর্ভাগ্য।

প্রাথমিক অবস্থার সাংকেতিক চিহ্ন (ঙ)। অন্যান্য ক্রিয়াশীলতাগুলোর পাশাপাশি বাংলা সংকেত চিহ্ন দেয়া হল ঃ

(১) প্রাথমিক অবস্থার পরই দেখা যায় কোনো একজন বাড়ী থেকে দূরের পথে রওয়ানা হয়। (ছ)

ছ^{১} - বয়স্কদের অনুপস্থিতি বা প্রস্থান।

ছ^{২} - পিতামাতা বা কারো মৃত্যু।

ছ^{৩} - যুবক বা অল্পবয়স্ক কারো অনুপস্থিতি বা প্রস্থান।

(২) নিষেধাজ্ঞা বা সতর্কতা থাকতে পারে (ঞ)।

ঞ^{১} - নির্দিষ্টভাবে কোনো সাবধানবাণী উচ্চারণ।

ঞ^{২} - উপদেশ বা নির্দেশ।

(৩) নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন, অর্থাৎ নায়ক সতর্কবাণী লঙ্ঘন করে (ড)।

ড^{১} - যে রীতিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়, সেই রীতিতেই তা লঙ্ঘিত হয়।

ড^{২} - লঙ্ঘিত নিষেধাজ্ঞা ও উহ্য নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে কোনো নির্দেশ অমান্য করা হয়।

ড^{৩} - লঙ্ঘন দিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত।

(৪) পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ)।

ঐ^{১} - প্রাথমিকভাবে খল নায়ক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।

ঐ^{২} - সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে খলের পরিদর্শন পরিক্রমা এবং অনুরূপভাবে নায়কও খল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।

ঐ^{৩} - ছদ্মবেশে বা অন্য উপায়ে পরিদর্শন পরিক্রমা।

ঐ^{৪} - সহায়কের মাধ্যমে পরিদর্শন-পরিক্রমা।

(৫) খলনায়ক নায়কের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করে (ফ)

ফ^{১} - খল নায়ক সম্পর্কে অথবা নায়ক খল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হয়।

ফ^{২} - ভিন্নমুখী তথ্যসংগ্রহ।

ফ^{৩} - এক নজর দেখে তথ্যসংগ্রহ।

(৬) ছলনাজাল বিস্তার (ন)

ন^{১} - সাধুতার আড়ালে প্রতারণা।

ন^{২} - ক্রমাগত ক্ষতিসাধনের প্রয়াস।

ন^{৩} - খলের সরাসরি যাদুদ্রব্য অথবা যাদুপদ্ধতি প্রয়োগ।

ন^{৪} - খলের চাতুরীর বিচিত্র পন্থা।

(৭) দুষ্কর্মে নিজের অজান্তে বশীভূত হওয়া (জ)।

জ^{১} - অনুরোধে উপরোধে ইতিবাচক সাড়া।

জ^{২} - খলের যাদুজালে যান্ত্রিকভাবে ধরা দেওয়া।

জ^{৩} - আপন কাজের মাধ্যমে শত্রুকে সাহায্য করা।

জ^{৪} - প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি যার মাধ্যমে খলের কাছে ধরা দেওয়া হয়।

(৮) খলত্ব। খলনায়ক ক্ষতিসাধন করে। এই ক্রিয়াশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই অবস্থা থেকেই কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে (আ)

আ^{১} - খল কাউকে অপহরণ করে।

আ^{২} - কোনো যাদুদ্রব্য বা নিমিত্তকে হস্তগত করে।

আ^{৩} - যাদুতে সাহায্যকারীকে হস্তগত করে (বলপূর্বক)।

আ^{৪} - শস্য বিনষ্ট করে।

আ^{৫} - দিনের আলো হাতের মুঠোয় বন্দী করে।

আ^{৬} - অন্যভাবে ধ্বংস সাধন করে।

আ^{৭} - শারীরিক পীড়ন বা ক্ষতিসাধন করে।

আ^{৮} - যাদুশক্তি বা অন্য উপায়ে অন্তর্ধানীত করে।

আ^{৯} - শিকারকে হাতে পাবার জন্য দাবি জানায় বা প্রলুব্ধ করে।

আ^{১০} - কোনো একজনকে বিতাড়িত করে।

আ^{১১} - কাউকে জলে ডুবতে বা অগ্নিতে প্রবেশে বাধ্য করে।

আ^{১২} - যাদুমন্ত্র আরোপ করে।

আ^{১৩} - রূপান্তরিত করে এবং সেখানে অপরকে স্থাপন করে।

আ^{১৪} - হত্যার আদেশ এবং আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ।

আ^{১৫} - খল নিজেই কাউকে নিহত করে।

আ^{১৬} - খল কাউকে কারারুদ্ধ বা আবদ্ধ করে।

আ^{১৭} - বলপূর্বক বিবাহের ভয় দেখায়।

আ^{১৮} - 'মানুষ খাবে' এই ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চায়।

আ^{১৯} - রাত্রিতে পীড়নমূলক কাজ করে।

আ^{২০} - খল যুদ্ধ ঘোষণা করে।

(৯) অভাব। যাদুনিমিত্ত বা অন্য অভাব (অ)

অ^{১} - পত্নীর অভাব।

অ^{২} - যাদুনিমিত্তের অভাব।

অ^{৩} - ভ্রাম্যমান কোনো দ্রব্য বা পশুপাখির অভাব।

অ^{৪} - যাদুশক্তি সম্পন্ন দ্রব্য বা প্রাণী, যার মধ্যে জীবন অথবা মৃত্যু লুক্কায়িত, তার অভাব।

অ^{৫} - অর্থাভাব বা সম্পদ, বাসস্থানের অভাব।

অ^{৬} - অন্যান্য যাবতীয় অভাব।

(১০) মধ্যস্থকারী ও সংযোগকারী ক্রিয়াশীলতা (ব)

ব^{১} - নায়ককে প্রেরণের পর আহ্বান জানানো।

ব^{২} - নায়ককে সরাসরি প্রেরণ বা তার নিকট কিছু প্রেরণ।
ব^{৩} - নায়ককে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান।
ব^{৪} - দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা।
ব^{৫} - নির্বাসিত নায়ককে অন্যত্র প্রেরণ।
ব^{৬} - মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত নায়কের মুক্তি।
ব^{৭} - শোকসঙ্গীত গাওয়া।

(১১) প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক কাজের সূত্রপাত (চ)

নায়কের গৃহত্যাগ (↑) ক ↑ খ ↑ গ ↑ কখগ ↑ পর্যায়ক্রমে গুরুত্ববৃদ্ধিবাচক সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত।

(১২) সহায়কের প্রথম ক্রিয়াশীলতা (ঢ)

ঢ^{১} - দাতার দ্বারা নায়কের পরীক্ষা।
ঢ^{২} - দাতা কর্তৃক নায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ।
ঢ^{৩} - মৃত্যুপথযাত্রীর অনুরোধ।
ঢ^{৪} - আবদ্ধব্যক্তির মুক্তির জন্য অনুরোধ।
ঢ^{৫} - ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ।
ঢ^{৬} - বিবাদীদের সম্পত্তি বন্টনের দাবী।
ঢ^{৭} - অন্যান্য অনুরোধ।
ঢ^{৮} - নায়ককে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মারমুখী ব্যক্তি বা প্রাণীদের উদ্যোগ।
ঢ^{৯} - মারমুখীদের নায়ককে হাতাহাতিতে লিপ্ত করা।
ঢ^{১০} - যাদুদ্রব্য দেখিয়ে অন্যকিছু চাওয়া।

(১৩) নায়কের প্রতিক্রিয়া (ইতিবাচক, নেতিবাচক) (এ)।

এ^{১} - পরীক্ষামূলক কাজে স্বীয় অবস্থান বজায় রাখা বা না রাখা।
এ^{২} - অভিনন্দনের উত্তর দেওয়া অথবা না দেওয়া।
এ^{৩} - মৃতব্যক্তির সৎকার করা অথবা না করা।
এ^{৪} - বন্দীকে মুক্তিদান।
এ^{৫} - আবেদকের প্রতি নায়কের করুণা প্রদর্শন।
এ^{৬} - বিবাদকারীদের অংশ বন্টন।
এ^{৭} - নায়কের অন্যান্য সেবাপরায়ণমূলক কাজ।
এ^{৮} - জীবনের উপর আক্রমণের উদ্যোগ এবং আত্মরক্ষা।
এ^{৯} - প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে পরাভূত করা।
এ^{১০} - বিনিময়ে সম্মতি।

(১৪) যাদুর নিমিত্তের প্রয়োগকৌশল লাভ (ভ)

ভ^{১} - যাদুর নিমিত্ত সরাসরিভাবে প্রাপ্ত।
ভ^{২} - যাদুর নিমিত্ত সম্পর্কে সরাসরি নির্দেশ।

ভ^{৩} - যাদুর নিমিত্ত তৈরী হয়।
ভ^{৪} - যাদুনিমিত্তের ক্রয়বিক্রয়।
ভ^{৫} - যাদুনিমিত্তের আকস্মিকপ্রাপ্তি।
ভ^{৬} - যাদুনিমিত্তের নিজে থেকে নায়কের কাছে আসা।
ভ^{৭} - যাদুনিমিত্তকে পান বা আহার করা।
ভ^{৮} - যাদুনিমিত্তকে ধারণ বা হরণ করা।
ভ^{৯} - নানাজাতীয় যাদুচরিত্র নায়কের সাহায্যে নিজেদের সমর্পণ করে।

(১৫) নায়কের পরিবর্তন এবং পথ প্রদর্শন (গ)

গ^{১} - নায়ক বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়ে যায়।
গ^{২} - নায়ক জলপথ বা স্থলপথে যায়।
গ^{৩} - নায়ক পথ প্রদর্শিত হয়।
গ^{৪} - নায়ককে কোন পথে যেতে হ'বে, সেই পথের প্রতি নির্দেশ।
গ^{৫} - নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যবহার।
গ^{৬} - ফুল, রক্তের দাগ বা কোনোচিহ্ন দেখে পথের সন্ধান।

(১৬) সংগ্রাম বা যুদ্ধ (হ)

হ^{১} - খোলা মাঠে যুদ্ধ।
হ^{২} - প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা।
হ^{৩} - তাসের প্রতিযোগিতা।
হ^{৪} - ওজন বা মাপের প্রতিযোগিতা।

(১৭) চিহ্নিতকরণ (য)

য^{১} - শরীরে চিহ্ন করে দেয়া হয়।
য^{২} - আংটি অথবা তোয়ালে লাভ।

(১৮) বিজয় (ই)

ই^{১} - প্রকাশ্য যুদ্ধে খলের পরাজয়।
ই^{২} - প্রতিযোগিতায় খলের পরাজয়।
ই^{৩} - তাস খেলায় নায়কের জয়।
ই^{৪} - ওজন প্রতিযোগিতায় নায়কের জয়।
ই^{৫} - প্রাথমিক যুদ্ধ ছাড়াই খলের নিধন।
ই^{৬} - খলের সরাসরি নির্বাসন।

(১৯) অভাব অপসারিত (অঅ)

অঅ^{১} - অনুসন্ধানীয় ব্যক্তি বা বস্তু বুদ্ধির সাহায্যে হস্তগত করা।
অঅ^{২} - সম্মিলিতভাবে দ্রুত হস্তগত করা।
অঅ^{৩} - ভয় দেখিয়ে লাভ করা।
অঅ^{৪} - পূর্ববর্তী কাজের ফলস্বরূপ অনুসন্ধানীয় ব্যক্তি পশুপাখি, বস্তু প্রাপ্তি।

অঅ[৫] - যাদুনিমিত্ত ব্যবহারের ফলে প্রাপ্তি।

অঅ[৬] - যাদুনিমিত্তের সাহায্যে দারিদ্র্যমুক্তি।

অঅ[৭] - সন্ধানীয় ব্যক্তি, পশুপাখি বা বস্তু ধরা হয়।

অঅ[৮] - সম্মোহনী শক্তির অবসান।

অঅ[৯] - মৃতব্যক্তির পুনরুজ্জীবন।

অঅ[১০] - বন্দীর মুক্তি।

অঅ[১১] - যাদুনিমিত্তের ন্যায় সন্ধানীয়ের প্রাপ্তি।

(২০) নায়ক ফিরে আসে, কখনো খল (↓)

(২১) নায়ককে অনুসরণ করা হয় (পর)

পর[১] - নায়ককে উড়ন্তভাবে অনুসরণ।

পর[২] - অনুসরণকারী অপরাধীকে দাবী করে।

পর[৩] - অনুসরণ অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া।

পর[৪] - অনুসরণকারীর নিজেকে লোভনীয় বস্তু, প্রাণীতে রূপান্তরকরণ।

পর[৫] - নায়ককে গিলে ফেলতে চেষ্টা করা।

পর[৬] - অনুসরণকারীর নায়ককে হত্যার উদ্যোগ গ্রহণ।

পর[৭] - নায়ক যে গাছের মধ্যে আশ্রয় নেয় অনুসরণকারী সেই গাছটি চিবিয়ে খেতে চায়।

(২২) অনুসরণ থেকে নায়কের উদ্ধার (রস)

রস[১] - নায়ককে বাতাসের মধ্য দিয়ে বহন করা।

রস[২] - নায়ক পথে বাধার সৃষ্টি করতে করতে উড়ে যায়।

রস[৩] - উড়ন্ত যাত্রার সময়ে নায়ক অচেনা কিছুতে রূপান্তরিত হয়।

রস[৪] - আকাশ স্থল বা জলপথে প্রত্যাগমনের সময় নায়ক লুকোয়।

রস[৫] - নায়ককে কোনো ব্যক্তি আড়াল করে।

রস[৬] - নায়কের পশু বা পাথরে রূপ পরিবর্তন ও আত্মরক্ষা।

রস[৭] - লোভ থেকে বিরত থাকা।

রস[৮] - বিরুদ্ধ পক্ষ তাকে গিলে ফেলুক বা ধারণ করুক এমন কোনো অবস্থায় নায়ক নিজেকে ফেলেনা।

রস[৯] - জীবন বিপন্ন হলে নায়ক নিজেকে রক্ষা করে।

রস[১০] - সে প্রত্যাবর্তনরত অবস্থায় এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দেয়।

(২৩) নায়কের অপরিচিত অবস্থায় আগমন (ও)

ও[১] - দেশে ফিরে ছদ্মবেশে কাজ করে।

ও[২] - দেশে সরাসরি ফিরে আসে কিন্তু তাকে কেউ চিনতে পারেনা।

(২৪) মেকি নায়কের দাবি অগ্রাহ্য হয় (ল)

ল^{১} - অন্যেরা মিথ্যা দাবী করে যে, তারাই প্রকৃত কৃতিত্বের দাবীদার।

ল^{২} - অন্যেরা নায়কের স্ত্রীর উপর দাবী করে।

(২৫) কঠিন কাজ (ম)

ম^{১} - খাদ্য ও পানীয় দ্বারা পরীক্ষা।

ম^{২} - অগ্নিপরীক্ষা।

ম^{৩} - মৌখিক ভাগ্যপরীক্ষা।

ম^{৪} - নির্বাচনমূলক ভাগ্যপরীক্ষা।

ম^{৫} - কুশলীপনামূলক ভাগ্যপরীক্ষা।

ম^{৬} - সহনশীলতামূলক ভাগ্যপরীক্ষা।

ম^{৭} - কোনোকিছু নির্মাণ, গঠন বা বিচ্ছিন্নকরণ জাতীয় পরীক্ষা।

(২৬) কাজগুলো সম্পন্ন করা (স)

জিজ্ঞাসিত হ'বার পূর্বেই কাজগুলো সম্পন্ন করলে 'স' ব্যবহৃত হ'বে।

(২৭) নায়ককে চিনতে পারা (শ)

(২৮) মেকি নায়কের মুখোশ উন্মোচন (ঘ)

(২৯) নায়কের আকৃতি পরিবর্তন বা রূপান্তরকরণ (ট)

ট^{১} - যাদুনিমিত্তের সাহায্যে সরাসরি চেহারায় পরিবর্তন।

ট^{২} - আশ্চর্য প্রাসাদ নির্মাণ।

ট^{৩} - নতুন পোশাক পরিধান।

ট^{৪} - যুক্তিগ্রাহ্য ও কৌতুকময় আকৃতি।

(৩০) খলের শাস্তি (উ)

(৩১) বিবাহ (ঊ)

ঊ^{১} - রাজকন্যা ও রাজ্যলাভ।

ঊ^{২} - সিংহাসনছাড়া বিবাহ।

ঊ^{৩} - কেবল সিংহাসনলাভ।

ঊ^{৪} - বিবাহের প্রতিশ্রুতি।

ঊ^{৫} - পত্নীর বিয়োগ এবং সন্ধানের মাধ্যমে সুফল লাভ।

রূপতত্ত্বগত বিশ্লেষণে ক্রিয়াশীলতার কাঠামোকে এভাবে সাজানো যায়।

ঙ, ছ^{১,২,৩} এ^{১,২} ড^{১,২,৩} ঐ^{১,২,৩,৪} ফ^{১,২,৩} ন^{১,২,৩} জ^{১,২,৩} আ^{১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮,১৯,২০} অ^{১,২,৩,৪,৫,৬} ব^{১,২,৩,৪,৫,৬,৭} চ↑ঢ^{১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০} এ^{১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০} ভ^{১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯} গ^{১,২,৩,৪,৫,৬} হ^{১,২,৩,৪} য^{১,২} ই^{১,২,৩,৪,৫,৬} অঅ^{১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১}↓ পর^{১,২,৩,৪,৫,৬,৭} রস^{১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০} ও^{১,২} ল^{১,২} ম^{১,২,৩,৪,৫,৬,৭} সশঘ ট^{১,২,৩,৪} উঊ^{১,২,৩,৪,৫}

প্রপ্-এর সমগ্র বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে রেখাচিত্রে একত্রে সাজালে এরকম হ'বে।

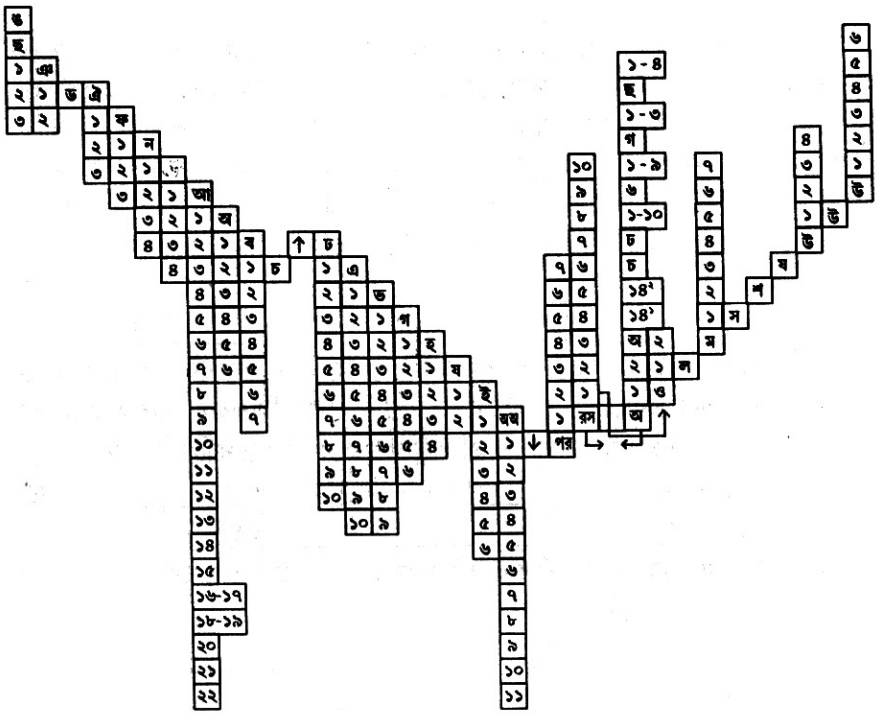

ব্যাপক অনুসন্ধান ও সূক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রপ্ দেখিয়েছেন যে এমন কোনো লোককথা সংগৃহীত হয়নি যাতে এই একত্রিশটির বেশী ক্রিয়াশীলতা রয়েছে। অধিকাংশ লোককথাতেই দশটি থেকে বাইশটি ক্রিয়াশীলতার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সবই এই ক্রিয়াশীলতার মধ্যে আবদ্ধ (৮) ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায়ও আমরা এই ক্রিয়াশীলতাগুলোর উপস্থিতি লক্ষ্য করি।

কাহিনীর মধ্যবর্তী ঘটনাপ্রবাহের ক্রিয়াশীলতা সমূহের মধ্যে প্রায়শই থাকে পুরস্কার (ভ) ,লাভজনক কিছু বা অভাবের অপসারণ (অ অ) অনুসরণ থেকে অব্যাহতি (রস) ইত্যাদি। এই জাতীয় ক্রমপ্রবাহকে অগ্রগতি বা Move বলা হয় (৯)। এই গতিপ্রবাহ কিভাবে একের সঙ্গে অপরে যুক্ত হয় তার অনুধাবনের সাহায্যেই একটি কাহিনীর কাঠামোতে একটি অথবা একাধিক কাহিনী আছে কিনা, তা নিরূপন করা যেতে পারে। কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গতিপ্রবাহগুলো একে অন্যের মিলিত হয়। যেমন (১) একটি গতিপ্রবাহ সরাসরি একে অপরকে অনুসরণ করে। যেমন,

(১) আ ——— উ^{২} (২) আ ——— উ^{৫}

(২) প্রথম গতিপ্রবাহ শেষ হবার পূর্বেই নতুন গতিপ্রবাহের সূত্রপাত হয়। ঘটনাগত প্রবাহের ফলে সক্রিয়তার বিঘ্ন ঘটে। সেই বিশেষ ঘটনাংশ সমাপ্তির পর, প্রথম গতিপ্রবাহের সমাপ্তিও তা অনুসরণ করে। এর রেখাচিত্রটি এমন ঃ

(১) আ ——— গ ..... অঅ ——— উ^{২}

(২) অ ——— অঅ

(৩) বিশেষ ঘটনাপ্রবাহও আবার বিঘ্নিত হতে পারে সক্রিয়তার ফলে এবং এর ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয় নিম্নভাবে ঃ

(১) ——— ..... ——— .....

(২) ——— ..... ———

(৩) ———

(৪) কোনো কোনো কাহিনী দুটো খলত্ব দ্বারা একই সঙ্গে শুরু হতে পারে। যার মধ্যে দ্বিতীয়টির পূর্বেই প্রথমটির পরিসমাপ্তি ঘটে। যদি নায়ককে হত্যা করা হয় ও যাদুনিমিত্ত চুরি যায়, তাহলে প্রথমে হত্যার অবসান ঘটে অর্থাৎ জীবন ফিরে পায় এবং যাদুর নিমিত্ত চুরি ও অপসারিত হয় অর্থাৎ তার পুনরুদ্ধার ঘটে। এর রেখাচিত্রটি হবে নিম্নরূপ ঃ

আ২ ১৪ { ১. ——— অঅ^{১}
{ ২. .....

——— অঅ^{১}

(৫) দুটো গতিপ্রবাহ-ই একইভাবে সমাপ্ত হতে পারে ঃ

১. ——— .....
২. ——— } ———

(৬) কখনো কখনো কাহিনীতে দুজন সন্ধানী থাকতে পারে। প্রথম গতিপ্রবাহের মাঝামাঝি উপস্থিত হয় নায়কের ভূমিকায়। সাধারণতঃ রাস্তায় কোনো অশুভ চিহ্ন দেখে এদের ছাড়াছাড়ি ঘটে। এই ছয়টি পদ্ধতিতে কাহিনীর গতিপ্রবাহসমূহ প্রত্যেকে পরস্পর একীভূত হয়। এদের মাধ্যমে একক কাহিনীগুলো গড়ে উঠবার অবস্থাগুলো হয় এইরকম।

(১) সমগ্র কাহিনীতে যদি একটি গতিপ্রবাহের ফলশ্রুতি হয়।

(২) যদি কাহিনীতে দুটো গতিপ্রবাহ থাকে, তবে তার একটি ইতিবাচক ও অন্যটি নেতিবাচকভাবে সমাপ্ত হয়।

(৩) যদি গতিপ্রবাহগুলো একত্রে জট পাকিয়ে যায়।

(৪) যদি প্রথম গতিপ্রবাহে যাদুর নিমিত্ত অর্জিত হয় ও তার প্রয়োগ হয় দ্বিতীয় গতিপ্রবাহে।

(৫) অনেকসময় দুর্ভাগ্যের অবসানের পরও হঠাৎ এক অভাব বা অভাববোধ দেখা দেয়, যা নায়ককে সন্ধানকালে প্ররোচিত করে, যার ফলে নতুন কাহিনী আসে না, আসে গতিপ্রবাহ। সেসব ক্ষেত্রেও আমরা একক কাহিনী লাভ করি।

(৬) যেখানে দুই খলত্বমূলক কাজ একই সঙ্গে উপস্থিত থাকে এবং জটিলতার সৃষ্টি করে, সেখানে ও একক কাহিনীই লাভ করা হয়।

(৭) যেখানে প্রথম গতিপ্রবাহে খলের সঙ্গে যুদ্ধ থাকে ও দ্বিতীয় প্রবাহ শুরু হয় নায়ক বা নায়কদের প্রাপ্ত সম্পদসমূহের চুরির ও গভীর খাদে নিক্ষেপের মাধ্যমে, তাহলে 'ল' ও কঠিন কাজের প্রবর্তনাও দেখা যায় — এমন কাহিনীকেও একক কাহিনীই বলতে হবে।

(৮) যে কাহিনীতে নায়কগণ রাস্তার চিহ্ন দেখে ছাড়াছাড়ি হয়, তা-ও একক কাহিনী। তবে পরবর্তী কালে প্রত্যেক নায়কের ভাগ্য এমন বিস্তৃত ও জটিলতায় প্রবেশ করতে পারে, যেগুলো এক একটি পৃথক কাহিনীর জন্মদান করে, তাহলে সেই কাহিনী একক কাহিনীর আওতায় পড়বে না। (১০)

কাহিনীর শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে কাঠামোগত উপাদানের উপর ভিত্তি করা প্রয়োজন বলে প্রপ্ বলেছেন। (১১) এর জন্য তিনি তিনটি সূত্র উল্লেখ করেছেন।

(১) একই বিশেষ লক্ষণের বিচিত্র প্রকাশ অনুসারে।

(২) এক বা একাধিক লক্ষণের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে।

(৩) পারস্পরিক ছাড়াছাড়ি লক্ষণসমূহ অনুসারে।

তাঁর মতে দুই জোড়া ক্রিয়াশীলতা যেমন খলের সঙ্গে যুদ্ধ ও তার উপর বিজয় আরোপ করা (হ-ই) এবং কঠিন কাজ ও তার সমাধান (ম-স)। তাছাড়া অনেক গতিপ্রবাহ যে ক্রিয়াশীলতা ছাড়া গঠিত হয়েছে তাও তিনি বিভিন্ন কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। তাঁর এই সূত্রের ভিত্তিতে তাহলে কাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে চারটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। (১) হ থেকে ই পর্যন্ত ক্রিয়াশীলতাযুক্ত কাহিনী (২) ম থেকে স পর্যন্ত ক্রিয়াশীলতাযুক্ত কাহিনী (৩) হ-ই, ম-স দুইয়ের মধ্য দিয়েই গঠন (৪) হ-ই এবং ম-স বিবর্জিত গঠন। অর্থাৎ, কাহিনীর

শ্রেণীকরণে উপাদানসমূহে উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কেমন, ক্রিয়াশীলতার গতিপ্রকৃতিই বা কিরকম তার উপর গঠন কাঠামো দণ্ডায়মান।

যেসব কাহিনীতে অধিকসংখ্যক গতিপ্রবাহ রয়েছে, যেখানে অনেক খল রয়েছে সেখানে প্রথম গতিপ্রবাহ একরকম হলে, দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ অন্যরকম হবেই। দ্বিগতিপ্রবাহ সম্পন্নকাহিনীতে যদি যুদ্ধ ও কঠিন কাজ দুটোই থাকে, তবে যুদ্ধ সংগঠিত হ'বে প্রথম গতিপ্রবাহে এবং কঠিন কাজ সম্পন্ন হ'বে দ্বিতীয় গতিপ্রবাহে।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার ক্ষেত্রেও এই সমস্ত উপাদান কাহিনীর গঠন কাঠামোতে লক্ষ্য করা যায়। লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মোটিফ্-এর গুরুত্বও অপরিসীম। স্টীথ টমসন মোটিফ্ ইনডেক্স এর সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, "A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it. (১২)

সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য লোককথা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি লোককথারই একটি বা এর বেশী মূল বিষয় আছে। এই মূল বিষয়টিই 'মোটিফ'। একটি লোককথাকে ভেঙে কাহিনী ব্যবচ্ছেদ করলে তার মধ্যে যে এক বা একাধিক কাহিনী অংশ পাওয়া যায়, সেই কাহিনী বা কাহিনী-অংশকেই স্টীথ টমসন 'মোটিফ্' বলেছেন। একটি লোককথার খণ্ড খণ্ড কাহিনী-অংশ সমগ্র কাহিনীকে একটি ঐক্যসূত্রে গেঁথে নেয়। লোককথার মোটিফ্ বা অভিপ্রায়গুলো বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিশ্বজনীন মানুষের এক মানসিক ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমস্ত অভিপ্রায়ে স্থানীয় বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধরা থাকলেও এর ভেতরে থাকে এক সর্বজনীন রূপ। এর সাহায্যে মানবসমাজের অন্তরের অন্তর্নিহিত অভিন্নতার রূপটিও ধরা পড়ে।

মোটিফের স্বরূপ ও বিশ্বজনীন অভিব্যক্তির প্রসঙ্গে রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অন্যতম প্রবক্তা ডঃ জওহরলাল হাণ্ডু বলেছেন, "Motif is a kind of characteristic which is used in comparative method to trace common elements in folklore, more particularly oral narrative. Motif as a unit of classification at once suggests or measures the character, the action and objects. The motifs can be universal in a good possibility." (১৩)

লোকসমাজের উদার মন ভৌগোলিক সীমারেখা, কৃত্রিম রাজনৈতিক মানচিত্রের বিভাজন বা অন্য কোনো রকম বিভেদকে মেনে নেন না। এই বিস্ময়কর মানসিকতাই ধরা পড়েছে মোটিফ্ ইনডেক্সের মধ্যমে। স্টীথ টমসন তাঁর "মোটিফ ইনডেক্স অব্ ফোক্ লিটারেচার" গ্রন্থে মোটিফগুলোকে এভাবে সাজিয়েছেন।

A. লোকপুরাণ

AO-A99 - সৃষ্টিকর্তা।
A100-A499 - দেবতা।
A500-A599 - উপদেবতা ও লৌকিক বীর।
A600-A899 - বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব।
A900-A999 - বিশ্বের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ।
A1000-A1099 - প্রাকৃতিক দুর্বিপাক।
A1100-A1199 - প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা।
A1200-A1699 - মানুষের সৃষ্টি ও স্থিতি।
A1700-A2199 - জীবজন্তুর সৃষ্টি।
A2200-A2599 - জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য।
A2600-A2699 - গাছগাছালির সৃষ্টি।
A2700-A2799 - গাছগাছালির বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি।

B. জীবজন্তু

BO-B99 - লোকপৌরাণিক জীবজন্তু।
B100-B199 - ঐন্দ্রজালিক জীবজন্তু।
B200-B299 - মানবিক গুণসম্পন্ন জীবজন্তু।
B300-B599 - বন্ধুভাবাপন্ন বা উপকারী জীবজন্তু।
B600-B699 - মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর বিয়ে।
B700-B799 - জীবজন্তুর অত্যাশ্চর্য গুণ।

C. ট্যাবু বা বাধানিষেধ

CO-C999 -

D. ঐন্দ্রচালিকতা বা যাদু

D0-D699 - রূপান্তরকরণ বা আকৃতি পরিবর্তন।
D700-D799 - যাদুশক্তি থেকে মুক্ত হওয়া।
D800 - D1699-ঐন্দ্রজালিক বস্তুসমূহ।
D1700-D2199-যাদুশক্তি ও তার প্রকাশ।

E - মৃত

E0-E199- পুনর্জীবন
E200-E599-ভূতপ্রেত বা অন্যান্য অশরীরী আত্মা
E600 - E699- অবতারত্ব বা পুনরায় শরীর গ্রহণ
E700 - E799- আত্মা।

F-অসাধ্যসাধন

F0-F199-অন্যবিশ্বে যাত্রা।
F200-F699-বিচিত্র প্রাণী।
F700-F899-অস্বাভাবিক স্থান ও বস্তু।
F900-F1099-অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ।

G. রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য দানব ডাইনী

G0-G399-নানাবিধ দৈত্য ও ডাইনী
G400-G599-পরাভূত দৈত্য-দানব।

H.পরীক্ষা

H0-H199-সনাক্তকরণ পরীক্ষা
H200-H299-সত্যের পরীক্ষা
H300-H499-বিবাহ পরীক্ষা
H500-H899-চাতুর্যের পরীক্ষা
H900-H1199- পৌরুষের পরীক্ষা ঃ কার্যভার।
H1200-H1399-সাহসের পরীক্ষা ঃ অনুসন্ধান
H1400-H1599-অন্যান্য পরীক্ষা।

J.-চালাক ও বোকা

J0-J199-জ্ঞানার্জন ও রক্ষা
J200-J1099-চালাকি ও বোকাস্বভাব।
J1100-J1699-চালাকি।
J1700-J2799- বোকা

K.-প্রতারণা

K0-K99-প্রতারণার দ্বারা প্রতিযোগিতায় জেতা।
K100-K299-প্রতারণার দ্বারা লাভ।
K300-K499-চুরি ও প্রতারণা
K500-K699-প্রতারিত করে মুক্তি পাওয়া।
K700-K799-প্রতারিত করে বন্দী করা
K800-K999-সাংঘাতিক প্রতারণা
K1000-K1199-নিজের ক্ষতি করেও প্রতারণা করা
K1200-K1299-অপমানিত হয়েও প্রতারণা করা
K1300-K1399-প্রলোভিত করা বা প্রতারিত করে বিয়ে
K1400-K1499-প্রতারিতের সম্পত্তি বিনষ্ট।
K1500-K1599-ব্যভিচারের সঙ্গে যুক্ত যে প্রতারণা
K1600-K1699-প্রতারক নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে
K1700-K1799-মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত করা
K1800-K1899-ছদ্মবেশ বা ভ্রান্তির দ্বারা প্রতারণা
K1900-K1999-ভণ্ড প্রতারক
K2000-K2199-মিথ্যা অপবাদ
K2200-K2299-খলনায়ক ও বিশ্বাসঘাতক
K2300-K2399-অন্যান্য প্রতারণা

L.-ভাগ্যচক্র

L0-L499

M.-ভাগ্য বা নিয়তিকে বশে আনা

M0-M495

N.-অদৃষ্ট ও কপাল

N0-N899

P.-সমাজ

P0-P699

Q.-পুরস্কার ও শাস্তি

Q0-Q599

R.-বন্দী ও পলাতক

R0-R399

S.-অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা

S0-S499

T.-ইন্দ্রিয়

T0-T699

U.- জীবন প্রকৃতি

U0-U299

V.-ধর্ম

V0-V599

W. চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য

W0-W299

X. হাসি ঠাট্টা

X0-X1799

Z. বিভিন্ন মোটিফ

Z0-Z99-শিকলি গল্প (Chain Motif)
Z100-Z190-সংকেতধর্মিতা
Z200-Z299-বীর
Z300-Z399-বিশেষ ব্যতিক্রম (১৪)

O I Y বাদ দিয়ে A থেকে Z পর্যন্ত ২৩ টি বর্গের ভেতর স্টীথ টমসন লোককথার যে অসংখ্য মোটিফকে বিজ্ঞান নির্ভর পন্থায় তালিকাবদ্ধ করেছেন, মানবজীবন ও পরিবেশের সব বিষয়ই তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তালিকাকে প্রয়োজনে সম্প্রসারণশীল করার জন্য তিনি মূল ভাগগুলোর অন্তর্গত মোটিফের সংখ্যায় দশমিক প্রথা ব্যবহারের নির্দেশও দিয়েছেন।

লোককথার অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লড লেভি স্ট্রস্-এর নাম বিখ্যাত হয়ে রয়েছে, তাঁর রূপতাত্ত্বিক গবেষণা-পদ্ধতির সাহায্যে লোকসাহিত্যের সকল উপাদানের মধ্যে "বিপরীতমুখী দুটো শক্তির" অস্তিত্ব অনুভব করার জন্য। তিনি বলেছেন, লোকসাহিত্যের সকল উপাদানের মধ্যে এই 'বাইনারী অপোজিশান' বা 'যুগ্ম বৈপরীত্য' রয়েছে। তিনিও লোককথার রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মোটিফের বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেবার কথা বললেন। তাঁর মতে লোককথার সঠিক অর্থ উদ্ধারের জন্য মোটিফকে বিযুক্ত করে অর্থবোধক পন্থায় সাজানো প্রয়োজন, তারপর বিপরীতমুখী বক্তব্য ও ক্রিয়াসমূহ চিহ্নিত করা দরকার। এর পরবর্তী অবস্থায় দেখা যাবে যুগ্ম বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়াশীলতায় কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ঘটনাগুলো আবর্তিত হবে এবং ধীরে ধীরে মধ্যস্থকারী শক্তির সাহায্যে কাহিনীতে একটি সুন্দর সমাপ্তি লক্ষ্য করা যাবে। লেভি স্ট্রস এভাবে বিশ্লেষণ করে রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির একটি সূত্র নির্দেশ করেছেন ঃ (১৫)

fx(a) : fy(b) : : fx(b):fa-1(y) । বাংলায় এটি হবে এরকম ফঙ(ক) : ফঞ(খ) : : ফঙ (খ) ফক-১(ঞ)। এই সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এখানে

a - প্রথম পক্ষ

fx - ক্রিয়াশীলতা

b - সংযোগকারী

fy - অন্যান্য কর্মকাণ্ড, যা প্রথমোক্তর বিরুদ্ধে নিয়োজিত এবং

b - র সঙ্গে যুক্ত

যদি a -র নেতিবাচক ভূমিকা দেখানো হয় fx হিসেবে, যার ফলে সে খল বা ভিলেন হিসেবে পরিচিত এবং অন্যচরিত্র b- ইতিবাচক ভূমিকা দেখানো হয় fy হিসেবে, যার ফলে সে নায়ক হিসেবে চিহ্নিত তাহলে b- কিন্তু নেতিবাচক ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে। এর ফলেই বিজয়সূচিত হয় এবং a-র ধ্বংসসাধনের মাধ্যমে y-র মূল্য নির্দিষ্ট হয়। এই ফর্মূলাটিকে বাংলায় সাজালে এরকম হবে।

ফক-১(ঞ) > ফঙ(খ)। অর্থাৎ লেভি স্ট্রসের ভাষায়

[fa-1(y) >fx (b)]

সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় বলা যায় b-এর সক্রিয়তায় কাহিনী প্রাথমিক অবস্থা থেকে বিপরীতমুখী প্রবাহে প্রবেশ করে এবং এই বিপরীতমুখী গতি তারই প্রভাবে এগিয়ে যেতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সুফলপ্রদ হয়ে তার পক্ষে আসে। এই অবস্থাটিকে এভাবে রেখাচিত্রের দ্বারা গ্রহণ করা যেতে পারে।

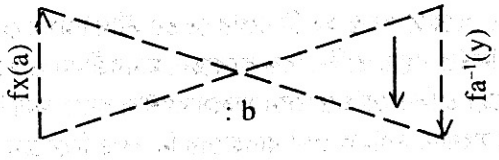

এভাবে x এবং y -র দ্বন্দ্ব a এবং b -র বৃহত্তর দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পরিণতির দিকে অগ্রসর হবার পরিস্থিতিটি রেখাচিত্রে এভাবে দেখা যেতে পারে।

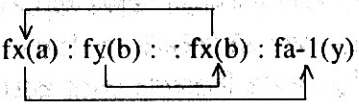

স্ট্রসের মতে যুগ্ম বৈপরীত্য ছাড়া পুরাকাহিনীর অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।(১৬)

রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে পরবর্তীকালে আরও সম্প্রসারিত করেছেন নোয়াম চমস্কি, উইলিয়াম হেনড্রিকস, ই কে মারাণ্ডা, পিমারান্ডা, অ্যালান ডান্ডিস্, মেলভিল জেকবস্, ক্রুদ ব্রিমণ্ড, ওয়ালটার অ্যান্ডারসন, লিণ্ডা ডেঘ, অ্যালবার্ট লর্ড প্রভৃতি। এদের মধ্যে নোয়াম চমস্কি, ই কে মারাণ্ডা, পি মারাণ্ডা ও অ্যালান ডাণ্ডিস বিশেষ খ্যাতিমান।

আমেরিকার প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে ভাষার কাঠামোগত বিশ্লেষণ করলেন এবং এর নাম দিলেন generative grammer বা সঞ্জননী ব্যাকরণ। চমস্কি তাঁর এই তত্ত্বকে ধ্বনিতত্ত্বের এবং উপভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সফলভাবে ব্যবহার করেন। ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চমস্কির তত্ত্ব বিশ্বে ব্যাপক অলোড়ন সৃষ্টি করলেও লোককথার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ অসুবিধেজনক বলে আমরা সেই পদ্ধতিগত আলোচনা থেকে বিরত রয়েছি।

ই কে মারাণ্ডা ও পি মারাণ্ডা রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে লেভি স্ট্রসের সূত্রকে অনুসরণ করে নিজস্ব উদ্ভাবিত কিছু পদ্ধতি যোগ করেছেন। তাঁদের সূত্র হল (১২)

QS:QR:FS:FR
QS=Quasi solution
QR=Quasi Result
FS = Final solution
FR = Final Result.

অ্যালান ডাণ্ডিস তাঁর রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি বিশ্লেষণের প্রথমেই প্রপের মোটিফ ইনডেক্সের অসাধারণত্ব স্বীকার করেছেন। প্রপের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অসাধারণত্ব স্বীকার করে এই তত্ত্বের সঙ্গে আরও দুটো সূত্র যুক্ত করলেন। এই দুটো সূত্রকে তিনি "মোটিফেম" নামে অভিহিত করলেন।

Lack and Liquidition অর্থাৎ অভাব ও অভাববোধ— এই সূত্রদ্বয় ডাণ্ডিসের অনন্য আবিষ্কার বলে চিহ্নিত হল (১৭)।

কাহিনী ঃ এক

রক্তপিপাসু দেবতা

রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীকরণ, কাহিনীর কাঠামোগত গতিপ্রবাহ, ক্রিয়াশীলতা, মোটিফ এবং বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার আলোচনা করা যেতে পারে।

অ্যান্টি আর্ণে-স্টিথ টমসন কৃত লোককথার টাইপ ইনডেক্সকে অনুসরণ করে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা "রক্তপিপাসু দেবতা"-কে সাধারণ লোককথার অন্তর্গত ঐন্দ্রজালিক কাহিনী, টাইপ ৩০০-৭৪৯ -এর পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

দেবতাদের গুণগত পরিবর্তন এই কাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও কিছু অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। যেমন, রানীমার সক্রোধ তিরস্কারে দেবতাদের মধ্যে বিনয়ভাবের প্রকাশ ঘটেছে, উপরন্তু নিজেদের দোষ স্বীকার করে তারা আত্মসমর্পণ করেছেন এবং এই তিরস্কারের দ্বারাই তাঁদের চৈতন্যোদয় ঘটেছে। যার পরিণতিতে কোনোরকম যুদ্ধবিগ্রহের অপেক্ষা না করেই রানীমার জয় ঘোষিত হচ্ছে।

এই কাহিনীটিকে মিশ্র গতি প্রবাহ সম্পন্ন একক কাহিনী বলে ধরা যায়। প্রথম গতিপ্রবাহঃ রানী হীরাবতীর ছেলে ত্রিলোচন (ঙ)। নদীর ঘাটে রানীমা জল আনতে গেলে দেবতারা তাঁর কাছে সহায়তা প্রার্থনা করেন ও অনুচরবৃন্দের সহায়তায় রানীমা মোষটির নিধনকার্যে সাহায্য করেন (ই[৫])।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ রাজবাড়ীতে রানীমা দেবতাদের বাসস্থান ও নিত্য সেবার্চনার ব্যবস্থা করছেন। দেবতাদের খলত্বের প্রকাশ, রাজপুত্রকে পাঁঠায় রূপান্তরিত করে রক্তপান (ন[৩]) রানীমার সক্রোধ তিরস্কারে খলের চৈতন্যোদয় ও খল বশীভূত হয় (ই[৭])।

কাহিনীর ক্রিয়াশীলতাসমূহ লক্ষ্য করা যাক।

কাহিনী ঃ অনেকদিন আগে ত্রিপুরাতে ত্রিলোচন নামে একজন রাজা ছিলেন। কিশোর ত্রিলোচনের মায়ের নাম ছিল রানী হীরাবতী। রানী হলে কি হ'বে, তিনি নিজ হাতেই সব কাজ করেন। (১)

একদিন বর্ষাকালে নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে (২) রানীমা এক করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলেন, রানীমা, রানীমা আমাদের বাঁচাও (৩) তিনি শব্দ লক্ষ্য করে ওরা কারা জানতে চাইলেন। তাছাড়া তিনি অনাথা বিধবা, তার দ্বারা কি-ইবা সাহায্য হ'তে পারে। (৪)

তখন ওরা জানালো যে, ওরা চৌদ্দজন দেবতা একটা পাজি মোষের তাড়া খেয়ে শিমূল গাছে চড়ে বসেছে। সাতদিন যাবৎ অনাহারী হয়ে আছে মোষের ভয়ে। সৌভাগ্যবতী ত্রিপুরার মহারানী সতীসাধ্বী। তিনিই একমাত্র এই বিপদ থেকে ওদের রক্ষা করতে পারেন (৫)।

(১) জোরালো প্রাথমিক অবস্থা (ঙ[১])
(২) নায়িকা স্থলপথে যায় (↑গ[১])
(৩) দেবতাদের প্রাণরক্ষার আবেদন। দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা - (ব[১])
(৪) করুণা প্রদর্শনে রানীমার অসহায়তা প্রকাশ (ঢ[১])
(৫) রানীমাকে দেবতাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন

রানীমা তাঁদের কথায় আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, দেবতার অসাধ্য কার্য্য একা স্ত্রীলোক হয়ে কি করে সাধন করবেন। তখন দেবতারা বল্লেন, যে কোনো এক অভিশাপে তাঁরা মোষের সাথে পেরে উঠছেন না। রানীমা ওদের রক্ষা করলে তাঁরা রানীমার কাছে চিরদিন বাঁধা থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন (৬)। রানীমা এজন্য কি করতে হ'বে, তা জানতে চাইলেন (৭)। একজন দেবতা বল্লেন, 'রানীমা তোমার রিছা (বক্ষাবরণী) মোষটাকে দেখিয়ে পিঠে ফেলে দিলেই সে বাগে আসবে (৭ক)। তখন ওটাকে শিমুল গাছে বেঁধে বলি দিলেই আমরা নেমে আসবো'। এরপর তুমি আমাদের বাড়ী নিয়ে যেও (৮)। এরপর রানীমা তাদের অপেক্ষা করতে বলে কিছুক্ষণ পরই কুড়ি/ পঁচিশজন অনুগত লোকজন নিয়ে ধারালো অস্ত্রশস্ত্রসহ ফিরে এলেন (৮ক)। তারপর দেবতাদের নির্দেশমতো রানীমার লোকজন রিছার সাহায্যে মোষটাকে বশীভূত (৯) করে। তারপর মোষটাকে বলি দেওয়া হল। বলি শেষে দেবতারা একে একে গাছ থেকে নেমে এলেন। ওদিকে রানীমা ফিরে গিয়ে (৯ক) রাজবাড়ীতে দেবতাদের থাকার জন্য জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখলেন। দেবতারা রানীমার লোকজনের পিঠে চড়ে রাজবাড়ীতে এলে, রানীমা পরম ভক্তিভরে তাঁদের প্রণাম করে গৃহে স্থাপন পূর্বক প্রতিদিন সেবা অর্চনার ব্যবস্থা করলেন। পরম নিষ্ঠাভরে পূজা অর্চনা করে পরে নিজে আহার্য্য গ্রহণ করেন। (১০) দেবতাদের ভোগ তৈরী করার জন্য হেঁসেলে প্রবেশ করেন যখন, (১০ক) তখন কিশোর ত্রিলোচন খেলাধূলা করার জন্য দেবতাদের ঘরে যায়। এভাবে দিন কেটে যাচ্ছিলো। ওদিকে দিনদিন ছেলেটি রক্তহীন ও ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছিল। অজানা আশংকায় হীরাবতী দুর্বল পুত্রের জন্য শঙ্কান্বিত হয়ে উঠলেন। যত্ন করেও ছেলের স্বাস্থ্য উদ্ধার হলনা (১১)। একদিন দেবতাদের ঘরের ভেতর থেকে ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ লক্ষ্য করে দেখলেন, দেবতারা একটি পাঁঠা বলি দিয়ে তাঁর সবটুকু রক্ত চুষে খেয়ে নিলেন খুব মজা করে। তারপর মন্ত্রঃপুত কিছুটা জল ছিটিয়ে দিতেই সেই পাঁঠাটা ত্রিলোচনের রূপে রূপান্তরিত হয়ে গেল। (১২) ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে রাগ-দুঃখে তীব্র ভাষায় রানীমা দেবতাদের তিরস্কার করতে লাগলেন, তাঁদের কৃতঘ্নতার জন্য। (১৩) তাঁর যথাসাধ্য সেবাযত্নেরও উল্লেখ করলেন রানীমা। এতে দেবতারা অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। বল্লেন

(৬) দেবতাদের সাথে রানীমার কথোপকথন (এ[২])
(৭) আবেদকের প্রতি সহায়তাদান (এ[৫])
(৭ক) কঠিন কাজ - (ম)
(৮) দেবতাদের দ্বারা যাদু নিমিত্তের নির্দেশ (ভ[২])
(৮ক) রানীমার প্রতিরোধমূলক কাজের সূত্রপাত (চ↓↑)
(৯) কঠিন কাজ সমাধান (স)
(৯ক) শত্রুনিধন (ই[৫])
(৯ক) (↓)
(১০) দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ ও উদ্ধারলাভ (অঅ[৮])
(১০ক) রানীমার সেবামূলক কাজ (এ[১])
(১১) দেবতাদের খলত্বের প্রকাশ। খলের জাদুজালে যান্ত্রিকভাবে সাড়া দিচ্ছে রাজপুত্র ও মা (জ[১])
(১২) রাজপুত্রকে দেবতারূপী খলদ্বারা (যাদুনিমিত্ত দ্বারা) পাঁঠায় রূপান্তরকরণ ও রক্তপান (ন[৪])(ট[১]) (খলের চাতুরীর বিচিত্র পন্থা)
(১৩) দেবতাদের গুণগত পরিবর্তন দেবতা > খল

যে তাঁরা অমৃত পান করেও এতো তৃপ্ত হননা যতটা খুশী হন এক বিন্দু রক্তপান করতে পেলে। একথা শুনে রানীমা তাঁদের সেবাপূজায় প্রতিদিন রুধির ভোগের জন্য একটি করে পাঁঠাবলি দেবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। রানীমার একথায় দেবতারা অত্যন্ত প্রীত হয়ে রানীমার জয় ঘোষণা করলেন। (১৪)

ক্রিয়াশীলতা অনুসারে কাহিনীটির আঙ্কিকরূপ হ'বে এইরকম ঃ

(ঙ[১]) গ[২] ব[৪] ঢ[৭] এ[২] এ[৫] ম ভ[২] চ ↑↓ স ই[৫] অ অ[৮] জ[২] ন[৪] ই[৭]।

এই কাহিনীর গঠনে ম থেকে স পর্যন্ত ক্রিয়াশীলতা বর্তমান।

রেখাচিত্রে সাজানো কাহিনীটির রূপ হ'বে এইরকম ঃ

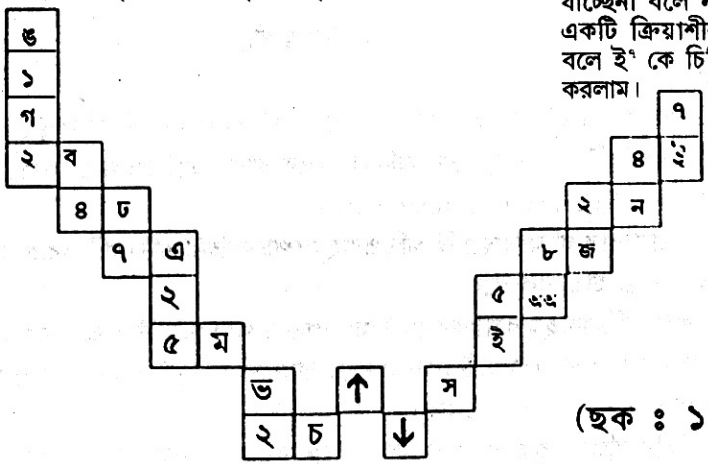

(ছক ঃ ১)

(১৪) এখানে তিরস্কারের দ্বারা খল বশীভূত হয়। এটা বিজয়েরই অংশ। যুদ্ধ ছাড়াই জয় হচ্ছে। (ই[৭]) (তিরস্কারের দ্বারা বশীভূত হবার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক কোন ব্যাপারও নেই। এই ক্রিয়াশীলতাটি প্রপ্ এর তালিকায় পাওয়া যাচ্ছেনা বলে নতুন একটি ক্রিয়াশীলতা বলে ই[৭] কে চিহ্নিত করলাম।

মোটিফ ঃ কাহিনীটিকে বিশ্লেষণ করে উল্লেখযোগ্য ভাবে যে মোটিফগুলো পাওয়া যাচ্ছে তা হ'ল— ম্যাজিক বস্তু, রিছা (বক্ষাবরণী) D 900 । পুনঃ পুনঃ রূপান্তর, ছাগল থেকে মানুষ, মানুষ থেকে ছাগল - D 601 । পুনর্জীবনদান, মন্ত্রপূত জলের সাহায্যে - E80, E84। বলিদানের সূত্রপাত। মানুষের বদলে পশুরক্তপান ইত্যাদি A 1545.2

ষণ্ড, পাঠান্তরে মোষ, গব (গো জাতীয় পশু) গোষ্ঠীপ্রতীক (totem)।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

লেভি স্ট্রস্-এর বিশ্লেষণের ফর্মুলা অনুসারে এই কাহিনীটিতে দুটো বিপরীতমুখী শক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এখানে প্রথম পক্ষ (a) দেবতারা এবং দ্বিতীয় পক্ষ রানীমা। প্রথম পক্ষের পদক্ষেপে বিষয়ের অবতারণা, উন্মোচন ও যাত্রা ঘটে। কিন্তু পরে a-র নেতিবাচক (খলত্ব প্রকাশ) ভূমিকা ও b-র ইতিবাচক ভূমিকার প্রকাশ দেখা যায় কাহিনীর নায়িকা হিসেবে। পরবর্তী সময়ে (b) নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে দেবতাদের অপরাধের জন্য তিরস্কার করে এবং সবশেষে b-র জয় ঘোষিত হয়। ফলে এখানে লেভিষ্ট্রসের ফর্মূলাটি সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায় বলেই মনে হয়। রেখাচিত্রে সাজালে এই বিশ্লেষণটি হবে এরকম।

সূত্রব্যাখ্যা ঃ

fx = ক্রিয়াশীলতা

a = প্রথম পক্ষ

fy = প্রথমোক্তর বিরুদ্ধে নিয়োজিত

b = দ্বিতীয় পক্ষ। এর সঙ্গে fy-র অবস্থান যুক্ত।

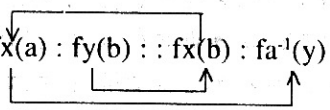

কাহিনী ঃ দুই

বানর বর

রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীকরণ ঃ 'বানর বর' লোককথাটি পশুকথা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পশুমানবের বিয়ের বৈশিষ্ট্যটি এখানে মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। এটি টাইপ ১৫০-১৯৯। মানুষ ও বন্যপশু পর্যায়ভুক্ত (Man-Animal tales) ।

কাঠামোগত গতিপ্রবাহ ঃ দ্বি-গতিপ্রবাহ সম্পন্ন কাহিনী এটি। গতিপ্রবাহ একে অপরকে অনুসরণ করে স্বাভাবিকভাবে।

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ বানর প্রথমে জামাকাপড় ও পরে মেয়েটিকে অপহরণ করে। মেয়েটি বানরের সঙ্গেই থাকে। মেয়েটি কৌশল করে বানরকে থাসতুই আনতে দূর গ্রামে পাঠায় ও নিজে পালিয়ে যায় ছেলে ততে সহ।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ বানর দংদরং বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে স্ত্রী-পুত্রের সন্ধানে বহির্গত হয়। শ্বশুরালয়ে এসে তাদের সন্ধান পায়। মুক্তিকামী মানবী-স্ত্রীর বুদ্ধি ও চাতুর্যে বানর মারা যায় ও স্ত্রী বানরের হাত থেকে রক্ষা পায়।

প্রথম গতিপ্রবাহে বানর খলের ভূমিকায় অবতীর্ণ কিন্তু দ্বিতীয় গতিপ্রবাহে দেখা যায় তার প্রতি মানবী স্ত্রীর সহানুভূতির ভাব জন্মাচ্ছে। বানরের সঙ্গে মানবী থাকতে পারে না বলেই তাকে পালাতে হলো। নায়িকার বিপরীতে সে এখানে প্রতিনায়ক হিসেবে কিছুটা প্রতিফলিত। দুটো গতিপ্রবাহ একে অপরকে অনুসরণ করছে। ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে আমরা কাহিনীটিকে এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি ঃ

শীতকাল। তখনো জুম শেষ হয়নি। বেগুন, তুলো এখনো রয়ে গেছে প্রচুর। বানর বেগুনগুলো খেয়ে ফেলতে পারে, তুলোটাও নষ্ট করে ফেলতে পারে তুলে না আনলে (১)। তাই অল্পবয়েসী মেয়েরা দল বেঁধে জুমে যাচ্ছে (২)। জুমে গিয়েই ওরা দেখলো একটা বানর জুমের ভাল ভাল বেগুনগুলো পেড়ে খাচ্ছে (৩)। মেয়েদের দলের

(১) জোরালো প্রাথমিক অবস্থা (ঙ')
(২) মেয়েদের জুমে যাত্রা (ছ')
(৩) খল (বানর) শস্য নষ্ট করে (আ')

ছোট মেয়েটি প্রথম দেখতে পেয়ে কুকুর লেলিয়ে দিল ছু-ছু-লে-লে বলে। কুকুরটা দৌড়ে গেল (৪)। কিন্তু অল্পের জন্য ধরতে পারলো না বানরটাকে (৫)। গাছে উঠে প্রাণ বাঁচায় বানর। (৬) নাগালের বাইরে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করলো এর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেনা (৭)। মেয়েরা জুমের কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকে। কুকুরটা ঘুরে বেড়ায়। দুপুরে খাবার সময় হলে সবাই রিতুকু (গামছা) নিয়ে স্নান করতে গেল। শাড়ী, বক্ষাবরণীগুলো এক জায়গায় রেখে সবাই গামছা পরে জলে নামলো। বানর গাছের উপর থেকে পাতার আড়ালে সব দেখছিল (৮)। মেয়েরা যখন আপনমনে স্নান করছিলো, তখন সে চুপিসারে নেমে এসে কাপড়গুলো গুটিয়ে নিয়ে গাছের উপরেই বসে রইলো। ব্যাপারটা মেয়েদের কারু নজরে পড়লো না(৯)। মেয়েরা স্নান করে এসে কাপড় না পেয়ে এ নিয়ে যখন বলাবলি করছিলো, ঠিক তখুনি বানরটা গাছের ডাল ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ওরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলো বানরটাই ওদের কাপড়গুলো মগডালে তুলে রেখেছে (১০)। কি করে এগুলো ফেরৎ পাওয়া যায় তাই ওরা ভাবতে লাগলো। দেখলো একটা সাতসিঁড়ি মই লাগানো আছে গাছে (১১)। বড় মেয়েটি গাছের নিচে এগিয়ে হাত তুলে বললো 'ও দাদা আমাকে একটি শাড়ী' (১২)। গাছ থেকেই বানরটা বললো, 'মইয়ের এক সিঁড়ি উঠে এসো, একগাদা বেগুন দাও, হে ভ্রষ্টা নারী।'(১৩) বড় মেয়েটি একগাদা বেগুন দিয়ে শাড়ী পেলো দেখে দ্বিতীয় মেয়েটিও বানরকে এগিয়ে এসে একই কথা বললো। বানর বললো, 'সিঁড়ির দুধাপ উঠে এসে দুগণ্ডা বেগুন এনে দাও।' মেয়েটিও তাই করলে বানর বেগুন হাতে নিয়ে মেয়েটির শাড়ী ফিরিয়ে দিলো। এমনি করে ছ'টি মেয়েই এক এক ধাপ সিঁড়ি উপরে উঠে এক এক গণ্ডা বেগুন বেশী দিয়ে ওদের নিজের নিজের শাড়ী নিয়ে নিলে বাকী রইলো ছোট মেয়েটি। সে বানরের কথামতো সাত ধাপ সিঁড়ি উপরে উঠে গেল সাতগণ্ডা বেগুন নিয়ে (১৪)। বানর বেগুন না নিয়ে মেয়েটিকেই হাত ধরে গাছে তুলে নিলো। মেয়েটির চীৎকারে অন্য মেয়েরা ফিরে এলো গাছের নিচে। কিন্তু বানর অনেক উঁচুতে মেয়েটিকে নিয়ে গেল (১৫)। মেয়েরা বাড়ী ফিরে এলো। রাতের অন্ধকারে বড়রাও জুমে গিয়ে মেয়েটির কোনো হদিশ পেলোনা। ততক্ষণে বানর মেয়েটিকে গভীর বনের এক বিরাট গাছে নিয়ে তুলেছে (১৬)। দিন যায়। বানরের সাথে কি মানুষ থাকতে পারে? কান্নাকাটি করে মেয়েটি কাটিয়ে দিল

(৪) খলের কাজে বাধাদান প্রতিরোধ (চ)
(৫) জীবনের উপর আক্রমণের উদ্যোগ ও আত্মরক্ষা (এ[৮])
(৬) গাছে উঠে আত্মরক্ষা (রস ৮-৯)
(৭) প্রতিশোধমূলক কাজের সূত্রপাত — (চ)
(৮) খলের প্রাথমিক পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ[১])
(৯) খল কিছু অপহরণ করে (আ[১])
(১০) শিকারকে হাতে পাবার জন্য প্রলুব্ধ করা (আ[৯])
(১১) সাত সিঁড়ি মই (সহায়ক) (ভ[১])
(১২) আবদ্ধ বস্তুর জন্য অনুরোধ (চ[১১])
(১৩) বিনিময়ে সম্মতি (এ[১০])

(১৪) খলের চাতুরীর বিচিত্র পন্থা (ন[৪])
(১৫) অনুসন্ধানীয় ব্যক্তিকে বুদ্ধির সাহায্যে খল হস্তগত করে (অঅ[১])
(১৬) বলপূর্বক অপহরণ ও নায়িকাকে আবদ্ধ করে (আ[১৬-১৭])

কিছুদিন। অবশেষে বানরের সাথেই থাকতে বাধ্য হ'ল। তবে পালিয়ে যাবার চিন্তাটা মনে রয়েই গেল। সে সুযোগ খুঁজতে লাগলো (১৭) বছর ঘুরে গেলে তার একটি ছেলেও হল। গাছের ডালেই সে বড় হ'তে লাগলো। কিছুদিন যেতেই বানরবৌ বানরকে বললো যে তার থাসতুই (টক আমড়া) খেতে খুব ইচ্ছে করছে (১৮)। কাছাকাছি কোথাও ফলটি পাওয়া যায় না বলে বানরকে দূর গাঁয়ে যেতে হল আনার জন্য (১৯)। বানর বেরিয়ে যেতেই মেয়েটি পালিয়ে যাবার জন্য তৈরী হ'তে লাগলো(২০)। যেতে খুব কষ্ট হ'ল তার। তবু যেতেই হ'বে। যাবার সময় চোখ মুছে উনুনে চাপানো ভাতের হাঁড়িকে বললো— "ভাতের হাঁড়ি তুমি এমনি করে টগবগ করে ফুটতে থেকো।" ঘরের পোষা বেড়ালকে বললো, "তুমিও মিঁউ মিঁউ ডাকতে থেকো। চাখাইখক্-কে বললো, 'তুমিও টপটপ জল ঝরাতে থেকো'। এভাবে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ছেলে ততেকে কোলে নিয়ে পিঠে ও হাতে যথাক্রমে লাঙ্গা ও দা নিয়ে বনের পথে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো (২১)। তখনো সন্ধ্যা হয়নি। বানর থাসতুই নিয়ে ঘরে ফিরে এলো(২২)। ঘরে ফিরে দেখলো ভাতের হাঁড়িতে টগবগ করে জল ফুটছে, বেড়ালটা মিউ মিউ করে ডাকছে, চাখাইখক্ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। দেখে মনে হচ্ছিল একটু আগেও সে ঘরে ছিল। বৌ ও ছেলেকে অনেক ডাকাডাকি করেও না পেয়ে বানর মনের দুঃখে ঘরের দাওয়ায় বসে কাঁদতে লাগলো(২৩)। পোষা বেড়ালটাকে এক ঘা দিয়ে মেরে ফেললো সে। তারপর বেড়ালের চামড়া দিয়ে বাদ্যযন্ত্র (দংদরং) বানিয়ে, সেটি বাজাতে বাজাতে বৌ আর ছেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে (২৪)। বন-জঙ্গল পেরিয়ে যাচ্ছে বানর(২৫)। পথে চাষীরা বললো যে এ পথেই একটি মেয়ে ছেলে কোলে করে গেছে। সে-ই নিশ্চয় বানরের স্ত্রী হবে (২৬)। বানর তাদের আশীর্বাদ করে পথ চলতে চলতে একদিন শ্বশুরবাড়ী পৌঁছোয়। ছেলে বাবাকে দেখে চিনতে পারে। মা ছেলেকে ধমকে বললো— 'দূর তোর বাবা কোথায়, এ যে একটা বানর' (২৭)। ছেলে দৌড়ে গিয়ে বাবার কোলে উঠলো,বাবা-মা ও জামাই-য়ের আগমনে তাকে ঘরে তুলে নিলো। জামাই এসেছে বলে পানভোজন শুরু হ'ল (২৮)। অনেক রাতে পাড়াপড়শী যে যার ঘরে চলে গেলো। বানর নেশায় চুর হয়ে ছিল।

বানরের স্ত্রী মাচার ঘরটিতে বিছানা করে রাখলো। বিছানার

(১৭) প্রতিরোধমূলক কার্য্যের সূত্রপাত (চ)

(১৮) প্রতারণামূলক অনুরোধ (ন[১])

(১৯) এখানে খল পুরোপুরি খল নয়, প্রতিনায়ক পর্যায়ভুক্ত। প্রতিনায়ককে সরাসরি দূরে প্রেরণ (ব[২]↑)

(২০) পলায়নেরপ্রস্তুতি

(২১) স্থলপথে নায়িকার যাত্রা (গ[১])

(২২) প্রতিনায়কের প্রত্যাবর্তন (↓)

(২৩) পত্নী ও পুত্রের অভাবে ক্রন্দন। (অ[১])

(২৪) স্ত্রী-পুত্রের সন্ধানে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মনের দুঃখে বানরের দূরদেশে যাত্রা (চ↑)

(২৫) বানর স্থলপথে যায় (গ[১])

(২৬) জুমিয়ারা পথ নির্দেশ করে (ফ[২]-গ[৩])

(২৭) খলের অপরিচিত অবস্থায় অন্যস্থানে আগমন (ও[২])

(২৮) স্ত্রীপুত্রের অভাব অপসারিত (অঅ[১])

একপাশে রাখলো একটি গর্ত। বানরকে গর্তের পাশেই শুইয়ে দিলো (২৯)। মদের নেশায় শোয়ামাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি তাকে সরে শুতে বললো। বানর ঘুমের ঘোরে সরে যেতে যেতে (৩০) মাচার গর্তের ভেতর দিয়ে নিচে পড়ে গেলো। সেখানে ছিল এক হাঁটু কাদা আর তাতে ছিলো শুয়োরের দল। বানর আর উঠতে পারলো না। শূয়োরগুলো দাঁত দিয়ে তাকে চিরে ফেললো। মেয়েটিও বানরের হাত থেকে রক্ষা পেলো (৩১)।

(২৯) সাধুতার আড়ালে ছলনাজাল বিস্তার ($ন^১$)
(৩০) ক্রমাগত ক্ষতি সাধনের প্রায়াস ($ন^২$)
(৩১) প্রাথমিক যুদ্ধ ছাড়াই খলের নিধন (প্রতিনায়কের) ($ই^৫$)

এই কাহিনীটির সংক্ষিপ্তরূপ হ'বে এইরকম।

প্রথম অংশ ঃ $ঙ^১$ $ছ^৩$ $আ^৪$ চ$এ^৮$ রস$^{৮-৯}$ চ$ঐ^১$ $আ^{১-৯}$ $ভ^১$ $চ^{১১}$ $এ^{১০}$ $ন^৪$ অ$অ^১$ $আ^{১৬-১৭}$ চ $ন^১$

দ্বিতীয় অংশ ঃ $ব^২$ ↑ $গ^২$ ↓ $অ^১$ চ ↑ $গ^২$ $ফ^২$ - $গ^৪$ $ও^২$ অ$অ^১$ $ন^{১-২}$ $ই^৫$

রেখাচিত্রে সাজালে কাহিনীটির চিত্র হ'বে এরকম ঃ

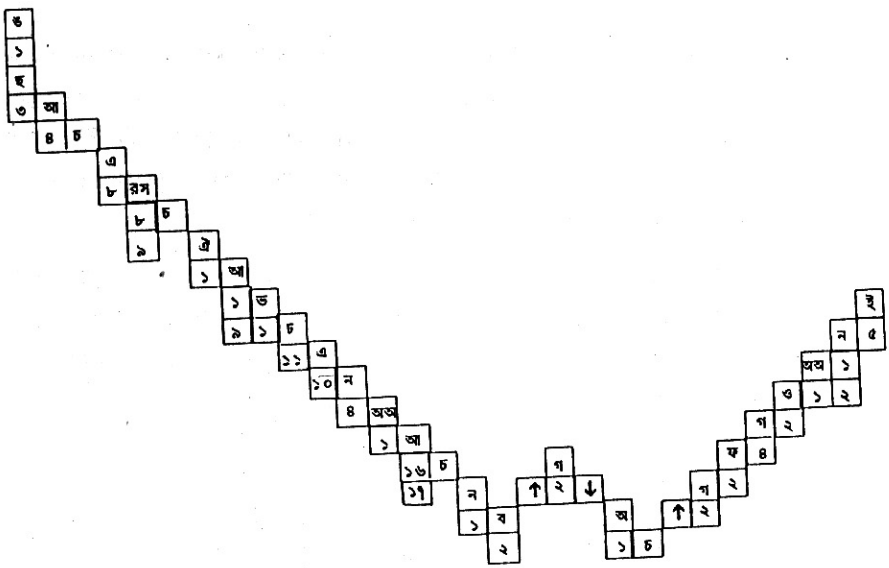

(ছক ঃ ২)

এই কাহিনীটির গঠন কাঠামো ম থেকে স, হ থেকে ই ক্রিয়াশীলতা বর্জিত। হত্যাই এখানে প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মোটিফ ঃ এই কাহিনীটির মূল অভিপ্রায় পশুর সঙ্গে মানবীর বিবাহ এবং মানবীর গর্ভে মানব সন্তানের জন্ম। মোটিফ B600-699। বানর অরণ্যচারী জনজাতি গোষ্ঠীর টোটেম বিশ্বাসজাত। মেয়েটির সঙ্গে প্রবঞ্চনা একটি গৌণ অভিপ্রায়। "ভাতের হাঁড়ি তুমি টগবগ করতে থেকো" বলা এবং সেইভাবেই ভাতের হাঁড়ির আচরণে ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রকাশ দেখা যায়।

সাত সংখ্যাটিকে লোকশ্রুতিতে ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন মনে করা হয়। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেও তাই এই সংখ্যাটিকে তাৎপর্য্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সেজন্যই সাতভাই, সাতবোন, সাত সতীন ইত্যাদির কথা প্রায়ই শোনা যায়। এই গল্পে রয়েছে সাতগণ্ডা বেগুন, সাতধাপ সিঁড়ি ও ৭ বোনের কথা। মেটিফ - Z.71.16.1

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

লোভিস্ট্রসের ফর্মূলাটি এই কাহিনীতে প্রয়োগ করা যেতে পারে এভাবে ঃ বানরবর যদি প্রথম পক্ষ হয় (a), তবে মেয়েটি অর্থাৎ নায়িকা দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ (b) । (a) এর নেতিবাচক ভূমিকা বস্ত্র অপহরণের এবং মেয়েটিকে আটকে রাখার মাধ্যমে আবদ্ধ থেকে মেয়েটির ইতিবাচক ভূমিকা। পরবর্তী সময়ে (b) নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে পালাবার পথ বের করে। অবশেষে (a) অর্থাৎ বানরের ধ্বংসের দ্বারা মেয়েটির বিজয় সূচিত হয়।

সামগ্রিক প্রক্রিয়ার বলা যায়, (b)- এর সক্রিয়তায় কাহিনী প্রাথমিক অবস্থা থেকে বিপরীতমুখী প্রবাহে প্রবেশ করে এবং এই বিপরীতমুখী গতি তারই প্রভাবে এগিয়ে যেতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সুফলপ্রদ হয়ে তার পক্ষে আসে। এই অবস্থাটিকে এভাবে রেখাচিত্রের দ্বারা গ্রহণ করা যেতে পারে।

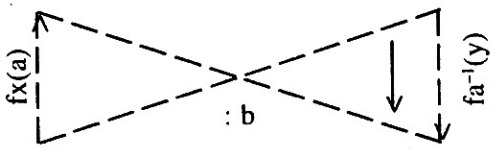

কাহিনী ঃ তিন

পুরোহিত

'পুরোহিত' নামক লোককথাটিকে সাধারণ লোককথার শ্রেণীভুক্ত করা চলে। 'বুড়া দেবতার' পুজো প্রচলন কিভাবে হ'ল তার ইঙ্গিতদানকারী এই কাহিনীটি ঐন্দ্রজালিক কাহিনীর অন্তর্গত অলৌকিক সাহায্যকারী, টাইপ ৫০০-৫৫৯ এর অন্তর্ভুক্ত। কাহিনীটির কাঠামোগত গতিপ্রবাহ দুটো।

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ এক বিধবা ও তার ছেলে। ছেলে জুম পোড়া দেবার সময় মায়ের নির্দেশ লঙ্ঘন করে। নাগরাজার ছেলেমেয়েরা আগুনে পুড়ে মারা যায়।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ জুমের কাজ শেষ করে বিধবার ছেলে বাড়ী ফিরে এসে দেখে নাগরাজা সাতপাকে ওদের ঘর জড়িয়ে রেখেছে। মায়ের নির্দেশে ছেলে বনে গিয়ে 'মামা' 'মামা' বলে ডাকে। মামা এসে তাকে পুজো পদ্ধতি শেখায়। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ সাপ সাতটুকরো হয়ে যায়।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

দশ গাঁয়ের সেরা ছ'কুড়ি - ছ - ঘরের গাঁ। এক বিধবা ও তার ছেলে সে গাঁয়ের এক ঘর। ছেলেটি ভারী আলসে। কাজে মন নেই সমবয়সীরা সবাই বিয়ে থা করলেও, সে কাজই করেনা তা বিয়ে করবে কি করে? (১) সংসারের অভাব অনটনও তাই বেড়ে চলেছে (২)। একদিন মা ছেলেকে জুম কেটে পোড়া দেবার জন্য বললো (৩)। মায়ের কথায় ছেলে রাগ করলো (৪)। মাথায় একটা চেম্পাই নিয়ে সে জুমে গেল (৫) এবং খানিক পরেই ফিরে এলে (৬) মা ওকে জিজ্ঞেস করলো, অন্যরা সারাদিন জুমে কাজ করেও কাটার কাজ শেষ করতে পারেনা আর তুমি (৭) এইমাত্র গিয়েই কি করে ফিরে এলে?

ছেলে বিজ্ঞের মতো উত্তর দলো, "তুমি কিছু ভেবোনা মা। দেখোইনা জুমে গিয়ে কি করেছি"। সে জুমে একটা প্রকাণ্ড ঘিলা লতা কেটে এসেছে।

গোড়াতে কাটা মাত্রই লতাটা মরে গেল। কথাটা শুনে মা চুপ করে রইলেন।

বেশ কিছুদিন পর জুমে আগুন দেবার সময় এলে মা আবার ছেলেকে সে কথা মনে করিয়ে দিলে সে যেতে রাজী হ'ল। নির্দিষ্ট দিনে মা ছেলেকে সাতজুমের মাটি, সাত পুকুরের জল, সাতটা মশাল বেঁধে দিল। যাবার সময় বলে দিল, যাতে দেবদেবীর বন্দনা করে জুম পোড়া দেয়। অন্যের ছেলেপিলেরা মারা যেতে পারে, তাদের বন্দনা করে

(১) জোরালো প্রাথমিক অবস্থা (ঙ[১])
(২) অর্থাভাব (অ[৫])
(৩) মায়ের অনুরোধ (ঢ[১])
(৪) নায়কের প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক (নেতি.)
(৫) নায়কের প্রস্থান ও (↑)
(৬) প্রত্যাবর্তন (↓)
(৭) সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ (ঐ[২])

পোড়া দেয় যেন (৮)। জুমে গিয়ে (৯) শুকনো ঘিলা লতায় আগুন দেওয়া মাত্রই সারা বনে আগুন ছড়িয়ে গেল। এদিকে বাড়ীতে মা যতক্ষণ জুম পোড়া শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ এক কলসী জল চালুনি দিয়ে ঢেকে তার উপর একটি পাখা রেখে দিল। সে বনেই ছিল নাগ রাজার ছেলেমেয়েরা। ওরা সবাই আগুনে পুড়ে ছাই হল। নাগরাজা বেরিয়েছিলো খাবারের খোঁজে। ফিরে এসে সে ঘরের কাছেই ঘেঁষতে পারলোনা আগুনের জন্য। রাগে দুঃখে সে জুম পুড়িয়ে ছেলের ঘরটাকে সাতপাকে জড়িয়ে আক্রোশে ফুঁসতে লাগলো। ঘরের ভেতরে মা বন্দী। ভয়ে গাঁয়ের লোকেরাও কাছে ঘেষতে পারলোনা।

(৮) মায়ের উপদেশ (এঃ[১])

(৯) জুমে যায় ছেলে (↑)

জুমের কাজ শেষ হ'লে ছেলে বাড়ী ফিরে এলো (১০)। ঘরে ঢুকতে গেলে নাগরাজা গর্জন করে উঠলো (১১)। উঠোনে দাঁড়িয়ে, কি করা উচিত, একথা মাকে জিজ্ঞেস করলে মা বললো বন্দনা না করে পোড়া দেওয়াতে এমন হ'ল। "এখন একটা কালো মোরগ, কিছু খই, এক বোতল মদ, কিছুটা হলুদ, একটা দা ও কলাপাতা নিয়ে বনে গিয়ে মামা-মামা বলে ডাকলেই সে সাড়া দেবে ও কি করতে হ'বে, তা বলে দেবে।" (১২)

(১০) ছেলের প্রত্যাবর্তন (↓)

(১১) প্রতিশোধ মূলক কাজের সূত্রপাত (চ)

(১২) নির্দেশ (এঃ[১])

এখন মায়ের কথামতো ছেলেটি বনে গিয়ে (১২ক) 'মামা-মামা' বলে সারাদিন ডাকার পর লুঙ্গা জমি থেকে কে যেন উ-ই-ই বলে সাড়া দিলে, সে দিকে ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে লম্বা চওড়া মিশকালো মস্ত বড় এক বুড়ো মানুষ দেখতে পেলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তুমিই কি সাড়া দিয়েছো? তুমিই কি আমার মামা"? সে বললো, "হাঁ আমিই সাড়া দিয়েছি (১৩)। পরিচয় পেয়ে ছেলেটি সব ঘটনা খুলে বললো এবং খুব তাড়াতাড়ি কোনো ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলো (১৪)। বুড়ো লোকটি বললো, "এক্ষুণি করে দিচ্ছি। যেভাবে বলবো ঠিক সেভাবে করে যাও (১৫)।" বুড়ো লোকটি কলাপাতাগুলোকে বিছিয়ে বাঁশ গুলোকে মাটিতে পুঁতে রাখতে বললো। সে বুড়ো লোকটির পায়ের কাছে ওগুলো সাজিয়ে রাখলো। বোতল থেকে কিছু মদও ঢেলে রাখলো মাটিতে পোঁতা বাঁশগুলোতে। কলাপাতার উপর দা-টাকে শোয়ালে পর বুড়ো তাঁকে অচাই হতে বললে সে জানালো যে কি করে অচাই হ'তে হয় তা জানেনা। মামার কথা মতো ছেলে বলতে শুরু করলো,"যে খেতে বলবে, যে পান করতে বলবে, যে দাঁত কড়মড় করবে, যে পেছনে নিন্দে করবে, তাকে মেরে ফেল,

(১২ক) নায়কের প্রস্থান (↑)

(১৩) অনুসন্ধানীয় সহায়কের সাক্ষাৎ (অঅ[৩])

(১৪) আবদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির জন্য অনুরোধ (চ[৪])

(১৫) আবেদকের প্রতি সহায়কের করুণা প্রদর্শন (এ[৫])

তাকে উদ্ধার করো (১৬)।" তারপর সে সাতবার কলাপাতা কাটলো। ওদিকে কলাপাতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে নাগরাজার শরীরটাও সাতটুকরো হয়ে গেল (১৭)। পুজোশেষে বুড়ো ছেলেকে বাড়ী যাবার নির্দেশ দিয়ে বললো (১৮) যে সে আর বুড়োর দেখা কখনো পাবেনা। যখন যা প্রয়োজন হ'বে তাঁর মা-ই সব বলে দেবে। বলেই লোকটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল (১৯)।

সেই বুড়ো লোকটিই হ'ল বুড়াদেবতা। বিধবার অলস ছেলেটা তারই। বিধবার ছেলে দ্বিধাগ্রস্ত মনে বাড়ী ফিরে এলো (২০)। দেখে সত্যি সত্যি নাগরাজার দেহ বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। ছেলে মার কাছে বুড়াদেবতার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বললো। এতক্ষণে ওরা হাফ ছেড়ে বাঁচলো। সেদিন থেকে মানুষ অসুখ বিসুখে পড়লে পুজো দেয়া শুরু হ'ল বুড়াদেবতাকে। আর যাঁরা এই পুজোর অচাই হয় তাদের বলে ঢেঙা অচাই।

(১৬) বুড়া দেবতা ছেলের সাহায্যে নিজেকে সমর্পণ করে (ভ°)
(১৭) প্রাথমিক যুদ্ধ ছাড়াই সাপের নিধন (ই°)
(১৮) নায়ককে গৃহে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান (ব°)
(১৯) সহায়কের স্থানগত পরিবর্তন। বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়ে যায় (গ১)
(২০) নায়কের প্রত্যাবর্তন (↓)

এই কাহিনীটির গঠন হ-ই এবং ম-স বর্জিত। সমগ্র কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত রূপ হ'বে এইরকম ঃ

ঙ১ অ৫ ঢ৭ নেতি ↑↓ ঐ২ ঞ২ ↑↓ চ ঞ২ ↑ অঅ৪ ঢ৪ এ৫ ভ৯ ই৫ ব৩ গ১↓

কাহিনীটিকে রেখাচিত্রে সাজালে এমন দাঁড়াবে ঃ

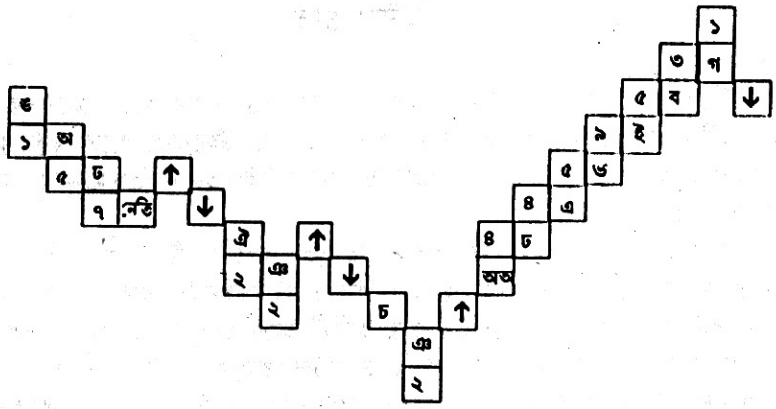

মোটিফ ঃ

বুড়াদেবতার অবৈধ সন্তানটি অলস ও বুদ্ধিহীন। অবৈধ সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ভারতীয় লোকপুরাণে দেখা যায়। ভ্রাতা-ভগ্নী অজাচার — T.415, জুমে আগুন দেবার আগে দেবতার বন্দনা করার অভিপ্রায়টি উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারা থেকে এসেছে। কালো মোরগ,

খই, মদ, হলুদ, কলাপাতা, কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের ক্ষমতা সম্পন্ন বলে বিশ্বাস। উল্লেখ্য, বস্তুগুলোর মধ্যে অস্ত্রিক প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়। D-800 । কলাপাতা জীবন প্রতীক E-761.7 মোটিফ। কলা সৃষ্টির ইঙ্গিতবাহী। দেববন্দনা কর্তব্যকর্ম। একে অবহেলা করা এখানে দুষ্কার্যের অন্তর্ভুক্ত। দুষ্কার্যের শাস্তি Q-270 motif। শাস্তিভোগ এসেছে সাতপাকে নাগরাজার ঘর জড়িয়ে রেখে মাকে বন্দী করে রাখার মাধ্যমে। পরে দেবতার পূজোর দ্বারা দৈব অনুগ্রহ অভিপ্রায়টিও এসেছে। এটি দেবসেবার পুরষ্কার (Reward for service of God) Q-21। এই কাহিনীর মূল অভিপ্রায় দৈব ও ভাগ্য (Chance and fate)।

সাত-সংখ্যাটি লোকশ্রুতি অনুযায়ী ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। সাত জুমের মাটি, সাত পুকুরের জল, ৭টা মশাল, সাত পাক, সাত টুকরো ইত্যাদিতে এই অভিপ্রায়টি প্রকাশিত। Z-71.16। আবহমানকাল ধরে বাঁশ ত্রিপুরার জনজাতিজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

লেভিষ্ট্রসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কাহিনীটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এখানে বিরুদ্ধপক্ষ দুটো। প্রথম পক্ষ, অর্থাৎ fx ক্রিয়াশীলতা-র সঙ্গে যুক্ত a নাগরাজা এবং দ্বিতীয় পক্ষ, fy-র সঙ্গে যুক্ত b-বিধবার ছেলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে fy(b) অর্থাৎ fx(a) র প্রতি নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়ে, যার ফলে fx(b) র বেগবানতা দেখা দেয় ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে এবং শেষ ফলশ্রুতি হিসেবে $fa^{-1}(y)$-র মাধ্যমে বিজয় সূচিত হয়। লেভিষ্ট্রসের ফর্মূলা $fx(a) : fy(b) :: fx(b) : fa^{-1}(y)$ সার্থকভাবেই প্রযোজ্য হয় এই কাহিনীটির ক্ষেত্রেও।

কাহিনী ঃ চার

উইপোকা স্বামী

"উইপোকা স্বামী" লোককথাটিতে মিশ্র-টাইপের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রথম গতিপ্রবাহটি সাধারণ লোককথার অন্তর্ভুক্ত টাইপ ৪৪১। দিনে উইপোকা, রাতে অপূর্ব কুমার। অভিশপ্ত রাজকুমার। কিন্তু দ্বিতীয় গতিপ্রবাহটিতে পশুকথা টাইপ ১৫০-১৯৯ মানুষ ও বন্যপশু, পাওয়া যাচ্ছে।

কাঠামোগত দিক থেকে দ্বি-গতিপ্রবাহ সম্পন্ন একক কাহিনী এটি। আপাত দৃষ্টিতে একটি কাহিনীর ভেতরে দুটো কাহিনীর অস্তিত্ব দেখা গেলেও এই কাহিনীটি একক কাহিনীই। কারণ, প্রথম কাহিনী-অংশ শেষ হবার পরই দ্বিতীয় কাহিনী-অংশ শুরু হয়েছে। দুটো অংশ মিলে কাহিনী জটিল হয়ে উঠেনি অথবা কোনো বিস্তৃত জটিল প্রেক্ষাপট তৈরী করেনি।

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ জুমিয়ার মেয়ের জন্মের পর বৌ মরে যায়। সে আবার বিয়ে করে। নতুন বৌ তার একটি কন্যা সহ স্বামীগৃহে আসে। চাষী নিজের মেয়ের জন্য জামাই খুঁজতে যায় বনে, বৌয়ের অনুরোধে। এক ঝাঁক উইপোকা ধরে নিয়ে আসে। মেয়েকে সৎমা উইপোকার সঙ্গে শুতে বলে। রাতে উইপোকা থেকে রাজপুত্র বেরোয়। রাজপুত্র শাপমুক্ত হয়ে বৌকে নিয়ে নিজ রাজ্যে চলে যায়।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ চাষী বৌয়ের অনুরোধে আবার জামাই খুঁজতে বনে যায়। জামাই হিসেবে অজগরকে চাষী বাড়ী নিয়ে আসে। রাতে নতুন বৌয়ের মেয়েকে অজগর খেয়ে ফেলে। প্রথম গতিপ্রবাহ ইতিবাচক ও দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ নেতিবাচক।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে এভাবে বিচার করা যেতে পারে —

দশপাড়ার সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের পাড়ার এক জুমচাষী। চাষী আর চাষী বৌ। দুজনের ছোট সংসার। বিয়ের দু এক বছর পর চাষী বৌয়ের একটি মেয়ে হ'ল (১) তারপরই বৌটি গেল মরে (২)। বেচারা স্বামী মেয়েটিকে নিজেই যত্ন করতে লাগলো এবং ঘর গৃহস্থালীর কাজও তাকেই করতে হতো। একা আর পেরে উঠছিলোনা (৩)। তাই দেখে শুনে একটি বিধবা মেয়েলোককেই বিয়ে করে আনলো ঘরে (৪)। সেই মেয়েলোকটি নিয়ে এলো সঙ্গে করে একটি মেয়ে সন্তান (৫)। এখন চাষীর ঘরে দু মেয়ে। চাষীর মেয়েটি ছিল ছোট, আর তাঁর বৌয়ের মেয়েটি ছিল বড় (৬)। মেয়ে দুটো বড় হলে চাষী বৌ চাষীকে বললো, মেয়েদের তো বিয়ের বয়স হয়েছে। কারো সাথে কথা জুড়ে বিয়ে ঠিক করছোনা কেন? (৭) বুড়ো বৌয়ের কথায় বললো, "আরে ধ্যাৎ, আমি কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে কথা জুড়বো?" ওদের ভাগ্য ভালো হ'লে এখানেই খোঁজ করতে আসবে' খন'। এভাবে মাঝেমাঝেই ওদের মধ্যে কথাবার্তা হ'তো। আর বুড়োও রেগে যেতো। একদিন বুড়ো রেগে এক ওয়াছুং (বাঁশের একগাঁট থেকে অন্য গাঁট পর্যন্ত) তরকারি, আর এক হাঁড়ি ভাত রেঁধে দিতে বললো বৌকে। যাতে সে জামাইয়ের সাথে দেখা হ'লে খাওয়াতে পারে। পরদিন ভোর হ'তে না হ'তেই চেম্পাইতে ভাত ও তরকারি (৮) নিয়ে বুড়ো বনে চললো (৮ক) জামাই খুঁজতে।

(১) প্রাথমিক অবস্থা (ঙ)
(২) চাষী বৌয়ের মৃত্যু (ছ২)
(৩) পত্নীর অভাবে (অ১)
(৪) অভাব অপসারিত (অঅ১)
(৫) নতুনস্ত্রীর এক মেয়ে
(৬) চাষীর দু মেয়ে এখন।
(৭) মেয়েদের বিয়ের জন্য আলোচনার অনুরোধ (ঢ১)
(৮) অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া (জ১)
(৮ক) বুড়ো বনে যায় (↑)

লোক নেই জন নেই গভীর বনে গিয়ে বুড়ো আপন মনেই জোরে ডাকতে শুরু করে দিলো,'অ-জামাই, অ-জামাই সাড়া দাও' বলে। জনমানবশূন্য গভীর বনে ডাকাডাকি করে ক্লান্ত হয়ে ভাবলো ভাত-তরকারীগুলো সব সে-ই খেয়ে নেবে। এমন সময় গভীর বনে কে যেন উঁ-ই-ই বলে সাড়া দিলো (৯)। সে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই দেখলো একটা উইয়ের ঢিবি। সে ভাবলো এখান থেকেই কেউ সাড়া দিয়েছে। খাবারগুলো তাই ওখানেই ঢেলে দিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর ভাবলো নিশ্চয়ই জামাইয়ের খাওয়া হয়ে গেছে। (১০) তাই এগিয়ে গেল। বুড়ো দেখলো এক দল উই-ঢিবি থেকে

(৯) অনুসন্ধানীয়ের সাড়া (অঅ)

(১০) খাবার দিয়ে পরীক্ষা করে চাষী (ম১)

বেরিয়ে এসে খাবারগুলো খেয়ে ফেলেছে। আর যাবে কোথায়? সব উইপোকাকে বুড়ো চেম্পাইয়ে তুলে নিয়ে এলো বাড়ীতে। বাড়ী এসেই (১০ক) বুড়ীকে বললো, "কইগো এনেছি তোমার জামাই"। বিছানায় পোকাগুলোকে ঢেলে দিলো (১১)। অমনি সারা বিছানায় পোকাগুলো ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে ছিল কিছু লালপিঁপড়ে। ভয়ে বুড়ীর কাঠ হবার উপক্রম। মনের কথা মনে চেপে বুড়ী বুড়োকে বললো, 'এ বুঝি তোমার জামাই? এ যে দেখছি একদঙ্গল উইপোকা'। রাতে বুড়ী চাষীর মেয়েকে উইপোকার সঙ্গে শুতে বললো। মেয়েটি প্রথমে রাজী না হলেও পরে বুড়ীর চেঁচামেচিতে উইপোকার সাথে ঘুমোতে গেল (১২)। রাতে উইপোকা আর লালপিঁপড়ের কামড় খেয়ে মেয়েটির হাত-পা ফুলে কলাগাছ (১৩)। পরদিন ঘুম থেকে উঠে সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে জুমে কাজ করতে গেলে (১৪) বুড়ীর মেয়ে সকলকে শুনিয়ে বললো, 'শোন, শোন ভারী মজার কথা। নাখুতি উইপোকার সঙ্গে বাসর করেছে। ও উইপোকার বৌ। ও উইপোকার সঙ্গে বাসর করেছে।' ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো (১৫)। লজ্জায় অপমানে চাষীর মেয়ে জুমে কাজ না করেই ফিরে আসে (১৬) ঘরে। এভাবে দুই তিনরাত বাসর করলো উইপোকার সঙ্গে নিরুপায় হয়ে।

এমনি সময় উইপোকার ভেতর থেকে একদিন বেরিয়ে এলো সুন্দর যুবক (১৭)। ও মেয়েটিকে বললো, "শোন আমি রাজার ছেলে। জাদুকরের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে গিয়ে শাপগ্রস্ত হয়ে উইপোকা হয়ে আছি। কোনো নারী যদি আমাকে বরণ করে নেয় তবেই আমার শাপ কেটে যাবে। তুমি কোনো চিন্তা করোনা। আমার শাপমোচন হ'বার সময় হয়ে গেছে (১৮)। পরদিন চাষীর মেয়ে রান্না করতে গেলে চাষীবৌ দেখলো মেয়ের দুকানে দুলছে সোনার দুল (১৯)। ব্যাপারখানা যেন কিরকম লাগছে। আগেতো কখনো ওর দুল ছিলোনা। লাকড়ি ঘরে ঘুমোবার সময় অন্য কোনো ছেলে এসে দিয়ে যায় কিনা। জুমেও সকলে এ নিয়ে কথা বলতে লাগলো। এত সব শুনেও মেয়েটি কিছুই বললোনা (২০)। সেদিন রাতেও মেয়েটি ঘুমোতে গেলে রাজকুমার বেরিয়ে এলো। মেয়েটি বললো তাঁকে, "এভাবে থাকলে ঘরসংসার হ'বে কি করে"। কুমার তখন বললো, "আমি যখন ঘুমিয়ে থাকবো তখন উইপোকাগুলোকে পুড়িয়ে ফেলো। আর আমার হাত পা খুব করে টিপে দেবে। তাহ'লেই আর উইপোকার ভেতর ঢুকতে পারবোনা।

(১০ক) চাষীর প্রত্যাবর্তন (↓)

(১১) সন্ধানীয় বস্তু ধরা হয় (অঅ[৭])

(১২) অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া (জ[৯])

(১৩) রাতে পীড়ন মূলক কাজ (আ[১৯])

(১৪) মেয়েটি পরদিন জুমে যায় (↑)

(১৫) বুড়ীর মেয়ে সকলের সামনে উপহাস করে চাষীর মেয়েকে (ফ[৩])

(১৬) চাষীর মেয়ে অপমানিত হয়ে বাড়ী ফিরে আসে।

(১৭) উইপোকার মানুষে রূপান্তর (ট) (কুমার এখানে প্রতিনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ)

(১৮) শাপমোচনের শর্ত ঘোষণা করে কুমার

(১৯) নতুন গয়না পরিধান (ট[৩])

(২০) প্রতিবেশীদের সন্দেহ

(২১) পরদিন মেয়েটি তাই করলো। কুমার আর উইপোকার ভেতর ঢুকতে পারলোনা (২২)। রাত ভোর হ'লে ঘরের ভেতরেই স্বামীর হাত-পা ধুইয়ে দিলো চাষীর মেয়ে। দুপুরবেলা সুন্দর করে রেঁধে থালা সাজিয়ে নিয়ে গেল শোবার ঘরে। এসব দেখে সৎমা ভাবলো নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেই অবাক (২৩)। মানুষ তো নয়, যেন দেবতা। এতো সুন্দর একটি ছেলে। পাড়ার লোকদের জানিয়ে এলো খবরটা (২৪)। ওর কথায় পাড়ার লোকেরা সবাই এলো। সবশেষে এলো বুড়োবুড়ীর দল। ওরা কুমারকে জিজ্ঞেস করলো ওর বাড়ী কোথায় (২৫)? সে তাঁর শাপগ্রস্ত হওয়া ও শাপমোচনের কাহিনী সব বললো। পরদিনই রাজপুত্র গাঁয়ের বড়দের প্রণাম করে বৌকে নিয়ে তাঁর রাজ্যে ফিরে গেল (২৬)।

সেদিন থেকে চাষীবৌ হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। বুড়োর মেয়ের তো যা হোক রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'ল। কিন্তু নিজের মেয়ের তো আজও হিল্লে হ'লনা (২৭) তাই বুড়োকে রোজই বলতে লাগলো, "কইগো আরেকজন জামাই খুঁজে আনবে কবে? আরো একটি মেয়ে রয়ে গেছে (২৮)। রোজই বিরক্ত হ'তে হ'তে বুড়ো বললো যে একদিন সে যাবে এবং পরদিনই এক ওয়াছুং তরকারী ও এক হাঁড়ি ভাত নিয়ে বনে গেল জামাই খুঁজতে। "অ-জামাই, অ-জামাই" চেঁচিয়ে ডাকলো (২৯) সূর্য ডুবু ডুবু হ'ল, কেউ সাড়া দিলো না। এমনি সময়ে বুড়ো জুমের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখল একটা মস্ত বড় অজগর-আরাম করে শুয়ে আছে। সাপটাকে দেখেই তার মুখের সামনে বুড়ো সবগুলো খাবার ফেলে দিলো। সাপ সব খাবার খেয়ে ফেললো। বুড়ো চেম্পাইতে ভরে সাপকে বাড়ী নিয়ে এলে সকলে জামাই দেখে ভারী খুশী হ'ল (৩০)।

রাতে চাষীবৌ মেয়েকে সাপের সঙ্গে শুতে বললে সে লাকড়ি ঘরেই শুতে গেল (৩১)। রাতে অজগর সাপ বুড়ীর মেয়ের হাঁটু অব্দি গিলে ফেললো। থাকতে না পেরে মাকে একথা বললে, মা বললো, 'চুপ করে থাক্ মা, তোকে গয়না পরিয়ে দিচ্ছে'। একসময় সাপটি মেয়েটিকে সম্পূর্ণ গিলে ফেললো। একটুও শব্দ বেরুলোনা (৩২)।

খেয়ে দেয়ে সাপটার পেট ফুলে ঢোল। জানালা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাক্ষুসে সাপটা শুয়ে রইলো ঘরের পেছনে কলাবাগানে। রাত ভোর হ'ল। কেউ বেরুচ্ছেনা দেখে কেউ কেউ উঁকি দিয়ে দেখলো।

(২১) কঠিন কাজ (ম[১])
(২২) কঠিন কাজ সমাপন (স)

(২৩) শাপগ্রস্ত (কুমার) প্রতিনায়কের মুক্তি (অঅ[৮])
(২৪) খল সকলকে খবর দেয়। (ঐ[১])
(২৫) সহায়কের মাধ্যমে পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ[৪])
(২৬) রাজপুত্র বৌকে নিয়ে চলে গেল (উ ↑)
(২৭) চাষীবৌয়ের ঈর্ষা।
(২৮) চাষীবৌ চাষীকে রোজ বিরক্ত করে (ন)

(২৯) চাষীর ইতিবাচক সাড়া (জ[১])

(৩০) জামাই হিসেবে সাপ নির্বাচন।
(৩১) মেয়ে সাপের সঙ্গে শুতে গেল (জ[১])

(৩২) সাপ মেয়েটিকে খেয়ে ফেললো (আ[৭])

ঘরে কেউ নেই না মেয়ে, না বর। কলাবাগানে সাপটাকে পেয়ে দা কুড়ুল ইত্যাদি দিয়ে সবাই সাপটার পেট কেটে ফেলতেই বেরিয়ে এলো হাঁড় মাংস গুঁড়িয়ে যাওয়া চাষীবৌয়ের আদরের মেয়েটি। কি আর করবে ওকে। তখন সবাই মিলে অজগরকে কেটেকুটে খেয়ে ফেললো (৩৩)।

(৩৩) পাড়া প্রতিবেশী সকলে সাপকে কেটেকুটে খেয়ে ফেললো। (আ^{১৫})

কাহিনীটির আংকিক রূপটি হবে এরকম ঃ

প্রথমাংশ ঃ (ঙ) ছ^{২} অ^{১} অঅ^{১} ঢ^{১} জ^{১} ↑ অঅ^{১} ম^{১} ↓ অঅ^{৭} জ^{১} আ^{১১} ↑ফ^{৩}↓ ট^{৩} ম^{৭} স অঅ^{৮} ঐ^{১} ঐ^{৪} ঊ↑।

দ্বিতীয়াংশ ঃ ন জ^{১} আ^{৭} আ^{১৫}।

কাহিনীটির রেখাচিত্রটি হ'বে এরকম ঃ

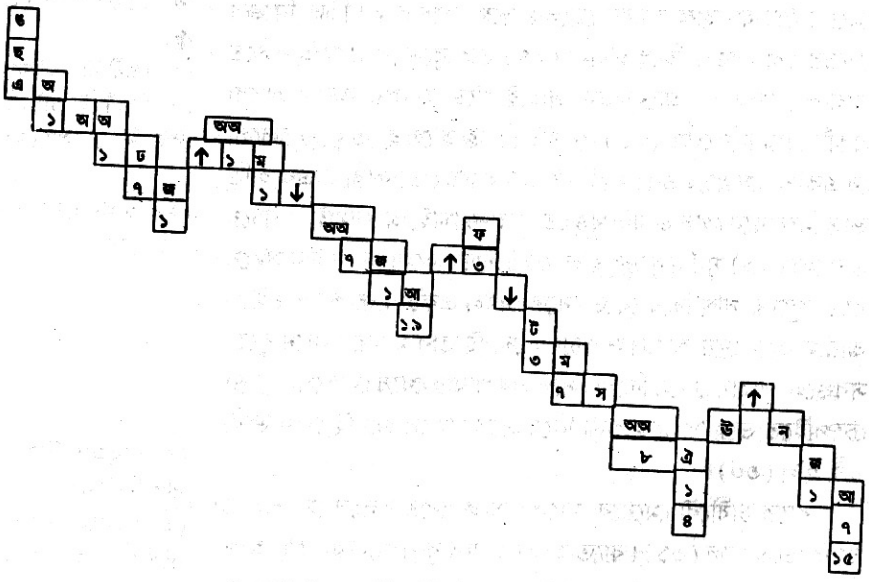

এই কাহিনীর প্রথমগতিপ্রবাহে ম থেকে স পর্যন্ত ক্রিয়াশীলতা পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয় গতিপ্রবাহে হত্যাই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মোটিফ ঃ "কাল সকালে যার মুখ দেখবো, তার কাছেই কন্যা সম্প্রদান করবো" — রূপকথার এই মোটিফটি (M 138.1) এখানে প্রকাশিত হয়েছে "যাকে ডেকে পাবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে" — এই অভিপ্রায়ের মাধ্যমে। রূপান্তর সাধারণতঃ একটি প্রাণীতে হয়, এখানে অনেকগুলো উইপোকাতে রাজকুমারের রূপান্তর ঘটেছে। আত্মার বহুধা বিভক্তি অভিপ্রায়টি অভিনব ভাবে এখানে উপস্থিত। দিনে উইপোকা রাতে কুমার — T মোটিফ। জাদুকরের শাপদ্বারা রূপান্তর D 525 । আগুনে উইপোকার মত্যু দ্বারা রাজপুত্রের রূপান্তর — D.789 । সৎ-মায়ের ঈর্ষা একটি বিশ্বজনীন অভিপ্রায়।

ভাগ্যবতী কনিষ্ঠা কন্যা L-50 বিবাহের দ্বারা শাপমোচন D মোটিফ। মানব ও মানবেতর প্রাণীতে বিবাহ কাহিনীটির অন্যতম অভিপ্রায়। এর মোটিফ — B 600 - 699.

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ—

লেভিস্ট্রসের সূত্র অনুযায়ী কাহিনীর বিশ্লেষণ এভাবে হ'তে পারে ঃ প্রথম পক্ষ (a) র খলত্ব যুক্ত হয় চাষী বৌয়ের ক্রিয়াশীলতায়। চাষী তার দ্বারা প্ররোচিত হয়। (b) অর্থাৎ ছোট মেয়েটির জন্য উইপোকা ধরে আনে বর হিসেবে। এখানে (a)-র ক্রিয়াশীলতাটি অর্থাৎ (fx) মেয়েটির পক্ষে আসে এবং অবশেষে মেয়েটি উইপোকাকে বিয়ে করে রাজরাণী হয় অর্থাৎ প্রতারকই প্রতারিত হয়ে যায়। এই ক্রিয়াশীলতাটি $fa^{-1}(y)$

আঙ্কিক ফর্মূলায় কাহিনীটি ঃ $fx\ (a) : fy\ (b) :: fx\ (b) : fa^{-1}(y)$

কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে ছোট মেয়েটির জন্য অজগর ধরে আনলে অজগর মেয়েটিকে খেয়ে ফেলে। এখানেও চাষী ও বৌ স্বীয় অবস্থান হারিয়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত তারা প্রতারিত হয়।

কাহিনী-পাঁচ

রাজহাঁসের কাহিনী

'রাজহাঁসের কাহিনী' নামক ব্রতকথাধর্মী লোককথাটি 'সাধারণ লোককথা' শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। ঐন্দ্রজালিক কাহিনী তথা অলৌকিক সাহায্যকারী টাইপ ৫০০-৫৫৯ অন্তর্ভূক্ত। স্বপ্নে দৃষ্ট নারীর অলৌকিক নির্দেশে সঙ্কটমুক্তি কাহিনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বহু গতিপ্রবাহসম্পন্ন একক কাহিনী এটি।

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ বিধবার ছেলে সামান্য দামে লাকড়ি বিক্রী করে শুধু চাল কিনে বাড়ীতে ফেরে। পরদিন সে রাজার পুকুরে মাছ ধরতে গেলে একটা রাজহাঁস বড়শীর টোপ গিলে ফেলে। ছেলেটি রাজহাঁস নিয়ে বাড়ী ফেরে। মা ভয়ে ভয়ে তা রাঁধে। রাতে রাজার পাহারাদারেরা এসে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গেল। মা কেঁদে কেঁদে অচেতন প্রায়। একজন বৃদ্ধা নারী স্বপ্নে ছাকলক দেবীকে পুজো করার নির্দেশ দেয়। রাজার পুকুরে ছা-কলক দেবীর নামে রাজহাঁসের পালক ফেলে আসার নির্দেশ দেয় ও পুজোর নিয়ম বলে দেয়। ভোর হলে বিধবা নির্দেশ পালন করে।

দ্বিতীয় অংশ ঃ রাজাও শেষরাতে স্বপ্ন দেখলেন, এক বৃদ্ধা তাঁকে বলেছেন, "হাঁস চুরি করেছে বলে বিধবার ছেলেকে জেলখানায় পুরে রেখেছিস। ওদিকে হাঁস দেখছি পুকুরেই সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।" ভোরে রাজা দেখলেন সত্যিই হাঁস পুকুরে চরে বেড়াচ্ছে। পাহারাদারদের বকলেন বিনা কারণে ছেলেটিকে ধরার জন্য।

তৃতীয়াংশ ঃ পাহারাদাররা ছেলেটিকে ছেড়ে দেয়। হাতে পাঁচটি টাকাও দেয়।

চতুর্থাংশ ঃ ছেলে ফিরে এলে মায়ের আনন্দ ও ছাকলক দেবীর পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো শেষে দেবীর ব্রতকথা সকলকে শোনানো হয় ও দিন দিন বিধবার সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হয় দেবীর আশীর্বাদে।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চাপিয়ে বিধবা ঘরের দাওয়ায় এসে বসলো। মনে খুব লেগেছে- "কি ভাগ্য নিয়েই জন্মেছি। আজ রাঁধা মাছগুলো পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে হল। কপালে আরো কি লেখা আছে কে জানে"। সে শুধু এ কথাই ভাবছে (১)।

(১) প্রাথমিক অবস্থা- অস্বাভাবিক দারিদ্র্য (ঙ[১])

খানিকবাদেই ছেলে ঘরে ফিরে এলো (২)। দা রেখে গামছা নিতে নিতে বললো, 'আজ লাকড়ি বেচতেই পারি নি মা, একেবারে জলের দরে বেচে দিয়ে তা দিয়ে শুধু চাল কিনে এনেছি। খুব খিদে পেয়েছে। তুমি ভাত বেড়ে রাখ। আমি হাত পা ধুয়ে আসছি (৩)।

(২) ছেলেটির অনুপস্থিতি (ছ[৩]) ছেলেটির ঘরে ফেরা (↓)

(৩) অভাবের যুক্তিগ্রাহ্যরূপ (অ[৩])

ছেলে গামছা নিয়ে হাত পা ধুতে গেলে (৪) মা উনুনে চাপানো হাঁড়িতে চাল ধুয়ে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাত হয়ে গেল। ছেলে এসে খেতে বসলে মা শুধু ভাতই খেতে দিলো। 'ছেলে ঘরে এলে দাম দেবো'— বলে জেলেদের কাছ থেকে মা খানিকটা মাছ রেখে তাই দিয়ে ঝাল রেঁধেছিলো। তা ছেলেও সময়মতো না ফেরাতে মাছ দিয়ে রাঁধা তরকারীও ফেরৎ নিয়ে গেছে। খানিকটা ঝোল হাঁড়ির তলায় পড়ে আছে। তাই বাটিতে করে ছেলেকে খেতে দিলো। ঝোল খেয়ে ছেলে খুব স্বাদ পেল। সে মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এ কিসের ঝোল মা? এমন স্বাদু তরকারীতো কখনো খাই নি' (৫)।

(৪) ছেলেটির স্থানগত পরিবর্তন (গ[১])

মায়ের মুখে রা নেই। একসময় ছেলের কথায় বলতেই হল ঘটনাটি। শুনে ছেলে বললো, 'ঘরে তো এক আঁটি লাকড়ি রয়েছে। কাল বনে যাচ্ছি না। ওগুলো বেচেই চাল নিয়ে আসবো। আর দুপুরে রাজার পুকুরে বঁড়শি ফেলে দু একটা মাছ পেয়ে গেলে খেতে পারবো। মা বললো, "রাজার পুকুরে বড়শী ফেলে বকুনি খেয়ে মর আর কি"(৬)। ছেলে বললো কত লোকই তো মাছ ধরছে। কাউকে তো মানা করে

(৫) অভাব, (অ[৩])

(৬) নির্দিষ্টভাবে সতর্কীকরণ (ঞ[১])

না। আমাকেই বা কেন বারণ করবে। যদি বারণ করে ফিরে আসলেই চলবে। তুমি কিছু ভেবো না'।

পরদিন খুব ভোরে লাকড়ির আঁটিটা বেচে চাল কিনে আনলো। (৬ক) তারপর খেয়েদেয়ে রাজার পুকুরের এক কোণে বড়শী ফেলে বসে রইলো। সারাদিনের শেষে কিছু না পেয়ে বড়শী উঠাতে যাবে এমন সময় কোত্থেকে এক রাজহাঁস বড়শীটাকে খেয়ে ফেললো। খাওয়ামাত্রই বড়শিটা টেনে তুললো। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলো একবার, কেউ কোথাও নেই। যারা বড়শী ফেলেছিলো, সবাই যে যার মতো চলে গেছে। সুযোগ বুঝে সেও হাঁসটাকে গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে বাড়ী নিয়ে এলো। সে হাঁসটা ছিলো রাজার পোষা হাঁস (৭)।

(৬ক) যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন (↑↓)

(৭) নিষেধ লঙ্ঘন (ড^{২}) ↑↓

রাজহাঁস দেখেই মা আঁৎকে উঠলো। 'তুমি রাজহাঁস চুরি করে এনেছো। যেখান থেকে এনেছো ওখানেই ওটাকে রেখে দাও গে। ছেলে বললো 'নিয়ে আসার সময় কেউ দেখে নি। হাঁসের মাংস কখনো খাই নি। আমি চেঁছে ছুলে আনছি, চট করে রেঁধে ফেলো'।

মা খুব ভয়ে ভয়ে রাঁধলো। রাত্রিতে মা ও ছেলে মাংস দিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো (৮)।

(৮) অভাব অপসারণ (অঅ^{৪})

ওদিকে পাহারাদার হাঁস না পেয়ে এদিক সেদিক খুঁজতে লাগলো। সকলেই বললো, 'সবার শেষে বিধবার ছেলে বড়শি ফেলেছে, একাজ নিশ্চয়ই তাঁর। হাঁস সে চুরি করেছে নিশ্চয়ই।

পাহারাদারেরা ওর ঘরে খুঁজবে বলে ঠিক করলো। গভীর রাতে ওরা এসে বললো যে এদের ঘরের পেছনে হাঁসের পালক পাওয়া গেছে। ঘরের ভেতরটাও দেখতে হবে।

ওদের কথা শুনে মা ও ছেলের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে রাজার লোকটি গর্জে উঠলো, "দরজা খুলে দেবে তো দাও, নয়তো দরজা ভেঙ্গেই ঘরে ঢুকবো"। ছেলেটি দরজা খুলে দিলে রাজার লোকেরা ঘরে ঢুকে এক হাঁড়ি মাংস পেলো। দলের সর্দার ও অন্যরা একটুকরো করে মাংস খেয়ে সত্যি মিথ্যে যাচাই করে দেখলো সত্যিই তো হাঁসের মাংসই বটে।

(৯) অনুসরণকারী অপরাধীকে দাবী করে (পর^{২}) নায়ক যাত্রা (↑) করে।

কোমরে বেঁধে ওরা বিধবার ছেলেকে রাজবাড়ীতে নিয়ে এলো। (৯) দুঃখে বিধবা মা মাটিতে পড়ে খুব কাঁদলো। কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান

হয়ে পড়ে আছে এমনসময় একজন বৃদ্ধা স্বপ্নে সান্ত্বনার সুরে বিধবাকে বললো, (৯ক) "ওঠো, আর কেঁদো না। ছা কলক দেবীকে ডাকো। তার মানত কর। তাঁকে পুজো দিলে তোমার ভালো হবে।

(৯ক) স্বপ্নে দেবীর সহায়তা (ঢ)

ঘুমের ঘোরেই বিধবা উত্তর দিলো — "মাগো আমি খুব দুঃখী। কাজকর্ম করার কিছু শক্তি নেই। একমাত্র ছেলে, সে-ই খেটেখুটে এনে আমাকে খাওয়ায়। সে-ও রাজার হাঁস চুরি করে এনে জেলখানায় পড়ে আছে। পুজোর জিনিষ কি করে জোগাবো' (৯খ)।

(৯খ) অনুরোধ (ঢ')

অচেনা স্ত্রীলোকটি বললো—'তোমার চিন্তা করতে হবে না। তোমার ছেলে ফিরে আসবে। রাত ভোর হবার আগেই কেউ ঘুম থেকে না উঠতেই ছা কলক দেবীর নামে রাজহাঁসের একটা পালক রাজার পুকুরে ফেলে আসো। ফিরে আসার সময় পেছনে ফিরে তাকাবে না কিন্তু।

এতোক্ষণে বিধবার মন শান্ত হয়ে গেছে। সে বললো, 'কি করে পুজো দিতে হবে, কিছুই তো বললেনা মা, কিছুইতো বুঝতে পারছি না।

দেবী বললেন—'চাল কলা গুড় জোগাড় করে, চাল গুঁড়ো করে তিন রকম পিঠা ভাজবে। পুজোতে খানিকটা দুধও দিও। পুজোর উপকরণগুলো কলাপাতায় সাজিয়ে দেবে। যারা দেবতার নামে উপোস করে থাকবে, তাদের একজন ব্রতকথা বলে শোনাবে ও অন্যরা সবাই একজায়গায় বসে শুনবে। পুজোর সময় ধূপদীপ জ্বেলে দেবে, উলুধ্বনি দেবে। পুজো শেষে প্রণাম করে মনের বাসনা অনুসারে ব্রত প্রার্থনা করবে। এরপর পুজোর জায়গায় বসে প্রসাদ নেবে।

বিধবা জিজ্ঞেস করলো—"ব্রতকথা কি রকম হবে মা?" দেবী বললেন, 'তোমাদের এই রাজহাঁস চুরি যাবার কাহিনীই হবে ব্রতকথা (১০)। বিধবা দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি হেসে বললেন যে সময় হলেই জানা যাবে এবং এরপর তিনি হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন (১১)। এদিকে রাত ভোর হয়ে আসছে। বিধবা একটি পালক নিয়ে রাজবাড়ীর পুকুরে গিয়ে রাজহাঁসের পালকটি কপালে ছুঁইয়ে, 'ছা-কলক দেবীর ব্রত প্রচার হ'তে হ'লে এই পালকটাই একটা রাজহাঁস হয়ে যাক্'— বলে পেছনে না তাকিয়ে ফিরে এলো। পিছন ফিরতেই একটা রাজহাঁস যেন পাখা ঝাঁপটিয়ে সাঁতার কাটছে শুনতে পেলো (১২)।

(১০) স্বপ্নে দেবীর আদেশ

(১১) হঠাৎ দেবীর অন্তর্ধান

(১২) স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী কার্য্যসম্পাদন

ওদিকে রাজাও শেষরাতে স্বপ্ন দেখলেন, একজন বৃদ্ধা নারী এসে বলছে—'হাঁস চুরি করেছে বলে বিধবার ছেলেকে জেলখানায় পুরে রেখেছিস্। ওদিকে হাঁস দেখছি পুকুরেই সাঁতার কাটছে (১৩)। ভোর হতেই রাজা পুকুরে একজন লোক পাঠালেন। সত্যি সত্যি রাজহাঁস পুকুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাহারাদারকে ডেকে পাঠিয়ে বিধবার ছেলেকে জেলে পুরে রাখার জন্য খুব ধমক দিলেন ও তাকে ছেড়ে দিতে বল্লেন এবং তাঁকে পাঁচটা টাকাও দিতে বল্লেন (১৪)। সে দৌড়ে গিয়ে জেলখানার লোকদের রাজার আদেশ বলে শোনালো। পাহারাদারও ছেড়ে দিলো তাঁকে (১৫)। ছেলেটি কিছুই বুঝতে না পেরে বাড়ী ফিরে এলো (১৬)। তার মা তাকে দেবীর কথা বলে পুজোর জিনিষপত্র নিয়ে আসতে বললো। মায়ের কথামতো ছেলেটি সব কিনে আনলে দেবীর নির্দেশমতোই পুজো হল এবং সেদিন থেকে দেবীর আশীর্বাদে বিধবার সংসারের উন্নতি হতে লাগলো (১৭)।

(১৩) রাজা কর্তৃক স্বপ্ন দর্শন।

(১৪) আবদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির আদেশ। নায়ককে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান (বং)

(১৫) বন্দীর মুক্তি (অঅ[১০])

(১৬) নায়কের প্রত্যাবর্তন (↓)

(১৭) ছা কলক দেবীর পূজো হয় ও বিধবার সংসারে উন্নতি। দৈবী সাহায্যে দারিদ্র্যমুক্তি (অঅ[৪])

এই কাহিনীটির আংকিক রূপটি হবে এইরকম ঃ ঙ[১] ছ[৩] ↓অ[৫] গ[২] অ[৩] ঞ[১] ↑↓ ↑↓ অ[৪] পর[২] ↑ঢ ঢ[৭] ব[৩] অঅ[১০] ↓ অঅ[৪]

রেখাচিত্রটি হবে এইরকম ঃ—

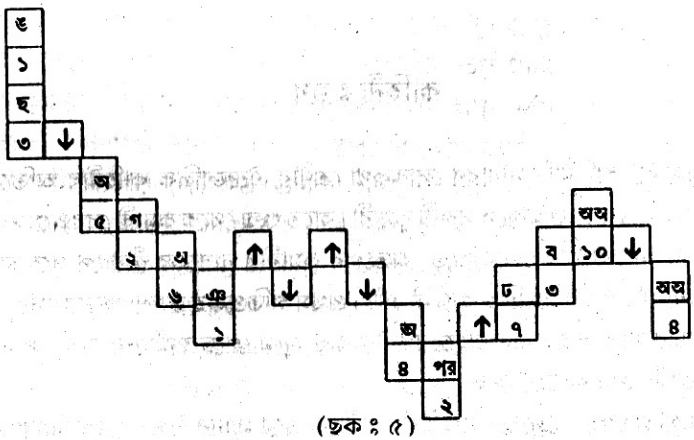

(ছক ঃ ৫)

এই কাহিনীটির ম-স, হ-ই বিবর্জিত গঠন। ছা-কলক দেবীর পুজো প্রতিষ্ঠার কাহিনীই এখানে প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মোটিফ ঃ

'ছা-কলক দেবীর পুজো এবং মহিমা প্রচারই এই লোককথাটির মূল অভিপ্রায়। এর মূল অভিপ্রায় দৈব ও ভাগ্য। স্বপ্নে বিধবাকে পথনির্দেশ — মোটিফ N.531। দেবীর নির্দেশ অনুযায়ী বর বা প্রার্থনা পূর্ণ Q 115 দেবীর আশীর্বাদে দিনদিন বিধবার সংসারে উন্নতি A 473.1.1 পেছনদিকে না তাকানো — C.331। ট্যাবু। রাজহাঁসের পালকটি ম্যাজিক পালক — D 1021 দেবীর সঙ্গে স্বপ্নে রাজার কথাবার্তা —H 38.2.4। দেবীর দয়ার মোটিফ — W 10.। গ্রাম্য দেবী, ছা-কলক — A 433.1, পুনর্জীবনদান — E. 1।

বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

লেভিস্ট্রসের সাংকেতিক রীতি অনুসারে পক্ষ এবং কার্যকারিতাকে নিম্নভাবে দাঁড় করানো যায়।

পক্ষ ঃ রাজার লোকেরা (রাজা) - a
বিধবার ছেলে - b
ক্রিয়াশীলতা (f)
দৈবী সাহায্য রাজার বিরুদ্ধে যায় - x
ছেলেটিকে রাজা মুক্তি দিতে বাধ্য হয় - y

ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় ঃ পাহারাদারেরা বিধবার ছেলেকে ধরে নিয়ে যায় কিন্তু দৈবী আদেশের ক্রিয়াশীলতাটি ছেলেটির পক্ষে আসায় (রাজার বিপক্ষে) ছেলেটিকে রাজা মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এবং এভাবে ছেলেটির বিজয় সূচিত হয়।

কাহিনী ঃ ছয়

গুল্মকুমারী

'গুল্মকুমারী' কাহিনীটি সাধারণ লোককথা শ্রেণীর ঐন্দ্রজালিক কাহিনীর অতিলৌকিক পর্যায়ভুক্ত। টাইপ ৪০৭। গুল্মরূপে সুন্দরী কুমারী। রাতে গুল্ম থেকে কুমারী বের হয়ে সংসারের সব কাজ করে। নায়ক তার প্রেমে পড়ে। অতঃপর কুমারীর নায়কের স্ত্রীরূপে গৃহে অবস্থান।

একাধিক গতিপ্রবাহ সমন্বিত কাহিনী এটি। **প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ** দশ পাড়ার সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের পাড়ার সাত ভাই। সাতভাইয়ের বৌয়েরাও জুমে গেছে স্বামীদের সঙ্গে। সবার ছোট ভাই জুমে একটি গুল্ম কুড়িয়ে পেল।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ ছেলেটি গুল্মটিকে বাড়ীতে এনে মাচার উপর রেখে দিলো এবং স্ত্রী সহ সকলকে বারণ করে দিলো যাতে কেউ না ধরে। ওর স্ত্রী ছিলাইকুমারী খুবই অপরিচ্ছন্ন। রাতে সবাই ঘুমিয়ে থাকলে গুল্ম থেকে বেরিয়ে আসে সুন্দরী কুমারী। সে ঘরের সব কাজ করে রাখে।

ছিলাইকুমারী গুল্মটিকে কেটে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। সেখানে গজায় মস্ত বড় লেবু গাছ। লেবু থেকে কুমারী বেরিয়ে ঘরের সব কাজ করে রাখে। ছিলাই লেবু কেটে ফেলে। লেবুর খোসা থেকে জন্মায় লাউ গাছ। একে একে ল্যাটামাছ, নারকেল ইত্যাদি জন্মালো লাউগাছ থেকে। ছেলেটি কুমারীকে একরাতে ধরে ফেলে। ছিলাইকে মাটি চাপা দেয় ও কুমারীকে বিয়ে করে।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়। দশপাড়ার সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের এক পাড়ার এক গেরস্ত। ওরা সাত ভাই। ওদের সাত বৌ (১)। জুমে কাজ করতে গেল ওরা একদিন (২)। কাজ করতে করতে সবার চেয়ে ছোট ভাই একটি গুল্ম কুড়িয়ে পেলো (৩)। ওটা ভারী গোল। সবাইকে ডেকে ডেকে দেখালো। এতো সুন্দর সুগন্ধি গুল্মটাকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কোমরে গুঁজে রাখলো (৪)। জুমের কাজ শেষ করে ফেরার সময় গুল্মটা বাড়ীতে নিয়ে এসে (৫) ঘরের মাচায় রেখে দিলো। স্ত্রীসহ সকলকে নিষেধ করে দিলো যাতে কেউ না ধরে (৬)। ওর স্ত্রী মানুষের আকৃতি হলেও, চাল-চলন খুব বিচ্ছিরি ছিলো। খুব অপরিষ্কার থাকতো। ভোর হ'লে ঘর ঝাঁট না দিয়েই মুখ হাত না ধুয়ে যা পেতো, তা খেয়ে নিতো। মাথায় চিরুনী দিতোনা কখনো। দেখলে জ্যান্ত রাক্ষসী মনে হয়। নাম ছিলো তাঁর ছিলাই কুমারী।

সেদিন নিশুতিরাত। চারদিকে সবাই ঘুমিয়েছে। কেউ কোথাও জেগে নেই। মাচার উপরের গুল্ম থেকে বেরিয়ে এলো এক সুন্দরী স্ত্রী লোক। দোলন চাঁপার মতো তার সুগন্ধ। ঘর ভরে গেল তাঁর মিষ্টি গন্ধে। গুল্মকুমারী একনিমেষে ঘর দোর নিকিয়ে, থালাবাসন ধুয়ে মুছে ভাতও পাঁচ তরকারী রেঁধে ফেললো। তারপর কিছু পান সাজিয়ে একখিলি পান নিজে খেয়ে (৭) রাত ভোর না হতেই গুল্মের ভেতর লুকিয়ে রইলো। ঘুম থেকে উঠে ঘরের সব কিছু দেখে ছিলাই কুমারী অবাক হয়ে (৮) স্বামীকে ডাকতে লাগলো, 'লকই-অ-লকই, বেলা হ'ল ওঠো। কাজে যাবে'। বৌ-এর ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে লকইয়ের চোখ ছানাবড়া। ভাবলো, আগে কখনো তো ওকে ঘরদোর এতো পরিষ্কার করতে দেখিনি। আমি না উঠতেই আজ ভাত পাঁচ তরকারী রেঁধে ফেলেছে। তার ধরন দেখি একেবারে পাল্টে গেছে। এভাবেই চলতে লাগলো ওদের সংসার। লকই জুমে যাবার সময় প্রত্যেক (৯) দিনই গুল্মটা ধরবেনা খাবেনা বলে বৌকে শাসিয়ে যায় (৯ক)। জুম

(১) প্রাথমিক অবস্থা। (ঙ)

(২) নায়কের গৃহের বাইরে যাত্রা (↑)

(৩) যাদুনিমিত্তের আকস্মিকভাবে প্রাপ্তি (ভ[৫])

(৪) যাদু নিমিত্তকে হস্তগত করে নায়ক (আ[১])

(৫) নায়কের প্রত্যাবর্তন (↓)

(৬) নিষেধ। যাদু নিমিত্ত সম্পর্কে নির্দেশ (ভ[২])

(৭) যাদুনিমিত্ত নায়কের সাহায্যে নিজেকে নিয়োজিত করে (ভ[৩])

(৮) খল-নায়িকার সন্দেহ।

(৯) নির্দিষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা (ঞ[১])

(৯ক) যাত্রা (↑)

থেকে ফিরে এসে আবার দেখে ওটা ঠিক আছে কিনা। লকই ওটাকে ভালোবেসে ফেলেছে। হাতে কাজ না থাকলে গুল্মের পাশে এসে বসে থাকে। এসব দেখে ছিলাইকুমারী রেগে আগুন। মনে মনে ভাবে লোকটা আমার চেয়ে গুল্মটাকে ভলোবেসে (১০) ফেলেছে। লকই জুমে গেলে একদিন সুযোগ বুঝে ছিলাই গুল্মটাকে কেটে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলো (১০ক)। বেলা শেষে বাড়ী ফিরে লকই দেখলো গুল্মটা নেই (১১)। ও খুব রাগারাগি করলো। গুল্মটাকেও সে পেলোনা। ওদিকে সেদিন থেকে ঘরের কাজকর্ম সব বন্ধ। গুল্ম হারিয়ে লকই মুখ ভার করে থাকে। ঘুম খাওয়া দাওয়া নেই। এমনি করেই দিন যাচ্ছে ওর।

(১০) অনুসরণকারীর গুল্মের প্রতি ঈর্ষা (পর) (১০ক) নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন ও গুল্ম বিনষ্ট করে (ড২, আ৩)

(১১) প্রত্যাবর্তন ও যাদু গুল্মের অভাব (↓) (অ২)

এদিকে যেখানে গুল্মটা ফেলেছিলো সেখানে গজিয়ে উঠলো এক লেবু গাছ (১২)। দু তিন মাসের মধ্যে তাতে লেবুও ধরলো একটা। কি অবাক কাণ্ড। এতো বড় গাছটায় কিনা মাত্র একটা লেবু ধরলো। লেবুটা কিন্তু অন্য লেবুর মতো নয় — ভারী সুন্দর। তাই ওটা তুলে নিয়ে মাচাং এর উপরই যত্ন করে রেখে দিলো (১৩)। আর বৌকে এবারও নিষেধ করে দিলো যাতে ওটা না ধরে। নয়তো সে রেহাই পাবেনা।

(১২) যাদুগুল্মের পুনর্জীবন (অঅ৯)

(১৩) যাদুনিমিত্তের অভাব অপসারিত (অঅ)

সেদিন থেকে ঘর আবার সুগন্ধে ভরে উঠলো। রান্নাবান্না, নিকোনো-মোছানো সব আগের মতোই হ'তে লাগলো। সবাই যখন অঘোরে ঘুমোয় তখন সে সব কাজ করে। পান সাজিয়ে, নিজে একখানা পান খেয়ে পানের পিচ্‌কি লকইয়ের কাপড়ের কোনায় মুছে যেতো। কেউ কিছু বুঝতে পারতোনা (১৪)। ছিলাই কুমারীও আগের মতোই ব্যবহার করতে লাগলো। লকই রোজ জুমে যাবার সময় নিষেধ করে যায় যাতে লেবু না ধরে। এসব ব্যাপার লকইকে খুব ভাবিয়ে তুললো। ঘরের সব কাজকর্ম আপনা আপনি হয়ে যায়, এর ভেতরের রহস্য সে কিছুতেই বুঝতে পারছেনা। গুল্মের মতোই লেবুটাকেও সে ভালোবাসতে লাগলো। লেবু ঘরে আসার পর থেকে তাঁর চাল-চলনও পাল্টে যেতে লাগলো। কম কথা বলে। বৌকে যখন তখন ধমকাচ্ছে। এসবই ছিলাইকুমারীর কাছে অসহ্য ঠেকছে। এমনি সময়ে একদিন লকই জুমে গেলে ছিলাই লেবুটা কেটে কুটে খেয়ে ফেললো (১৫)। বীচি আর খোসা দূরে কোথাও ফেলে দিল। বাড়ী ফিরে লেবু না পেয়ে লকই বৌকে খুব বকলো (১৫ক)। বৌ বললো সে খেয়ে ফেলেছে।

(১৪) যাদু চরিত্র নায়কের গৃহকর্ম করে দেয় (ভ২)

(১৫) নায়ক বাইরে গেলে খলনায়িকা লেবু নষ্ট করে (↑) (আ৩) (১৫ক) প্রত্যাবর্তন ও লেবুর অভাব (↓) (অ২)

দুদিন পর লেবুর খোসা ফেলার জায়গা থেকে গজিয়ে উঠলো মস্ত এক লাউ গাছ। লতা নয়তো যেন বাঁশ। উঠোনের পাশেই লকই মাচা বেঁধে দিয়েছে। সারা উঠোন জুড়ে গাছ ছড়িয়ে গেলো। কিন্তু তাতে লাউ ধরলো মাত্র একটি (১৬)। লাউটা যেমন বড় তেমনই সুন্দর। একদিন ছিলাই আপনমনে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে এমন সময় লাউয়ের ভেতর থেকে একটি স্ত্রীলোক এসে ছিলাইকে এক লাথি কষিয়ে দিয়ে আবার লাউয়ের ভেতর গিয়ে ঢুকে পড়লো। সেদিন থেকে রোজ ছিলাই লাথি খেয়ে আসে (১৭)। কিন্তু দেখতে পায়না কাউকে (১৮)। এদিকে লকই লাউটা তুলতে বারণ করেছে (১৯)। একদিন স্ত্রী তাকে বললো ওটার জন্য উঠোন পরিষ্কার করা যায় না, তাই ওটাকে খেয়ে ফেললে কেমন হয়? লকই খুব রাগ করলো। কিছুদিন পর লাউটা একটু শক্ত হ'লে সে ওটা ঘরে এনে রাখলো। ভোর না হতেই বৌ আবার জুমে যাবার জন্য ডাক দেয়। লকই-ও আবার বদলে গেল (২০)। চালচলন দেখে বৌও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। ভাবলো লাউটাকে শেষ করতে হ'বে। একদিন ওটা কেটে রেঁধে ফেললো। লাউ না পেয়ে লকই খুব রাগ করলো। বীচিগুলো শক্ত হয়ে যাওয়াতে ওদের দুজনের কেউই তরকারীটা খেতে না পেরে সবটা তরকারীই জলে ফেলে দিলো (২১)।

এবার হ'ল ল্যাটা মাছ (২২)। ছিলাই কলসী নিয়ে জল আনতে গেলেই জল ঘোলা করে দেয় (২৩)।

ঘোলা জল খেয়ে লকই বৌকে বকলে সে বললো যে মাছটার জন্যই সে জল আনতে পারেনা যখন, তখন মাছটাকে খেয়ে ফেললেই হয়। বলামাত্রই লকই ওটাকে ধরে আনলো (২৪)। কিন্তু কাঁটা গলায় বিঁধে প্রাণ যাবার অবস্থা। কাজেই সব তরকারী ফেলে দিতে হ'ল।

তরকারী ফেলার জায়গা থেকে গজিয়ে উঠলো একটা নারকেল গাছ (২৫)। নারকেলও ধরলো মাত্র একটা। লকইর খুব ভাবনা হলো একটা নারকেল দেখে। তাই এটাকেও ঘরে এনে রাখলো। নারকেল আনার সাথে সাথে আবার ঘরের কাজকর্ম আপনা আপনি হ'তে লাগলো। লকইয়ের ভাবনা বেড়ে গেল। বন্ধুরা ওকে একদিন জিজ্ঞেস করলো সে এতো রোগা হ'ল কি করে (২৬)? লকই সব খুলে বললো। বন্ধুরা বুদ্ধি দিলো সারারাত তো জেগে থাকা যাবেনা, তাই বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের ডগাটা কেটে জেগে থাকতে। ঘুম পেলে সামান্য নুন লাগিয়ে দিলে আর ঘুম আসবেনা (২৭)।

(১৬) যাদুচরিত্রের পুনর্জীবন (অঅ[৩])

(১৭) যাদুনিমিত্ত নিজে থেকে খল-নায়িকার কাছে আসে (ভ[৩])

(১৮) নিজেকে অন্তর্দ্ধানীত করে (আ[৩])

(১৯) নিষেধাজ্ঞা (ঞ[১])

(২০) যাদুনিমিত্ত দ্বারা নায়ক প্রভাবিত হয় যাদুর প্রয়োগ কৌশল লাভ (ভ)

(২১) খল শস্য বিনষ্ট করে (আ[৩])

(২২) যাদুলাউয়ের মাছে রূপান্তর

(২৩) খলের প্রতারণা-মূলক অনুরোধ (ন[৩])

(২৪) খলের প্রতারণা মূলক অনুরোধে নায়ক ধরা দেয়(জ[৩])

(২৫) জাদুনিমিত্তের পুনর্জীবন ও রূপান্তর (অঅ[৩])

(২৬) সহায়ক বন্ধুদের দ্বারা

(২৭) জিজ্ঞাসাবাদ ও উপায় সন্ধান (ঢ[২])(ভ[২])

এমনি করে সে রাতে একদিন জেগে থেকে দেখলো নারকেল থেকে এক সুন্দরী মেয়ে বের হয়ে এসে সারা ঘরে থুথু ফেলছে আর বলছে ছিঃ ছিঃ ছিলাই কুমারীর ঘরের কি ছিরি (২৮)। এতো দেখছি গোয়ালঘর। চটপট ঘর পরিষ্কার করে ভাত তরকারী রেঁধে বাসন কোসন ধুয়ে পান সাজিয়ে এক খিলি পান নিজে খেয়ে চলে যাবে এমন সময় লকই হঠাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ওকে জাপটে ধরলো। কুমারী নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু লকই ওকে জোর করে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখলো (২৯)।

এদিকে রাত থাকতেই লকই বনে একটা গর্ত খুঁড়ে ছিলাইকে সেই গর্তের পাশে নিয়ে গিয়ে আচমকা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো (৩০)। তারপর কাঁটা ও মাটি চাপা দিয়ে দিলো চিরদিনের মতো (৩১)। বাড়ী ফিরে গুল্মকুমারীকে বিয়ে করে নতুন করে ঘরসংসার শুরু করে দিলো (৩২)।

(২৮) যাদুনিমিত্তের আকস্মিক প্রাপ্তি (ভ[৫])
(২৯) যাদুনিমিত্তের আকস্মিক প্রাপ্তি (ভ[৫]) অনুসন্ধানীয় ব্যক্তি বুদ্ধির সাহায্যে হস্তগত হয় (অঅ[১]) ও স্থানান্তরকরণ (গ)
(৩০) প্রাথমিক যুদ্ধ ছাড়াই খলের নিধন (ই[৫])
(৩১) খলের অনুসরণ থেকে রক্ষা (রস)
(৩২) বিবাহ (উ)—

গুল্মকুমারী কাহিনীর আংকিক রূপটি হ'বে এইরকম ঃ

(ঙ) ↑ ভ[৫] আ[২] ↓ভ[২] ভ[৯] ঞ[১] ↑ পর ড[২] আ[৪] ↓ অ[৫] অঅ[৯] অঅ ভ[১] ↑ আ[৪] ↓ অ[২] অঅ[৯] ভ[৬] আ[৮] ঞ[১] ভ আ[৪] ন[৪] জ[৪] অঅ[১] ঢ[২] ভ[২] ভ[৪] ভ[৫] অঅ[১] গ ই[২] রস উ।

রেখাচিত্রে সাজালে কাহিনীটির রূপ হ'বে এরকম ঃ

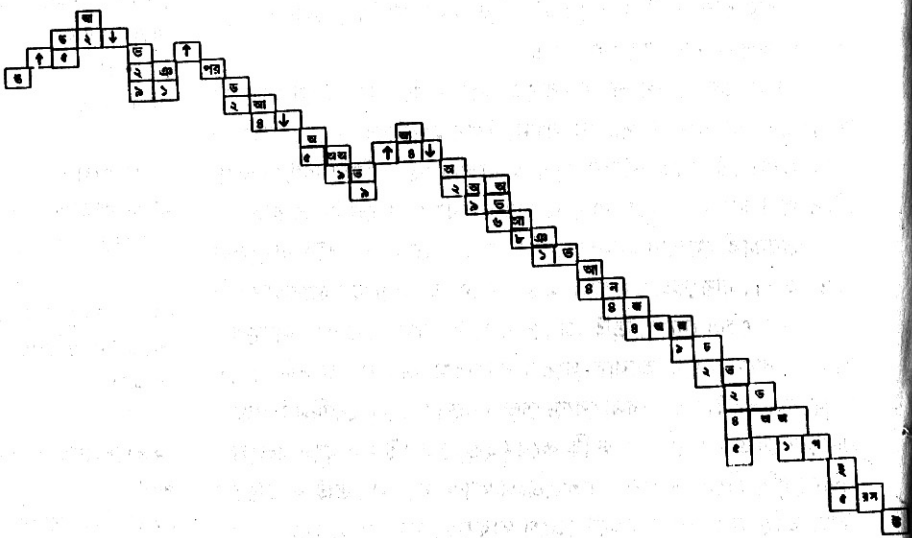

এই কাহিনীটির হ-ই, ম-স বর্জিত গঠন। জাদু নিমিত্তের বারবার পুনর্জীবন গ্রহণ প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মোটিফ ঃ এই লোককথাটিতে যে অভিপ্রায়টি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, তা হ'ল রূপপরিবর্তন (transformation) মোটিফ - D0 - D699 । গুল্ম থেকে লেবু, লেবু থেকে লাউ, লাউ থেকে ল্যাটা মাছ, ল্যাটা মাছ থেকে নারকেলে রূপান্তর যাদুবিশ্বাসজাত। নারকেল নরমুণ্ডের প্রতীক। গুল্ম, ল্যাটামাছ, লাউ, নারকেল মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে যৌন প্রতীক বলে গণ্য হ'তে পারে। পরিবর্তনের ধারায় গুল্ম থেকে নারকেল সর্বপ্রাণবাদ ও টোটেম বিশ্বাসজাত অভিপ্রায়। উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারার পরিচয় গল্পটিতে পাওয়া যাচ্ছে। পানের পিক রক্তের প্রতীক। লকইয়ের কাপড়ে পানের পিক মুছে দেওয়া যৌনবাসনার সূচক। ছোট বউকে পুঁতে ফেলে গুল্মকুমারীকে বিয়ে করার মধ্যে সামাজিক বিধির প্রকাশ যে এক ব্যক্তির জীবিত একাধিক স্ত্রী থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অলুক্ষণে নারী ছিলাইকুমারী N. 134.1.2 ।

গুল্মকে প্রথম দর্শনে ভালেবাসা T.15 গুল্মকুমারীর ঐন্দ্রজালিক কাজকর্ম D মোটিফের অন্তর্গত। ছিলাইকুমারীর মধ্যে রাক্ষসীসুলভ আচার আচরণের মধ্যে যে অভিপ্রায়টি প্রকাশিত তার মোটিফ G.532 (hero hidden and ogre deceived by his wife) এটিও লোককথার একটি অতি সাধারণ অভিপ্রায়।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

লেভি ষ্ট্রসের সূত্রানুযায়ী binary opposition হিসেবে এখানে পাওয়া যাচ্ছে ছিলাইকুমারী ও লকইকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে fx (a) = ছিলাই কুমারী, fy (b) লকই। এখানে fx(a)- র ক্রিয়াশীলতার (খলত্বের) জন্যই গুল্মের বারংবার ধ্বংস ও পুনর্জীবনপ্রাপ্তি ঘটে। fy(b) -র ক্রিয়াশীলতা (a) -র বিরুদ্ধে নিয়োজিত, যে খল হিসেবেই এখানে পরিচিত। পরিশেষে (a)-র প্রতি (b)-র নেতিবাচক মনোভাব অর্থাৎ গর্ত খুঁড়ে চিরদিনের জন্য মাটি চাপা দেওয়ার মাধ্যমে (a) অর্থাৎ খলের উপর (b)-র বিজয় সূচিত হয়। এভাবেই লেভিষ্ট্রসের ফর্মুলাটি এখানে সুপ্রযুক্ত হয়।

কাহিনী ঃ সাত

কথা বলোনা

'কথা বলোনা' কাহিনীটিকে সাধারণ লোককথার অন্তর্ভুক্ত অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কার্য্য টাইপ ৪৬০-৪৯৯ শ্রেণীভুক্ত করা চলে।

দ্বিগতিপ্রবাহ সম্পন্ন কাহিনী এটি। প্রথম গতিপ্রবাহটি এইরকম ঃ প্রাচীনকালে রাজার অন্দরমহলে দাসীর জন্য রাজার লোকেরা গাঁয়ে গাঁয়ে সুন্দরী মেয়েছেলে খুঁজে বেড়াতো। এক জুম চাষীর দু'মেয়ে। দেখে যেন মনে হয় তুলোর দেবী (খুলুমা) আর ধান্যের দেবী (মাইলুমা) ধরাধামে এসেছে। কাজের মরশুমে জুমিয়া আর বৌ কাজে যাবার সময় মেয়েদের বলে গেল যেন চুপ করে ঘরে বসে থাকে, নয়তো রাজার লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে যাবে। রাজার

লোকেরা ঘুরতে ঘুরতে গ্রামে এসে হাজির। মেয়েরা ভয় পেয়ে কথা বলে ফেললো। রাজার লোকেরা মেয়ে দু'টোকে ধরে নিয়ে যায় ও দু'বোনকেই দাসী করে রাখলো রাজার অন্দরমহলে। কেঁদে কেঁদে মেয়ে দু'টো মারা যায়।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ পরজন্মে দু'বোন দু'টো পাখি হয়ে জন্মায় ও 'কথা বলো না', 'কথা বলোনা' বলে সবাইকে সাবধান করে দেয় সবসময়। আগের জীবনে রাজার লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে গিয়েছিলো বলে এজন্মে ওরা কথা বলে না।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

প্রাচীনকালে রাজার অন্দরমহলে দাসীর জন্য রাজার লোকেরা গাঁয়ে গাঁয়ে সুন্দরী মেয়েছেলে খুঁজে বেড়াতো। রাজ্যের সেরা সুন্দরী মেয়েদের খুঁজে এনে অন্দরমহলে দাসী করে রাখতো। তা ওর ছেলেই থাক, স্বামীই থাক্, রেহাই পেতোনা। এমনি যখন দেশের হাল, তখন পাহাড়ের গাঁয়ে এক জুমচাষী থাকতো। তার দু'টো মেয়ে ভারী সুন্দর। কাজে কর্মেও ওরা ভারী চালাক। গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে রূপগুণে ওদের মতো একজনও নেই। দেখে যেন মনে হয় 'ধানের দেবী' ও 'তুলোর দেবী' ধরাধামে এসেছেন। দেবতাও ওদের রূপে ভুলে যায়। সবসময় জুমচাষীর মনে একই চিন্তা। মেয়েদের রাজার ভয়ে ঘরে রাখাও সমস্যা। কখন জানি রাজার লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে যায়। চাষীর জুমও ততো ভালো না। তাই ঘরে রেখে বিয়ে দিতেও ভরসা পাচ্ছেনা। বিয়ের পর খেতে পরতে হ'বেতো। স্নেহের বাঁধন কাটিয়ে উঠতে পারে না বলে পরের ঘরে মেয়েকে পাঠাতেও মন চায় না। মেয়ে দু'জনও বাবা-মাকে খুব ভালোবাসে (১)।

কাজের মরশুমে একদিন জুমিয়া আর ওর বৌ কাজে যাবার সময় (১ক) রাজার লোকেরা মেয়েদের দেখে ফেলার ভয়ে মেয়ে দু'টোকে সঙ্গে না নিয়ে ওদের বলে গেল ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকতে। কোনো কথাবার্তা যেন না বলে (২)। মেয়েরাও টংঘরের এককোণে চুপ করে বসে রইলো ভয়ে জড়সড় হয়ে (৩) চাষী বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়েছে (৪) ওদিকে রাজার লোকেরাও একসময় গাঁয়ে এসে হাজির হ'ল। এদের আগমন টের পেয়ে বড়বোন ছোটবোনকে বলছে, 'ওই শোন্, আপদগুলো এসে গেছে দেখছি। কথা বলিস না, চুপ করে থাক। টের পেলে ধরে নিয়ে যাবে। দিদি কথা বলছে দেখে ছোটবোন দিদিকে কথা বলতে বারণ করলো। ছোটবোন কথা বলছে দেখে বড়বোন আবার ওকে নিষেধ করলো (৫)। এমনি

(১) জোরালো প্রাথমিক অবস্থা (ঙ১)
(১ক) জুমে যাত্রা ও (↑)
(২) নির্দিষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা (ঞ১)
(৩) নিষেধাজ্ঞা পালন।
(৪) বয়স্কদের গৃহে অনুপস্থিতি (ছ১)
(৫) নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন (ড১)

করে এ ওকে নিষেধ করতে করতে কখন যে ওদের গলার স্বর চড়ে গেছে ওরা তা টের পেলোনা (৬)। টংঘরের পাশ দিয়ে রাজার লোকেরা যাচ্ছিলো। দু'বোনের কথা শুনতে পেয়ে ওরা মেয়েদের টংঘরের উপর উঠে এলো। সুন্দর মেয়ে দু'টিকে ওরা ধরে নিয়ে গেলো(৭)। দু'বোনকেই দাসী করে রাখলো রাজার অন্দরমহলে (৮)। কাজ থেকে চাষী আর বৌ ফিরে এসে দেখলো (৯) ঘর অন্ধকার। রাজার লোক ওদের ধরে নিয়ে গেছে (১০)। মেয়েদের শোকে ক'দিন বাদেই চাষী আর বৌ মরে গেল (১১)। কতো সাধ ছিলো দুটো ছেলে এনে ঘরে মেয়েদের বিয়ে দেবে তা আর হল'না।

এদিকে মেয়ে দুটোর মনেও সুখ নেই। রাজবাড়ীর জাঁকজমকেও ওদের মন ভোলাতে পারলোনা (১২)। দিনরাত কেঁদে কেঁদে ওরাও একদিন মরে গেল (১৩)। পরের জীবনে ওরা পাখি হয়ে জন্মালো। আগের জীবনে রাজার লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে গিয়েছিলো বলে, এ জন্মে ওরা, কথা বলে না। 'কথা বলো না' 'কথা বলো না' বলে সবাইকে ওদের অতীত জীবনের দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে (১৪)

এই কাহিনীটির আংকিক রূপটি হ'বে এই রকম ঃ

ঙ[১] ঞ[১] ↑ ছ[১] ড[২] জ[৩] আ[৮] আ[১৬] ↓ অ[৬] ছ[২] অ[৫] ছ[২] অ অ[৯]

রেখাচিত্রে কাহিনীটির রূপ হ'বে এরকম ঃ

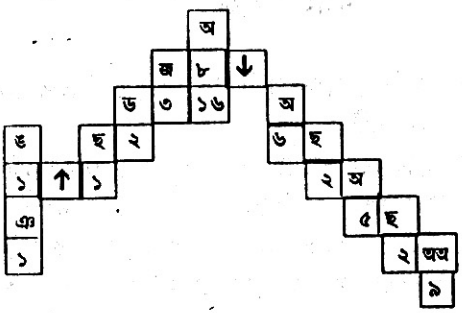

(ছক ঃ ৭)

(৬) আপনকাজের মাধ্যমে শত্রুকে সাহায্য করা (জ[৩])

(৭) খল কর্তৃক নায়িকাদের অপহরণ (আ[৮])

(৮) খল নায়িকাদ্বয়কে দাসী করে রাখে অন্দরমহলে (আ[১৬])

(৯) চাষী, চাষী বৌয়ের প্রত্যাবর্তন (↓)

(১০) গৃহে মেয়েদের অনুপস্থিতি (অ[৬])

(১১) চাষী ও বৌয়ের মৃত্যু (ছ[২])

(১২) নায়িকাদ্বয়ের অভাববোধ (অ[৫])

(১৩) নায়িকাদ্বয়ের মৃত্যু (ছ[২])

(১৪) মৃতের পুনরুজ্জীবন (অঅ[৯])

এই কাহিনীতে হ-ই, ম-স ক্রিয়াশীলতাবর্জিত গঠনই পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে মৃত্যুও জন্মান্তর গ্রহণই মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

মোটিফ ঃ

দুবোন মৃত্যুর পর আবার দু'টো পাখি হয়ে জন্মালো মনের দুঃখে এবং 'কথা বলো না' বলে সবাইকে আগের জন্মের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে,এর দ্বারা কাহিনীতে মিথের ছোঁয়া লেগেছে। এতে যে অভিপ্রায়টি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশিত, তা বাধানিষেধ বা taboo।

জুমিয়া মেয়ে দু'টোকে কথা বলতে নিষেধ করেছিলো, কিন্তু ওরা তা অমান্য করে রাজার লোকদের হাতে ধরা পড়ে এবং দাসী জীবন যাপনের দণ্ড পায়। মৃত্যুতে মুক্তি ও পাখিরূপে নবজন্ম।

কথা বলা নিষেধ-মোটিফ C400। মানুষের পাখিরূপে নবজন্ম E613। বলপূর্বক বিবাহরীতি - T192। রাজা কর্তৃক প্রজার স্ত্রী বা ভগ্নী অপহরণ P 15। এটিও শ্রেণী ভুক্ত সমাজের একটি ব্যাধি। আদিবাসী সমাজেও এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

খেটে-খাওয়া মানুষ তার পারিবারিক জীবন নিয়েও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। রাজার বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না, এতো স্বাভাবিক। বিরিন্দিয়ারা শ্রেণীশোষক গোষ্ঠীর দালাল।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ লেভিষ্ট্রসের সূত্র অনুযায়ী এই কাহিনীতে fx(a) হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে রাজার লোকেরা। সংযোগকারী হিসেবে দেখা যাচ্ছে জুমিয়ার মেয়ে দু'টোকে অর্থাৎ fy(b); পরবর্তী পর্যায়ে (b)-র ক্রিয়াশীলতা (a)-র বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে। কান্নাকাটি করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এবং তৎপরবর্তী সময়ে $fa^{-1}(y)$ হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে জন্মান্তরিত পাখি দু'টো, যারা 'কথা বলোনা' বলে সবাইকে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এভাবেই শেষ সমাধান হিসেবে মুক্তির মাধ্যমে তাদের জয় সূচিত হচ্ছে।

কাহিনী ঃ আট

বিচার

"বিচার" নামক লোককথাটি সূত্রমূলক কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। টাইপ ২০০০-২৩৯৯। দুই গতি প্রবাহ সম্পন্ন একক কাহিনী এটি।

প্রথম অংশ ঃ বিধবার জুমে ঢুকে শূয়োর ধান খায়। ব্যাঙ আর চামচিকেতে খুব ভাব। একদিন মতান্তর হ'ল। ব্যাঙের কথায় চামচিকে ভড়কে গিয়ে ধনেশপাখির নাকের গর্তে ঢুকতে গেলে সে হ্যাঁচ্চু করে উঠলো। এতে বানর ভয় পেলো, তার হাত থেকে ফল পড়লো হরিণের পিঠে। হরিণ দৌড়ে পালাতে গেলে মুরগীর ডিম নষ্ট হ'ল। রেগে সেও পিঁপড়ের ডিম খেয়ে ফেললো। পিঁপড়ে রেগে গিয়ে ঘুমন্ত এক শূয়োরকে কামড়ে দিলো। আর পিঁপড়ের কামড় খেয়ে শূয়োর দৌড়ে যাবার পথে বিধবার জুমে ঢুকে ধান খেয়ে ফেললো।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ বিধবা রাজার কাছে নালিশ করে শূয়োরের বিরুদ্ধে। রাজা শূয়োরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিয়ে একে একে লাল পিঁপড়ে, হরিণ, বানর, ধনেশ পাখি, চামচিকে, ব্যাঙ সবাইকে ডেকে আনলেন। অবশেষে ব্যাঙকে শাস্তি দিলেন।

বিধবার জুমে ঢুকে শূয়োর ধান খায়। জুমে ঢুকে ধান খায়, তাই তার উপযুক্ত বিচার হওয়া দরকার। কেন সে শুধু শুধু ধান খাবে।

একটা ব্যাঙ আর একটা চামচিকে। দু'জনেই খুব ভাব (১)। একদিন ব্যাঙ চামচিকেকে তার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে এলো। চামচিকেও এলো নেমন্তন্ন খেতে। একথা সে কথার পর কোনও ব্যাপারে দু'জনের মাঝে মতান্তর দেখা দিল। এ্যাদ্দিন কিন্তু ওরা হরিহর আত্মা হয়েই চলে আসছিলো। সেখান থেকেই দু'জনের মন কষাকষি শুরু। তাই ব্যাঙ বলতে লাগলো।

(১) প্রাথমিক অবস্থা (ঙ[১])

বাঁশে ঢুকলে ছিঁড়ে খাবো
গর্তে ঢুকলে খুঁড়ে খাবো—
উড়ে যাবি তো বাঁশ আছে, পেরে খাবো
যাবি কোথায়? তোকে খাবোই খাবো (২)

(২) খলত্বের প্রকাশ। শিকারকে হাতে পাবার জন্য দাবী জানায়, (আ[৮])

ব্যাঙের কথায় চামচিকে ভারী ভড়কে গেল। কোথাও গিয়ে চামচিকে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কোথায় থাকবে, কি করে রাত কাটাবে এ চিন্তাই তাকে অস্থির করে তুললো। সাত পথের বাঁকে এক প্রকাণ্ড বটগাছ। সে বট গাছে ধনেশ পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। সে ধনেশ পাখির নাকের ফোকরে ঢুকে রাতটা কাটিয়ে দেবে ভাবলো (৩)। নাকের ফোকরে কিছু ঢুকলে কি স্থির থাকা যায়। হলুদ ধনেশটারও নাক সুড়সুড় করছিলো। ওদিকে গাছের মগডালে হাতে একটা ফল নিয়ে একটা বানর আপন মনে লোফালুফি করছিলো। আর মনের আনন্দে গান গাইছে।

(৩) জীবনের উপর আক্রমণের উদ্যোগ ও আত্মরক্ষা (এ[৮])

'আমি খাবো কি ছেলে খাবে
দেখতে কিন্তু মন্দ নয়
ফলটা ভারী গোল, ছেলে খাবে কি
আমি খাবো, ফলটা ভারী গোল'।

গান গাইছে তো গাইছে — খেয়াল ছিলোনা কোনদিকে। এমনি সময়ে আচমকা হলুদ ধনেশ পাখিটা বাসা থেকে হ্যাঁচ্-চু করে উঠলে, বানর হকচকিয়ে গেল আর হাতের ফলটা গাছের নীচে হরিণের পিঠে গিয়ে পড়লো (৪)।

(৪) দুষ্কর্মে নিজের অজান্তে বশীভূত হওয়া (জ)

আর অমনি হরিণ পড়ি কি মরি সে দৌড়। হরিণের যাবার পথেই বন মোরগের বাসা। মুরগী বাসায় তা দিচ্ছিল — যাবার পথে হরিণ না জেনেই ডিমগুলো পা দিয়ে গুড়িয়ে দিলো, মুরগী কোনমতে প্রাণে

বাঁচলো - ডিমগুলোর জন্য রাগে দুঃখে গা জ্বালা করতে লাগলো। সেও রেগে গিয়ে পিঁপড়েদের ডিমগুলো খেয়ে বাসা তছনছ করে দিল। লাল পিঁপড়েরা রাগে গরগর। কি করবে না করবে পালিয়ে যাবার পথে একটা ঘুমন্ত শূয়োরকে পেলো। আরাম করে ঘুমুচ্ছে। ওকে পিঁপড়েরা খুব করে কামড়ে দিলো। হাজার পিঁপড়ের কামড় খেয়ে রাগে টগবগ করতে থাকে শূয়োর (৫)। দৌড়ে যাবার পথে পেল বিধবার জুম। আর যায় কোথায়। খেয়ে দেয়ে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে-তাই করে দিলো সবটা জুম (৬)।

(৫) মুরগী, পিঁপড়ে, হরিণ পরস্পর নিজের অজান্তেই দুষ্কর্ম করে (জ)

(৬) শূয়োর শস্য নষ্ট করে (আ[৪])

বিধবা রাজার' কাছে গিয়ে নালিশ ঠুকে দিল, 'ধর্মাবতার মহারাজ, মারলে পিঠে দাগ বসে যাবে, কেটে দেখলে গলায় রক্ত দেখতে পারেন। এতোটুকু কষ্টে গড়া বিধবার জুম, কোথাকার এক পাগলা শূয়োর নষ্ট করে দিলো। কত যুগ গেল কোথাও কারু জুমে ঢুকে শূয়োর ধান খেয়েছে শুনিনি। আপনি, যা হোক একটা বিচার করুন (৭)। রাজা সেপাইদের ডেকে পাঠালেন ও বললেন বিধবার জুম শূয়োর কতটা খেয়েছে তা দেখে আসতে ও শূয়োরকে ধরে আনতে (৮)।

(৭) সুবিচারের অনুরোধ (ঢ[৭])

(৮) রাজা বিধবাকে দয়া প্রদর্শন করেন (এ[৫])

সেপাইরা শূয়রকে ধরে নিয়ে এলো রাজার কাছে। সেপাইরা বললো, ওটাকে আর জুম বলে চেনা যায় না। রাজা বল্লেন, 'এই তুই জুমটা নষ্ট করে দিলি কেন? এখন তুই কি শাস্তি পেতে চাস্? বল। (৯)

(৯) দাতার (রাজার) ক্রিয়াশীলতা, খলকে জিজ্ঞাসাবাদ (ঢ[২])

শুনে শূয়োর বিনীতভাবে বললো, 'আপনিই বিচার করুন ধর্মাবতার, গরম কাল বলে আমি বিশ্রাম করছিলাম। লাল পিঁপড়েরা এসে আমায় কামড়ে দিলে রাগে ঠিক থাকতে না পেরে বিধবার জুমের ধান খেয়েছি (১০)। এবার রাজার হুকুমে সান্ত্রীরা লাল পিঁপড়েদের ধরে আনতে গেল। খোঁজ খবর নিয়ে পিঁপড়েদের বাঁশের চোঙে ভরে নিয়ে এলো। রাজা ওদের জিজ্ঞেস করলেন, তোরা নকি শূয়োরকে কামড়ে দিয়েছিস্? এবার কি শাস্তি পেতে চাস্ বল। একসাথে সকলে বলে উঠলো — 'মহারাজ গর্ত্তের ভেতর আমরা ডিম ও খাবারগুলো যত্ন করে গুছিয়ে রাখছিলাম মুরগী এসে আমাদের ডিমগুলোকে খেয়ে ঘেটে তছনছ করে দিলো। আমরা কিছুই না করতে না পেরে হাতের কাছে যাকে পেলাম, তাকেই কামড়ে দিলাম।

(১০) ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ (ঢ[৫])

রাজার আদেশে সিপাইরা মুরগীকে ধরে নিয়ে এলো। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সে বললো হরিণ এসে তাঁর ডিমগুলোকে মাড়িয়ে দেবার ফলে সে অন্যের যা হোক কিছু ক্ষতি একটা করে দিল।

এরপর রাজাদেশে সান্ত্রীরা হরিণকে ধরে আনলো। সেও প্রশ্নের উত্তরে বললো 'গাছের ছায়াতে শরীর এলিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ বানর গাছ থেকে একটা ফল ফেললো। হকচকিয়ে পালিয়ে যাবার সময় খেয়াল ছিল না বলে মাড়িয়ে দিয়েছি'।

রাজা তখন বানরকে আনতে পাঠালেন। সে বললো 'একটা ফল পেয়ে মনের আনন্দে হাতে নিয়ে লোফাচ্ছিলাম। এমনি সময়ে হলুদ ধনেশ পাখিটা আচমকা একটা হাঁচি দিলো। হাত থেকে ফলটাও ফসকে পড়ে গেল।

রাজা বললেন ব্যাপারটা বেশ তো ঘোরালো। রাজার হুকুমে সিপাইরা আবার চললো।

খুঁজে পেতে ধরলো ধনেশ পাখিকে।

''হলদে ধনেশ বললো; 'সাত পথের বাঁকে সাতডালা গর্তে বসে ডিমে তা দিচ্ছিলাম। কোথাকার এক চামচিকে এসে আমার নাকের ভেতর ঢুকতেই আচমকা হেঁচে দিলাম'। তখন রাজা সান্ত্রীদের পাঠিয়ে চামচিকেকে ধরে আনিয়ে চামচিকেকে বললেন — 'তুই কেন হলদে ধনেশের নাকে ঢুকলি? তোর জন্যে কি আর জায়গা ছিলোনা? চামচিকে বললো, 'না ধর্মাবতার — দেখুন ব্যাঙ আমাকে এদিকে শাসাচ্ছে',

'বাঁশে ঢুকলে ছিঁড়ে খাবো
গর্তে ঢুকলে খুঁড়ে খাবো
উড়ে যাবিতো, বাঁশ আছে পেরে খাবো
যাবি কোথায়? তোকে খাবোই খাবো

তাই ভয় পেয়ে হলদে ধনেশের নাকের ভেতর পালিয়েছিলাম। কি আর করি মহারাজ'? রাজা এবার ব্যাঙকে আনার জন্য সান্ত্রীদের পাঠালেন। সান্ত্রীরা জুমে গেল। এদিকে ব্যাঙ জুমের কোন গর্তে ঢুকে মনের আনন্দে ডেকে চলেছে। সান্ত্রীরা ওকে ডাকতেই সে লাফিয়ে দরবারে গিয়ে পৌঁছোলো। রাজাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মহারাজ কেন ডেকেছেন আমাকে'?

রাজা জিজ্ঞেস করলেন— তুই চামচিকেকে খেতে চেয়েছিলি? ব্যাঙ বললো —'চামচিকের সাথে মতের অমিল হলে

বাঁশে ঢুকলে চিরে খাবো,
গর্তে ঢুকলে খুঁড়ে খাবো
উড়ে যাবিতো বাঁশ আছে, পেরে খাবো

যাবি কোথায়? তোকে খাবোই খাবো' বলেছি (১১)

রাজা এবার সান্ত্রীদের বল্লেন ওকে বেঁধে রাখতে ও বন্দুকের হাতল দিয়ে বেশ কয়েক ঘা দিতে। ব্যাঙের মুখে রা-টি নেই। সেই থেকে ব্যাঙ আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না (১২)।

(১১) রাজা কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ (ঢ১)

(১২) খলের শাস্তি (উ)

কাহিনীর আংকিক রূপ ঃ

(ঙ১) আ৯ এ৮ জ আ৪ ঢ৭ এ৫ ঢ২.৫.২ উ।

রেখাচিত্রে সাজালে রূপটি দাঁড়াবে এরকম ঃ

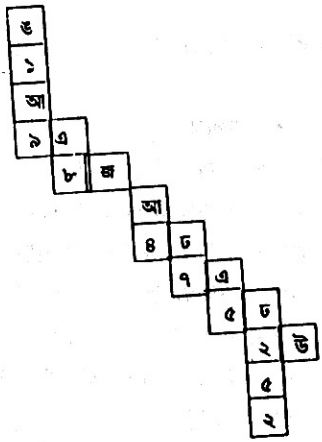

(ছক ঃ ৮)

এই কাহিনীটিতে কঠিন কাজ ও সমাপন (ম-স) অথবা সংগ্রাম ও বিজয় জাতীয় ক্রিয়াশীলতা দেখা যাচ্ছেনা। সুতরাং এটি বিবর্জিত গঠন হিসেবেই শ্রেণীভুক্ত।

মোটিফ ঃ

অন্যায় বা দুষ্কর্ম যত সামান্যই হোক, তা বাড়তে দিলে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে একশ্রেণীর লোক রয়েছে, যাঁরা অন্যের দুরবস্থার সুযোগে নিজের সুখকে জাহির করতে চায়। অভাবী মানুষের দুঃখ নিয়ে আনন্দ করে সামাজিক ও মানবিক দিক থেকে অন্যায় করে। সুখী ব্যাঙ সামান্য মতের অমিল থেকেই চামচিকের উপর একটা মানসিক আধিপত্য বিস্তার করে। এর ফলে অন্যায় করলে যে তাকেও শাস্তি পেতে হবে, তা ভুলে যায় এই ধরণের চরিত্রেরা। আদিবাসী সমাজে লোকপতি বা সর্দার প্রকৃত অন্যায়কারীকে উচিত সাজা দেয়। লোককথাটিতে মীথধর্মিতা রয়েছে। অস্বাভাবিক ঘটনা এর বিশেষ অভিপ্রায়। মোটিফ - F-900। শূয়োরের ধান খাওয়া extraordinary swallowing - F910। ব্যাঙের নির্দয়তার শাস্তি Q.285। বিচার u. 10.

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

এই কাহিনীটি লেভিষ্ট্রসের ফর্মূলা অনুসারে দাঁড়াবে এরকম ঃ

পক্ষ ঃ a - শূয়োর ধান খায়

b - বিধবা নালিশ করে রাজার কাছে।

ক্রিয়াশীলতা (f) ঃ

x - জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজা

y - ব্যাঙকে শাস্তি দেয়।

এখানে এলি মারাণ্ডাকৃত আ. স ঃ আ. ফঃ শে. স ঃ শে. ফ সূত্রটিও ব্যবহার করা যায়।

আপাত সমাধান (আ, স) - শূয়োর বিধবার জুম নষ্ট করে

আপাত ফল (আ, ফ) - বিধবার নালিশ রাজার কাছে।

শেষ সমাধান (শে, স) - সকল প্রাণীকে জিজ্ঞাসাবাদ

শেষ ফল (শে, ফ) - অন্যায় কাজের জন্য আসল দোষী ব্যাঙ শাস্তি পায়।

কাহিনী ঃ নয়

মুরগীর পিঠে

"মুরগীর পিঠে" কাহিনীটি পশুকথার অন্তর্গত। টাইপ ২০০-২১৯। দ্বিগতি-প্রবাহ সম্পন্ন একক কাহিনী এটি।

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ একটি মুরগী ছেলেমেয়েদের জন্যে পিঠে তৈরী করে ও খাওয়ায়। বান্ধবী বিড়াল বেড়াতে এলে তাকেও খাওয়ায়। বিড়াল বাড়ী গিয়ে ছেলেমেয়েদের পিঠে খাওয়ার জন্য মুরগীর বাড়ীতে পাঠালে মুরগী নোংরা জিনিষ খাইয়ে দেয় বেড়ালের বাচ্চাদের।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ বিড়াল ক্ষিপ্ত হয়ে মুরগীকে সাজা দেবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু পরিশেষে মুরগী বুদ্ধিক্রমে নিজে রক্ষা পায় ও বিড়াল মৃত্যু বরণ করে। ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটি এরকম ঃ

এক মুরগী। ছেলেপিলে আছে। একদিন মুরগীকে তার ছেলেমেয়েরা বললো, "আমরা একদিনও পিঠে খাই নি মা, আমাদের পিঠে খাওয়াতে হবে'। তখন মা মুরগী রাজী হয়ে গেল। আপন মনে গুন গুন করতে করতে উঠোনে চাল গুঁড়ো করতে লাগলো (১)। এমন সময় মুরগীর বন্ধু বিড়াল বেড়াতে এল (২)। বিড়ালের সাথে কথা বলতে বলতেই চাল গুঁড়ো করে পিঠে তৈরী করলো। তারপর বান্ধবীকে খেতে দিলো। যাবার সময় মুরগীকে বিড়াল বললো, "আমার ছেলেমেয়েরা এবার পিঠে খায়নি, অল্প হলেও ওদের খাইয়ে দিও' (৩)।

(১) প্রাথমিক অবস্থা (δ^1)

(২) বিড়াল এখানে প্রতিনায়কের ভূমিকায় আগমন (↓)

মুরগী এতে রাজী হ'ল। ওদিকে পিঠেগুলো স্বাদু হওয়াতে মুরগীর ছেলেমেয়েরা সব খেয়ে ফেললো। এদিকে বিড়াল বাড়ী ফিরেই বাচ্চাদের পাঠিয়ে দিল।

পিঠে তো শেষ, উপায়ান্তর না দেখে মুরগী বিড়ালের বাচ্চাদের শূকরের বিষ্ঠা এনে খেতে দিলো। তেতো, ঝাঁঝ পিঠে খেয়ে ওদের মন ভরলো না। বাড়ী ফিরে মাকে বললো, 'তুমি না বলেছিলে পিঠে খুব স্বাদ। আমরা যেগুলো খেলাম, সে তো বিচ্ছিরি। কালো গোল গোল'। একথা শুনে বিড়াল ভাবলো তাইতো, নিশ্চয়ই ত'হলে শূয়োর মোরগের নাড়িটাই জড়ো করে খাইয়ে থাকবে। মুরগীর সাহসের বলিহারী। বিড়াল প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে মনে মনে মুরগীকে চিবিয়ে খাওয়ার কথা ভাবলো। তাহলেই নষ্টামোর সাজা হবে। (৪)

দিনের বেলা পালিয়ে যেতে পারে ভেবে রাত্রিতেই ওকে ঘাড় মটকাবার বুদ্ধি বের করে বিড়াল মুরগীকে জিজ্ঞেস করলো, সে রাত্রে কোথায় ঘুমোয়? মুরগী বিড়ালের মতলব বুঝতে পেরে যেন কিছু হয় নি এমন ভান করে বললো, 'আর কোথায় ঘুমোবো বন্ধু গরীব মানুষ, তা ওই ছাদের উপর ছেলেপিলেদের নিয়ে ঘুমিয়ে থাকি। (৫)

ওদিকে রাত্রে মুরগী ছেলেপিলেদের নিয়ে মস্ত এক জালার ভেতরে ঢুকে রইলো। যাতে কেউ না শোনে, তাই ফিস ফিস করে বললো যেন ওরা কেউ কোন শব্দ না করে (৬)। ঠিক এমনি সময়ে বিড়ালও মুরগীর খোঁজে এসে গেছে। বলতে লাগলো মিঁউ, সইকে খাবো মিঁউ, সইকে খাবে মিঁউ, সইকে খাবো মিঁউ (৭)। ঘরের আনাচে কানাচে খুঁজে দেখলো, কিন্তু কোথাও মুরগীর খোঁজ পেলো না। শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ মনে পড়লো জালাটা দেখার কথা। জালার ভেতর ফিস্ ফিস্ আওয়াজ (৮) শুনে বিড়াল গর্জে উঠে বললো, জালা থেকে এক্ষুণি বের হ, তোদের আজ চিবিয়ে খাবো (৯)। মুরগী এই বিপদে বুদ্ধিহারা না হয়ে গলার সুর নামিয়ে বিড়ালকে বললো, তা, সই খেতে চাওতো খাবে। খেতে হ'লে আগুনে সেঁকেপুড়ে খাওয়াই ভালো। উনুনে আগুনটা জ্বেলে নাও। মুরগীর খুব বুদ্ধি ছিলো। ও ঘুমোতে যাবার আগেই একটা পচা ডিম উনুনে ছাই চাপা দিয়ে গিয়েছিল। খানিকটা দূরে একটা মস্ত হাড়িতে অনেকগুলো সিঙ্গি মাছও জিইয়ে রেখেছিলো (১০)।

(৩) পিঠে খেতে দিলে অভাববোধের উদয় (অ[৩])

(৪) প্রতিহিংসা পরায়ণ কাজের সূত্রপাত (চ) প্রতিনায়কের খলে রূপান্তর।

(৫) সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে বিড়ালের (খল) পরিদর্শন পরিক্রমা, খল নায়ক সম্পর্কিত তথ্যাদি এই পরিক্রমার দ্বারা সংগ্রহ করে (ঐ[১])

(৬) ছেলে-মেয়েকে মুরগী কথা বলতে নিষেধ করে (এঃ[২])

(৭) বিড়াল তার শিকারকে হাতে পাবার জন্য দাবী জানায় (আ[৩])

(৮) মুরগীর আওয়াজ বিড়ালকে সুযোগ এনে দেয় তাদের উপস্থিতির তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে (ফ[২])

(৯) রাতেই বিড়াল মুরগী ও বাচ্চাদের হত্যার উদ্যোগ নেয় (চ[৮])

(১০) জীবন বিপন্ন হওয়ায় নায়ক এখানে নিজেকে রক্ষা করে (রস[১])

রাগে বিড়ালের চিন্তা করার সময় ছিলো না। বলার সাথে সাথে বিড়াল উনুনে আগুন জ্বালাতে গেল। এই ফাঁকে মুরগী যাতে না পালায় সেদিকেও নজর রাখতে হচ্ছে। দু একবার মুখে হাওয়া দিতেই আগুন জ্বলে উঠলো। আর যায় কোথায়। সাথে সাথেই ছাইয়ের তলায় লুকানো ডিমটাও প্রচণ্ড শব্দে বিড়ালের চোখে মুখে ছিটকে পড়লো (১১)। চিৎকার দিয়ে বিড়াল কেঁদে উঠলো। সবকিছুই সে ঝাপসা দেখছিলো। কেঁদে কেঁদেই সে মুরগীকে বললো - সই, ও সই আমার চোখ দু'টো যেতে বসেছে, জল কোথায় আছে তাড়াতাড়ি বল। একটু জল দিয়ে ধুয়ে দিই'। 'তা, ঘরের কোণে বড় হাঁড়িতে আছে। ওখানেই ধুয়ে নাও না'। মুরগী উত্তর দেয়। কোনোরকমে দৌড়ে গিয়ে হাঁড়িটার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিলো। আর অমনি সিঙ্গি মাছগুলো বিড়ালের নাক, মুখ ও চোখে খুব করে কাঁটা ফুটিয়ে দিলো। বিষের জ্বালায় মরিয়া হয়ে চীৎকার দিয়ে বললো, 'সই, এবার বুঝি প্রাণেই মারা যাচ্ছি। কি করবো এখন বল। ''তা এখন ওই বেড়াটাতেই চোখ দু'টো মুছে ফেল' বলে মুরগী একটা বেড়া দেখিয়ে দিলো। ওই কদিন হ'ল গেরস্ত বেড়াটা তৈরী করেছে। ঘষতে ঘষতে চোখের ঘা-টা আরো বেড়ে গেল বিচ্ছিরিভাবে। (১২) যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে একসময় বিড়াল মরে গেল। তখন থেকে মোরগ ছানাদেরও আর কোন ভয় রইল না (১৩)।

(১১) প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে পরাভূত করা (এ[১])

(১২) মুরগী মিথ্যা কথা বলে শারীরিক ক্ষতি সাধন করে বেড়ালের (আ[১])
খলের শাস্তি (উ)

(১৩) শাস্তিলাভ। কোনোরূপ যুদ্ধ ছাড়াই খলের নিধন (ই[৫])।

আঙ্কিক রূপ ঃ

(ঙ[১]) অ[৬] চ ঐ[২] ঞ[২] আ[১] ফ[২] ঢ[৮] রস[১] এ[১] উ ই[৫]

চিত্ররূপটি হ'বে এরকম ঃ

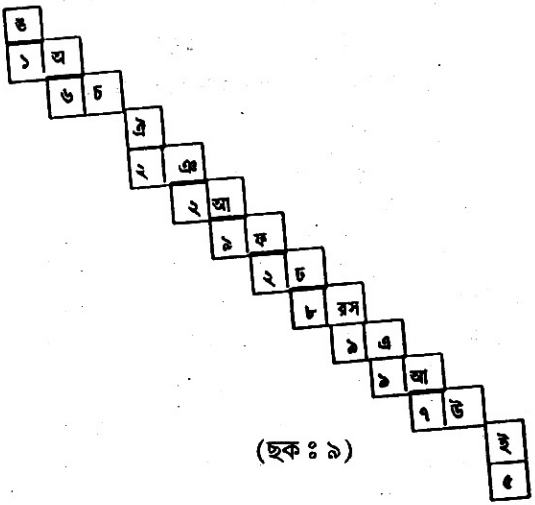

(ছক ঃ ৯)

এখানে কঠিন কাজ ও সমাধান (ম-স) অথবা সংগ্রাম ও বিজয় এই জোড়বদ্ধ ক্রিয়াশীলতাগুলোর অভাব রয়েছে। এটিও হ থেকে ই ও ম থেকে স বিবর্জিত গঠন।

মোটিফ ঃ

লোককথাটিতে নীতিশিক্ষামূলক ভাব ও বক্তব্য রয়েছে। এখানে প্রধান অভিপ্রায়টি সবলের কাছে দুর্বলের জয় - মোটিফ L 310. প্রতারণা করে শত্রুজয় K মোটিফের অন্তর্গত।

সমাজজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে বলে সহজেই এই ধরণের লোককথা সমাজে প্রচার পায়। কাহিনীটিকে রূপক হিসেবেও নেয়া যেতে পারে। বিড়াল ধূর্ত ও প্রবঞ্চক। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সমাজে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। এজন্য অনেক সময় শঠতার আশ্রয়ও নিতে হয়।

বিড়াল অত্যাচারী সবল শ্রেণীর প্রতীক। তবু সে প্রকাশ্যে অন্যায় করতে ভয় পায় বলেই ছলনার আশ্রয় খোঁজে। দুর্বলতর গোষ্ঠীর প্রতীক মুরগী আত্মরক্ষার তাগিদে বুদ্ধিকেই বেছে নিয়েছে এবং এভাবেই বিড়ালকে হত্যার মধ্য দিয়ে দুর্বলতর শ্রেণীর একাকীত্ব ও অসহায়ত্বকে সে জয় করেছে পরিজন সহ। এটাই চিরন্তন সত্য। এই কাহিনীর উপজীব্য এটিই যে সাধুতার আচরণে খল নিজেকে ঢাকলেও সামান্য প্ররোচনাতেই সেই আবরণ ঘুচে যায়। খলত্বের পুরস্কার স্বরূপ শাস্তি তার প্রাপ্য হয়।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

লেভি ষ্ট্রসের সূত্রটি এই লোককথাটিতে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়। এখানে fx (a) খল চরিত্র বিড়াল ও fx(b) পক্ষ মুরগী। বিড়ালের নেতিবাচক ভূমিকার জন্যই নায়িকা রূপে চিহ্নিত চরিত্র মুরগীর নেতিবাচক ভূমিকাটি লক্ষ্য করা যায় পরপর ক্ষতিসাধনের প্রয়াসে। এই কাহিনীটির উপাদানে প্রাথমিকভাবেই X ও Y-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের যে প্রবণতা দেখা গেছে পিঠের প্রসঙ্গ নিয়ে তাই ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হয় a এবং b-র মধ্যে বৃহত্তর দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে এবং তা-ই পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে a-র ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে b-র জয় সূচিত হয়।

কাহিনী ঃ দশ

কথা বলা আংটি

''কথা বলা আংটি' কাহিনীটিকে সাধারণ লোককথার অন্তর্গত ঐন্দ্রজালিক বস্তু টাইপ ৫৬০-৬৪৯-র অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এই কাহিনীটি কয়েকটি গতিপ্রবাহসম্পন্ন একক কাহিনী। এর আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে দুটো কাহিনী পাওয়া গেলেও এটি একক কাহিনী।

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ বুড়োবুড়ি দুই নাতিকে খুব ভালোবাসে। ঠাকুমা দাদুকে না দিয়ে পাখির ডিম খেয়ে ফেলাতে নাতিদের উপর ওরা খুব রাগ করে।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ একটা তেলালো শূয়োরকে কেটে দাদু ও ঠাকুমা রান্না করে খেয়ে নেয় ও ছেলেদুটোকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়।

তৃতীয় গতিপ্রবাহ ঃ বাড়ী থেকে বের হয়ে ওরা ভিন গাঁয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। পথে ক্লান্ত হয়ে ভুল করে বড় ভাই শকুনের ডিম খেয়ে ফেলে ও শকুন হয়ে যায়। উড়ে চলে যাবার আগে ছোট ভাইকে বিধবার জুমে পৌঁছে দিয়ে যায়।

চতুর্থ গতিপ্রবাহ ঃ বিধবার জুমের ফুটি খেয়ে ফেলে ক্ষুধার্ত ছোট ছেলেটি। সে দৈব নির্দেশে যাদু আংটি পায়। গরীব বিধবার সচ্ছলতা বৃদ্ধি হয়। নতুন টংঘর হয়।

পঞ্চম গতিপ্রবাহ ঃ বিধবার নতুন লাঙ্গা দেখে গাঁয়ের চক্‌দ্রির মেয়ের খুব পছন্দ হয়। সে বিষন্ন মনে দিন কাটায় দেখে তার বাবা শক্তি পরীক্ষার জন্য গাঁয়ের ছেলেদের আহ্বান করে। কেউ কৃতকার্য্য হতে পারে না। অবশেষে এই বিধবার ছেলেটি শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হয়ে চক্‌দ্রির মেয়েকে বিয়ে করে।

প্রথম কাহিনীটি শেষ হয়ে যাচ্ছে বড়ভাইয়ের শকুনের রূপান্তর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর দ্বিতীয় কাহিনীটি শুরু হচ্ছে ছোটভাইয়ের বিধবার জুমের ফুটি খাওয়া এবং তাঁকে মা বলে গ্রহণ করার মাধ্যমে। এই কাহিনীটি সমাপ্তি পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাহিনীকে টেনে নিয়ে যায়। ক্রিয়াশীলতা অনুসারে কাহিনীটিকে এভাবে ভাগ করা যায় ঃ

দশ গাঁয়ের সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের এক গাঁ। ও গাঁয়ে বুড়ো আর বুড়ির এক ঘর। ওদের নাতি আছে দুটো (১)। নাতি দুটো একদিন জুমে গেল কাজ করতে(২)। কাজের মরশুম। কাজ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে গেলে ওদের খুব খিদে পেলো।(৩) জুমের পাশেই ছিলো ঘুঘুর বাসা, সেখান থেকে ওরা চারটে ডিম খেলো (৪)। দিনের শেষে বাড়ী ফিরে এসে (৫) ঠাকুমাকে (আচুই) বললো স্বাদু ডিমগুলোর কথা (৬)। শুনে ঠাকুমা বললো, 'আমার জন্য দুটো আনলে না কেন? অনেকদিন খাই নি (৭)। তখন প্রসঙ্গটা ওরা চেপে গেলেও পরে ছেলে দুটো যখন ঘরে নেই, তখন বুড়ো বুড়ী বলাবলি করলো, 'মা-বাবা মরা ছেলে দুটোকে আমরা কত আদর করি। ওদের না দিয়ে আমরা কিছু খাই না। আর ওরা আজ কিনা দিব্যি জুমে গিয়ে দুটো ঘুঘুর ডিম খেয়ে এলো, দাদা দিদার জন্য একটা ডিমও আনলো না। আপদগুলোর বিন্দুমাত্র দয়ামায়া নেই দেখছি। ওরা জুমে যাক্ অন্য একদিন,আমরাও বড় তেলালো শূয়োরকে কেটে খাবো একদিন। ওদের জন্য একটুও রাখবো না (৮)।

যেমনি কথা তেমনি কাজ। পরদিন দুভাই জুমে গেলে (৯) বুড়োবুড়ী দুজনে মিলে বড় তেলালো শূয়োরকে কেটে ফেললো। এমন

(১) প্রাথমিক অবস্থা (ঙ)
(২) নাতিরা জুমে যায় (↑)
(৩) খিদে পায় ছেলেদের (অ')
(৪) ক্ষিদে নিবৃত্ত হয় (অঅ')
(৫) ছেলেদের প্রত্যাবর্তন (↓)
(৬) শত্রুকে আপন কাজের মাধ্যমে সাহায্য করা (জ')
(৭) প্রতারণামূলক অনুরোধ (ন')
(৮) প্রতিশোধমূলক কাজের সূত্রপাত (চ)
(৯) ছেলেদের গৃহত্যাগ (↑)

সময় দুভাই জুম থেকে ফিরে এলে (১০) বুড়োবুড়ি ভাবলো, আপদগুলোকে না দিয়ে খেতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা রোসো, একটা বুদ্ধি বের করছি'। দু ভাই এসে জিজ্ঞেস করলো কেন ওদের না জানিয়ে শূয়োরটাকে কেটে ফেলা হয়েছে। বুড়ী বললো, 'কেটেছি বেশ করেছি। এবার যা তো, নাড়ি ভুড়িগুলো ধুয়ে আনতো (১১)। ওরা দুজনে ওগুলো ধুতে গেলে (১২) বুড়োবুড়ী মাংস রেঁধে তাড়াহুড়ো করে সব মাংস খেয়ে ফেললো। যেটুকু পারলো না সেটুকু লুকিয়ে রাখলো (১৩)। ওদের জন্য এক টুকরো মাংসও রইলো না (১৪)। কাজ সেরে এসে (১৫) দু ভাই মাংসের জন্য ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলো। ঠাকুমা বললো, "তোদের জন্য আবার কি? ঘর থেকে বেরিয়ে যা আপদগুলো। তোদের মনে দয়ামায়া নেই। এই বলে বুড়ো তার নাতি দুটোকে ঘর থেকে বের করে দিল (১৬)।

ঘর থেকে বের করে দিলে ছেলে দুটোও আর এ গাঁয়ে থাকবে না ভেবে, ভিন গাঁয়ের পথ ধরলো। বনের ভেতর দিয়ে পথ (১৭)। তখনকার পাড়াগুলোও ছিলো খুব দূরে দূরে। মানুষও ছিলো এখনকার চাইতে অনেক কম। যেতে যেতে বেলা শেষে ওরা এক জায়গায় গিয়ে থামলো। খিদে তেষ্টায় দুজনেই ওরা অবসন্ন। পা আর চলছে না। কাছে পিঠে খাবার মতো কিছুই আর পেলো না (১৮)। পাশেই একটি বিরাট গাছে পাখির বাসা দেখে বড়ভাই গাছে উঠে গেল। খিদেয় তর সইছিলো না। তাই একটা ডিম ফেলে দিল মাটিতে ছোট ভাইয়ের জন্য। মাটিতে পড়েই ডিমটা চৌচির হয়ে গেল। ছোট ভাইয়ের আর ডিম খাওয়া হল না। ওদিকে গাছে বসে যে শকুনের ডিম খেয়েছিলো সে আস্তে আস্তে শকুন হয়ে গলে (১৯)। কি আর করবে। শকুন তখন ছোট ভাইকে বললো গাছের উপর থেকে, "ভাই দেখতেই পাচ্ছিস, আমি শকুনের ডিম খেয়ে শকুন হয়ে গেছি। মানুষের সঙ্গে আর থাকতে পারবো না। শকুনের দলেই যেতে হবে এখন (২০)। এ কথা শুনে ছোটভাই কেঁদে বললো, আমি একা কি করে থাকবো? এদিকে লোকজনও দেখছি না। বনও খুব গভীর (২১)। শকুন হলে কি হবে, মনে কিন্তু ছোট ভাইয়ের জন্য আগের মতোই মায়া রয়েছে। উপর থেকে সে বললো, "অমি চলে গেলেও তোকে গাঁয়ের কাছে পৌঁছে দেবো। তুই একটা কাজ করিস্, আমি উপর দিয়ে উড়ে যাই, তুই আমাকে দেখে দেখে চলে আয়।"

(১০) দুভাইয়ের প্রত্যাবর্তন (↓)

(১১) প্রতারণামূলক অনুরোধ (ন[১])

(১২) দু ভাইয়ের অনুপস্থিতি (ছ[৩]) বাড়ীর বাইরে যায় (↑)

(১৩) চাতুরীর বিচিত্র পন্থা (ন[৪])

(১৪)খাদ্যাভাব (অ)

(১৫) ভাইদের ফিরে আসা (↓)

(১৬) নাতিদের বিতাড়িত করা হয় (আ[১০])

(১৭) নায়কের স্থানগত পরিবর্তন ও স্থলপথে যাত্রা (গ[২])

(১৮) ক্লান্ত নায়কদের খাদ্যাভাব (অ[৩])

(১৯) ডিম খাওয়ার পর নায়কের আকৃতিগত পরিবর্তন (অঅ[৪]-ট[৪])

(২০) দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা (ব[৪])

(২১) অনুরোধ (ঢ[১])

শকুন উপর দিয়ে উড়ে চললো, ছোট ভাই উপর দিকে চেয়ে জংগলের পথ বেয়ে এগোতে লাগলো। খানিকবাদেই শকুন ছোট ভাইকে এক বিধবার জুমে পৌঁছে দিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেল (২২)। (২২) উড়ন্ত শকুন নায়ককে পথ প্রদর্শন করে (গ°)

জুম হলে কি হবে। ফসল হয় সামান্যই। কোনো টংঘরও নেই কোথাও। গরীব এক বিধবার জুম কিনা, তাই এ অবস্থা। নাওয়া খাওয়া নেই। সারাদিনের ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়েছে ছেলেটি (২৩)। তা হোক, পেটে কিছু দিতে হবে ভেবে ছেলেটি ঢুকে পড়লো খাবারের খোঁজে। অনেক খুঁজে পেতে একটা ফুটি পাওয়া গেল। সে জুমে একটিই ফুটি ফলেছিল। ছেলেটি তা-ই খেয়ে নিলো (২৪)। লতাপাতা কুড়িয়ে গাছের নীচেই এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়লো। দুপুর রাতে ছেলেটি স্বপ্ন দেখছে এক দেবতা এসে তাকে বলছে বাবু রাত ভোরে বিধবার জুমের পাশের বাঁশঝাড়টি খুঁড়ে দেখবে। ওখানে একটি জিনিষ পাবে, সেটি তোমার কাছে যত্ন করে রেখে দিও, কাজে লাগবে (২৫)। (২৩) খাদ্যাভাব ও অন্যান্য (অ°) (২৪) খাদ্য সংগ্রহ। অভাব অপসারণ (অঅ°) (২৫) ঘুমের ঘোরে স্বপ্নদর্শন ও দেবতার নির্দেশ।

ভোর না হতেই দেবতার কথামতো সে বাঁশঝাড় খুঁড়ে পেলো একটি সোনার আংটি। এ আংটিটা কিন্তু সাধারণ আংটি নয়। সে কথা বলতে পারে। বলে দিলে কোনো কাজই তার অসাধ্য নয়, সবই সে করতে পারে। ছেলেটি হাতের আঙ্গুলে আংটিটি পরে রাখলো (২৬)। রাত ভোর হতেই বিধবা এলো জুম দেখতে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলো ফুটিটা নেই। সে আপন মনেই বলতে লাগলো, আমি বিধবা, কাজ করার লোকও নেই। অন্যদের জুমের মতো আমার জুমও ততোটা বাড়বাড়ন্ত নয়, একটা ফুটি ফলেছিলো তাও কে নিয়ে গেল (২৭)। (২৬) সন্ধানীয়ের প্রাপ্তি ও অভাব অপসারণ (অঅ°) (২৭) বিধবার অনুযোগ

এমনি সময়ে ছেলেটি এগিয়ে এসে বললো যে, সে-ই ফুটিটা খেয়ে নিয়েছে। কারণ দুদিন সে কিছুই খায় নি তাই বিধবা যেন তাকে না বকে (২৮)। তখন বিধবা বললো ছেলেটি যখন তাঁকে 'মা' বলে ডেকেছে তখন তো আর করার কিছুই নেই। তার নিজের কোনো ছেলেমেয়ে নেই, আজ থেকে সে-ই তার ছেলে। ছেলেটিও বললো, "আমারও কেউ নেই মা, আমি তোমার এখানেই জুম আগলে রাখবো, শুধু দুবেলা দুমুঠো আমাকে খেতে দিও (২৯)। দুজনেই দুজনকে ভালোবেসে ফেললো। বিকেলে বাড়ী ফেরার সময় বিধবা ছেলেকে বাড়ী যেতে বললে সে যেতে রাজী হোলো না। জুম আগলে ওখানেই থাকতে চাইলে বিধবা স্নেহের কণ্ঠে বললেন " এখানে একটা টংঘরও (২৮) নায়কের অনুরোধ (ঢ°) (২৯) অভাববোধের যুক্তিগ্রাহ্যরূপ (অ°)

নেই, কি করে রাতবিরেতে থাকবে? মাকে বুঝিয়ে সে একাই জুমে থেকে যায়। বিধবা দুশ্চিন্তা নিয়ে একা জুমে ফিরে এলো। ছেলেটিও একা রয়ে গেল।

রাত হল। কেউ কোথাও নেই। ছেলেটি আংটিকে বললো, "আমার এখানে থাকার জায়গা নেই। এক্ষুনি একটা টংঘর বানিয়ে দাও দেখি। (৩০) আংটি সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুন্দর 'গীয়ারিঙ' বানিয়ে দিলো। ঘর গেরস্থালীর সব জিনিষপত্র একে একে সাজিয়ে রাখলো ভেতরে। ছেলের আদেশে শাকসব্জী দিয়ে জুমটাকেও সাজিয়ে দিলো। নতুন জুম পুরনো জুমের চেয়ে চারগুণ বড় হয়ে গেল। ছেলেটি সে রাত টংঘরে উঠেই কাটালো। (৩১)

(৩০) যাদু নিমিত্তকে অনুরোধ (ঢ°)

(৩১) যাদু নিমিত্ত নায়ককে নানাভাবে সাহায্য করে (ভ°)

পরদিন ভোরে বিধবা জুমে এলো। ছেলেটি রাতে একা জুমে রয়েছে। তাই কতো দুশ্চিন্তা। কিন্তু দূর থেকে সে নিজের জুমটাকেও চিনতে পারছে না। জুমে তো গীয়রিঙ ছিলো না। কি করে হল? সব কিছু দেখে অবাক হয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো, কি করে একরাতে সে এতো বড় টংঘর তৈরী করলো। 'এমনিতেই তুলেছি মা'— বলে ছেলে বাকীটুকু চেপে গেল। এখন থেকে বিধবার আর কোনো কষ্ট রইলো না। (৩২)

(৩২) বিধবার দারিদ্র্য মুক্তি যাদুবস্তুর সাহায্যে (অঅ°)

ধান কাটার কিছুদিন আগে "বালাকামাদি" (ধান কাটার আগে দেয় পুজো) দিতে হবে। বিধবা পুরনো পাড়ায় " অচাই" ডাকতে গেলে সে পুজো করতে রাজী হোলো না, বিধবা গরীব বলে। অনেক বলে কয়ে বিধবা নিয়ে এলো অচাইকে (৩৩)। ওদিকে ছেলে আংটিকে বলে পুজোর জিনিষপত্র জোগাড় করে রেখেছে। অচাই এসে পুজো করার পর তাঁকে খুব ভালো করে খাইয়ে দেওয়া হল। বিধবা রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে দেখে গাঁয়ে গিয়ে সবাইকে বলতে লাগলো, "তোমরা বিধবার জুমে গিয়ে দেখ, ওর আর আগের মতো অভাব নেই। গাঁয়ের সবচেয়ে ধনী সে (৩৪)। সকলে এসে দেখলো সত্যি তো।

(৩৩) বিধবার অচাইকে অনুরোধ (ঢ°)

(৩৪) এক নজরে দেখে তথ্য সংগ্রহ (ফ°)

একদিন ছেলে তাঁর মাকে একটি লাঙ্গা বানিয়ে দিলে, সেই গাঁয়ের চকদ্রির মেয়ের এমনই একটি লাঙ্গার ইচ্ছে জাগলো। সে একদিন বিধবাকে জিজ্ঞেস করলো, " মাসী এটি কোথায় পেয়েছো? আমাকে একটি বানিয়ে দাও না।" বিধবা বললো 'আমার ছেলে বানিয়ে দিয়েছে। ওকে বলে দেখি। একদিন চক্দ্রির মেয়ে বিধবার জুমে বেড়াতে এসে

ছেলেটিকে লাঙ্গা বানিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলো। ছেলেটি বললো যে সময় হলেই বানিয়ে দেবে (৩৫)।

জুমের ধান কাটা সারা হলে ছেলে আংটিকে বললো সব ধান কেটে মেরে ঘরে উঠাতে। এক রাতের মধ্যেই আংটি সব ধান ঘরে উঠিয়ে দিলো (৩৬)। ওদিকে বিধবার জুম থেকে ফিরে আসা অব্দি মেয়েটির মুখে হাসি নেই। দিনরাত কি যেন ভাবছে (৩৭)। বিয়ে দিলে ভালো হ'তে পারে ভেবে বাবা মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে লাগলো।

আগের দিনে গাঁয়ের সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করতে হলে গাঁয়ের ছেলেদের কোনো একটি পরীক্ষা দিতে হতো। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলেটিই সুন্দরী মেয়েটিকে বিবাহের যোগ্য বলে মনোনীত হতো। চক্‌দ্রিও ঘোষণা দিলো যে, " যে শক্তিশালী যুবক এক হাত দিয়ে একটা শূয়োর মেরে কেটে চেঁছে ছুলে সবাইকে খাওয়াতে পারবে, তাঁর সাথেই তাঁর মেয়ের বিয়ে হবে (৩৮)। ছিক্‌লা পত্‌লকের (বিয়ের জন্য যে শক্তি বা বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হয়, তারই নাম ছিক্লা পত্‌লক) দিন গাঁয়ের অবিবাহিত ছেলেরা সবাই এসে জড়ো হল। মজা দেখতে এসেছে সবাই। বিধবাও তাঁর ছেলেকে নিয়ে এসেছে।

ওদিকে চক্‌দ্রি সবচেয়ে শক্তিশালী তেলালো শূয়োরটাকে খাঁচায় পুরে রেখেছে। যুবক ছেলেরা খাঁচায় ঢুকে একে একে শক্তি পরীক্ষা দিতে গিয়ে কেউবা আঁচড় খেলো হাতে পায়ে, কেউবা ব্যথা পেয়ে ফিরে এলো। দু একজন শূয়োরের কাছেই ঘেঁষতে পারলো না (৩৯)। চক্‌দ্রি তখন পরিহাস করে বললো "এতো ভারী লজ্জার কথা। আমার গাঁয়ের ছেলেরা দেখছি একেবারে শক্তিহীন।" ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, আমরাতো সবাই, চেষ্টাকরে দেখলাম, বিধবার ছেলেটি কিন্তু এখনো দেখে নি। ওতো আমাদেরই গাঁয়ের ছেলে। একজন ওকে চেষ্টা করে দেখতে বললো। গাঁয়ের ছেলেরা ওকে জোর করে খাঁচায় ঢুকিয়ে দিলো। কি আর করা। এদিক ওদিক দু একবার লক্ষ্য করে আচমকা সে শূয়োরটার একটা পা ধরে ওকে কাবু করে ফেলে অবশেষে ওটাকে মেরে ফেলে। উপস্থিত সকলে ওর শক্তির তারিফ করতে লাগলো। এবার সে এক হাতেই ওটাকে চেঁছে ছুলে, রান্না করে খেতে দিলো (৪০)। চক্‌দ্রি খুশী হয়ে অচাই ডেকে পুজো দিয়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে খুব জাঁক করে ওদের দুজনের বিয়ে দিলো। সেদিন থেকে ওরাও দশ গাঁয়ের সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের একঘর হয়ে

(৩৫) অনুরোধ ও নায়কের ইতিবাচক সাড়া (ঢ[১], এ)

(৩৬) যাদু অংটি নায়ককে নানাভাবে সহায়তা করে (ভ[১])

(৩৭) অন্যান্য অভাব (অ[৩]) চক্‌দ্রির মেয়ের মুখে হাসি নেই।

(৩৮) বিবাহের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা।

(৩৯) কঠিন কাজ (ম[৪]) নির্বাচনমূলক পরীক্ষা।

(৪০) কঠিন কাজ সমাধান করে নায়ক-স

সুখে বাস করতে লাগলো। (৪১)

(৪১) নায়ক বিয়ে করে সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে (উ)

কাহিনীর আংকিক রূপ হবে এরকম ঃ

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ ↑অ[৫] অঅ[৭] ↓ জ[৩] ন[১] চ

দ্বিতীয় ও তৃতীয় গতিপ্রবাহ ঃ ↑↓ন[১]↑ ছ[৩] ন[৪] অ আ[১০]গ[২] অ[৫] অঅ[৪] ট[৪] ব[৪] ঢ[৭] গ[৩]

চতুর্থ গতিপ্রবাহ ঃ অ[৬] অঅ[৪] অঅ[৫] ঢ[৫] অ[৫] ঢ[৭] ভ[৯] অঅ[৬]

পঞ্চম গতিপ্রবাহ ঃ ঢ[৭] ফ[৩] ঢ[৭] এ ভ[৯] অ[৬] ম[৪] স উ

রেখাচিত্রে সাজানো কাহিনীটি হবে এরকম ঃ

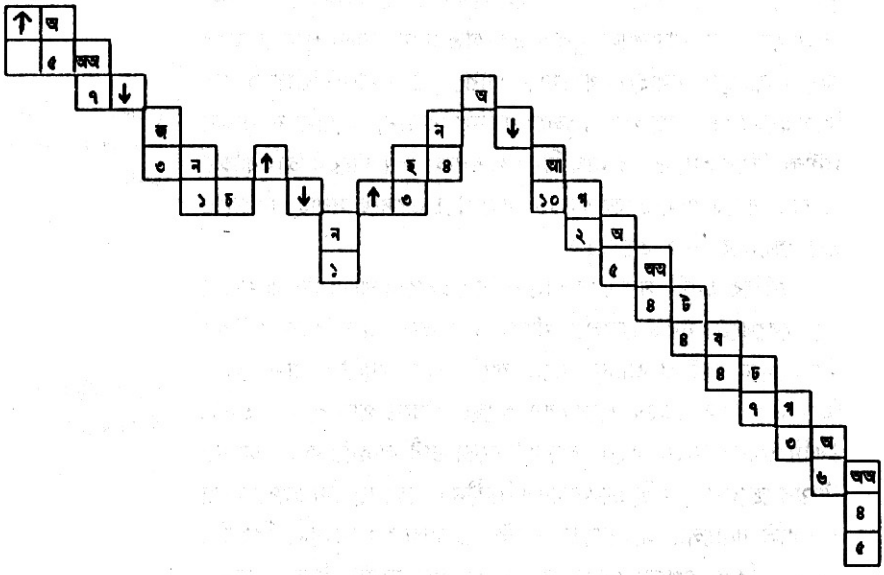

(ছক ঃ ১০)

কথা বলা আংটি কাহিনীটির শেষ গতি প্রবাহে ম-স ক্রিয়াশীলতা পাওয়া যাচ্ছে। ছিক্কা পত্‌লকের অন্তর্ভুক্ত কঠিন কাজটি (একহাত দিয়ে শূয়োর মেরে চেঁছে ছুলে সবাইকে খাওয়ানোর) নায়ক সম্পন্ন করে।

মোটিফ ঃ কাহিনীটির প্রধান অভিপ্রায় ভাগ্যবান ও জয়ী কনিষ্ঠ সন্তান। মোটিফ L10 । রূপকথার এটি একটি চিরন্তন অভিপ্রায়। শকুনের ডিম খেয়ে শকুনে রূপান্তরের মোটিফ - D

550 । শকুন মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই এর ডিমে যাদুশক্তি রয়েছে। আংটির যাদুশক্তি আছে যেমন, তেমনি এটি যৌনপ্রতীকও। এর দ্বারা অচিরেই ছেলেটির বিবাহের সম্ভাবনাও বোঝাচ্ছে। ম্যাজিকআংটি পরে অসাধ্যসাধন-মোটিফ D 1470 । চক্‌দ্রি বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী। সুতরাং তাঁর সুন্দরী মেয়েকে যে বিয়ে করবে,তার অসাধারণ শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে। মোটিফ H 331.5 । একহাতে শূয়োর মেরে চেঁছে ছুলে রান্নাকরা ইত্যাদি আদিম শিকারী জীবনের ঐতিহ্যাশ্রিত। চক্‌দ্রি, গ্রামের 'চৌধুরী'।

স্বপ্নের মাধ্যমে দেবতার আদেশে জুমের পাশের বাঁশঝাড়ে ম্যাজিক আংটির সন্ধান লাভ লোক পৌরাণিক ভাবনাসঞ্জাত। স্বপ্নের মাধ্যমে দেবতার নির্দেশ লাভ ব্যাপারটি ভারতীয় লোক কথার বিশেষতঃ উপজাতি লোককথার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

এই কাহিনীটিতে বিরুদ্ধ শক্তি দুটোকে এভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। খল হিসেবে পক্ষ (a) ঠাকুমা ও দাদু, যারা স্বার্থপরতার জন্য ছেলে দুটোকে তাড়িয়ে দেয়। পক্ষ (b) ছেলে দুটো। এখানে বড় ভাই শকুন হয়ে গিয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে মুক্তির স্বাদ পায় ও দ্বিতীয় ছেলেটি দৈবী সহায়তায় আংটি লাভ করে। আংটি সহায়ক হয়ে তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে, দারিদ্র্যের অপসারণের মাধ্যমে। এভাবেই ছেলেটি স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

লেভিস্ট্রসের সূত্র অনুযায়ী।

পক্ষ ঃ a - দাদু ও ঠাকুমা (অবিচার প্রসূত কাজ)
b-অসহায় ছেলেদুটো

ক্রিয়াশীলতা (f)
x-বিতাড়ন করা হয়।
y-দৈবী সহায়তায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থাৎ,

$$fx(a) : fy(b) : fx(b) : fa^{-1}(y)$$

কাহিনী ঃ এগারো

একফালি লাউয়ের গল্প

"একফালি লাউয়ের গল্প" কাহিনীটি সাধারণ লোককথার অন্তর্গত ধর্মীয় বা নীতিমূলক কাহিনী, টাইপ ৭৫০-৮৪৯। এই লোককথাটি দুটি গতিপ্রবাহ সম্পন্ন একক কাহিনী। এখানে প্রতিটি গতিপ্রবাহ একে অপরকে অনুসরণ করে। কাহিনীটির প্রথম গতিপ্রবাহে দেখা যায় দুবোন। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে। একজন খুব ধনী, অন্যজন দরিদ্র। একদিন বড়বোন ছোটবোনের বাড়ীতে এলে ছোটবোন তাকে একফালি লাউ দেয়। পরে আবার তা ফেরৎ ও নিয়ে নেয় ও তাকে বিতাড়িত করে।

২য় গতিপ্রবাহ ঃ বড়বোন বাড়ী ফেরার পথে বুনোকচু পায় ও দৈবাদেশ প্রাপ্ত হয় এবং দারিদ্র্যমুক্তি ঘটে। ছোটবোন একদিন বড়বোনের বাড়ী আসে। সে তার সচ্ছল অবস্থা দেখে খুশী হয় ও বড়বোনকে নিজের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে। বড়বোন যায় কিন্তু ছোটবোনের বাড়ীতে কিছু না খেয়েই খাবার থালাতে সোনাদান। ঠুকে চলে আসে। ছোটবোন তার পূর্বকৃত কাজের সাজা পেলো।

কুশীলবদের ক্রিয়াশীলতা অনুসারে কাহিনীটিকে এভাবে বিভক্ত করা যায় ঃ—

ওরা দুবোন। দুবোনেরই বিয়ে হয়েছে। ছোট বোনের অনেক টাকা-পয়সা, সোনাদানা। বড়বোন এতো গরীব যে এ বাড়ী ও বাড়ী ভিক্ষে করে খায় (১)।

(১) জোরালো প্রাথমিক অবস্থা (ঙ১)
(২) আর্থিক অভাব (অ৩)

একদিন বড়বোন ছোটবোনের বাড়ীতে এসেছে কিছু সাহায্যের জন্য। (২) একবেলা চলতে পারে এমন চাল ও একফালি লাউ দিলো ছোটবোন। অঢেল টাকাপয়সা থাকলেও ওর মন ততো উদার ছিলোনা, তাই চালের বদলে ওকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে চাইলো (৩)। ছোটবোন প্রথম দেখলো বড় বোনের মাথা। সে এতো গরীব, চুলে তেল নেই, চিরুনীও পড়েনা। ছোটবোন দিদির মাথায় উকুন পেলো। এর পর ছোট-বড়কে ওর মাথা বেছে দিতে (৪) বললো। বড়বোন কোনো উকুন ওর চুলে পেলোনা, কিন্তু ছোটবোন নিজেই চুল আঁচড়াতে গিয়ে উকুন পেলো (৫)। উকুন পেয়েই মনে মনে ভাবতে লাগলো, 'দিদি দেখছি আমাকে ঠকাতে চাইছে। একবেলার খাবার পেয়েই খুশীতে ডগমগ, কাজের বেলা দেখছি, কিছুই নেই। রাক্ষুসীটাকে মজা দেখাচ্ছি'। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দিদি একফালি লাউ দিয়ে যে ভেট দিয়েছিলো তাও কেড়ে রেখে দিলো। সামনের দরজা দিয়ে বেরুলে ছেলেমেয়েদের অমঙ্গল হ'বে বলে, পেছনের দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিলো (৬)। বড়বোন আর কি করবে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর পথে রওয়ানা হ'ল (৭)। পথের পাশে বুনোকচুবন। যাবার পথে ওগুলোই একমুঠো তুলে নিলো রেঁধে খাবে বলে (৮)। বাড়ী ফিরে বুনো কচুর ডাঁটাই কেটেকুটে উনুনে চাপিয়ে দিলো। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি, খুবই ক্লান্ত। একসময় উনুনের পাশেই ঘুমিয়ে পড়লো। এমনি সময় দেবতা এসে ওকে স্বপ্নে বললো, 'দেখ্ মা তোর অবস্থা দেখে আমি খুব ব্যথা পেয়েছি। আমি আর কি করতে পারি। উঠে দেখ্ তোর কচুগুলো সব সোনা করে

(৩) নায়িকার উপস্থিতি খলনায়িকার বাড়ীতে (ছঃ)
(৪) সাধুতার আচরণে ছলনা জাল বিস্তার, প্রতারণামূলক অনুরোধ (ন১)
(৫) উকুন বেছে দেওয়ার কঠিন কাজ (ম১) পরীক্ষা
(৬) দিদিকে ছোটবোনের অবিশ্বাস। নায়িকা নিজের অজান্তেই খলের শিকারে পরিণত হয় (জ৩)
খলনায়িকা দিদিকে তাড়িয়ে দেয় (আ১০)
(৭) নায়িকা বাড়ী যায় (↑)
(৮) বুনো কচু সহায়ক।

দিয়েছি। এগুলো বেচে ছেলেপিলেদের নিয়ে সুখে থাকিস্ (৯)। আদেশ পেয়েই ধড়মড়িয়ে উঠে দেখলো দেবতার আদেশে কখন জানি সব কচু সোনা হয়ে গেছে। তারপর একতাল সোনা বেচে সে খুব ধনী হয়ে গেল। ঘরদোর সব সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে ফেললো (১০)।

একদিন ছোটবোন তাড়িয়ে দিয়েছিলো, কথাটি সে ভোলেনি। দেবতার দয়ায় তারও আজ সুযোগ এসেছে। তাই তার ঘরদোর দেখে যেতে ছোট বোনকে খবর পাঠালো। ছোটবোন লোকমুখে বড়বোনের দারিদ্র্যমুক্তির খবর পেয়েছিলো (১১)। নিজের চোখে পরখ করে সেও খুব খুশী হ'ল। দিদি তাঁকে আদর যত্ন করলো, কতো গল্প হ'ল দুবোনে। দুবোন সারাদিন একসাথে খাওয়া দাওয়া করলো (১২)। বাড়ী ফিরে ছোট বোনও একদিন বড়বোনকে বেড়িয়ে যেতে খবর পাঠালো। বড়বোন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো (১৩)। সে একদিন সমস্ত অলংকার গায়ে পরে ঘোড়ার গাড়ী হাঁকিয়ে এলো (১৪)। ছোটবোন সাথেসাথে সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে 'এসো এসো' বলে তাঁকে এগিয়ে নিতে এলো। একদিন তাঁকে পেছনের দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলো বলে সে, সামনের দরজা দিয়ে ঘরে না ঢুকে পেছনের দরজা দিয়েই ঘরে এলো।

খাবার সময় ছোটবোন ভালো ভালো খাবার সাজিয়ে বড়বোনকে এনে দিলে, সে খাবার না খেয়ে অলংকারগুলো থালায় ঠুকে ঠুকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল (১৫)। ছোটবোন জিজ্ঞেস করলো, 'দিদি তুমি দেখছি কিছুই খেলেনা'। তখন দিদি বললো, 'একদিন আমি গরীব ছিলাম বলে, তুই আমাকে একফালি লাউ আর একমুঠো চাল দিয়েও কেড়ে নিয়েছিলি। তোর ছেলেমেয়েদের অমঙ্গল হবে বলে সামনের দরজা দিয়ে বেরোতেও দিস্নি। আমার আজ কিছু সোনাদানা হয়েছে বলেই না আমাকে একটু আদর করছিস্। তুই দেখছি আমাকে ভালোবাসিস্না, ভালোবাসিস্ সোনাদানাকে। তাই আজ না খেয়ে, সোনার অলংকারগুলো থালায় ঠুকে ঠুকে চলে এলাম (১৬)। বলে বড়বোন গাড়িতে গিয়ে বসলো (১৭)। ছোটবোন নিজের কাজের শাস্তি পেলো (১৮)।

(৯) দেবতার স্বপ্নাদেশ ও দৈবীনিমিত্তের প্রয়োগ কৌশল।

(১০) দেবতার আদেশে দারিদ্র্য অপসারণ (অঅ)

(১১) সহায়কের মাধ্যমে পরিদর্শন পরিক্রমা ও খলের নায়িকার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ (ঐ°)

(১২) দিদির অনুরোধে খল নায়িকার ইতিবাচক সাড়া (জ')

(১৩) প্রতিশোধমূলক কাজের সূত্রপাত (চ↑)

(১৪) নায়িকার অলংকার পরিধান ও অশ্বারোহন (ট) ও আগমন (↓)

(১৫) ছলনার বিচিত্র পন্থা (ন)

(১৬) খলের অনুরোধে নেতিবাচক সাড়া (এ নেতি)

(১৭) নায়িকার প্রত্যাবর্তন(↑)

(১৮) খলের শাস্তি (উ)

এই কাহিনীটির আংকিক রূপটি হ'বে এইরকম ঃ

(ঙ[১]) অ[৬] ছ[৪] ন[১] ম[৭] জ[৫] আ[১০] ↑ অঅ ঐ[৪] জ[১] চ ↑ ট ↓ ন এ নেতি ↑ উ

চিত্ররূপটি হবে এইরকম ঃ

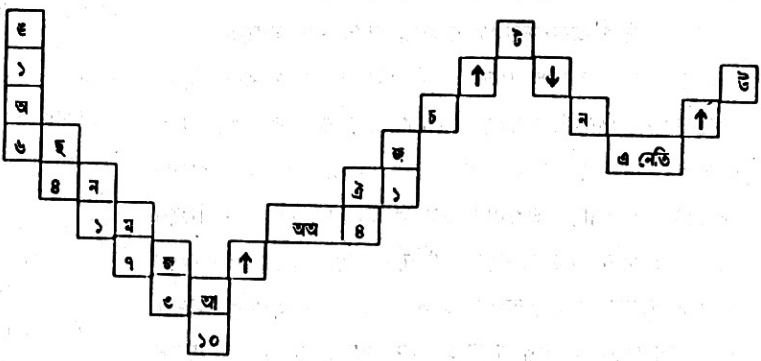

(ছক ঃ এগারো)

কঠিন কাজ ক্রিয়াশীলতাটি (ম) এখানে থাকলেও নায়িকার পক্ষে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি বলে এই ক্রিয়াশীলতাটির অভাব দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এই কাহিনীটির ম-স, হ-ই ক্রিয়াশীলতাহীন গঠন কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। মানবজীবন যে দৈব ইচ্ছাধীন, তা-ই এই কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আজ যে দরিদ্র, কাল সে ও ঈশ্বরের দয়ায় ধনবান হয়ে উঠতে পারে। স্বপ্ন ও দৈবনির্দেশ এই কাহিনীতেও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়েছে। স্বপ্নের মাধ্যমে দৈবসহায়তার নিদর্শন এই উপজাতি সমাজের দৈবাধীন মানসিকতারই পরিচায়ক।

মোটিফ ঃ বুদ্ধিমতী কনিষ্ঠা ভগিনী বাংলা লোককথায় একটি পরিচিত অভিপ্রায় হলেও এখানে ঠিক তা নয়। হিংসুটে বোনের মোটিফ-K 242.1। স্বপ্নে নির্দেশলাভ মোটিফ N.531 স্বপ্নে হলেও অক্ষম মানুষ নিজের দুরবস্থা ফেরাতে সদাই উন্মুখ। এখানে দেবতার কথার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাপূরণের কথাও বলা হ'তে পারে। এর সামাজিক নীতিশিক্ষার দিকটিও লক্ষ্য করার মতো। দুষ্কার্য্যের শাস্তি মোটিফ - Q 200 - Q 399.

কাহিনীর প্রথম অংশে বড়বোনের দরিদ্রবেশে ছোটবোনের বাড়ী যাওয়া ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং পরে ধনীবেশে গমন ও অভ্যর্থনা; আমার সোনাদানাকে ভালোবাসিস্ আমাকে ভালোবাসিস্না' - এর মোটিফ J 1561.3 দুইবোনের মধ্যেকার এই সম্পর্ক সামাজিক জীবনের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান। সামাজিক এক নির্মম অভিজ্ঞতা থেকে লোককথাটির জন্ম। কাহিনীতে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ এখানে লেভিস্ট্রসের সূত্রানুসারে (fx) ক্রিয়াশীলতা অর্থাৎ খলত্ব এর সঙ্গে জড়িত ছোটবোন (a) এবং (fy) ক্রিয়াশীলতাটি জড়িত b- (বড়বোনের) সঙ্গে। প্রথম পক্ষ (স্বচ্ছলতা) ও দ্বিতীয় পক্ষ (দারিদ্র্য) এইভাবে দুটো বিরোধীশক্তির অবস্থান কল্পনা করা গেলে, তা বাস্তবায়িত হয় a ও b-র দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। দৈবী সহায়তায় এই বিপরীতমুখী গতি b-র পক্ষে আসে ও পরবর্তী সময়ে সুফলপ্রদ হয় তারই জন্য। এভাবে b-অর্থাৎ বড়বোনের দারিদ্র্য শেষে জয়ী হয়।

কাহিনী ঃ বারো

ধনেশপাখির গল্প

"ধনেশপাখির গল্প" লোককথাটি সাধারণ লোককথার অন্তর্ভুক্ত অদৃষ্ট ও ভাগ্য টাইপ ৯৩০-৯৪৫ শ্রেণীর অন্তর্গত।

কাঠামোগত দিক থেকে কাহিনীটি একক গতিপ্রবাহ সম্পন্ন। **প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ** এক জুম চাষী। তাঁর নাম কচাক রায় ও তার বউ ছাম্পারি। কচাক আলসে, সারাদিন বাঁশী বাজায় ও খুব বদমেজাজী। ছাম্পারী সারাদিন কাজ করে। একদিন সে জুমচাষে গেলে তাঁর ছেলেটিকে ভালুক অপহরণ ও হত্যা করে। দুঃখে ছাম্পারি স্বামীকে অভিসম্পাত দিলো পাখি হয়ে জন্মাবে বলে। তারপর গভীর বনের দিকে উড়ে গেল।

কুশীলবদের ক্রিয়াশীলতা অনুসারে কাহিনীটিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ

বুড়ো - বুড়ীরা যেভাবে বসে থাকে তেমনি করে বসে থাকে যে বিরাট লম্বা পাখিটি তার নাম ধনেশ পাখী। কোনো এক সময় শাপগ্রস্ত হয়ে পাখিটি পৃথিবীতে এসেছে। সে গল্পটা হ'ল এরকম।

অনেকদিন আগে দূর পাহাড়ের গাঁয়ে এক গেরস্ত জুম চাষ করতো। তার নাম কচাক রায় ও বৌয়ের নাম ছাম্পারি। জুমের পাশেই ওদের ঘর। জুমে ফসলও হয় অনেক। কিন্তু কচাক এতোই আলসে, সে এদিকের কুটোটিও ওদিকে নেয় না। মদ পেলে তা-ই নিয়ে থাকে, আর নয়তো সারাদিন ধরে বাঁশী বাজায়। ওদিকে সে ছিলো বদমেজাজী। ছাম্পারী জুম পরিষ্কার করা থেকে ফসল তোলা অব্দি সব কিছুই করে। বাড়ীতেও বিশ্রাম পেতো না। ছ'কুড়ি ছ'ঘরের গাঁয়ে ওর মতো আর একটিও মেয়ে নেই। পান থেকে চুন খসলেই কচাক ছাম্পারিকে বকুনি দিতো। তবু ছাম্পারী কচাককেই ভালবাসতো। সুখে দুঃখে ছাম্পারির দিন যায়। একদিন ভুট্টার মতো গায়ের রঙ তার একটি ছেলে হোল। (১)

(১) প্রাথমিক অবস্থা (ঙ')

এদিকে কাজের মরশুম এসে গেছে। জুমের কাজে যেতে হ'বে। ছেলেটি তত বড়ও হয় নি যে পিঠে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তাই রোজ খাইয়ে দোলনায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে ছাম্পারি কাজে যায় (২)। সেদিনও ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে কাজে গেল (৩) কচাককে বলে গেল ছেলেকে দেখার জন্য (৪)। সেও দেখবে বললো (৫)। এদিকে ছাম্পারিও বেরুলো আর কচাক অন্য দিনের মতো পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসলো বাঁশী নিয়ে (৬)। ওদের গায়রিঙের দরজা ছিলো পূর্বদিকে। এদিক দিয়েও টংঘরে আসা যাওয়ার পথ ছিলো (৭)।

ওদের ঘর থেকে খানিক দূরেই ছিল একটা বাঁশ ঝাড়। সেখান থেকে ঘন বন শুরু। এতো ঘনবন যে বনকুকুর ভালুক, বাঘেরা সেখানেই দল বেঁধে থাকে (৮)। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো একটি ভালুক (৯)। সুযোগ বুঝে একসময় ছেলেটিকে নিয়ে সে চলে গেল (১০)। ঘুমন্ত খোকার মুখ থেকে কোনো আওয়াজও বেরুলোনা। এদিকে বাঁশী নিয়ে মশগুল কচাকও বিন্দু বিসর্গ জানতে পারলো না। সূর্য ডোবার আগেই ছাম্পারি তাড়াতাড়ি ফিরে এলো (১১)। এসেই দোলনার পাশে (১২) "কোথায় — কোথায় আমার জুমের লাল ফলটি" বলেই ডুকরে উঠলো (১৩)। কিন্তু খুব দেরী হয়ে গেছে। সেই কখনইতো সব শেষ হয়ে গেছে। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে স্বামীকে সে খুব বকতে লাগলো (১৪)।

মনে ব্যথা পেয়ে কেউ বকুনি দিলে তা না লেগে যায় না। ছাম্পারির কথাও লেগেছিলো। সে বলতে লাগলো, "আর জীবনে তুমি পাখি হয়ে জন্মাবে। তোমার ঠোঁট দুটো বাঁশীর মতই লম্বা হ'বে। গলার স্বরও হ'বে কর্কশ। যেন শুনলেই কানে তালা লাগে। তোমার ছেলেমেয়েরা বড় না হওয়া অব্দি ওদের বুকে নিয়েই তোমার স্ত্রী বসে থাকবে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে তুমি সারাদিন স্ত্রী কে খাবার এনে খাওয়াবে। অমনি করে করে ক্লান্ত হয়ে যাবে, তোমাকে সাহায্য করারও কেউ থাকবে না (১৫)। এতোটুকু বলেই ছাম্পারি ঝট্ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল গভীর বনের দিকে। (১৬) সেদিন থেকে ধনেশ পাখির বাচ্চা হ'লে মা পাখিটি তার ছেলেপিলেদের আগলে গাছের বড় গর্তে বসে থাকে সারাদিন। আর পুরুষ পাখিটি নাওয়া খাওয়া ছেড়ে সকাল-সন্ধ্যে ঘুরে ঘুরে খাবার জোগাড় করে করে ক্লান্ত হ'তে থাকে (১৭)।

(২) অর্থাভাব। তা অপসারনের জন্যে নায়িকাকে সরাসরি প্রেরণ (অ[৩], ব[১])

(৩) নায়িকা জুমে যায়। (↑)

(৪) নির্দিষ্টভাবে সাবধান বাণী উচ্চারণ (ঞ[১])

(৫) প্রতিশ্রুতি দান (জ[১])

(৬) প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের প্ররোচনা অনুভব। নির্দেশ লঙ্ঘন (ড[১])

(৭) খলের আগমন পথের ইঙ্গিত (গ[৩])

(৮) খলের উপস্থিতির সম্ভাবনা।

(৯) ঘনবনের আঁধারই সহায়ক। যার দ্বারা পরিদর্শন পরিক্রমা সমাপ্ত হয় (ঐ[৩])

(১০) খল শিশুটিকে অপহরন করে (আ[১])

(১১) নায়িকার প্রত্যাবর্তন (↓)

(১২) শূন্য দোলনাই দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা করার কাজে নিজেদের সমর্পন করে (ভ[১])

(১৩) শিশুর অভাব (অ[১])

(১৪) খল শিশুটিকে নিহত করে (আ[১৭])

(১৫) নায়িকা অভিসম্পাত দেয় প্রতিনায়ককে।

(১৬) নায়িকার গৃহত্যাগ (↑)

(১৭) অভিসম্পাতের ফলে প্রতিনায়কের দেহগত রূপান্তর সাধন ও ধনেশপাখিতে পরিবর্তন - (X)

কাহিনীটির আংকিক রূপটি হ'বে এই রকম ঃ

(ঙ[১]) অ[৫] ব[২] ↑ ঞ[১] জ[১] ড[২] গ[৪] ঐ[৩] আ[১] ↓ ভ[৯] অ[৯] আ[১৫] ↑ X

রেখাচিত্রে সাজালে তার রূপটি হ'বে এরকম ঃ

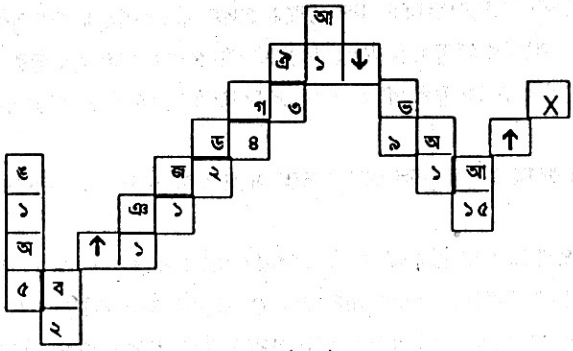

ছক (১২)

ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে ম থেকে স অথবা হ থেকে ই পর্যন্ত গঠন এই কাহিনীটিতে অনুপস্থিত। এই কাহিনীটিকেও তাই এই গঠনকাঠামোবর্জিত কাহিনীই বলা হ'বে।

মোটিফ ঃ আদিবাসী পুরুষরা সাধারণতঃ অলস ও অকর্মণ্য হয়ে থাকে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও, পুরুষের সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ভূমিকাটিও অনস্বীকার্য্য। এই সৃষ্টিকথামূলক কাহিনীটিতে পারিবারিক দায়িত্ব অবহেলার শাস্তির মোটিফ — Q।

ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে অভিশাপের অভিপ্রায়টিও আছে — M 391. মানুষের পাখিরূপে নবজন্ম — E 613।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

লেভিষ্ট্রসের ফর্মূলা এখানে এভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পক্ষ ঃ a কচাক (বৌকে সব কাজ করতে বাধ্য করে)

b - বৌ

এখানে ক্রিয়াশীলতা (F) : (X) = আলসেমি দোষ

(Y) বৌ অভিশাপ দেয়।

ফলে কচাক ধনেশপাখি হয়ে যায়।

এলি মারাণ্ডার সূত্রও এখানে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আ. স = কচাকের আলসেটি ও মনোযোগ হীনতা।

আ. ফ = ছেলেকে ভালুক নিয়ে যায়

শে. স = দুঃখে শোকে বৌ অভিশাপ দেয়

শে. ফ = কচাক ধনেশ পাখি হয়ে যায়?

কাহিনী ঃ তের

স্বর্গের ফুল রাম্না

"স্বর্গের ফুল রাম্না" কাহিনীটি সাধারণ লোককথার অন্তর্ভুক্ত। অদৃষ্ট ও ভাগ্য টাইপ ৯৩০-৯৪৫ শ্রেণীর অন্তর্গত। কাঠামোগত দিক থেকে কাহিনীটি একাধিক গতিপ্রবাহ সম্পন্ন একটি একক কাহিনী। ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে **প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ** এক যুবক স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। পথে রাম্না ফুল (খেরেংবার) খোঁপায় পরার ইচ্ছে হল স্ত্রীর। অনিচ্ছাসত্বেও স্বামী স্ত্রীর কথায় গাছ থেকে ফুল পাড়ে এবং দেবতাদের ব্যবহার্য্য ফুল স্ত্রী খোঁপায় ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ ফুল চুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী হুলক্-এ পরিণত হয়ে যায়। স্ত্রী দুঃখে মারা গেল।

তৃতীয় গতিপ্রবাহ ঃ মেয়েটি সেই বনেই আবার গোধিকারূপে জন্ম নেয়। শাস্তিস্বরূপ তাঁর হুলক জন্ম হোলো না। আজও বৈশাখ মাস এলে খেরেংবার ফুল ফুটলে তার গত জীবনের কথা মনে করে 'হুলক হুতে, হুলক হুতে', বলে গুমড়ে উঠে আর গোধিকা নিচে থেকে লেজ চাপড়াতে থাকে।

ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে কাহিনীটিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা চলে।

কদিন পরই বৈশাখের গড়িয়া পূজার সময় ঘরে ঘরে চলবে হৈ, হুল্লোড় আর পানভোজনের ছড়াছড়ি। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি চলছে (১)। এমনি দিনে এক যুবক শ্বশুরবাড়ীতে তার জামাইখাটার মেয়াদ শেষ করে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে (২)। এবার 'সেনা'য় (গড়িয়া উৎসবের সময়কে বলা হয় সেনা) স্ত্রীকে নিয়ে নিজের গাঁয়ে থাকবে, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আনন্দ করবে তাই তার মনে প্রচণ্ড আনন্দ। খেয়ে দেয়ে রওয়ানা হ'তে হ'তে খানিকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল। তবু আশা সূর্য ডোবার আগেই গাঁয়ে ফিরবে। বনের মধ্য দিয়ে পথ। লোকজন নেই কোথাও (৩)। এমন সময়ে আচমকা বাতাসে ভেসে এলো নাম-না জানা এক মিষ্টি ফুলের গন্ধ। "বাঃ কি চমৎকার! এমন সুগন্ধ কি ফুলের গো"? স্ত্রী জিজ্ঞেস করে স্বামীকে। সে বললো এটা খেরেংবার (রাম্না) ফুলের গন্ধ। স্ত্রী বললো, "এ নামতো কখনো শুনিনি" (৪)। আমাকে এক গোছা দাও না পেড়ে, পরতে ভারী শখ হচ্ছে (৫)। তখন স্বামী বললো, এ ফুল কি মানুষে পরতে পারে, ও যে শুধু দেবতাদের জন্যই ফুটে থাকে। ও পরলে মানুষের খুব অনিষ্ট হয় (৬)। মেয়েটি জানতে চাইলো স্বর্গের ফুল পৃথিবীতে এলো কি করে? স্বামী বললো, কোনো এক সময় এক অপ্সরা শাপভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে

(১) প্রাথমিক অবস্থা (ঙ)

(২) নায়ক নায়িকার দূর যাত্রা (↑)

(৩) নায়ক স্থলপথে যায় (g^{x})

(৪) অভাববোধ ফুলের জন্য (a°)

(৫) ফুল পেড়ে দেবার অনুরোধ ($c^{\prime}$)

(৬) নির্দিষ্টভাবে সতর্ক বাণী উচ্চারণ (এ°)

আসার সময় তার প্রিয় ফুলের চারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো। পৃথিবীর জল হাওয়া তার সইবে না বলে তার জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা হল। সে বেঁচে আছে অন্য একটা গাছে শিকড় আঁকড়ে, সে গাছের রস শুষে নিয়ে (৭)। মিষ্টি গন্ধ ফুলটা পরতে না পেয়ে স্ত্রীর মনটা খারাপ হয়ে গেল (৮)। দেখে যুবক তার স্ত্রীকে বললো যে সে এক্ষুণি পেড়ে দিচ্ছে (৯)। তবে সে যেন ফুল হাতে নিয়েই খোঁপায় না গোঁজে। বাড়ী ফিরে দিয়ারীর সাথে পরামর্শ করে দেবতার ফুল দেবতার নামে উৎসর্গ করে না হয় পড়া যাবে (১০)। সে যেন নিচে দাঁড়িয়ে থাকে, স্বামী গাছে উঠছে (১১)। এই বলে সে তরতর করে গাছে উঠে নিচে স্ত্রীর হাতে ফুল ফেললো। স্ত্রী ফুলগুলো নিলো (১২)। এমন সুন্দর ফুল হাতে নিয়ে লোভ সম্বরণ না করতে পেরে একগোছা ফুল খোঁপায় গুজে দিলো (১৩)। আর ওদিকে স্বামীর হাত পা আটকে যেতে লাগলো গাছের ডালে। গাছ থেকেই স্বামী ভয় পেয়ে বলে উঠলো— একি, আমার শরীরটা বদলে যাচ্ছে কেন? তুমি কি ফুলগুলো পরেছো? স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী ভয় পেয়ে উপর দিকে তাকিয়ে দেখে সে সত্যি সত্যি বদলে যাচ্ছে (১৪)। তাই তাড়াতাড়ি ফুলের থোকাটি ছুঁড়ে ফেলে দিলো। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। যা হবার তাতো হয়েই গেছে (১৫)। তখন সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, 'হায় আমি কেন ফুলগুলো পরতে গেলাম'? ওকে এখানে কি করে রেখে যাবো আমি? কি করেই বা একে আবার মানুষ করে তুলবো (১৬)? গাছে উঠে স্বামীকে নামিয়ে আনতে চাইলো কিন্তু পারলো না। জিজ্ঞেস করলো তাকে, কি করে সে আবার মানুষের চেহারা ফিরে পাবে (১৭)? স্বামী বেচারা এতোক্ষণে প্রায় হুলক হয়ে গেছে। সে বললো যে আর সে মানুষ হতে পারবে না। অস্পষ্টভাবেই সে বলতে লাগলো, "তোমাকে নিয়ে ঘর করবো মনে কতো সাধ ছিলো। কপাল মন্দ বলে তা হোলো না। এখন এখানে না থেকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে যাও। ওই পায়ে চলা পথটি ধরে এগিয়ে গেলে পথ হারাবে না (১৮)। মা বাবাকে বুঝিয়ে বলবে-ওদের সান্ত্বনা দিও। এ জীবনে না হলেও আরেক জীবনে তোমার সাথে মিলিত হবো। এখন থেকে আমাকে হুলক্ হয়েই থাকতে হবে (১৯)। নীচে থেকে স্বামীর কথা শুনতে শুনতে ব্যাথায় বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে স্ত্রীর। সে চীৎকার করে গাছের গোড়ায় মাথা কুটতে লাগলো, "তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। আমার জন্যই তো তুমি হুলক্ হলে। কেন আমি

(৭) নেপথ্য কাহিনী বলে নায়ক, নায়িকাকে
(৮) প্ররোচনার ভাব (প্ররো)
(৯) নায়িকার অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া, নায়কের। (জ[১])
(১০) নির্দিষ্টভাবে সাবধানবানী উচ্চারিত হচ্ছে (ঞ[১])
(১১) আবেদকের প্রতি নায়কের করুণা প্রদর্শন (এ[৫])
(১২) সন্ধানীয় বস্তু প্রাপ্তি। অভাব অপসারিত (অঅ[১])
(১৩) লোভের বশবর্তী হয়ে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন (ড[২])
(১৪) পূর্ববর্তী কাজের ফলস্বরূপ নায়কের পশুতে রূপান্তর (রস[৬])
(১৫) দুষ্কর্মে নিজের অজান্তে বশীভূত হওয়া (জ[৩])
(১৬) অনুশোচনা ও আত্মবিলাপ শোকবাচক শব্দে (ব[১])
(১৭) প্রেরণের পরে আহ্বান জানানো (ব[১])
(১৮) নির্দিষ্ট পথ ধরে নায়িকাকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ (গ[৩])
(১৯) জন্মান্তর বিশ্বাস ও আপন দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা (ব[৪])

সর্বনাশা ফুল পরতে গেলাম। আমি এ গাছের গোড়াতেই মাথা কুটে মরবো (২০)। আর সত্যিই কিছুক্ষণের মধ্যে মাথা ঠুকতে ঠুকতে স্ত্রীর দেহটা অসাড় হয়ে পড়লো (২১)। তীব্র যন্ত্রনায় বুক ফেটে গেলেও মুখে কোনো কথা ফুটছিলো না স্বামীর। স্ত্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো গোঙানির শব্দ হু-হু-হুলক্ হুতে (২২)। স্ত্রীর অতৃপ্ত মন স্বামী সান্নিধ্য চেয়েছিলো। তার দুরাকাঙ্ক্ষার শাস্তিস্বরূপ সে হুলক্ হয়ে জন্মালো না। সেই বনেই সে গোধিকা হয়ে জন্মালো (২৩)।

(২০) স্বামীর অভাব ও জীবনধারণে অপারগতার জন্য শোক বিলাপ (অ^{১}) (ব^{৪})

(২১) নায়িকার মৃত্যু (ছ^{২})

(২২) স্ত্রীর অভাব (অ^{১})

(২৩) জন্মান্তর। পত্নীর পূনর্জন্মের ফলে অভাব (পত্নীর) অপসারিত (অঅ^{১})

আজও বৈশাখ মাস এলে খেরেংবার ফুল ফুটলে হুলক্ তার গত জীবনের কথা মনে করে 'হুলক্ হুতে হুলক্ হুতে' বলে গুমড়ে উঠে আর নীচ থেকে মুফুক্ (গোধিকা) লেজ চাপড়াতে থাকে। নরনারীর এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কান্না দেবতাদের মনেও দোলা দিয়েছিলো। আর কোনোদিন যাতে এরকমটা না হয় সেজন্য দেবতারা সেদিন থেকে খেরেংবার ফুলের গন্ধ নিজেদের গায়ে নিয়ে নিলো। তাই আজ আমরা রান্না ফুলের বুকে কোনো গন্ধ খুঁজে পাই না (২৪)।

(২৪) রীতি লঙ্ঘন করার জন্য নেতিবাচক ফল।

এই কাহিনীটির আংকিক রূপটি হবে এইরকম ঃ

(ঙ) ↑ গ^{২} অ^{৬} ঢ^{৭} ঞ^{১} প্ররো জ^{১} ঞ^{১} এ^{৫} অঅ^{৭} ড^{২} রস^{৬} জ^{৩} ব^{৭} ব^{১} গ^{৩} ব^{৪} অ^{১} ছ^{২} অ^{১} অঅ^{১} নেতি।

কাহিনীটির চিত্ররূপ হবে এরকম ঃ

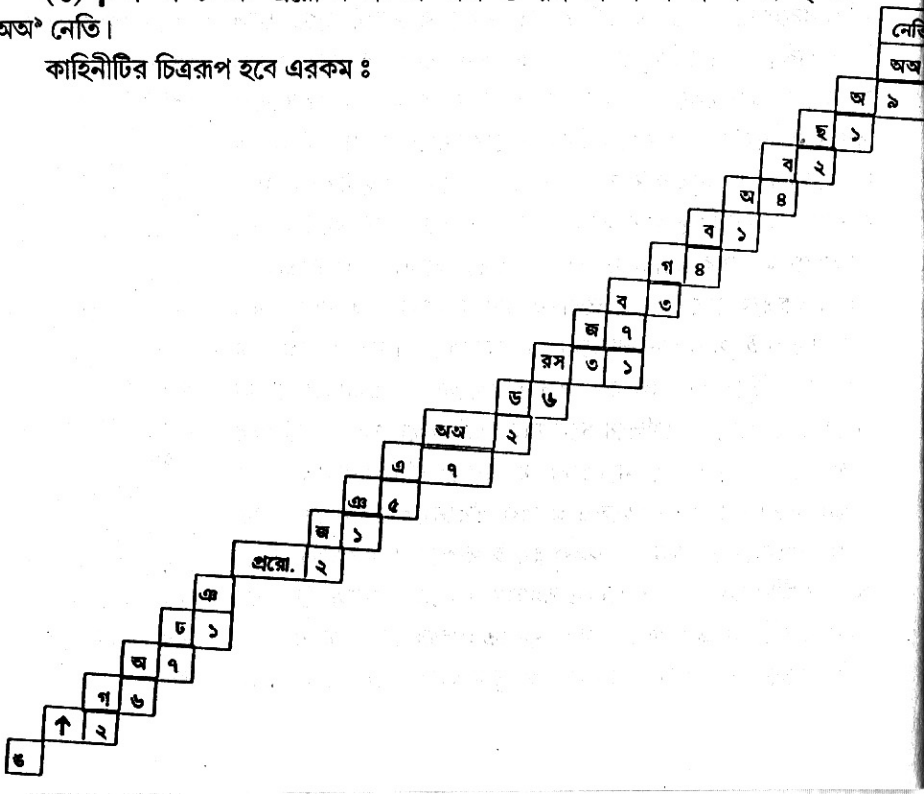

এই কাহিনীটিতেও হ থেকে ই এবং ম থেকে স পর্যন্ত ক্রিয়াশীলতার অভাব রয়েছে।

মোটিফ ঃ এই লোককথাটিতে যেসব অভিপ্রায় প্রকাশিত তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য Taboo বা বিধিনিষেধ। স্বামীর স্ত্রীকে নিষিদ্ধ ফুল পরতে নিষেধ করা এবং স্ত্রীর নিষেধ অমান্য C. 762.1। মাথায় ফুল রেখে রূপান্তর D 596। মানুষের (উল্লুক) হুলক্-এ রূপান্তর D 110। মানবীর গোসাপে রূপান্তর E 600। হুলক্ ও গোসাপে রূপান্তরটি টোটেম বিশ্বাসজাত। রাঙ্গা ফুলের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক শক্তির ইঙ্গিত থাকায় এর মোটিফ D 8980.1।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

এখানে লেভিস্ট্রসের ফর্মূলা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ অর্থাৎ (a) যুবতী স্ত্রী, দ্বিতীয় পক্ষ (b) যুবক।

(a) - অবিবেচনাপ্রসূত কাজে যুবককে প্ররোচিত করে।

(b) - যুবক ফুল পাড়তে বাধ্য হয়।

ক্রিয়াশীলতা

X - যুবক হুলক্ হয়ে যায়।

Y - স্ত্রী প্ররোচনামূলক কাজের শাস্তি পায়।

এলিমারাণ্ডাকৃত সূত্রটিও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আ.স - স্ত্রী যুবককে প্ররোচনা দেয়।

আ.ফ - যুবক প্ররোচিত হয়ে ফুল পাড়ে।

শে.স - যুবক হুলক্ হয়ে যায়।

শে.ফ - স্ত্রী শাস্তি পায়। গোধিকারূপে জন্মগ্রহণ করে।

কাহিনী ঃ চৌদ্দ

সজারুর বুদ্ধি

"সজারুর বুদ্ধি" কাহিনীটি পশুকথার অন্তর্ভুক্ত। টাইপ ৫। 'আমার শরীরের এই লোমখানা মেপে দেখ তাহলেই বুঝবি' প্রতারণা মূলক।

এই কাহিনীটি সহজ একগতিপ্রবাহ সম্পন্ন। হাতি জল খেতে গিয়ে নোংরা জল দেখে জল ঘোলাকারীকে খোঁজার জন্য এগোয়। সজারুকে দেখে। কে বড় এই প্রতিযোগিতায় বুদ্ধির সাহায্যে সজারু জয়লাভ করে। হাতি লেজ তুলে পলায়ন করে।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

খুব বড় একটা দাঁতাল হাতি। একদিন জল খেতে গিয়ে দেখলো জলটা খুব ঘোলা বিচ্ছিরি। তা দেখে হাতি ভাবলো নদীর ওপারে কেউ স্নান করছে হয়তো, তাই জল এতো নোংরা। (১) মানুষ কি এতো নোংরা জল খেতে পারে? তাই খুব রেগে গিয়ে ওপারের দিকে

(১) জোরালো প্রাথমিক অবস্থা (σ^1)

রওয়ানা হলো হেলেদুলে (২), জল ঘোলাকারীকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে (৩)। গিয়ে দেখলো একটা ছোট্ট সজারু স্নান সেরে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। দূর থেকে হাতি সজারুর সম্বন্ধে ততোটা আন্দাজ করতে পারে নি। তবু সে ওকে দেখেই প্রচণ্ড রেগে ওকে জিজ্ঞেস করলো, "তুই কি আমার খাবার জল ঘোলা করেছিস্" (৪)? এদিকে সজারু শরীরের প্রায় সবটাই গর্তে ঢুকিয়েছিলো। খানিকটা মুখ বের করে দাঁত দেখিয়ে সে খেঁকিয়ে উঠলো — 'কি, কি বলছিল্ তুই"? "এ পাহাড়ের সব্বাই আমাকে ভয় করে, আর তুই কোথাকার কে এমন, আমার খাবার জল ঘুলিয়ে দেবার সাহস হ'ল"? — রেগে গিয়ে বললো হাতি (৫)। এতে সজারু ততোধিক রেগে গিয়ে বললো, "আমি হলাম এ রাজ্যের রাজা, তোর জল খাবার জায়গাটা তাও আমার রাজ্যের ভেতরই। আর তুই কিনা চোখ রাঙিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে এলি? যা এক্ষুণি দূর হয়ে যা, নইলে এক্ষুণি মাটিতে পুঁতে ফেলবো দেখিস্ (৬)। হাতি শুঁড় তুলে বিশাল দেহ নাড়িয়ে শক্তি প্রদর্শন করতে চাইলো। মেঘের মতো গর্জন করে উঠলো। বললো, "খুব তো বড়াই করছিস্। তোর শরীরটা যদি আমার একখানা পায়ের মতোও হ'তো। তখন সজারু বললো, "আরে তুই কি আমাকে এতোটুকুন ভাবছিস্ নাকি? মনে রাখিস তোর মতো তিন চারটে জানোয়ার আমার সকাল বেলার জল খাবার খেতেই লেগে যায়?" এবার হাতি ভড়কে গিয়ে ভাবলো, সত্যিই তো, ও আবার কেমন লোক। ও আগে কখনো সজারু দেখেনি। আজই প্রথম। তাও যখন গর্তে ঢোকে সজারু। তখন লেজের কিছুটা অংশ এবং পরে মুখের খানিকটা। খুব বড় কিছু একটা কিনা কে জানে। তাই বলে তো ভয় পাওয়া চলবে না, ভেবে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'তা হ'লে বেরিয়ে আয়, তুই কত বড় মানুষ খেকো পরখ করে দেখি। সজারু তখন গর্ত থেকে না বেরিয়েই শরীর থেকে একটা কাঁটা তুলে হাতির সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, তা আমার শরীরের এই লোমখানা মেপে দেখ, তাহলেই বুঝবি' (৭)। কাঁটা দেখে হাতি মহাভাবনায় পড়লো। এ যে আস্ত একটা লোহার কাঁটা। মানুষের লোম কি এতো শক্ত (৮)? জীবনে অনেক মানুষের দেখা পেয়েছি। কিন্তু এমন সূঁচের মতো লোমওয়ালা মানুষের দেখা তো পাইনি। ওর সাথে কুস্তিতে পেরে উঠবোনা মনে হচ্ছে (৯)। ভয়ে শিউরে উঠলো হাতি। লেজ আকাশে তুলে, যেদিকে দু'চোখ যায়,

(২) হাতী সজারুকে হাতে পাবার জন্যে রওয়ানা হয় (আ[৩])

(৩) অনুসরণকারীর নায়ককে হত্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ (পর[১])

(৪) হাতী (খল) নায়ক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হয় (ফ[১])

(৫) সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে খলের পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ[১])

(৬) প্রতিরোধমূলক কাজের সূত্রপাত (চ)

(৭) মাপের প্রতিযোগিতা (হ[৪])

(৮) মাপের প্রতিযোগিতায় প্রত্যক্ষভাবেই নায়কের জয় (হ[৪])

(৯) জীবন বিপন্ন মনে হ'লে হাতী (খল) নিজেকে রক্ষা করে (রস[১])

প্রচণ্ড দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলো (১০)। এদিকে তখন সজারুর হাসি কে দেখে। শরীরে বড় হলে কি হ'বে, কখনো কখনো হাতি, ওর চেয়ে ছোট কারু কাছে হেরে যেতে পারে (১১)।

(১০) বুদ্ধির সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি পরাভূত হ'ল (এ^{৯})

(১১) খলের সরাসরি নির্বাসন (ই^{৬})

কহিনীটির আংকিক রূপ ঃ

(ঙ^{১}) আ^{৯} পর^{২} ফ^{১} ঐ^{২} চ হ^{৪} ই^{৪} রস^{৯} ঐ^{৯} ই^{৬}

চিত্ররূপটি দাঁড়াবে এরকম ঃ

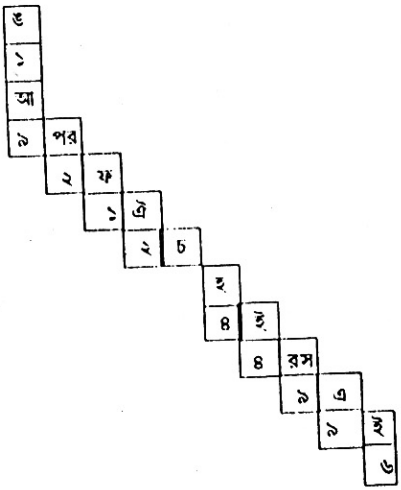

এই কাহিনীটিতে হ থেকে ই পর্যন্ত ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এই ক্রিয়াশীলতাটি এখানে এসেছে হাতি ও সজারুর আয়তন বা মাপের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। সজারু ক্ষুদ্র প্রাণী হয়েও বুদ্ধির সাহায্যে জয়ী হয়।

মোটিফ ঃ

এই কাহিনীতে হাতি ও সজারু পশু হয়েও মানুষেরই মতো আচরণ করে এবং কথা বলে, যা নাকি লোককাহিনীরই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দু'টো পশুর কথোপকথন ও অনুভুতিকে ঘিরে কাহিনীর কাঠামো গঠিত হলেও, তা মনুষ্যসমাজেরই একটি বিশেষ ভাবনার দ্যোতক। সমাজে যে দুর্বল, সেই হয় অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও প্রতি পদক্ষেপে সবলের অত্যাচারে জর্জরিত। আর, সবলের দম্ভ সেখানে সর্বদাই উচ্চরবে বিঘোষিত। সবল চিরকালই আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে দুর্বলের অধিকারকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। হাতি বনের

রাজা না হলেও শক্তিমত্তায় এবং দৈহিক আয়তনের দিক থেকে সমগোত্রীয়। এখানে তাঁকে রাজশক্তির প্রতীক হিসেবেই ধরা যায়। অন্যদিকে সজারু দৈহিক আয়তনে হাতির তুলনায় নগণ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি প্রাণীই প্রতিমুহূর্তে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ। কখনো সে সংগ্রাম প্রত্যক্ষ, কখনো বা পরোক্ষে। সবল যতো বেশী তার দম্ভকে উচ্চকোটীতে নিয়ে যায় ও দুর্বলের প্রতি তার অন্যায় আচরণের ভার বৃদ্ধি করে, দুর্বল ততোই আপন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে দৃঢ়মুষ্টি হয়। শারীরিক শক্তি প্রয়োগে ব্যর্থ হলেও বুদ্ধিকে কার্যসিদ্ধির সহায়ক রূপে নিয়োজিত করে। যার ফলে অতিবড় পরাক্রমশালীও অতিক্ষুদ্র কারু কাছে পরাজিত হয়ে যায়। ক্ষুদ্রের এই জয়, অত্যাচারিতের এই জয় পরম মহান। এই কাহিনীটিতেও আমরা এই মহত্ত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। লোককথায় এটি একটি সাধারণ অভিপ্রায়।

হাতি কর্তৃক সজারুকে মিথ্যা দোষারূপ মোটিফ K 2100। সজারুর কাঁটা ছুঁড়ে প্রতারণা করা KO. সবলের সঙ্গে (হাতি) যুদ্ধে জয় (সজারু) L 310.

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

লেভিষ্ট্রসের পদ্ধতি অনুসারে এই কাহিনীটির পক্ষ ও কার্যকারিতাকে এভাবে দাঁড় করানো যায়।

পক্ষ ঃ a - হাতি (সবলের অথবা রাজশক্তির প্রতীক)

b - সজারু (দুর্বল অথবা শোষিতের প্রতীক)

ক্রিয়াশীলতা (f) :

X - শায়েস্তা করার চেষ্টা

Y - শায়েস্তা হয়।

আঙ্কিক ফর্মূলায় কাহিনীটি এভাবে দেখানো যেতে পারে ঃ

$fx(a) : fy(b) : fx(b) : fa^{-1}(y)$

ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় ঃ হাতির প্রতারণার ফলে [fx(a)], সজারু প্রতারিত হয় [fy(b)] এবং পরে সজারুর প্রতারণায় [fx(b)] হাতি প্রতারিত হয় [(fa=1(y)]

এলি মারাণ্ডার কার্যকারণ ফলশ্রুতি সূত্রটি এখানেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আ.স - হাতি প্রতারণা করে।

আ.ফ- সজারু প্রতারিত হয়। ভীত হয়।

শে.স - সজারু হাতিকে ভয় দেখায়।

শে.ফ - হাতি নির্বাসিত হয়।

কাহিনী ঃ পনেরো

একটি মাছির গল্প

"একটি মাছির গল্প" লোককথাটি হাসি ও পারিবারিক কাহিনী শ্রেণীর অন্তর্গত সূত্রমূলক কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। টাইপ - ২০০০ - ২৩৯৯।

দুই গতিপ্রবাহ সম্পন্ন একক কাহিনী এটি। প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ জুম ক্ষেতে মাছি পায় এক যুবক। মাছির সাহায্যে বিয়ে করতে না পারলে সে বাড়ী ফিরবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে গৃহত্যাগ করে।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ কয়েকদিন পর সে এক গেরস্তের ঘরে আশ্রয় নেয়। মাছি গেরস্তের মেয়ের ভুলে উড়ে যায়। ছেলেটি পরিবর্তে 'চুউান' পায়। সেখান থেকে অন্য গেরস্তের ঘরে আশ্রয় নিলে গেরস্তের মেয়ের ভুলে 'চুউান' নষ্ট হয়। এবার ফেরৎ পায় মোরগ। পথ চলতে চলতে অন্য গেরস্ত বাড়ীতে গেলে সেখানে তারা মোরগটিকে ভুলে খেয়ে ফেলে। পরিবর্তে সে পায় ছাগল। এমনি করে ছাগলের বদলে গরু এবং গরুর বদলে বৌ পেলো। অনেকদিন পর যুবক বৌ আর ছেলে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে এভাবে বিভক্ত করা চলে।

কাজের মরশুম, গাঁয়ের যুবক-যুবতী আর বিবাহিত মেয়েরা কাজ করছে দূর পাহাড়ের জুমে (১)। ওদের মাঝে এক যুবক একটি মাছি ধরে বলছে, " দেখ, দেখ আমি একটি তা বড় মাছি ধরেছি। কি সুন্দর পোঁ পোঁ করে ডাকছে (২)। কাজে মনোযোগ নেই দেখে ওর বৌদি ওকে ডেকে বলে, 'কাজ না করে মাছিই ধরছো দেখি, তা দিয়ে বিয়ে করতে পারবে কি?' যুবক বললো, "পারবোনা কেন, আমার ভাগ্যে যাকে পাবার তাকে পাবোই। কোথায় যাবে সে? বৌদি বললো, " বেশ তাহলে এই মাছিটা দিয়েই বিয়ে কর দেখি, কাজ করার দরকার নেই" (৩)। যুবকও বললো, "সত্যি বলছি, আমি এ মাছিটা দিয়ে বিয়ে করতে না পারি তো আর ঘরে ফিরবোনা। যুবক মাছি হাতে নিয়েই কাজ ছেড়ে চলে এলো (৪)। বাড়ী ফিরে কাপড় চোপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো দূর গাঁয়ের পথে (৫)। মেয়ের খোঁজে (৬)। মাছিটা কিন্তু হাতের মুঠোয়ই রয়ে গেলে। তখনকার দিনে গাঁগুলো ছিল খুব দূরে দূরে। এক গাঁ থেকে ভিন্ গায়ে যেতে হ'লে বেশ সময় লাগতো।

(১) প্রাথমিক অবস্থা (ঙ)
(২) চিহ্নিত করণ মাছিলাভ ($য^২$)

(৩) বৌদি যুবককে কঠিন কাজে রত হবার প্ররোচনা দেয়। ($ম^৫$)
(৪) যুবক জুম থেকে চলে যায় গৃহে। প্রত্যাবর্তন (↓)
(৫) নায়কের দূর গাঁয়ের পথে যাত্রা। গৃহত্যাগ।(↑)
(৬) অভাব, স্ত্রীর ($অ^১$)
(৭) যুবক স্থলপথে যায় ($গ^১$)

গাঁওলোতেও লোক ছিল কম। যা হোক যুবক চলতে চলতে কোনও এক গাঁয়ে এসে পৌঁছুলো (৭)। বেলা যায় যায়। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে। রাত কাটাবার জন্য এক গেরস্তের ঘরে উঠে সে বললো, ''জ্যাঠা, আজ আমি এখানে ঘুমোবো। বেলা গেছে আজ আর পথ চলতে পারবো না'' (৮)। গেরস্ত উত্তরে বললো, ''ঘুমোতে চাও তো ঘুমোও'' (৯)। একটা হাঁড়িতে মাছিটিকে রেখে দিলো যুবক। পরদিন খুব ভোরে রান্নার জন্য 'সরক' (মাটির তৈরী ঢাকনা) খুলতেই মাছিটি ভোঁ করে উড়ে গেল (১০)। চলে যাবার সময় যুবক মাছিটি পেলো না। জ্যাঠা তখন তাঁকে মাছির বদলে একটা 'চুউান' (মদ বানানোর জন্য যে পিঠে তৈরী হয়) দিলো (১১)। যুবক মাছির বদলে (চুউান' নিয়ে পথ চলতে লাগলো (১২)। যেতে যেতে সন্ধ্যে নাগাদ সে আর এক গাঁয়ে এসে পৌঁছলো। এক গেরস্তকে সে বললো, ''জ্যাঠা আজ আমি তোমার ঘরেই থাকবো, আমার এ 'চুউান'টা কোথায় রাখবো?'' গেরস্তের কথামতো চুউানটা সে পিঠের চালনিতে রেখে দিলো (১৩)। সেদিন রাতে গেরস্তের মেয়ে ভুল করে তার চুউানটা পিষে ফেললো। পরদিন যখন যুবক তার জিনিষ ফেরৎ চাইলো, গেরস্ত বললো হয়তো তোমার ছোট বোন তা পিষে ফেলেছে। তা এর বদলে একটা মোরগ নিয়ে যাও বাবা (১৪)। কি ভুলই না হয়ে গেল। যুবক তাতেই রাজী হল। মোরগ নিয়ে পথ চলতে চলতে (১৫) সন্ধ্যা হলে সে এক বাড়ীতে আশ্রয় নিলো রাত কাটাবার জন্য (১৫ক)। ওদের মোরগ রাখার ঘরে নিজের মোরগটাকে পুরে রাখলো। রাতে বাড়ীর মালিক একটা মোরগ কেটে অতিথিকে খাওয়ালো, নিজেরাও খেলো। পরদিন যাবার সময় সে মোরগ ফেরৎ চাইলে গেরস্ত খুঁজে পেতে না পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসল। বললো, তাহলে তো গেল রাতে তোমার মোরগটাই কাটা গেছে। তুমি না হয় মোরগের বদলে ছাগলটাই নিয়ে যাও (১৬)। যুবক তাতেই রাজী হ'ল। যুবক ছাগল নিয়ে চলতে লাগলো (১৭)। ছাগল নিয়ে পথ চলতে চলতে রাত হয়ে এলে এক গেরস্তের ঘরে আশ্রয় নিলো (১৮) এবং তাদের ছাগল রাখার ঘরে তার নিজের ছাগলটিকে রাখলো। সেদিন রাতে গেরস্ত ছাগল কেটে অতিথিকে ভোজ দিল।

(৮) আশ্রয়ের জন্য অনুরোধ (ঢ[১])

(৯) সহানুভূতিময় সহায়কের সাক্ষাৎ (ভ[৬])

(১০) আশ্রয়দাতার বাড়ীর বালিকার অসাবধানতায় প্ররোচনামূলক উপাদান মাছির উড়ে যাওয়া (অ[৫])

(১১) প্ররোচনামূলক উপাদানের পরিবর্তন ঃ মাছির পরিবর্তে 'চুউান' লাভ। (এ[১০])

(১২) যুবকের পুনর্বার যাত্রা (গ[২]) স্থলপথে।

(১৩) পুনরায় আশ্রয় লাভ। (অঅ)

(১৪) প্ররোচনামূলক উপাদানের আবার পরিবর্তন।

(১৫) স্থানান্তরে যাত্রা, পুনর্বার (গ[২]) বিনিময়ে সম্মতি (এ[১০])

(১৫ক) আশ্রয়লাভ (অঅ)

(১৬) পুনর্বার উপাদানের পরিবর্তন।

(১৭) বিনিময় (এ[১০]) ও সহায়ক উপাদান নিয়ে যুবকের যাত্রা (গ[২])

(১৮) আশ্রয়লাভ (অঅ)

এমনি কাণ্ড যে ছাগল কেটে অতিথিকে ভোজ দিল সেটা ছিল যুবকেরই। পরদিন ভোরবেলা যাওয়ার সময় যুবক তার ছাগলটি নিয়ে যেতে চাইলে গেরস্ত ছাগল নেই দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো, "তাহলে তো ভুলে রাতে তোমার ছাগলটাকেই কাটা হয়েছে। কি আর করা যায়। ছাগলের বদলে তুমি না হয় একটা গরু নিয়ে যাও।"

যুবক গরু নিয়ে পথ চলতে চলতে (১৯) বেলাশেষে আর এক গাঁয়ে উঠলো। এভাবে দিন যায়। রাত আসে। এমনি দিনে যুবক এক বাড়ীতে উঠে গেরস্তের কাছে রাতের জন্য আশ্রয় চাইলো এবং তার গরুটাকে গেরস্তের গোয়ালঘরে রেখে দিল (২০)। পরদিন ভোরবেলা গেরস্ত অন্যদিনের মতো গোয়ালঘরের দরজা খুলে দিতেই অন্য দিনের মতো গরুগুলো সব পাহাড়ে চড়তে গেল। যাবার সময় যুবক গরু ফেরৎ চাইলে গেরস্ত সব খুঁজে গরু না পেয়ে বললো "আমি তো তোমার গরু ছেড়ে দিয়েছি" (২১)। যুবক বললো, "তা হ'লে এখন আমি কি করবো জ্যাঠা?" গেরস্ত তাকে কোথা থেকে এনেছো, কেন এনেছো ইত্যাদি হরেক রকম কথা জিজ্ঞেস করলো। যুবকও বাধ্য হয়ে সব কথা বললো— একটি মাছি থেকে বিয়ে করতে চাওয়ার অদ্যন্ত ঘটনা।

(১৯) সহায়ক উপাদানের পরিবর্তন (এ^{১০}) পুনর্বার যাত্রা স্থলপথে (গ^{২})
(১৯ক) আশ্রয়ের জন্য অনুরোধ (ঢ^{১})
(২০) গেরস্তের ঘরে পুনর্বার আশ্রয়লাভ (অঅ)
(২১) সহায়ক উপাদানের অভাব (অ^{৫})

গেরস্তের এক যুবতী কন্যা ছিল। গেরস্ত তাকে জামাই হয়ে থেকে যাবার প্রস্তাব দিল। সেও রাজী হ'ল। সে বছর সে ওখানেই ঘর সংসার বেঁধে রইলো (২২)। বছর ঘুরতে একটি ছেলে হ'ল। সেই যে কবে ঘর ছেড়ে এসেছে আর বাড়ী ছেড়ে যায় নি। এবার তার নিজের জায়গায় বৌ ছেলেকে নিয়ে ফিরে এলো (২৩)। এসেই ছেলে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে গান গাইতে লাগলো। গান শুনে সত্য মিথ্যা পরখ করার জন্য গাঁয়ের যুবতী মেয়েরা সবাই দেখতে এলো।

আগেকার দিনে এমনি করেও পাহাড়ে বিয়ে হ'তে পারতো।

(২২) গেরস্ত গরুর বদলে বৌ দেয় (এ^{১০}) অভাব অপসারিত (অঅ^{১})
(২৩) যুবক বৌ ও ছেলে সহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে (স)(↓)

এই কাহিনীটির আংকিক রূপটি হ'বে এইরকম ঃ

(ঙ) য^{২} ম^{৫} ↓ ↑ অ^{১} গ^{২} ঢ^{৭} ভ^{৬} অ^{৫} এ^{১০} গ^{২} অঅ এ^{১০} গ^{২} অঅ এ^{১০} গ^{২} ঢ^{৭} অঅ অ^{৬} এ^{১০} অঅ^{১} স↓

চিত্ররূপ সাজালে এরকম দাঁড়াবে ঃ

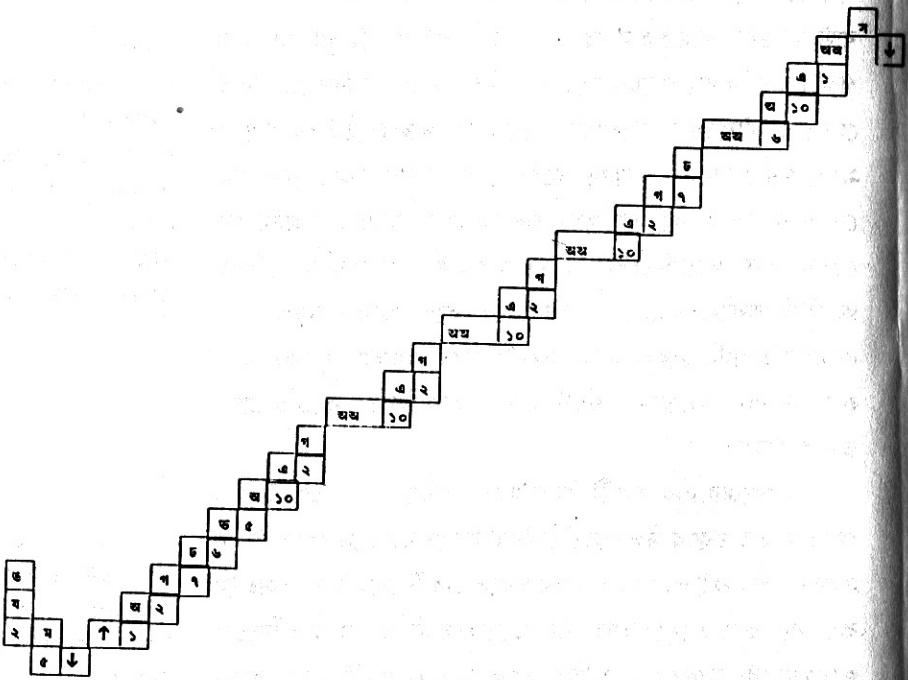

'মাছির বদলে বৌ আনার' প্ররোচনা দিয়ে বৌদি যুবকটিকে কঠিন কাজে (ম-শীর্ষক ক্রিয়াশীলতা) প্রবৃত্ত করে এবং স্থানান্তরে গিয়ে বিনিময়ের মাধ্যমে ছেলেটি মাছির বদলে বৌ পায় এবং এভাবে কঠিন কাজ সম্পন্ন করে। ফলে এই কাহিনীটিতে ম থেকে স পর্যন্ত ক্রিয়াশীলতা পাওয়া যাচ্ছে বলে এই কাহিনীটিকে 'কঠিন কাজ সমাপন' শ্রেণীভুক্তও করা বলে।

মোটিফ ঃ এই লোককথাটি সুযোগ ও ভাগ্য অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। ভাগ্যবান বিজয়ী কনিষ্ঠ সন্তান মোটিফ L-10 । বিয়ের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরীদের মধ্যে "জামাইখাটা" নামক একটিপ্রচলিত রীতি রয়েছে। তারই প্রতিফলন রয়েছে গল্পের শেষদিকে। এটি H-motif এর (পরীক্ষা) অন্তর্গত। এই কাহিনীর মূল মোটিফ Z. Chain motif. আশ্রিতকে রক্ষা করা আদিবাসীদের কাছে ধর্মীয় কর্তব্যরূপে গণ্য করা হয়।

কাহিনীটিতে যুবকটির বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে রাত্রিবাসের অনুরোধ ও আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে একটি সুসংহত সমাজভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বারবার আশ্রিতের গচ্ছিত বস্তু হয় অপহৃত হচ্ছে নয় কোনোনা কোনো ভাবে নষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এর বিনিময়ে প্রতিক্ষেত্রেই সে অন্য কোনো উপকারী বস্তু ফেরৎ পাচ্ছে আশ্রয়দাতার কাছ থেকে। এখানে সামাজিক রীতিবিধান মানার গুরুত্বটুকু উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ছেলেটি যেভাবে একটি মাছির সাহায্যে বিয়ে করতে সক্ষম হলো-গল্পের শেষে এমন একটি তৎকালীন সামাজিক প্রথারও সূত্র দেয়া আছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই কাহিনীটিতে একটু কিংবদন্তীর ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

এখানে প্রথম পক্ষ (a) বৌদি। প্ররোচনা দেয় যুবককে মাছির সাহায্যে বিয়ে করার জন্য। fx ক্রিয়াশীলতাটি (a) র সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। (b) যুবকটি প্ররোচিত হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ (b) যুক্ত fy ক্রিয়াশীলতাার সঙ্গে, fx (b) অর্থাৎ সে 'মাছির বদলে স্ত্রীর' সন্ধানে বহির্গত হয় ও অবশেষে কঠিন কাজটি সম্পন্ন করে ও বিজয়ী হয় $fa^{-1}(y)$ র দ্বারা

কাহিনী ঃ ষোল

সব কালাদের এক ঘর

"সব কালাদের এক ঘর" নামক এই কাহিনীটিকে হাসি ও পারিবারিক কাহিনী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সূত্রমূলক কাহিনীর অর্ন্তগত। করা চলে। টাইপ ২০০০-২৩৯৯।

এটি কাঠামোগত দিক থেকে একক গতিপ্রবাহ সম্পন্ন কাহিনী। একটি মেয়ে জুমে কাজ করছিলো। রাজার লোকেরা অন্য গ্রামের পথ নির্দেশ চাইলে বধিরতার জন্য মেয়েটি অন্য তথ্য অর্পণ করে। বাড়ী ফিরে মাকে একথা জানালে মা-ও বধিরতার জন্যে অন্য কথা বোঝে ও তা বাবাকে বলে। বাবাও বধির। সেও অন্য কথা বুঝে নেয়। অবশেষে মা-বাবা-মেয়ে পরস্পর কিছু না বুঝে প্রচণ্ড ঝগড়া করতে থাকে। পড়শীরা এসে প্রকৃত তথ্য জেনে সব মিটমাট করে দেয়।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা চলে।

রাজার লোকেরা কোনো একগাঁয়ে যাচ্ছিল। বনের ভেতর দিয়ে পথ। যেতে যেতে পথ হারিয়ে কোনো এক জুমজাযীর জুমে গিয়ে (১) প্রাথমিক অবস্থা (δ)

উঠলো (১)। সেখান একটি মেয়ে কাজ করছিলো। রাজার লোকেরা ওকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, বলতো দিদি, ওই গাঁয়ে (কোনো এক গাঁয়ের নাম বললো) কোন পথে যাবো (২)? সেই মেয়েটি ছিল কালা (৩)। কানে শুনতে পেত না। সে ভাবলো, ওদের জুমের সীমা কতটুকু রাজার লোকেরা তা-ই জানতে চেয়েছে। তাই ও বললো, "এ জুমটা আমাদের, ওই জুমটা দিদিদের (৪)। রাজার লোকেরা কিছুই না বুঝে অন্য একটা পথ ধরে এগিয়ে চললো (৫)। রাজার লোকেরা চলে যাবার পরই মেয়েটি দৌড়ে বাড়ী এলো (৬)। বাড়ীর লোকদের এক্ষুণি খবরটা দিতে হ'বে। ছেলেবেলা থেকে মেয়েটি কোনওদিন রাজার লোকদের সঙ্গে কথা বলে নি। ঘরে এসেই সে মাকে বললো, "মা আজ আমি রাজার লোকদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা আমাদের জুমের সীমা কতদূর অব্দি জিজ্ঞাসা করতেই আমি আমাদের ও দিদিদের জুমের সীমা দেখিয়ে দিয়েছি (৭)।

তার মা-ও ছিলো বধির (৮)। সে-ও ভাবলো মেয়ে বুঝি বলছে যে ওরা পড়শীর মুরগী চুরি করে খেয়ে ফেলেছে। অন্যের জিনিষ ধরলো না, ছুঁলনা আর ওরা বুঝি চোর। দাওয়ায় বসে বুড়োস্বামী বৌয়ের জন্য একটা লাঙ্গা (খাচি) বান,ছিল। বৌ ওখানে গিয়ে বললো, "ওগো শুনছো, আমরা নাকি পড়শীর মুরগী চুরি করে খেয়েছি। মাতিং কোত্থেকে শুনে এসে বললো (৯)।

স্বামী বেচারাও ছিল বধির (১০)। সে ভাবলো স্ত্রী বুঝি বললো, অন্য মেয়ের সাথে তার ভাব রয়েছে। বৌকে দেবার জন্যই নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দাওয়ায় বসে এতো সুন্দর লাঙ্গা বানাচ্ছে। যেই এই কথা মনে আসা অমনি বুড়ো রাগে ফুঁসতে লাগলো। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে। রেগে সে দায়ের এককোপেই লাঙ্গাটা দু'টুকরো করে ফেললো (১১)।

কেউ কারো কথা বুঝতে না পেরে সবাই যে যার মতো বকছে, ঝগড়া করছে। কে কার কথা শুনবে. ওদের ঝগড়া শুনে পড়শীরা এসে দাওয়ায় জড়ো হল। সত্যিই তো আজ কি হল? কি নিয়ে ওদের এত চেঁচামেচি? ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কি নিয়ে এতো ঝগড়া করছো (১২)?

মেয়ে প্রকৃত ঘটনা বললো। এবার পড়শীরা মাকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা মাতিং এসে তোমাকে কি বলেছে বলতো?"। মা

(২) রাজার লোকেরা অন্য গ্রামের সন্ধান চায় (ঐ[৪])

(৩) মেয়েটি বধির শ্রবণশক্তির অভাব (অ[৫])

(৪) নির্দেশ (এ[২])

(৫) রাজার লোকদের স্থানগত পরিবর্তন (গ[২])

(৬) মেয়েটির গৃহে প্রত্যাবর্তন (↓)

(৭) মেয়ে মায়ের কাছে মনগড়া তথ্য সরবরাহ করে (ফ. নেতি)

(৮) মা-ও বধির। শ্রবণশক্তির অভাব (অ[৫])

(৯) মা বাবাকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে (ফ.নেতি)

(১০) স্বামীও বধির (অ[৫]) শ্রবণশক্তির অভাব।

(১১) বাবা প্রতিশোধ মূলক আচরণ করে (চ)

(১২) সহায়ক পড়শীরা ঝগড়ার কারণ জানতে চায় (ঐ[৪])

বললো, "মাতিং এসে বলেছে আমরা নাকি পড়শীর মুরগী চুরি করে খেয়েছি। ঘরের মানুষকে তাই শোনাতে গিয়েছিলাম। সে কিনা লাঙ্গাটা দুটুকরো করে ফেললো।

এবার পড়শীরা বুড়োকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, বাবু, তুমি এতো রেগে গেলে কেন বলতো?" বুড়ো বললো, "নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে তাঁকে দেবার জন্যে আমি লাঙ্গা বানাচ্ছিলাম আর সে-ই বলে কিনা অন্য কারো সঙ্গে আমার ভাব রয়েছে। তোমরাই বল, এসব শুনে কারো রাগ না হয়ে পারে?"

কেউ কারো কথা শুনতে পায়নি বলেই ঘোঁট পেকেছে এমন ভেবে পড়শীরা খুব একচোট হেসে মা-বাবা মেয়ের ঝগড়া মিটিয়ে দিল (১৩)।

(১৩) বিবাদকারীদের বিবাদ মিটিয়ে দেয় পড়শীরা (এ.ইতি)

সমগ্র কাহিনীটির আংকিক রূপটি হবে এইরকম। (ঙ) ঐ[৪] অ[৫] এও[২] গ[২] ↓ ফ. নেতি. অ[৫] ফ. নেতি অ[৫] চ ঐ[৪] এ. ইতি।

চিত্ররূপ ঃ

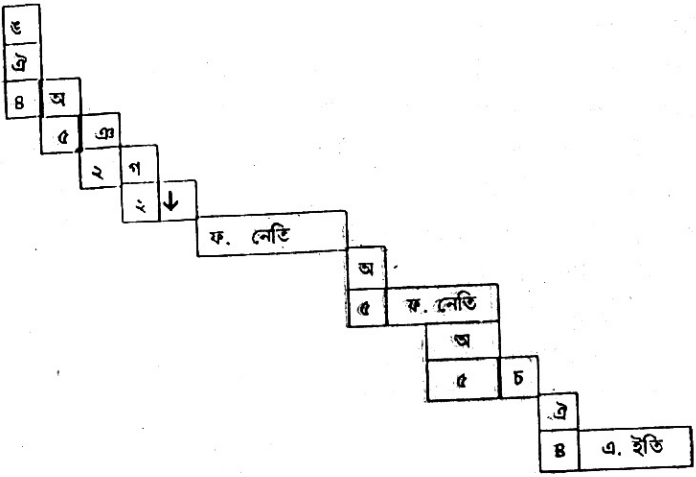

কাহিনীটিতে ম থেকে স পর্যন্ত অথবা হ থেকে ই পর্যন্ত ক্রিয়াশীলতা পাওয়া যাচ্ছেনা বলে ম স, হ ই বিবর্জিত গঠনভুক্ত শ্রেণী বলেই ধরা যায়।

মোটিফ ঃ কাহিনীটির মূল অভিপ্রায় হচ্ছে বধিরতার জন্যে এক পরিবারের মধ্যে সকলের বুদ্ধিবিভ্রম। বধিরতা এক সামাজিক অভিশাপ।

বধির ব্যক্তি ও তাঁদের উত্তর X III একে অন্যকে মিথ্যে দোষারোপ K 2100 শারীরিক দিক থেকে অক্ষম মানুষদের নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করার একটি অভিপ্রায় লোকমানসে লক্ষ্য করা যায়। তা থেকেই লোককথাটির সৃষ্টি বলে মনে হয়।

কাহিনীটিকে প্রকৃতিগতভাবে বধির অসহায় মানুষের সীমাবদ্ধতাকে দূরীভূত করতে সহায়কের প্রয়োজন হয়েছে। পড়শীদের দ্বারা সমস্ত তথ্য অনুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ করে বিবদমান প্রতিবেশীদের মাঝে সুন্দর, সুস্থ সম্পর্কের সৃষ্টি করার বিবরণের মাধ্যমে একটি সুন্দর সামাজিক সম্পর্ক ও অবস্থানের আভাস। প্রতিবেশীসুলভ মৈত্রীর দ্বারা একটি জোটবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থারও একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক।

অন্যদিকে কাহিনীর গঠন বা কাঠামোর দিক থেকে দেখলে এর মাঝে কিছু অবাস্তবতা ও অযৌক্তিকতা দেখা যায়। যেমন বধির ব্যক্তির সাধারণতঃ বাক্-ক্ষমতা থাকার কথা নয়। থাকেও না অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে উল্টো ব্যাপার। একই পরিবারে সকলেই বধির, অথচ সকলেই কথা বলতে সক্ষম। লোককাহিনীতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, এই নিয়ম মেনেই কাহিনীর সম্ভাব্যতা তাই আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

এখানে fx(a) অর্থাৎ প্রথম পক্ষ রাজার লোকদের প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়ের অবতারণা ঘটে। fy(b) দ্বিতীয় পক্ষ মেয়েটি ভুল বোঝে এবং সেখানে কাহিনী ভুল বোঝার উপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলে। fx(b) সহায়ক শক্তি সমূহ মেয়েটির পক্ষে আসে। অবশেষে সমস্ত বিবাদের মীমাংসা হিসেবে $fa^{-1}(y)$ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এলি মারাণ্ডাকৃত সূত্রটিকেও এভাবে দেখা যেতে পারে।

আ.স - রাজার লোক প্রশ্ন করে।

আ.ফ - মেয়েটি ভুল বোঝে।

শে.স - পরিবারের সকলে ঝগড়া করে।

শে.ফ - সহায়ক শক্তি বিবাদ মিটিয়ে দেয়।

কাহিনী ঃ সতেরো

প্রতিজ্ঞা ঃ

"প্রতিজ্ঞা" লোককথাটিকে সাধারণ লোককথা শ্রেণীর অন্তর্গত ঐন্দ্রজালিক কাহিনী, টাইপ ৩০০-৭৪৯ শ্রেণীভুক্ত করা চলে। একাধিক গতিপ্রবাহ সমন্বিত একক কাহিনী এটি।

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ গেরস্ত বৌ ও গাইমার যথাক্রমে মেয়ে ও ছেলে জন্মালো। দুজনে খুব বন্ধু। গেরস্ত বৌয়ের মেয়ে আত্মহত্যা করে দেখে গরুমার ছেলেও (গরু) দুটো গাছের ডালে গলা আটকে মারা যায়।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ রাজার বাড়ীতে মেয়েটি রাজকন্যারূপে ও গরুটি শ্বেতহস্তীরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। আবার বন্ধুত্ব হয়। একদিন শ্বেতহস্তী মেয়েটিকে নিয়ে পলায়ন করে।

তৃতীয় গতিপ্রবাহ ঃ রাজকুমারীর সন্ধানদাতার জন্য পুরষ্কার ঘোষণা। দু'ভাই সন্ধানে বেরোয়। শ্বেতহস্তীকে হত্যা করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। আবার রাক্ষসীর সঙ্গে যুদ্ধ হয় বড় ভাইয়ের — রাক্ষসী ব্রাহ্মণের মেয়ে ও রাজকুমারীকে নিয়ে পালায়। দু'ভাই আবার উদ্ধার করে তাদের। বড় ভাইয়ের খলত্ব।

চতুর্থ গতিপ্রবাহ ঃ ছোটভাই সুড়ঙ্গের ভেতরে আটকা পড়ে। বুদ্ধি ও মন্ত্রপূতঃ লতার সাহায্যে বিপন্মুক্ত হয়। মেকি — নায়কের মুখোশ উন্মোচন। বড় ভাইয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ কন্যার ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হয়।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীর বিশ্লেষণ ঃ

কোনো এক গৃহস্থের ঘর। গেরস্ত বৌয়ের ছেলে হবে। এদিক ওদিক ফুটোফাটা এক টংঘরের দাওয়ায় বসে তাঁত বুনছিলো। ঘরদোরও গুছিয়ে রাখতে পারেনি, কাজকর্ম ততোটা করতে পারেনা বলে। টংঘরের নীচে আছে একটা গরু। ওরও বাচ্চা হবে। নড়তে চড়তে একদম ইচ্ছে করে না (১)। কাপড় বুনতে বুনতে আচমকা গেরস্ত বৌয়ের হাতের মাকুটা ফসকে গেল। গেরস্ত বৌ গরুকে বললো মাকুটা তুলে দিতে (২)। গরুটিও মাকুটা তুলে দিলো (৩)।

(১) প্রাথমিক অবস্থা (δ^1)
(২) সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা হয় ($\text{চ}^{\text{ৎ}}$)
(৩) গাইমার অনুরোধে সাড়া দেয়া (জ^1)

আবার কাপড় বুনতে বুনতে মাকুটা পড়ে গেলে গেরস্ত বৌ মাকুটা তুলে দিতে বললে (৪) গরু বিরক্ত হল খুব। এবার কিন্তু সে এমনিতে মাকুটা তুলে দিতে চাইলো না। সে বললো, 'দেখ বৌ, তোমার ঘরেও হ'বে, আমার ঘরেও হ'বে। তোমার নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছে, আমারও হচ্ছে। তুমি বারবার আমাকে কি করে ফরমাস করছো। তাই বলছি শপথ করতো তুলে দিই এবার"। গরু বললো, "তোমার ছেলে আর আমার মেয়ে হ'লে অথবা তোমার মেয়ে আর আমার ছেলে হলে দু'জনের বিয়ে হ'বে। দু'জনেরই মেয়ে হ'লে ওরা সই

(৪) পুনর্বার অনুরোধ ($\text{চ}^{\text{ৎ}}$)

পাতবে। বৌ বললো তা হ'বে খন, এখন মাকুটা তুলে দে দিকি। গাইমা মাকুটা তুলে দিলো। (৫)

একদিন গেরস্ত বৌয়ের মেয়ে ও গাইমার ছেলে হলো (৬)। ওরা দু'জনে সবসময় একসঙ্গে ঘোরে-ফেরে, খায়, ঘুমোয়। এমনকি মেয়েটি জুমে কাজ করতে গেলে বা নদীর ঘাটে জল আনতে গেলেও সে সাথে যায়। এসব দেখে পড়শীরা মেয়েটিকে গরুবৌ বলে ডাকে। একদিন এজন্য মেয়েটি খুব কান্নাকাটি করলে মা তাকে পূর্ব শপথের কথা বলে। সেদিন থেকে মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। পড়শীরা তাহলে ঠিকই বলেছে। ঘরের পাশেই ছিল মস্ত আমলকী গাছ। একদিন সইতে না পেরে মেয়েটি গাছের ডালে গলা আটকে ঝুলে মরলো। গরুটাও দেখাদেখি ওই ডালের মাঝেই মাথা আটকে ঝুলে মরলো (৭)।

একবছর পর এক রাজার ঘরে মেয়েটি আবার জন্ম নিলো। গরুটাও সেই রাজার ঘরে শ্বেতহস্তীরূপে জন্ম নিলো (৮)। রাজকুমারীর সব সময়ের খেলার সাথী শ্বেতহস্তীটি। হাতির কিন্তু পূর্বজন্মের সব কথা মনে ছিলো। সাদা হাতি রাজকুমারীকে নিয়ে বেড়ায়, এদিকে ওদিক ঘোরে, কথাবার্তা বলে। একদিন সাদাহাতি কুমারীকে পিঠে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে এলোনা। সাদা হাতি যে কোন্ পথে পালালো কুমারীকে নিয়ে, কেউ জানলো না। রাজবাড়ীতে কান্নার রোল উঠলো (৯)।

রাজা একদিন ঢোল পেটালেন, যে কুমারীকে এনে দিতে পারবে, তার সাথে কুমারীর বিয়ে দেবেন ও রাজ্যের অর্দ্ধেকটা দেবেন। কিন্তু এই ডাকে কেউ সাড়া দিতে এলো না।

অন্য এক রাজ্যের দু'ভাই রাঙ্গিয়া ও ভুতুয়া এই সময় এই রাজ্যে বেড়াতে এসে এই খবর জেনে রাজার ঢোল ধরলো। তারপর ওরা শুধু হাতে বেরিয়ে পড়লো রাজকুমারীর সন্ধানে (১০)। পথে বেরিয়ে সাদাহাতীর পায়ের চিহ্ন দেখে এগিয়ে যাবে বলে ঠিক করলো। কিছুদুর যেতেই ভুতুয়া কুকুরের পায়ের দাগ দেখে রাঙ্গিয়াকে বললো, "এগুলো নিশ্চয়ই হাতির পায়ের দাগ। আমি ওকে একাই ঘায়েল করতে পারবো। তোমার দরকার হবে না, তুমি ফিরে যাও (১১)। "আচ্ছা হবে খ'ন, এবারে চলতে থাকো" — ছোটভাই দাদাকে বললো (১২)। দিন মাস পেরিয়ে বছর হল। দু'ভাই এগিয়ে চললো। বন আরো গভীর হচ্ছে (১৩)। এক রাজার রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজার রাজ্যে ওরা পৌছোলো

(৫) অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া, শর্তসাপেক্ষে (এ)

(৬) গেরস্ত বৌয়ের মেয়ে, গাইমার ছেলে হয়।

(৭) মেয়েটি ও বাছুরটির মৃত্যু (ছ')

(৮) রাজার ঘরে মেয়েটি ও গরু শ্বেতহস্তীরূপে পুনর্জন্ম (অঅ')

(৯) শ্বেতহস্তী রাজকুমারীকে নিয়ে পালায় (আ')

(১০) রাঙ্গিয়া ও ভুতুয়া রাজকুমারীর সন্ধানে যাত্রা করে(চ↑)

(১১) বড় ভাইয়ের প্রতারণামূলক অনুরোধ (ন')

(১২) অনুরোধে সাড়া দেয় না (জ')

(১৩) বনের ভেতর দিয়ে পথ (গ')

(১৪) অন্য রাজ্যে গমন (গ)

(১৪)। দু'ভাই যতোই এগিয়ে যাচ্ছে হাতির পায়ের দাগগুলোও যেন আরো বড় বড় হচ্ছে (১৫)। এবার ভুতুয়া ভয় পেয়ে রাঙ্গিয়াকে ডেকে বললো, "আমি ফিরে যাচ্ছি, কোথাকার এক রাজকুমারীর জন্য বেঘোরে প্রাণ দেবো"? রাঙ্গিয়া বললো, "তাড়াতাড়ি হেঁটে চল, আরও এগিয়ে যেতে হবে"। ভুতুয়ার যেন আর পা চলছে না। সে রাঙ্গিয়াকে বললো ভাই দেখছিস্ এটাই সাদা হাতীর পায়ের চিহ্ন হ'বে। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে একদিন ওরা সাদা হাতির দেখা পেলো (১৬)। সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল রাঙ্গিয়া। ওদের যুদ্ধে বন-জঙ্গল কেঁপে উঠলো। এমন লড়াই কেউ কখনো দেখেনি। এক নাগাড়ে কয়েকদিন এই লড়াই চললো (১৭)। শেষ পর্যন্ত সাদা হাতিই হেরে গেল। রাঙ্গিয়া হাতিকে মেরে (১৮) রাজকুমারীকে নিয়ে ঘরের পথে পা বাড়ালো (১৯)। ফিরে আসার সময় অন্য এক রাজার রাজ্যে থেমেছে বিশ্রামের জন্য। বনের মাঝে একটা ঘর দেখে রাত কাটাতে ওরা তিনজন সেই ঘরে গেল। ঘরের ভেতর যেন মানুষের হাড়ের পাহাড়। ওরা ঘরের কোণে গিয়ে চুপ করে রইলো। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। এমন সময় তিন-চারজন লোক একটি মেয়েকে নিয়ে ওখানে এলো। সবাই কাঁদছে। রাঙ্গিয়ারা কিছুই বুঝতে পারলো না। ওরা জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কোত্থেকে এলে এখানে? এ যে রাক্ষসী চাক্‌বাইয়ামার ঘর তা কি তোমরা জানো না? এ তারই রাজ্য। আমরা তার প্রজা (২০)। এই রাজ্যের নিয়ম হ'ল রোজ একজন করে লোক এনে চাকবাইয়ামাকে দিতে হ'বে, নয়তো একদিনেই সবাইকে খেয়ে ফেলবে। আজ আমাদের পালা। তাই আমরা ওকে নিয়ে এসেছি (২০ক)।

কিন্তু তোমরা এখানে এলে কেন? তোমাদেরও রাক্ষসী খেয়ে ফেলবে যে"। রাঙ্গিয়া কি এসবকে ভয় করে? সে বললো, "যদি খেয়ে ফেলে কি আর করা যাবে? তবু ভাবছি খানিকটা দেখে নেবো। তোমরা ওকে দিয়ে যেতে চাওতো দিয়ে যাও" (২১)।

মেয়েটি ছিল ব্রাহ্মণকন্যা। ওকে ওখানে রেখে বাকী সকলে খানিক পরে চলে গেল। নিশুতি রাত। মেয়ে দুটো আর ভুতুয়া ঘুমিয়েছে। রাঙ্গিয়া শুধু দরজায় পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় আচমকা বনবাদাড় কাঁপিয়ে চাকবাইয়ামা দরজায় এসে বাজখাই কণ্ঠে বলতে লাগলো, "ঘরে কে আছিস্?" (২২) ভেতর থেকে রাঙ্গিয়া জবাব দিলো, 'কেন রাঙ্গিয়া জাগছে'। রাঙ্গিয়ার নাম শুনে রাক্ষসী পড়ি কি মরি করে ছুটলো।

(১৫) হাতির পায়ের দাগ দেখে অনুসন্ধান (গ[৩])

(১৬) সাদা হাতির দেখা পেলো ওরা (ফ[৩])

(১৭) হাতির সঙ্গে লড়াই(হ)

(১৮) হাতির নিধন। রাঙ্গিয়ার জয় (ই)

(১৯) নায়ক কর্তৃক রাজকুমারীকে উদ্ধার ও প্রত্যাবর্তন (অঅ[১]↓)

(২০) রাক্ষসীর ঘর। নির্দিষ্ট ভাবে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয় (ঞ[১])

(২০ক) মানুষ খাবে এই ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চায় (আ[১৮])

(২১) প্রতিদিন একজনকে রাক্ষসীর খাদ্য হিসেবে প্রয়োজন হয়।

(২২) রাক্ষসীর আগমন ও শিকারকে হাতে পাবার জন্য প্ররোচনা দেয় (আ[১])

সাদা হাতির সঙ্গে রাঙ্গিয়ার লড়াইয়ের খবর সেও পেয়েছিলো। ওদিকে ওর খিদেও পেয়েছে খুব। তাই ও আবার খানিক বাদেই ফিরে এলো (২৩)। আবার রাঙ্গিয়ার নাম শুনে পালালো। এবার রাঙ্গিয়ার ঘুম পাওয়াতে দরজায় ভুতুয়াকে পাহারায় রেখে নিজে ঘুমোতে গেল। যাবার সময় দাদাকে বলে গেল যাতে দাদা রাক্ষসীকে নিজের নাম না বলে রাঙ্গিয়া জেগে আছে বলে।

(২৩) সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে খলের পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ[১])

একটু পরেই রাক্ষসী এলে ভুতুয়া বললো "রাঙ্গিয়া জাগছে"। এভাবে বারবার এসে রাঙ্গিয়ার নাম শুনে সে পালালো। ওদিকে বারবার ভাইয়ের নাম বলে বিরক্ত হয়ে ভুতুয়া ভাবলো সে নিজেওতো কিছু কম নয়। তাই গলা চড়িয়ে বললো, "ভুতুয়া জাগছে"। অমনি রাক্ষসী লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেললো। দরজা ভাঙতেই ভুতুয়ার মুখোমুখি হল। বাঁচি কি মরি, দু'জনের লড়াই শুরু হল (২৪)। রাতভোরে রাক্ষসী ভুতুয়াকে অজ্ঞান করে (২৫) মেয়ে দুটোকে নিয়ে পালিয়ে গেল। রাতভোর হ'লে রাঙ্গিয়া জেগে দেখলো ভুতুয়াও নেই, মেয়েদুটোও নেই। বাইরে এসে ভুতুয়াকে জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখে তাকে সেবাশুশ্রুষা করে ভালো করে তুললো (২৬)। জ্ঞান ফিরে এলে ভুতুয়া একে একে রাতের ঘটনা সবই শোনালো। আবার রাঙ্গিয়া রাজকুমারীকে উদ্ধারের জন্য যাত্রা করলো (২৭)। কিন্তু কোথাও পেলো না। খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে একদিন গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে এমন সময়ে দূরে বাইলিংচিং (একরকম বনজ গাছ)-এর মরা ঝাড় দেখতে পেলো (২৮)। ছেলেবেলা থেকে জানে এ গাছ কখনো মরে না। এই গাছটা মরলো কেন? ঝাড়টা টেনে তুলতেই দেখলো একটা প্রকাণ্ড গর্ত পাতাল অব্দি চলে গেছে। তাহলে চাকবাইয়ামা এ পথেই পালিয়েছে। বন থেকে একটা ঘিলা লতা এনে তাকে সুড়ঙ্গের পথে গলিয়ে দিলো রাঙ্গিয়া। এবার দুজনেই লতা ধরে নীচে নেমে গেল ও রাক্ষসীকে দেখতে পেলো। সাথে সাথে রাঙ্গিয়ার সঙ্গে রাক্ষসীর লড়াই শুরু হল। একটু পরেই রাক্ষসীকে কুপোকাৎ করে টেনে ওর পাগুলো ছিঁড়ে ফেললো। যন্ত্রণায় একসময় ও মরে গেল (২৯)। এই সুড়ঙ্গের মধ্যেই একসময় রাজকুমারী ও ব্রাহ্মণ মেয়েটিকে পাওয়া গেল। ভুতুয়া, রাজকুমারী ও ব্রাহ্মণ মেয়েটিকে নিয়ে ঘিলা লতা ধরে উপরে উঠে এলো। রাঙ্গিয়া যখন উঠে আসবে ঠিক সে সময়েই ভুতুয়া রাজকুমারীকে বিয়ে করার মতলবে ঘিলা লতাটা কেটে দিলো এবং সুড়ঙ্গের মুখেও

(২৪) রাক্ষসী দরজা ভেঙ্গে ফেলে ও যুদ্ধ শুরু হয় (জ°)
(২৫) প্রতিনায়কের পরাজয় (এ[১])

(২৬) রাঙ্গিয়া ভাইকে উদ্ধার করে ও ভালো করে তোলে (ফ°—এ[১])
(২৭) পুনর্বার রাঙ্গিয়া রাজকুমারীকে উদ্ধারের জন্য যাত্রা করে (চ ↑)
(২৮) সহায়ক গাছ।

(২৯) রাক্ষসীর সঙ্গে লড়াই ও রাক্ষসীর মৃত্যু (হ-ই)

মস্ত একখানা পাথর চাপা দিয়ে দিলো (৩০)। যাতে রাঙ্গিয়া ওখানে তিলে তিলে পচে মরে।

ব্রাহ্মণ মেয়েটিকে ওর মা বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে রাজকুমারীকে নিয়ে ভুতুয়া রাজবাড়ীতে এলো। রাজাকে বললো, "মহারাজ আপনার মেয়েকে নিয়ে এসেছি। রাজকুমারী সহ অর্দ্ধেক রাজত্ব আমাকে দান করুন। আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন (৩১)। রাজা রাঙ্গিয়ার কথা জিজ্ঞেস করাতে সে বললো রাক্ষসী তাকে খেয়ে ফেলেছে এবং সে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে এনেছে (৩২)। রাজা কুমারীর সঙ্গে ভুতুয়ার বিয়ের ব্যবস্থা শুরু করলেন। রাঙ্গিয়া যে মরেনি তাতো কুমারী নিজেই দেখেছে। তাই সে ব্রতের ভান করে রাজার কাছে খবর পাঠালো যে ব্রতের এক বছর না গেলে কিছুতেই সে বিয়ে করবে না। ভুতুয়াকে তাই বাধ্য হয়েই অপেক্ষা করতে হল (৩৩)।

ওদিকে সুড়ঙ্গের ভেতরে রাঙ্গিয়া। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উপায় ভাবছে। হঠাৎ তার মনে পড়লো ঘিলা লতাটার কথা। ওটাকে মন্ত্র পড়ে মাটিতে পুঁতে দিতেই একটা লতা গজিয়ে উঠলো। লতাটা বড় হ'তে হ'তে একসময় সূর্যালোক পেয়ে গাছপালাকে জড়িয়ে ধরলো। এবার লতাটা বেয়ে সে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো (৩৪)। ওখান থেকে বেরিয়ে সে সোজা ব্রাহ্মণের ঘরে চলে এলো। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ওকে দেখে খুব খুশী হয়। সে-ও ওর কাহিনী বলে শোনালো। ব্রাহ্মণ তাকে রাজার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো (৩৫)। রাজাও লোকমুখে তার বেঁচে থাকার কাহিনী শুনে খুব অবাক হলেন। তিনিও পাইক পাঠিয়ে তাঁকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যান (৩৬)।

রাঙ্গিয়াকে দেখেই রাজকুমারী চিনতে পারে (৩৭)। সে তার বাবাকে বলে যে রাঙ্গিয়াই শ্বেতহস্তীকে মেরে ওদের বাঁচিয়েছে। সব শুনে রাজা ওর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন (৩৮)। রাজা ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে ভুতুয়ার বিয়ে দিলেন(৩৯)।

রাজ্যের অর্দ্ধেক পেয়ে রাজকুমারীকে নিয়ে রাঙ্গিয়া সুখেই দিন কাটাতে লাগলো। ভুতুয়াকেও সে কিছুটা দিলো, কারণ বড় ভাইতো। (৪০)

(৩০) ভুতুয়ার খলত্ব (আ)

(৩১) ভুতুয়া রাজার কাছে মিথ্যে কথা বলে রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চায়। (ন[১]) (ল[১])

(৩২) ভুতুয়া ভাই সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ দেয়।

(৩৩) কুমারীর নেতি বাচক সাড়া। বিয়েতে রাজী হয় না। ব্রতের ভান করে (জ. নেতি)

(৩৪) সহায়ক মন্ত্রপুতঃ ঘিলা লতার সাহায্যে সুড়ঙ্গ থকে বেরোয় (ভ[৯] = গ[৫])

(৩৫) সহানুভূতিময় সহায়ক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী (ঢ[২])

(৩৬) রাজ্যে নিয়ে যান রাজা ভুতুয়াকে (↓)

(৩৭) রাজকুমারী তাকে চিনতে পারে (শ)

(৩৮) রাঙ্গিয়ার রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ (ঊ[১])

(৩৯) ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে ভুতুয়ার বিবাহ (ঊ[২])

(৪০) রাঙ্গিয়া রাজকুমারীর সঙ্গে সুখে থাকে (ঊ)

কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ ঃ

ঙ[১] ঢ[৮] জ[১] ঢ[৭] এ ছ[২] অঅ[৯] আ[১] চ ↑ ন[১] জ[১] গ[২,৬] ফ[৩] হ-ই অঅ[১] ↓ এঃ[১] আ[১৮,৯] ঐ[২] জ[৩] এ[৯] ফ[৩] এ[৭] চ ↑ হ-ই আ ন[১] ল[১] জ.নেতি ভ[৯] গ[৫] ঢ[২] ↓ শ ঊ[১,২]

কাহিনীটিতে সংগ্রাম ও বিজয় অর্থাৎ হ-ই ক্রিয়াশীলতাটি দুবার পাওয়া যাচ্ছে। একবার শ্বেতহস্তীর সঙ্গে এবং অন্যবার রাক্ষসীর সঙ্গে সংগ্রাম রাঙ্গিয়ার। দুইবারই রাঙ্গিয়া জয়ী হয়। (প্রতিজ্ঞা)

মোটিফ ঃ এই রূপকথাটিতে কয়েকটি অভিপ্রায় থাকলেও মূল প্রাথমিক অভিপ্রায় জন্মান্তর-মোটিফ E. 600 এবং গৃহপালিত জীবে (হাতিতে) জন্মান্তর E. 611। হাতি কুমারীর বহনকারী - B 550 । রাজকুমারীকে নিয়ে শ্বেতহস্তীর পলায়ন - R 225 । রাজকুমারীকে যে উদ্ধার করবে, তার সঙ্গে বিয়ে - H 310 মোটিফের অন্তর্গত। রাক্ষসী ও হাতির সঙ্গে যুদ্ধে রাঙ্গিয়ার জয় - L 310 । নরমাংসভোজী রাক্ষসী চাকবাইয়ামা - G10 । রাক্ষসীর জন্য প্রতিশ্রুতিমতো মানুষ প্রেরণ S 262 । রাক্ষসীকে রাঙ্গিয়ার নাম বলে বোকা বানানোর মোটিফ G. 570 । রাক্ষসীর পুরী থেকে মেয়েটির উদ্ধার R. 111.1.3 । রাজার কাছে ভুতুয়ার মিথ্যাভাষণ-K 2115.1 বিশ্বাসঘাতক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা K 2211., অসীম শক্তিশালী পুরুষ রাঙ্গিয়া F 610 । মন্ত্র পড়ে ঘিলা লতাকে মাটিতে পুঁতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গাছ জন্মানোর মধ্যে মন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক শক্তি রয়েছে। এর মোটিফ - D. 900 । কন্যাকে কে পাবে - H. 621.1, সত্যের জয়-M. 10। অর্দ্ধেক রাজত্বসহ রাজকন্যা লাভ - Q. 112. ভাগ্যবান ও জয়ী কনিষ্ঠ সন্তান-L. 10।

গরুর সঙ্গে মানুষের বিয়ে টোটেম বা কুলপ্রতীক থেকে এসেছে। ষাঁড়টা মরে গিয়েও মেয়েটিকে ভুলতে পারে নি, রাজার হাতি হয়ে জন্মেছে। পূর্বজন্মের কথা মনে ছিল। জন্মান্তরে বিশ্বাস আদিবাসী জীবনের একটি চিরন্তন বিষয়

জুম নির্ভরতা ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই কাহিনীটি সেই বৈশিষ্ট্য থেকে একেবারেই আলাদা। 'জুম' কোনো না কোনোভাবে প্রতিটি কাহিনীটিতে সম্পৃক্ত হয়ে আছে, কিন্তু এখানে কোনোভাবেই জুমের অবস্থান পরিলক্ষিত হয় না। আরো একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার জুমভিত্তিক কাহিনীগুলোতে রাক্ষসীর আবির্ভাব জাতীয় কোন উপাদান পাই না। তাই মনে হয় মূল ভূখণ্ডের লোককথা প্রসারিত হয়েছে এখানে। তারপর এই কাহিনীকে এরা নিজেদের মতো করে গড়ে নিয়েছে।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

লেভিস্ট্রসের ফর্মূলাকে অনুসরণ করে এই কাহিনীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই কাহিনীতে রাঙ্গিয়া দুবার বিজয়ী হয়। একবার সাদাহাতিকে হত্যা করে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে এবং পরে রাক্ষসীকে হত্যার মাধ্যমে সে রাজকন্যাকে বিবাহ করতে সক্ষম হয়। তাহলে

পক্ষ ঃ a - শ্বেতহস্তী (পরে রাক্ষসী)
b - রাঙ্গিয়া

ক্রিয়াশীলতা (f)
x - অপহরণ করে (শ্বেতহস্তী ও রাক্ষসী দুজনে)
y - হত্যা করা হয় দুজনকেই।

এখানে fx(a) অর্থাৎ শ্বেতহস্তী fy(b) অর্থাৎ রাঙ্গিয়া। fx(b) দ্বারা একটি বেগবান পদ্ধতির প্রকাশ ঘটেছে, যার শেষ ফলশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে ফর্মূলার সর্বশেষ সদস্য fa - 1 (y) দ্বারা। এখানেই বিজয় সূচিত হচ্ছে।

"প্রতিজ্ঞা" কাহিনীটির চিত্ররূপ ঃ

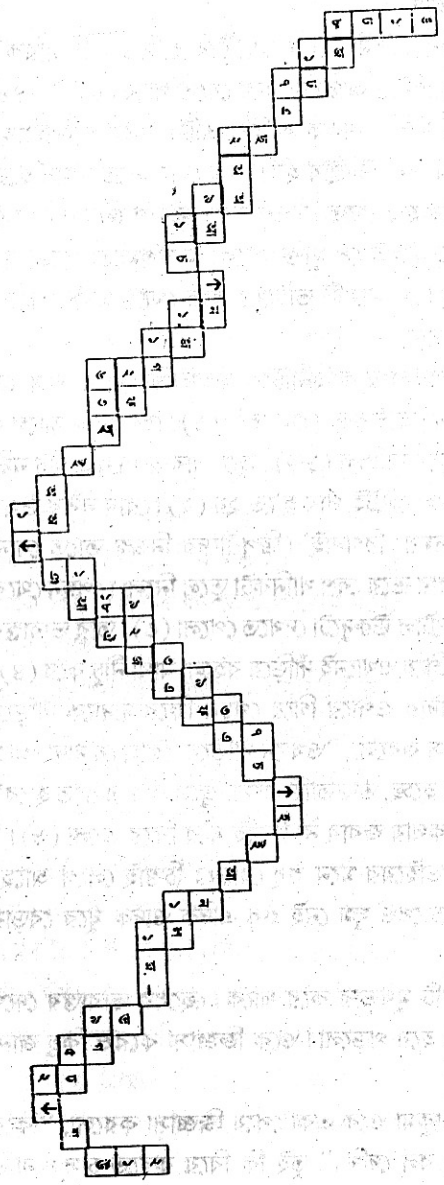

ছক ঃ সতেরো

কাহিনী ঃ আঠারো

ছাতিম গাছের কাহিনী

"ছাতিম গাছের কাহিনী" লোককথাটিকে হাসিও পারিবারিক কাহিনীর অন্তর্গত একজন নারীর (বালিকা) কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। টাইপ ১৪৪০-১৫২৪।

দ্বি-গতিপ্রবাহ সম্পন্ন একক কাহিনী এটি। **প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ** ভাই আর বোন। ভাই বোনকে বিয়ে করার জন্য উদগ্রীব হয়। কিন্তু বোন এতে বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ রাতে দেবতা স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন যেন মেয়েটি একটি ছাতিমচারা এনে পুজো করে, তাহলেই সে মুক্তি পাবে। নির্দেশমতো পুজো করে এবং চারাটি বড় হয়ে আকাশছোঁয়া হ'ল।পরে মেয়েটি ভাইয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে সেই গাছের মাথায় চড়ে মেঘের রাজ্যে চলে যায়।

ক্রিয়াশীলতা অনুসারে কাহিনীটিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা চলে।

ভাই আর বোন। ভাই বড়, বোন ছোট (১)। ছোটবোন আগে ও পেছনে ভাই-ওরা জুমে যাচ্ছিল (১ক)। জুমে যাবার পথে একটা নদী, তাতে সাঁকো নেই বলে হেঁটেই পার হ'তে হয় (২)। বোন নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় 'রিগনাই' (ত্রিপুরীদের নিজস্ব তাঁতে বোনা শাড়ী বিশেষ) ভিজবার ভয়ে বেশ খানিকটা তুলে নিলো। পেছন থেকে দাদা তার ধবধবে নিটোল উরুদুটো দেখতে পেলো (৩)। তার ভাবান্তর হ'ল। সে আর না এগিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো মাথা নীচু করে (৪)। ওদিকে ছোটবোন নদীর ওপারে গিয়ে পেছন ফিরে দাদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, "ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে যে দাদা, আজ জুমে যাবেনা? বেলা হচ্ছে, তাড়তাড়ি এসো, জুমে কাজ করতে হ'বে" (৫)। ভাই বোনের কথায় জবাব না দিয়েই ঘরে ফিরে এলো (৬)।

সেদিন থেকে ভাইয়ের মনে শুধু বোনের চিন্তাই লেগে আছে। কাজেও মন নেই, চোখেও ঘুম নেই শুধু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় (৭)।

দিনরাত ছেলেটি মুখভার করে থাকে। ছেলের ভাবান্তর দেখে মা বাবা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। ওকে জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানা গেলনা (৮)।

একদিন ওর ঠাকুমা ওকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কিরে দাদু, কি হ'ল তোর বল্ দেখি।" তুই কি বিয়ে করতে চাস্? নাতি উত্তর দিলো, "হ্যাঁ বিয়ে করতেই চাই (৯)। ঠাকুমা একে একে গাঁয়ের সব মেয়েদের নাম বলে গেল। কিন্তু কারু নামেই সাড়া দিলোনা সে।

(১) প্রাথমিক অবস্থা (ঙ)
(১ক) জুমে যায় (↑)
(২) নায়িকা স্থলপথে যায় (গ[১])

(৩) ভাই উরু দেখে প্ররোচিত হয় (প্ররো)
(৪) অভাববোধ (অ[৫])
(৫) সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ[১] নেতি)
(৬) খলের গৃহে প্রত্যাবর্তন (↓)

(৭) নিষেধ লঙ্ঘনের প্ররোচনা অনুভব

(৮) অভাববোধ (অ[১])

(৯) বোনকে বিয়ের জন্য জোর করে (আ[১৭])

এতে ঠাকুমা রেগে গিয়ে বললো, তা হ'লে তুই কাকে চাস্ বল্। গাঁয়ের সব মেয়ের নাম করলাম। নাম করিনি শুধু তোর ছোট বোনের। তাহ'লে কি তুই তোর বোনকেই বিয়ে করতে চাস্?" এবার নাতি জবাব দিলো, "হ্যাঁ ওকেই চাই" (১০)। ঠাকুমা যেন আকাশ থেকে পড়লো। কি সৃষ্টিছাড়া কথা ছেলের। এতে দোষ হ'বে, ইত্যাদি বুঝিয়েও ছেলের গোঁ থেকে সরানো গেলনা। (১১) ছোটবোনকে বিয়ে করতে না পারলে ও মরবে (১২)।

অনেক বুঝিয়েও যখন কোনো কাজ হলনা, (১৩) তখন ঘরের সকলে মিলে ঠিক করলো বোনের সঙ্গেই বিয়ে দেবে। নিজেরাই দুই একটি করে বিয়েবাড়ীর কাজকর্ম গুছিয়ে আনতে লাগলো। বর-কনের জন্য একটা নতুন ঘর বানানো হ'ল (১৪)। বিয়েবাড়ীর ভোজের জন্য চাল করা হ'ল। নাতনিটিও কিছু আঁচ করতে পারলোনা। গাঁয়ের বান্ধবীরাও ওকে নানা কথা জিজ্ঞেস, করলো। কিন্তু ও কিছু বলতে পারলোনা দেখে ওরা বললো, "তাহ'লে, তোর সঙ্গেই তোর দাদার বিয়ে হবে"। মেয়েটি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারেনা অথচ মনের মাঝে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

এমনি সময় বুড়ী ঠাকুমা একদিন বিয়ে বাড়ীর মদ রাঁধবার জন্য বিন্নী ধান রোদে দিয়েছে। ঘরে কেউ নেই। যে যার মতো কাজে গেছে। মনে কতো চিন্তা। তাই চুল এলিয়ে উঠোনে চাটাইয়ের এককোণে সে গিয়ে বললো। আর আপন মনে চুলের কাঁটা দিয়ে চাটাইয়ের উপর ঠুকতে লাগলো। ঠুক্ ঠুক্ শব্দ শুনে ঠাকুমা ভাবলো পাখি ধান খাচ্ছে। সে চোখেও ভালো দেখতে পায়না। সুর করে বলতে লাগলো, "আমার নাতি-নাতনীর বিয়ের জন্য মদ তৈরী করতে বিন্নী রোদে দিয়েছি, অপয়া পাখি সব কোন মশান থেকে উড়ে এসে খেতে লেগেছিস্"? নাতনী সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, "কি বললে ঠাকুমা? কাদের বিয়ের কথা বললে? দাদার সঙ্গে আমার বিয়ে। এতোদিন গোপন করে রেখে আজ বলে ফেললে" (১৫)। বুড়ী নাতনীর কথায় চমকে উঠলো। কিন্তু বুড়ী কিছু বললোনা (১৬)।

ভাইবোনের বিয়ের কথা কেউ কখনো শোনেনি। এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। বারবার মেয়েটির মনে বাজতে লাগলো। সেদিন রাতেই

(১০) বোনকেই বিয়েকরতে চায়।
(১১) উহ্য নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে কোনো আদেশ অমান্য করা হয় (ড[২])
(১২) 'মরে যাবে' - ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চায় (আ[১৭])
(১৩) অনুরোধে নেতিবাচক সাড়া - (জ[১] নেতি)
(১৪) বিয়ের প্রস্তুতি নেয়া হয়।

(১৫) সহায়কের মাধ্যমে পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ[৩])
(১৬) অনুরোধে নেতিবাচক সাড়া (জ[১] নেতি)

স্বপ্ন দেখলো, একজন দেবতা এসে ওকে বলছে, "শোন্ মেয়ে একটা ছাতিমের চারা এনে পুজো কর, তাহ'লেই, তুই মুক্তি পাবি। তোর দুঃখ দূর হ'বে। (১৭)

পরদিন গাঁয়ের মেয়েরা বনে যাচ্ছে। সেও গেল। (১৮) বনে যে যার মতো কাজ করছে, কেউ বা নিজেদের মধ্যে গালগল্প করছে। সে-ই কেবল কাজ না করে একা একা জুমের চারদিকে ছাতিমচারা খুঁজে বেড়াতে লাগলো। খুঁজে পেতে একসময় একটা ছোট্ট ছাতিমের চারা পেয়েও গেল (১৯) ওটাকেই উঠিয়ে এনে জুমের পাশে পুঁতে দিয়ে চারপাশে জল ঢেলে পুজো করতে লাগলো (২০)। এভাবে পুজো করতে করতে একসময় গাছটা বড় হয়ে উঠতে লাগলো। এবার মেয়েটি ছাতিম গাছের উপর বসেই গান গেয়ে উঠলো — "ওগো ছাতিম, দাদার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছে, তুমি ক্রমশঃ বড় হ'তে থাকো" (২১)।

তার গানের তালে তালে গাছটাও ক্রমশঃ বড় হয়ে আকাশের দিকে উঠে যেতে লাগলো। গাঁয়ের মেয়েরা বাড়ী ফিরে এলে মেয়েটির মা মেয়ের বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলো কেন মেয়ে বাড়ী ফেরেনি। ওরা বললো যে, সে ছাতিমচারা এনে পুজো করছে (২২)। মা-বাবা তাড়াতাড়ি পড়শীদের নিয়ে জুমের পাশের ছাতিমতলে গেল। এই সময়ের মধ্যে ছাতিমগাছ মেয়েটিকে নিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। মা-বাবার অনুরোধেও (২৩) মেয়ে নেমে আসছেনা (২৪) দেখে পড়শীরা সকলে গাছটার গোড়াতেই কোপাতে শুরু করলো (২৫)।

ওদিকে পড়শীরা ছাতিমকে যতোই কাটছে ততোই সে বেড়ে যাচ্ছে (২৬)। উপায় না দেখে বাবা বাধ্য হয়েই এবার মেয়েকে বললো, "নেমে এসো মা, তোমাকে দাদার সঙ্গে বিয়ে দেবোনা, ওকে এখুনি কেটে ফেলবো"।

এই বলে বাবা একটা কালো কুকুর এনে কেটে রক্তগুলো মেয়েকে দেখালো (২৭)। গাছের উপর থেকেই মেয়ে এবার বলে উঠলো, "আমি কি জানিনি, আমি কি দেখিনি, তোমরা যে কালো কুকুর কেটে এনেছো" (২৮)।

মেয়েটি আরো বললো, "দখিনা হাওয়া তুমি বইতে থাকো, বাবাকে প্রণাম করি, উত্তুরে হাওয়া তুমি বইতে থাকো, মাকে প্রণাম করি"।

(১৭) দেবতা কর্তৃক স্বপ্নাদেশ, মুক্তির নির্দেশ (ভ১)

(১৮) নায়িকা বনে যায়। (↑)

(১৯) সরাসরিভাবে মুক্তির নিমিত্ত প্রাপ্তি (ভ১).

(২০) প্রতিরোধমূলক কাজের সূত্রপাত (চ)

(২১) দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা ও অনুরোধ (ব৪-চ১)

(২২) সহায়কের মাধ্যমে মেয়েটির বাবা-মা তথ্য সংগ্রহ করে। (ঐ৪) ও কোনো উপায়ে অন্তর্দ্ধানীত করে (আচ)

(২৩) বাবা-মা মেয়েটিকে অনুরোধ করে (চ১)

(২৪) অনুরোধে নেতিবাচক সাড়া (ঐ২ নেতি)

(২৫) নায়িকা যে গাছে আশ্রয় নেয় খল তা ধ্বংস করতে চায় (পর১)

(২৬) গাছ নায়িকার সাহায্যে নিজেকে সমর্পণ করে (ভ৪)

(২৭) খলের ছলনার বিচিত্র পন্থা (ন৪)

(২৮) মেয়ে বাবার ছলনা বুঝতে পারে।

মেয়েটি গান গাইছে। ওদিকে হাওয়ারাও বইতে শুরু করেছে। এবার মেয়েটি ওখান থেকেই মাথা নত করে গুরুজনদের প্রণাম জানালো (২৯)। চোখের জল ফেলে একসময় মেয়েটি সোজা হয়ে মেঘের ওপারে চলে গেল (৩০)। নীচে দাঁড়িয়ে ভাই দেখলো বোন চলে যাচ্ছে আকাশের উপরে। সে তরতর করে উঠে গেল, বোনকে নামিয়ে আনতে। কিন্তু ও বোনকে ছুঁতেও পারলোনা (৩১)। ওদিকে আকাশে উঠে যাবার সময় (৩২) দাদা যেন কখনো ওর নাগাল না পায়, ভাইয়ের মলিন লালসা কোনদিন ছুঁতে না পারে, তার ব্যবস্থা করে গেল। ছাতিম গাছের মাথাটা পা দিয়ে ভেঙে দিয়ে গেল। আকাশ ফাটা শব্দে গাছের চূড়াটা মাটিতে ভেঙে পড়লো (৩৩)।

(২৯) গুরুজনদের মেয়েটি প্রণাম করে।
(৩০) জীবন বিপন্ন হ'লে নায়িকা নিজেকে রক্ষা করে (রস[৯])
(৩১) প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে পরাভূত করে (এ[১])
(৩২) সন্ধানীয় ব্যক্তি স্থানান্তরিত হয় (অঅভ[১])
(৩৩) নায়িকা পথে বাধার সৃষ্টি করতে করতে চলে যায় (রস[২])

সেদিন থেকে আজ অবধি কখনো আকাশ কালো হয়ে কড়কড় করে উঠলেই সেই ছাতিম গাছের কাহিনী আমাদের মনে করিয়ে দেয়। থেকে থেকে বিজলী চমকালে মনে হয় যেন সেই মেয়েটি কখনো কোমড়ের রিগ্‌নাইটি ভালো করে এঁটে দেবার সময় পলকের জন্য তার উরুদেশ দেখতে পাচ্ছি। সেদিন থেকে ছাতিম গাছের মাথা নেই।

কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত রূপটি হ'বে এরকম ঃ

ঙ ↑ গ[২] প্ররো অ[৫] ঐ[২] নেতি ↓ অ[১] আ[১৭] ড[২] আ[১৭] জ[১] নেতি ঐ[৪] জ[১] নেতি ভ[২] ↑ ভ[১] চ ব[৪] ঢ[৭] ঐ[৪] আ[৮] ঢ[৭] ঐ[২] নেতি পর[৭] ভ[৯] ন[৪] রস[৯] এ[১] অঅভ[১] রস[২]।

ছাতিম গাছের কাহিনীর চিত্ররূপটি হ'বে এরকম ঃ

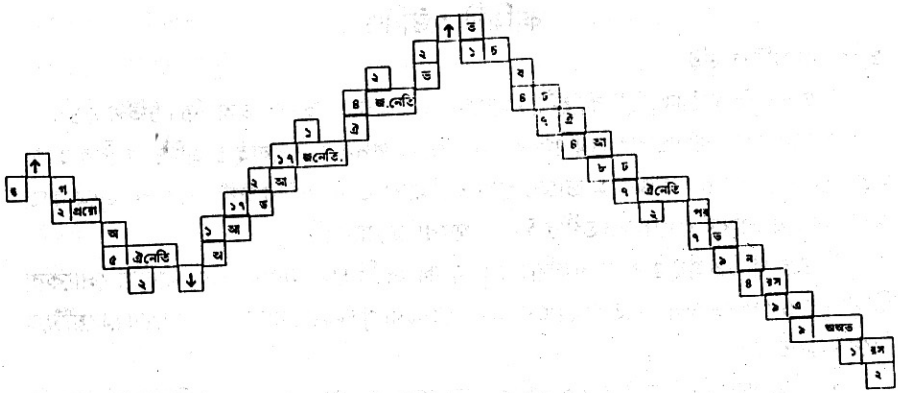

অভিপ্রায় বা মোটিফ ঃ

আদিম মানবের কাছে ভাই-বোনের বিবাহ ছিল স্বীকৃত বাস্তব ঘটনা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভাইবোনের বিয়ের ব্যাপারটিতে যৌনতা সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরোপিত হ'ল। এই কাহিনীটি সেই ঘটনারই স্মৃতি বহন করছে। মোটিফ T 10 ও T 415। বয়োজ্যেষ্ঠদের ছলনা - K motif এর অন্তর্গত। দেবতার দ্বারা স্বপ্নে মুক্তির পথ নির্দেশ N 531। কালোকুকুর আত্মাপ্রতীক। ছাতিমগাছ ও বিদ্যুৎচমক যৌনপ্রতীক বলে গণ্য। ছাতিমগাছটি ঐন্দ্রজালিক গুণসম্পন্ন Extraordinary tree motif. F-810।

সাহায্যকারী পশুপাখির মতো সাহায্যকারী বৃক্ষও লোককথার একটি বিশেষ অভিপ্রায়। বৃক্ষে অন্যলোকে নীত হওয়া F.66.1.1। সৃষ্টিকথার ছোঁয়া রয়েছে এতে। সবশেষে রয়েছে বিজয়িনী কনিষ্ঠা সন্তান মোটিফটি L50।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

লেভিষ্ট্রসের সূত্র অনুযায়ী এখানে প্রথম পক্ষ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে ভাইকে। পরবর্তী সময়ে পরিবারস্থ সকলে একযোগে তারই সঙ্গে মেয়েটির বিরুদ্ধে খলত্বের প্রকাশ ঘটায়। অর্থাৎ,

fx(a) = ভাই। দ্বিতীয়পক্ষ অর্থাৎ fy(b) মেয়েটি। পরবর্তীসময়ে fx(b) পর্যায়ে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দৈবী সহায়তায় ছাতিমগাছের সাহায্যে অন্যলোকে নীত হয় এবং ভাইয়ের পরাজয় সূচিত হয়। fa-1 পর্যায়ে মেয়েটির বিজয় সূচিত হচ্ছে। তাহ'লে লেভিষ্ট্রসকৃত সূত্র fx(a) : fy(b) : fx(b) : fa^{-1}(y) সূত্রটি এই কাহিনীটির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কাহিনী ঃ উনিশ

ছিপিংতুই মাইরুংতুই

"ছিপিংতুই মাইরুংতুই" কাহিনীটি সাধারণ লোককথা শ্রেণীর অন্তর্গত। টাইপ ৫১০।

অনেকগুলো গতিপ্রবাহ সমন্বিত কাহিনী এটি। **প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ** জুমিয়ার স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু। মেয়ে ছিপিংতুই কাজকর্মে ভালো হলেও বিমাতা ও সৎভগ্নীর ঈর্ষা। একদিন জুমে কাজ করার সময়ে পাখির কথায় সৎভগ্নীর ঈর্ষায় আরো প্ররোচনা।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ অন্য একদিন জুমের কাজে বিশ্রাম নেবার সময় রাজার লোকেরা ছিপিংতুই এর কাছে জল খেতে চায়। ওর ব্যবহারে ওরা খুশী হয়। রাজা একথা শুনে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়।

একদিন ছিপিংতুই মাইরুংতুই নদীর ঘাটে জল আনার সময় রাজা ছিপিংকে ঘোড়ায় তুলে রাজধানীতে নিয়ে আসে। এ খবরে বিমাতা সপত্নীকন্যার সৌভাগ্যে ঈর্ষাকাতর হয়ে মনে মনে ফন্দী আঁটে।

তৃতীয় গতিপ্রবাহ ঃ রাজা মেয়েটিকে বিয়ে করে সিংহাসনে নিজের পাশে বসায়। রানী হয়েও সে অত্যন্ত কর্মশীলা ছিলো। বিমাতা বারবার খবর পাঠালে রানী অবশেষে বাড়ীতে যায়। চুল বাঁধার ছলনা করে সৎমা রানীকে হত্যা করতে চায়। সৎভগ্নী রানীর পোষাকে মেকি নায়িকা রূপে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে।

চতুর্থ গতিপ্রবাহ ঃ নানা কাজ দেখে রাজার মনে রানী সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। মনের দুঃখে বনে গেলেন রাজা মৃগয়ায়। সহায়ক হরিণ রাজাকে রানীর দুর্ভাগ্যের কথা জানায়। রাজা মেকি-নায়িকাকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করেন ও রাজধানীতে ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন ও প্রকৃত রানী ছিপিংতুইকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনেন।

পঞ্চম গতিপ্রবাহ ঃ সৎ-মাকে ছলনা করে খবর পাঠিয়ে পুত্রসহ রাজধানীতে নিয়ে আসা হয় নবজাত নাতিকে দেখার জন্য। কিন্তু পরে রাজা তাকে শাস্তি দেয় ও মেয়ের কাটামুণ্ড উপহার দেয়। ফলে মা চিরদিনের জন্য মূর্চ্ছিত হয় যায়।

এখন ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে এভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে।

কাহিনী ঃ ছ'কুড়ি ছ'ঘরের এক ঘর। এক জুমচাষী। দু বিয়ে তার। বড় বৌয়ের একমাত্র মেয়ে ছিপিংতুই। ছোটবৌয়ের দিকে একপুত্র। নাম অগুরায় ও মেয়ে মাইরুংতুই। জুমিয়ার ঘরে কোনো অভাব ছিলোনা (১)।

একদিন জুমিয়ার স্ত্রী অজানা রোগে মারা গেলে (২) বড় মেয়ে ছিপিংতুই তার বিমাতার কাছেই থাকে। ছিপিংতুই দেখতে কালো হলেও শরীরের গড়ন ছিলো ভারী সুন্দর। ঘরকন্নার কাজ, জুমের কাজ, তাঁতের কাজ সবই সে ভালোভাবে করতে পারতো (৩)। কিন্তু ওর বোন মাইরুংতুই কোনোকিছুই ভালোভাবে করতে পারতোনা। তাহলেও সে ছিপিংতুইকে ভারী হিংসে করতো। ছিপিংতুই নীরবেই থাকতো (৪)।

(১) জোরালো প্রাথমিক অবস্থা (ঙ১)
(২) মাতার মৃত্যুজনিত অনুপস্থিতি (ছ১)
(৩) নায়িকার ক্রিয়াশীলতা
(৪) ছিপিংতুই এখানে খলের ভূমিকায়। খলের অজ্ঞতা।

একদিন দুবোন জুমে কাজ করছে, এমন সময় একটা পাখি বলে উঠলো, "ওই ময়লা রিগ্নাই পরা মেয়েটি যদি রাজরানী হ'তো কি ভালোই না হ'তো।" এই কথা শুনে মাইরুং তার দিদিকে বললো, "দিদি, দিদি আমার দা খানাই তুমি নাও, আর তোমার ওগুলো আমায় দাও (৫)। দিদি তাই দিলো (৬)। এবার পাখিটা আবার বলে উঠলো, "ওই পরিষ্কার রিগ্নাই পরা মেয়েটি যদি রাজরানী হ'তো, তাহলে কি ভালোই না হ'তো। একথা শুনে মাইরুংতুই খুব রেগে গেল। দিদির কাছ থেকে সব ফেরৎ নিয়ে নিলো। এমনি করেই ছিপিং এর দিন যাচ্ছে।

(৫) খলের প্রতারণামূলক অনুরোধ (ন১) সহায়ক পাখির আবির্ভাব। (ভ১)

আরেক দিনের কথা। জুমের কাজের ফাঁকে দুপুরবেলা দুবোন ওদের টংঘরে উঠে বিশ্রাম নিচ্ছে, এমন সময় রাজার লোকেরা ওদের জুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তৃষ্ণার্ত হয়ে ওরা মাইরুংতুই এর কাছে এসে জল চাইলো (৭)। কিন্তু রাজার লোকেরা জলে বিচ্ছিরি গন্ধ বলে খেতে না পেরে চলে যাচ্ছিল এমন সময় ছিপিংতুই ওদের ডেকে যত্ন আত্তি করে বসিয়ে ঠাণ্ডা জল খেতে দিলো (৮)। মেয়েটির মিষ্টি ব্যবহারে রাজার লোকেরা সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল (৯)। রাজধানীতে ফিরে ওরা ছিপিংএর খুব প্রশংসা করতে লাগলো। রাজার কানেও একথা গেল। রাজাও এমন একটি মেয়েরই খোঁজে ছিলেন বিয়ে করবেন বলে। রাজপুলিশের কথায় রাজার মেয়েটিকে খুব দেখার ইচ্ছে হ'ল। এছাড়া রানী করে আনার আগে নিজের চোখে দেখতে চান। রাজার লোকেরা রাজাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ছিপিংতুই-এর গাঁয়ে (১০)। নদীর ঘাটে যে পথে মেয়েটি যাবে সে পথেই গাছের আড়ালে লোকেরা মেয়েটিকে দেখিয়ে দিলো (১১)। এক পলক দেখেই রাজার ওকে পছন্দ হ'ল(১২)। তিনি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মাইরুংতুই ভয়ে পালিয়ে গেল আর, রাজা ছিপিংকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে এলেন (১৩)। মাইরুং-এর আর রাণী হ'বার ভাগ্য হোলোনা। মনে মনে ওর মা অন্য ফন্দী আঁটতে লাগলো (১৪)। রাজা ছিপিংকে বাড়ীতে এনে জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়ে করলেন(১৫)। রাজরানী করে তাকে নিজের পাশে বসালেন। রানী হলেও ছিপিং রেশমী সূতোর রিছা বুনতো। একবছর পর তার একটি ছেলে হলে, রাজ্য জুড়ে উৎসবের বন্যা বইতে লাগলো আর ওদিকে বিমাতা ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো (১৬)। মাইরুংকে কি করে রাজার সঙ্গে বিয়ে দেয়া যায়, তাই ভাবতে লাগলো। বিমাতা কিছুদিন পর পরই ছিপিংকে এসে বেড়িয়ে যাবার জন্য খবর পাঠাতো (১৭)। কিন্তু রাজার মন কিছুতেই তাকে পাঠাতে সায় দিতো না। বারবার খবর দিয়েও যখন আনা গেলনা, তখন সৎমা বাবার অসুখ বলে খবর পাঠালো। (১৮) এ অবস্থায় রাজা আর বারণ করতে পারলেন না। যাবার সময় রানীকে বলে দিলেন, "যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে এসো" (১৯) রাজাকে প্রণাম করে রানী বাপের বাড়ী গেল (২০)। বাড়ীতে এসে দেখে বাবা মারা গেছে। সংসারে তার কেউ নেই (২১)। খুব কাঁদলো সে। সাথে সাথেই রাজবাড়ীতে ফিরে যেতে চাইলো। কিন্তু ছোটবোন ও বিমাতার অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও

(৬) অনুরোধে নায়িকার ইতিবাচক সাড়া - (জ[১])

(৭) রাজার লোকেরা জল খেতে চায়। খল নায়িকা স্বীয় অবস্থান বজায় রাখতে পারে না (এ[১] নেতি)

(৮) নায়িকার সেবামূলক কাজ (এ[১])

(৯) আবেদকের প্রতি নায়িকার করুণা প্রদর্শন ও আবেদকের প্রস্থান (এ[৫])

(১০) (রাজা) পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ[১])

(১১) সহায়কদ্বারা নায়ককে পথ প্রদর্শন (ভ[১] গ[৪]) ও সন্ধানীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেয়া হয় (অঅভ[১])

(১২) এক পলক দেখেই রাজার তথ্য সংগ্রহ (ফ[৩])

(১৩) নায়ক নায়িকাকে অপহরণ করে

(১৪) সৌভাগ্যলাভে অপারগ হয়ে খলের ক্রন্দন ও খলত্বের চিন্তা (অ[৩]-ন[৪])

(১৫) নায়কও নায়িকার বিবাহ (উ[১])

(১৬) সৎমায়ের ঈর্ষা

(১৭) খলের চাতুরীর বিচিত্র পন্থা (ন[৪])

(১৮) খলের চাতুরী (ন[৪])

থাকতে হ'ল (২২)। সঙ্গের লোকজনকে দুদিন পর এসে নিয়ে যেতে বলে পাঠিয়ে দিল (২৩)। বিকেলে ছোটবোন বড় বোনের চুল আঁচড়ে দেবার বায়না ধরলো। ছিপিং কিছুতেই রাজী হ'লনা। মাইরুং চিরুনী এনে প্রায় জোর করেই দিদির মাথা আঁচড়াতে লাগলো (২৪)। আসার সময় রাজা নিজের হাতে ছিপিংয়ের মাথায় একটা ফুল গুঁজে দিয়েছিলেন আর বলে দিয়েছিলেন ফুলটা না ফেলতে। এ ফুল যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কোনো বিপদ হ'বেনা (২৫)। কিন্তু ছোটবোন চুল আঁচড়াতে গিয়ে ফুলটি টংঘরের নীচে ফেলে দিলো (২৬)। সে বোনকে ফুলটা তুলে দিতে বললো (২৭)। কিন্তু বোন বললো, "ওখানে শূয়োরের নাড়ী জমে আছে, কি করে যাই বলতো? অন্য আরেকটা ফুল পরে নিলেই চলবে। (২৮) ওর কথায় কান না দিয়ে ছিপিং নিজেই গেল ফুলটা তুলে আনতে (২৯)।

যেই ছিপিং নীচু হয়ে ফুলটা তুলতে যাবে, অমনি সৎমা আর সৎ ভগ্নী উপর থেকে একহাঁড়ি গরম জল ঢেলে দিলো তার মাথায়। সমস্ত শরীরটা পুড়ে গেলে যন্ত্রণায় ছিপিং ছটফট্ করতে লাগলো (৩০)। মরে গেছে ভেবে মা-মেয়ে ছিপিংকে বস্তায় পুরে দূরে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলো (৩১)।

বাড়ী ফিরে ছিপিংয়ের পোষাক পরে রানী সেজে বসে রইলো সৎবোন (৩২)। রাজবাড়ী থেকে ছিপিংকে নিতে এলে মাইরুং ওদের সঙ্গে রাজবাড়ীতে চলে এলো (৩৩)।

রানী ফিরে আসায় রাজার মনে ভারী আনন্দ। কিন্তু রানীতো এতো ফরসা ছিল না কথাবার্তাও ঠিকমতো মিলছে না। রেশমীসূতোর রিছাও এলোমেলোভাবে বুনছিলো। সন্দেহ হলেও রাজা মুখ ফুটে কিছু বললেন না।

একদিন রিছা বোনার সময় একটি পাখি রানীকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, "দুটো ফেলে তিনটে নাও, তিনটে ফেলে দুটো নাও" (৩৪)। রানীর ভারী রাগ হ'ল। তাঁর মনে হ'ল ছিপিংই পাখি হয়ে এসব বলছে। তাই পাখিটাকে তাড়াবার খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু পাখিটা কোথাও না গিয়ে এ ডাল ও ডালে থেকে গেল। ওদিকে কথাটা রাজার কানেও গেল। এদিকে সন্দেহও বেড়ে যাচ্ছিলো। সন্দেহ দূর করার উপায় খুঁজে না পেয়ে রাজা শিকারে যাবার মনস্থ করলেন (৩৫)। ছিপিং-এর এমন কেন হ'ল ভেবে রাজার মন খুব খারাপ। শিকারেও মন বসলোনা (৩৬)।

(১৯) নির্দিষ্ট ভাবে সতর্কতামূলক নির্দেশ (ঞ[২])
(২০) নায়িকার প্রস্থান (↑)
(২১) পিতার মৃত্যু (ছ[২])
(২২) প্রতারণামূলক অনুরোধ (ন[১])
(২৩) নায়িকা খলের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেয় (জ[১])
(২৪) সাধুতার আড়ালে বোনের ছলনা জাল (ন[১])
(২৫) রাজার দেয়া দৈবী ফুল (ভ[২])
(২৬) নায়িকা খলের দুষ্কর্মে নিজের অজান্তে বশীভূত হয় (জ)
(২৭) অনুরোধ (ঢ[১])
(২৮) অনুরোধে নেতিবাচক সাড়া (জ[২] নেতি.)
(২৯) আপন কাজের মাধ্যমে শত্রুকে সাহায্য করা (জ[৩])
(৩০) নায়িকাকে হত্যার প্রচেষ্টা (আ[১])
(৩১) নায়িকাকে দূরে ফেলে আসে (আ[১০])
(৩২) রাণীর পোষাক পড়ে ছলনা ও যুক্তি গ্রাহ্য আকৃতি (ট)
(৩৩) খল রাজবাড়ীতে যায় রাণী সেজে। (ও)
(৩৪) কুশলীপনা মূলক পরীক্ষা (ম[৫])

সারাদিন ঘুরে একটিও শিকার না পেয়ে সন্ধ্যেবেলা পোষা হরিণের ঘরে গেলেন। এই হরিণের জন্য রাজা বনের ভেতর সুন্দর একটা ঘর তুলে দিয়েছিলেন। যত্ন করার জন্য লোকও রেখে দিয়েছিলেন।

হরিণের কাছে গিয়ে তাকে বল্লেন যে রাতটা তিনি হরিণের কাছেই কাটাতে চান। কিন্তু হরিণ রাজী হ'লনা দেখে রাজা অবাক হয়ে ভাবলেন হরিণতো কোনোদিন এমন করেনা, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে (৩৭)। রাজা হরিণকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সে কিছুতেই বলতে চাইলোনা। রাজাও না জেনে ছাড়বেন না (৩৮)। অবশেষে সে চোখের জল ফেলতে ফেলতে রানীর করুণ কাহিনী বললো (৩৯)। কি করে গরমজল ফেলে দেবার পর রানী যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলো। বনের লতাপাতা ঔষধ দিয়ে হরিণ কি করে রানীকে ভালো করে তুললো সবই বললো (৪০) রাজা শুনে অবাক হ'ল। তারপর রাজা রানীকে দেখতে চাইলো। হরিণ দেখালো (৪১)।

রাজা রানীকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে চাইলে হরিণ গররাজী হলো। অগত্যা রাজা হরিণের কাছে যখন প্রতিজ্ঞা করলেন মাইরুংতুইয়ের রক্তে রানীকে স্নান করাবেন, তখন আর হরিণের কোনো আপত্তি রইলোনা। রাণীকে রাজার সঙ্গে রাজবাড়ীতে যেতে দিলো (৪২)। শিকার থেকে ফিরে রাজা মাইরুংকে কিছুই জানালেন না। একদিন ওকে বললেন যে ওর সাথে রাজার নদীতে স্নান করার ইচ্ছে হয়েছে (৪৩) একথায় আনন্দে আটখানা হয়ে সে স্নানের পোষাক নিয়ে রাজার সঙ্গে স্নানে গেল (৪৪)। নদীর ঘাটে গিয়ে পিঠ ঘসে দেবার নাম করে তরোয়াল দিয়ে মাইরুংকে এককোপে দু'খানা করে ফেললেন (৪৫) সেই রক্তে ছিপিংকে স্নান করিয়ে মাইরুং এর মাংস অর্দ্ধেক কুকুরকে খাওয়ালেন ও বাকী অর্দ্ধেক একটা হাঁড়িতে পুরে রেখে দিলেন। তারপর গয়নাগাটি পরিয়ে ছিপিংকে আবার রাজবাড়ীতে নিয়ে এলেন (৪৬)।

রাজ্যের লোকেরা ছিপিংকে ফিরে পেয়ে খুবই খুশী হ'ল। (৪৭)

দু'একদিন পর নাতির মুখ দেখার খবর (৪৮) দিয়ে সৎ মায়ের কাছে লোক পাঠানো হ'ল। খবর পেয়েই মাইরুংয়ের মা রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে রাজবাড়ীর দিকে রওয়ানা হ'ল (৪৯)।

রাজবাড়ীতে এসে নাতির কথা বলায় দাসদাসীরা ঠাট্টা করতে লাগলো। রাঁধুনে ঠাকুর রানীর মাকে আর রাজার শালাকে তাড়াতাড়ি

(৩৫) রাজার সন্দেহ। শিকারের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ (ক ↑)
(৩৬) পত্নীর জন্য অভাববোধ (অ[১])
(৩৭) হরিণ সহায়ক। দু জায়গার মধ্যে স্থানগত পরিবর্তন। (ভ[১])
(৩৮) সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ (ঐ[১])
(৩৯) অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া (এ[৫])
(৪০) সংযোগকারী ক্রিয়াশীলতা
(৪১) রাজার অনুরোধ (ঢ[১]) সহায়কের করুণা প্রদর্শন (এ[৫])
(৪২) নায়িকা সন্দর্শন ও মেকিনায়িকার মুখোশ উন্মোচন (শ-ঘ) নায়কের প্রতিজ্ঞা। রাজবাড়ীতে নায়ক ও নায়িকার প্রত্যাবর্তন (↓)
(৪৩) নায়ক ছলনাজাল বিস্তার করে। (ন[১])
(৪৪) খলের ইতিবাচক সাড়া অনুরোধে (জ[১])
(৪৫) ১ম খলের হত্যা (আ[১৫])
(৪৬) রাণীর নতুন পোষাক পরিধান। অভাব অপসারণ ও প্রত্যাগমন (ট[৩]-অঅ[৪]) (↓)

খেতে দিলো (৫০)। ভালো ভালো খাবার পেয়ে মনের আনন্দে ওরা খেতে লাগলো। মাংস খেতে গিয়ে ছেলেটি একসময় মাকে বললো যেন সে মাংসে দিদির গায়ের গন্ধ পাচ্ছে। মা কথাটি বিশ্বাস করলো না। খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ী ফেরার সময় (৫১) দাসী এসে একটা বড় মুখ বাঁধা হাড়ি এনে দিলো ওদের হাতে। বললো এতে সন্দেশ আছে। বাড়ী গিয়ে যেন সবাইকে খেতে দেয়। অন্য একজন দিলো মুখবাঁধা একটি লাউয়ের খোলা। বললো, "অনেক দূরে যাবে, তাই মেয়ে এতে ঠাণ্ডা জল দিয়েছে (৫২)। এবার মাও ছেলে-মেয়ে ও নাতির সঙ্গে দেখা হলনা ভেবে মন খারাপ করে গাঁয়ের পথে রওয়ানা হলো।

(৪৭) রাণীকে পেয়ে সবাই খুশী হয়।
(৪৮) নায়ক সাধুতার আচরণে ছলনাজাল বিস্তার করে (ন^{১})
(৪৯) খলের গৃহত্যাগ (↑)
(৫০) ছলনা।
(৫১) খল বাড়ী ফিরে যায় (↓)
(৫২) ছলনা।

পথে একজন জিজ্ঞেস করলো, মেয়ের মাংস কেমন খেলে? চড়া রোদে ক্লান্ত হ'য়ে ওরা একটা গাছের ছায়ায় বসলো। লাউয়ের খোলা থেকে জল খেতে যাওয়ামাত্র মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে ওদের কামড়াতে শুরু করলো। আধমরা হয়ে কোনোরকমে ওরা বাড়ী পৌঁছোলো (৫৩)।

(৫৩) খলের শাস্তি (উ)

বাড়ী যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়াপড়শী ভিড় করলো মেয়ে জামাইয়ের দেয়া সন্দেশের জন্য। হাঁড়ি খুলে দেখলো মেয়ের কাটা মাথা। সেই যে মাইরুংয়ের মা মূর্ছা গেল আর কোনোদিন তার মূর্ছা ভাঙেনি (৫৪)।

(৫৪) খলের শাস্তি (উ)

এখন ক্রিয়াশীলতাগুলোকে এভাবে সাজানো যেতে পারে।

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ ঙ^{১} ছ^{২} ভ^{৯} ন^{১} জ^{১}

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ ঐ^{১} নেতি.এ^{৭} এ^{৫} ঐ^{২} ভ^{৯} - গ^{৪} অঅভ^{২} ফ^{৩} অ^{৫} ন^{৪}

তৃতীয় গতিপ্রবাহ ঃ উ^{২} ন^{৪} ঞ^{২} ↓ ছ^{২} ন^{১} জ^{১} ন^{১} ভ^{২} জ ঢ^{৭} জ^{১} নেতি জ^{৩} আ^{৭} আ^{১০} ট ও।

চতুর্থ গতিপ্রবাহ ঃ ম^{৫} ক ↑ অ^{১} ভ^{৯} ঐ^{২} এ^{৫} ঢ^{৭} এ^{৫} শ-ঘ ↑

পঞ্চম গতিপ্রবাহ ঃ ন^{১} জ^{১} আ^{১৫} ট^{৩} অঅ^{৪} ↑ ন^{১} ↑↓ উ।

এই কাহিনীটিতে হ-ই অথবা ম-স ক্রিয়াশীলতাগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে হত্যাই প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যাচ্ছে। দুটো খল চরিত্রের শাস্তিই প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ সাপের কাটা মাথা ফেলা হয়েছিল যেখানে, সেখানে অজস্র খুম্পুই ফুল ফোটে। বড়বোন ঝর্ণার জল ফুলে উঠলে সেই জলে তলিয়ে গেল। সে জলের নিচে তার অজগর স্বামীর প্রাসাদে চলে গেল। যাবার আগে ছোটবোনকে ভবিষ্যৎ সুখের পথ বলে গেল।

তৃতীয় গতিপ্রবাহ ঃ ছোটবোন দিদির কথামতো বটগাছে বসে সূতো কাটে। রাজা খবর পেয়ে তাকে রাণী করে নিয়ে যায়। ছোটরাণীর ছেলে হলে অন্যরানীরা তার সন্তানদের জলে ফেলে দেয়। মাসী সন্তানদের পালন করে। পরে পরীক্ষার সাহায্যে মা নিজ সন্তানদের ফেরৎ পায়। রাজা অন্যরাণীদের শাস্তি দিলেন। ছোটরানী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে রাজা সুখে দিনযাপন করতে লাগলেন। ক্রিয়াশীলতা অনুসারে কাহিনীটিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

কাহিনী ঃ দশ গাঁয়ের সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের গাঁয়ের এক অচাইয়ের সংসারে শুধু দুটো মেয়ে। ওরা ছোটবেলাতেই মাতৃহীনা। মেয়েরা বড় হয়েছে বলে জুমের কাজ ওরাই করে। অচাই এ গাঁ ও গাঁ ঘুরে বেড়ায় (১)।

মেয়ে দুটো জুমে যাবার সময় মায়দুল (ভাতের মোচা) নিয়ে যায়। ওদের জুমে কোনো টংঘর নেই। ঝড়বাদল এলে ওরা দাঁড়াতে পারে না। একদিন এমনি ঝড়বাদলের সময় বড়বোন ছোটবোনকে বললো যদি কেউ সে সাপ, বাঘ, ভালুক, মানুষ যাই হোক না কেন, টংঘর বানিয়ে দেয় তাহলে সে তাকে বিয়ে করবে। এসব বলাবলি করে ওরা সেদিন বাড়ী ফিরে এলো (২)। বনদেবী ওদের কথাবার্তা শুনে সেদিন রাতেই একটি টংঘর বানিয়ে দিলেন (৩)।

পরদিন ভোরে জুমে যেতেই দূর থেকে টংঘর দেখে (৪) ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হল। দুজনেই দৌড়ে টংঘরে উঠে গেল ও একটা অজগরকে বেরিয়ে যেতে দেখলো।

অজগরই ঘর বানিয়েছে ভেবে সেদিন থেকে তাকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নিলো বড় বোন (৫)।

দু তিন দিন পর একদিন দুপুরে একসঙ্গে খাওয়ার জন্য দিদি ছোটবোনকে বললো অজগরকে ডাকতে। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ওর জামাইবাবু, বনজঙ্গল দুমড়ে টংঘরে এসে হাজির হল। সে ভয় পেয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইলো। দিদি তার নিজের খাবারটুকু সাপটিকে এগিয়ে দিলে সে খেয়ে চলে গেল। এভাবে রোজ দুপুরে ছোটবোন জামাইবাবুকে ডাকে। সে এসে খায়। বাকী যা থাকে তা ছোটবোন খায়। দিদি না খেয়ে থাকে (৬)। এর ফলে সে দিন দিন শুকিয়ে যেতে থাকে। তা দেখে বুড়ো অচাই চিন্তিত হয়ে পড়লো কোনো রোগশোক হয়েছে কিনা ভেবে। একদিন সে তার বড় মেয়েকেই জিজ্ঞেস করলো।

(১) জোরালো প্রাথমিক অবস্থা (ঙ')

(২) অভাবের যুক্তি গ্রাহ্যরূপ (অ') গৃহে প্রত্যাবর্তন (↓)

(৩) অভাব অপসারণ (অঅ')

(৪) এক পলক দেখেই তথ্য সংগ্রহ (ফ')

(৫) ভ্রান্তধারণা। অজগরকে দূর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে পতিত্বে বরণ।

(৬) সন্ধানীয় প্রাণীকে পাওয়া (অঅ)

সে বললো যে সে ভালো আছে, তার কিছু হয় নি। তখন অচাই আর কিছু বলে নি (৭)।

একদিন ছোটবোন বাড়ীতে ছিলো। বড়বোন একা জুমে গেছে (৮)। বাবা ছোটবোনকে জিজ্ঞেস করাতে সে আনুপূর্বিক বিবরণ দিলো। দুপুরবেলা না খাওয়াতে দিদি কাহিল হয়ে যাচ্ছে (৯) বলাতে বাবা রেগে গিয়ে বললো "মজা দেখাচ্ছি" এবং উপায় খুঁজতে লাগলো। (১০) সেদিন বড় মেয়ে পড়শীর জুমে দিন বদলীতে গিয়েছে। দুপুরে অচাই সাপকে ডাকতে বললো (১১)। সে এলে অচাই দা দিয়ে সাপটিকে কেটে ফেলে ও (১২) ও এর মাংস রান্না করে দিদিকে খাওয়াতে বলে। অজগরের মাথা আর হাড় জুম থেকে দূরে ঝরণার গভীর জলে ফেলে দিয়ে এলো (১৩)। টংঘরটাকেও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখলো।

ওদিকে পড়শীর জুমে কাজ করছিল অজগর বৌ। হঠাৎ তার গলার মালাটা খসে গেল। মালাগুলো কুড়িয়ে নিলে গাঁথা যাবে ভেবে কুড়োতে গিয়ে একটাও পেলো না। শরীরটাও যেন কেমন লাগছে ওর। কাজকর্মে মন লাগছে না। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলে বোন বললো, "দিদি খাবার আছে খেয়ে নাও"। গায়রিঙ-এ ছিটেফোঁটা রক্ত দেখে কিসের রক্ত জানতে চাইলে বোন বললো, 'বাবা একটা কচ্ছপ কাটছিলো হয়তো তারই রক্ত লেগে আছে'। দিদি খেতে এসে কিছুই খেতে পারলো না। মনে খুবই সন্দেহ হতে লাগলো। ঘরটা অজগর সাপের গন্ধেই ভরে আছে। (১৪)

খেতে বসে অন্যদিনের মতো অজগরকে ডাকলো বড়বোন, কিন্তু কেউ এলো না। অজগরকে না পেলে সেও ফিরবে না বলে বড়বোন বেরিয়ে গেল (১৫)। অজগর না আসাতে বড়বোন খুব কাঁদলো। ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পেলো না (১৬)। এদিক ওদিক খুঁজে পেতে বেলাশেষে ঝরণার ধারে এসে দাঁড়াল। এ ঝরণাতেই অজগরের মাথাটা ফেলেছিল অচাই। ঝরণার দুধারে ফুটে উঠেছে অজস্র খুম্পুই ফুল। লোভ সামলাতে না পেরে ছোটবোন একটা ফুল নিয়ে মাথায় গুঁজে ফেললো। সাথে সাথেই তা শুকিয়ে গেল। পরপর কয়েকবার এমন করার পর প্রতিবারই ফুলগুলো শুকিয়ে গেল। দিদি এতে অবাক হয়ে নিজে একটা ফুল মাথায় গুঁজলো। ওর মাথার ফুলটা এতে শুকোলো না (১৭)। এর ভেতর নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। অজগরের স্ত্রীর মনে সন্দেহ দেখা দিলো (১৮)। সে ছোটবোনকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে (১৯) জলে নামলো এবং নেমেই সুর করে গেয়ে

(৭) সরাসরি প্রশ্নের দ্বারা পরিদর্শন পরিক্রমা(ঐ[১])

(৮) বড়বোনের অনুপস্থিতি (ছ[৩])

(৯) সহায়কের সাহায্যে পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ[৪])

(১০) ক্ষতিসাধনের প্রয়াস (ন[২])

(১১) সন্ধানীয় প্রাণীকে ডাকা হয় (অঅভ[২])

(১২) অজগরকে হত্যা (আ[১৫])

(১৩) হত্যার চিহ্ন লোপাটের উদ্দেশ্যে সতর্কতা।

(১৪) নায়িকার সন্দেহ।

(১৫) নায়িকা গৃহত্যাগ করে। স্বামীকে না পাওয়া পর্যন্ত না ফেরার প্রতিজ্ঞা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (ক ↑↓ খ)

(১৬) পতির অভাব ও ক্রন্দন (অ[১])

(১৭) ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াশীলতা।

(১৮) ভিন্নমুখী তথ্যসংগ্রহ (ফ[২])

(১৯) নির্দেশ

উঠলো, ফুটতে থেকো দোলনচাঁপা ফুঁসতে থাকিস্ জল, ঝরণা বয়ে কোথায় যাস্ আমায় নিয়ে চল্"। গানের সাথে সাথে ফুলগাছের অফুটন্ত ফুলগুলো একে একে ফুটতে লাগলো। ওদিকে ঝরণার জল ক্রমশ ফুঁসতে লাগলো। পায়ের গোড়ালিতে পড়ে থাকা জল মেয়েটির কোমর ছাপিয়ে উঠলো। আবারও গেয়ে উঠলো অজগর বৌ। তারপর বোনকে বললো, "তোর জামাইবাবুর কাছেই আমি যাচ্ছি, আমাকে আর ফিরে আসতে বলিস না। বোন তোকে দুটো কথা বলি শোন্। তুই সেভাবে চলিস্, তোর ভালো হবে। এখান থেকে সোজাসুজি এগিয়ে যাস। যেতে যেতে একসময় সাত পথের মোড়ে গিয়ে পৌঁছুবি। সাত পথের বাঁকেই আছে এক বিরাট বটগাছ। এর সাতটা ডাল সাতদিকে চলে গেছে (২০) সাতটা ডাল যেখান থেকে উঠেছে, সেখানে আছে এক সোনার চরকা। সেই বটগাছে চড়ে সোনার চরকা দিয়ে সুতো কাটতে থাকিস। তার সাথে সাথে সুর করে গাইতে থাকিস্— "রাজার রানী না হই যদি আমি নারী নই (২১)। সাত সন্তানের মা না হলে আমি নারী নই"।

কথা শেষ হতেই অজগর বৌ জলের তলায় তলিয়ে গেল (২২)। ডুবে যেতেই জলের নীচে এক প্রকাণ্ড রাজবাড়ী দেখতে পেলো (২৩)। বাড়ীর ফটকে মানুষের রূপ ধরে (২৪) এসে দাঁড়িয়ে আছে ওর স্বামী। ওকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। দুজন দুজনকে পেয়ে ভারী খুশী হল (২৫) অজগরস্বামী স্ত্রীর কাছে সবকিছু খুলে বললো (২৬)। কি করে ছোটবোন ওকে ডেকেছে, অচাই কি করে ওকে কেটে ফেললো সবই (২৭)। ছোটবোন ওকে মিছিমিছি ডাকতে অজগর ওর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল বলেই ওর ফুলগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। "তোমার ছোটবোন রাজরানী ও সাতসন্তানের মা হবে ঠিকই, কিন্তু ও সুখী হবে না। বললো স্বামী (২৮)। বড়বোন তখন ছোটবোনের হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো (২৯)। স্ত্রীর কথায় স্বামীর মন প্রসন্ন হল (৩০) সে বললো শুধুমাত্র তোমার জন্যই শেষ পর্যন্ত সে সুখী হতে পারবে। সেদিন থেকে ওরা সুখে শান্তিতে জলপুরীতে বাস করতে লাগলো (৩১)।

ওদিকে ছোটবোন দিদির কথামতো পথ চলতে চলতে সাত ডালা বটগাছের কাছে এলো (৩২)। গাছে উঠে সোনার চরকায় সুতো কেটে কেটে গান গাইতে লাগলো। রাজার সেপাইরা যাচ্ছিল সে পথে। ওরা মেয়েটিকে দেখে বিভিন্ন প্রশ্ন করলো, কিন্তু একটিও উত্তর পেলো না। সে আপন মনে চরকা কাটতে লাগলো।

রাজসৈন্যরা রাজধানীতে গিয়ে এ খবর জানালে রাজা সত্যমিথ্যে

(২০) কোন পথে যেতে হবে বড়বোন ছোটবোনকে তার নির্দেশ দেয় (গ[৪]) কোনো চিহ্ন দেখে পথের সন্ধান (গ[৫])

(২১) কঠিন কাজ জাতীয় পরীক্ষা (ম[১])

(২২) নায়িকার জলপথে যাত্রা (গ[১])

(২৩) আশ্চর্য প্রাসাদ নির্মাণ (ট[১])

(২৪) নায়কের আকৃতি পরিবর্তন (ট)

(২৫) নায়িকার পতিলাভ (অ[১])

(২৬) মেকি নায়িকার মুখোস উন্মোচন (ঘ)

(২৭) ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ (ঢ[৫])

(২৮) অভিশাপ

(২৯) ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ (ঢ[৫])

(৩০) আবেদকের প্রতি নায়কের করুণা প্রদর্শন (এ[৫])

(৩১) ক্রিয়াশীলতার জন্য ইতিবাচক ফল (+)

(৩২) ছোটবোন নির্দিষ্ট স্থানে আসে (↑)

যাচাই করার জন্য এলেন সাত পথের বাঁকে। সত্যিই তো। তিনিও ওকে প্রশ্ন করে কোনো জবাব না পেয়ে প্রশ্ন করলেন যে সাতসন্তানের মা হতে পারবে কিনা (৩৩)। সে স্বীকার করলো। রাজা তাকে নেমে আসতে বললেন এবং পরে বিয়ে করে রাজবাড়ীতে নিয়ে এলেন (৩৪)। এখন থেকে অচাইর ছোটমেয়ে হল রাজরানী। রাজার আরো ছিল সাতরানী। তিনি ছোটরানীকে নিয়ে সুখেই আছেন। সাতরানীর কারুঘরেই ছেলেমেয়ে ছিলো না। সেজন্য রাজা ছোটরানীকে খুব ভালোবাসতেন আর অন্য রানীরা ছোটকে খুবই ঈর্ষা করতো (৩৫)।

ছোটরানীর ছেলে হবে শুনে রাজার খুব আনন্দ হল। দরবারকক্ষ থেকে অন্দরমহল পর্যন্ত একটা লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন যেন প্রসববেদনা শুরু হলেই যেন দড়ি ধরে টানেন। রাজা চলে আসবেন (৩৬)।

অন্য রানীরা এখবর জেনে (৩৭) সবাই এসে ছোটরানীকে বললো রাজা সত্যিসত্যি আসেন কিনা তার পরীক্ষা করতে (৩৮)। রানী রাজী না হওয়াতে রানীদের মাঝেই একজন দড়ি টানলেন (৩৯) অমনি রাজা দৌড়ে এলেন। এসে দেখলেন, না কিছু না (৪০)। ছোটরানীকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করাতে ছোটরানী জানালো যে সত্যি মিথ্যে যাচাই করার জন্য একরানী দড়ি টেনেছে। রাজা কাউকে কিছু না বললেও প্রচণ্ড রেগে গেলেন। দরবারে ফিরে গেলেন (৪১) এমনি করে রোজই কোনও রানী চুপিসাড়ে যখন তখন দড়ি টেনে রাজাকে বিব্রত করতে লাগলেন (৪২)। রাজা খুব বিরক্ত হয়ে আর যাবেন না বলে ঠিক করলেন। সত্যিসত্যি যেদিন রানীর প্রসববেদনা হল সেদিন বারবার দড়ি ধরে টানলেও রাজা আর গেলেন না। নিরুপায় হয়ে অগত্যা ছোটরানী সতীনদের কাছেই গিয়ে বললো (৪৩)। সতীনেরাও সুযোগ বুঝে দুটো সাতনরী কাপড় দিয়ে ছোটরানীর দুচোখ বেঁধে নদীর পারে নিয়ে গেল। সেখানে একটি মেয়ে হ'ল কিন্তু সতীন রানীরা শিশুটিকে নদীর জলে ফেলে দিল। ছোটরানী অজ্ঞান থাকায় কিছুই বুঝতে পারলো না (৪৪)।

এভাবেই প্রতিবছরেই ছোটরানীর এক একটি ছেলেমেয়ে হ'ল। কিন্তু একমেয়ে ও সাত ছেলেকে প্রতিবারই সতীনেরা জলে ফেলে দিলো (৪৫)। ওদিকে ছেলেমেয়েদের জলে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই অজগর বৌ ওদের বুকে তুলে নিতো। মাসীর কাছেই ওরা লালিতপালিত হতে লাগলো (৪৬)।

চোখবাঁধা থাকতো বলে ছোটরানী কিছু দেখতে পেতো না। রানী

(৩৩) দাতা কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ (ঢ১)

(৩৪) বিবাহ (ঊ)

(৩৫) খলত্ব (আ)

(৩৬) রাজা কর্তৃক সতর্কতামূলক নির্দেশ (ঞ১)

(৩৭) খল সংবাদ সংগ্রহ করে (ফ১)

(৩৮) প্রতারণামূলক অনুরোধ (ন১)

(৩৯) খলত্ব (আ)

(৪০) খলের কাজে যান্ত্রিকভাবে সাড়া দেওয়া (জ১)

(৪১) রাজার খলসম্পর্কে সংবাদপ্রাপ্তি ও প্রত্যাবর্তন (ফ১↑)

(৪২) খলত্ব (আ)

(৪৩) আপনকাজের দ্বারা শত্রুকে সাহায্য করা (জ০)

(৪৪) নায়িকাকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে খলদের উদ্যোগ (ঢ০)

(৪৫) খলত্ব (আ)

(৪৬) বড়বোন নায়িকাকে সাহায্য করে (ভ১)

জানতে চাইলে সতীন রানীরা বাঁশের টুকরো, পাথর কুঁচি এগুলো এনে দেখাতো এবং এগুলো দোলনায় রেখে সুর করে গান গাইতো। রাজা ছেলেমেয়েদের দেখতে চাইলে দাসীরা গানের মাধ্যমে বলতো রানীর ছেলে হয়েছে বাঁশের কঞ্চি, পাথর কুঁচি আর এতে রাজা লজ্জা পেয়ে চলে যেতেন (৪৭)। এবার রাজা খুব চিন্তিত হলেন। মানুষের ঘরে কি কখনো এসব জন্মায়। তাহলে ছোটরানী নিশ্চয়ই রাক্ষসী। ওকে ঘরে রাখলে অমঙ্গল হবে বলে রানীকে মাথা মুড়িয়ে ছাগল চরাতে পাঠিয়ে দিলেন। (৪৮)

(৪৭) খলের চাতুরীর বিচিত্র পন্থা (ন[৪])

(৪৮) রাজা নায়িকাকে ছাগল চরাতে পাঠায় (আ[১০])

রাজ্যের লোকেরা নদীর ঘাটে জল আনতে যায় কিন্তু জল আনতে পারে না। কলসী জলে ডোবালেই কে যেন কলসীগুলো ফুটো করে দেয়। কিন্তু কারা যে করছে তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। লোকেরা জল খেতে না পেরে রাজার কাছে নালিশ করলো। রাজা নিজেই নদীর ঘাটে গিয়ে (৪৯) দূর থেকে নদীর বুকে সাতটি ছেলে ও একটি মেয়েকে নৌকো নিয়ে খেলা করতে দেখলেন (৫০)। ওরাই কলসী ফুটো করেছে ভেবে রাজা ওদের ধরতে গেলেন। কিন্তু ধরতে পারলেন না। ধরতে গেলেই ওরা পালিয়ে যায় জলের তলায়। হাল ছেড়ে দিয়ে রাজা ওদের পরিচয় জানতে চাইলেন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে। মাসী যে রকম শিখিয়ে দিয়েছিলো ওরাও ঠিক তেমনই বললো, "নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে যে নারী নিজের স্তন দিয়ে আমাদের মুখে দুধ এনে ফেলতে পারবে, আমাদের পেট ভরাতে পারবে সে-ই আমাদের মা"। (৫১)

(৪৯) প্ররোচনা (প্ররো)

(৫০) সংযোগকারী ( )

(৫১) নায়ক কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ (ঢ[২])

রাজার আদেশে রাজ্যের সব মায়েরা স্তন দিয়ে গেল কিন্তু একবিন্দু দুধও কারু মুখে পড়লো না (৫২)। কি করা যায় ভাবছেন রাজা, এমন সময় রাজপুলিশেরা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা এক মহিলাকে নিয়ে এলো (৫৩)। রাজার অনুরোধে সে স্তন দেওয়ামাত্রই ছেলেমেয়েদের পেট ভরে গেল (৫৪)। ছেলেমেয়েরা মাকে চিনতে পেরে দৌড়ে এলো মায়ের কাছে (৫৫)। রাজা খুব অবাক হয়ে ছেলেমেয়েদের পরিচয় চাইলেন। জলপুরীর মাসীর শেখানো মতো ছেলেমেয়েরা জন্ম থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে শোনালে রাজা লজ্জায় অধোবদন হলেন ও রানীর কাছে ক্ষমা চাইলেন (৫৭)।

(৫২) নির্বাচনমূলক পরীক্ষা (ম[৪]-)

(৫৩) ছেঁড়া পোষাকে নায়িকার কৌতুকময় আকৃতি (ট[৪])

(৫৪) কঠিন কাজ সমাধান (স)

(৫৫) নায়িকাকে চিনতে পারা (শ)

(৫৬) জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ ও খলের মুখোশ উন্মোচন (ঐ[২], ঘ)

(৫৭) ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ (ঢ[৫])

(৫৮) খলের শাস্তি (উ)।

এবার সাজা দেবার পালা। রাজাদেশে খুব বড় গর্ত করা হল, তরপর একতাল মাটি ফেলা হল সেখানে। তারপর হিংসুটে সাতরানীকে ওই গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিলো। সাতরানী নিজেদের হিংসার ফল পেলো (৫৮)।

সমগ্র কাহিনীটির আংকিক রূপটি হবে এইরকম ঃ

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ ঙ[১] অ[৫] ↓ অঅ[৪] ফ[৩] অঅঐ[২] ছ[৩] ঐ[৪] ন[২] অঅভ[২] আ[১৫]

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ ক ↑ খ ↑ অ[১] ফ[২] গ[৪.৬] ম[৭] গ[২]

তৃতীয় প্রবাহ ঃ ট২ট অ১ ঘ ঢ৫ এ৫ + ↑ ঢ২ ঊ আ ঞ১ ফ১ ন১ আ জ২ ফ১ ↑ আ জ৩ ঢ৮ আ ভ৯ ন৪ আ১০ প্ররো. ঢ২ ম৪-ট৪ স শ ঐ২ ঘ ঢ৫ উ।

মোটিফ ঃ এটি ত্রিপুরীদের একটি ক্লাসিক রূপকথা। যে গীয়ারিং (টংঘর) তৈরী করে দেবে তাকেই স্বামী নির্বাচন করার অভিপ্রায় H মোটিফের অন্তর্গত। সাহায্যকারী বনদেবী মোটিফ N.817। সাপ থেকে মানুষে জন্মান্তর D 191. খুম্পুই ফুল শুকিয়ে যাওয়া জীবনপ্রতীক E 761 অভিপ্রায়জাত। আদিবাসীদের জীবনে কাউকে দেখিয়ে ফুল পরা যৌনবাসনার সূচক। আচমকা গলার মালা খসে যাওয়া জীবনপ্রতীক E 761.7 কাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়। অন্যায়ভবে নিহত ব্যক্তির (অজগররূপী মানুষ) হাড় ও মাথা ফেলা হয়েছিল যে ঝরণাতে, তার দুপাশে অজস্র খুম্পুই (দোলনচাঁপা) ফুলের জন্ম স্টীথ টমসনের Reincarnation in plant (tree) growing on grave-E631. মোটিফের অন্তর্গত। একস্বামীর (রাজার) বহুবিবাহ T 145।

নির্দয়ভাবে সতীনরানী কর্তৃক ছেলেমেয়েদের নদীতে ফেলে দেওয়া S 140.। সত্যি ছেলেমেয়ে হলেও বাঁশের টুকরো পাথরকুচি ছেলেমেয়ে হয়েছে বলে ছোটরানীকে প্রতারণা K মোটিফের অন্তর্গত। হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে (অন্য রানীদের দ্বারা) ছোটরানীর ক্ষতিসাধন K 2000। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে স্তন দিতেই ছেলেমেয়েদের নাকেমুখে গিয়ে পড়ার ফলে পেট ভরে যাওয়া ও মাকে চিনতে পারা রূপকথার এই এভিপ্রায়টি H.175 মোটিফের অন্তর্গত। সাতভাই ও একবোন Z.71.5.1 দোষীরানীদের শাস্তি-Q ২৬১ নির্বাসিত স্ত্রীর সঙ্গে রাজার পুনর্মিলন S451., বিজয়ী ও ভাগ্যবতী ছোটরানী এই রূপকথাটির অন্যতম অভিপ্রায়।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

এই কাহিনীটির মধ্যে যে বিরোধ ও সংঘাতের যে চিত্র আছে তা কাঠামোগত বিশ্লেষণদ্বারা ফুটে উঠেছে। কাহিনীর অন্তর্বর্তী অংশে রানীদের সংঘাত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হলেও অজগরকে অচাই ও ছোট মেয়ে কর্তৃক কেটে ফেলার ব্যাপারটি পরোক্ষ সংঘাতমূলক। অন্যায়ভাবে অসহায় অজগরকে ছোটবোন ও বাবা হত্যা করে। সরাসরি সে এর প্রতিবাদ করতে পারে নি কিন্তু তার প্রতিবাদ অবচেতনে কাজ করেছে। তারই ফলে তাঁর স্ত্রী খুম্পুই ফুল (অজগর থেকে জন্মান্তর খুম্পুইয়ে) মাথায় দিলে তা সতেজ থাকলেও ছোটবোন মাথায় দেওয়া মাত্রই তা শুকিয়ে যায়। অজগর এখানে উৎপাদন শক্তির প্রতীক। এখানে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করতে পারে নি অজগর। প্রতিবাদ রয়েছে তার হৃদয়ে।

অন্যায়ভাবে হত্যাকারী ছোটবোনকে অজগর অভিশাপ দেয়। বোন অভিশপ্ত জীবন ভোগ করে। পরে নিপীড়কের শাস্তির স্খলন হয় নিপীড়িতেরই ক্ষমার সহায়তায়। এখানে মধ্যবর্তী সহায়কের ভূমিকায় কাজ করে অজগরের স্ত্রী (বড়বোন)। লেভিস্ট্রসের ফর্মূলাকে তাহলে এই কাহিনীর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

$$fx(a) : fy(b) : fx(b) : fa^{-1}(y)$$

এছাড়াও অর্ন্তবর্তী দ্বন্দ্ব যা সৃষ্টি হয়েছে ছোটরানীর প্রতি অন্যান্য রানীদের প্রতারণা বা মিথ্যাচারের দ্বারা, সেখানেও দেখা যায় যে রাজা সাতরানীকে মাটি চাপা দিয়ে শাস্তি দেন অর্থাৎ সত্যের প্রতিভূ রাজা মিথ্যাকে হত্যা করে ছোটরানীর সংসারে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করে সত্যের জয় সূচনা করলেন। লেভিস্ট্রসের ফর্মূলাটি এভাবেও প্রযোজ্য হতে পারে।

"অজগর সাপের গল্প" কাহিনীটির চিত্ররূপ হবে এইরকম ঃ

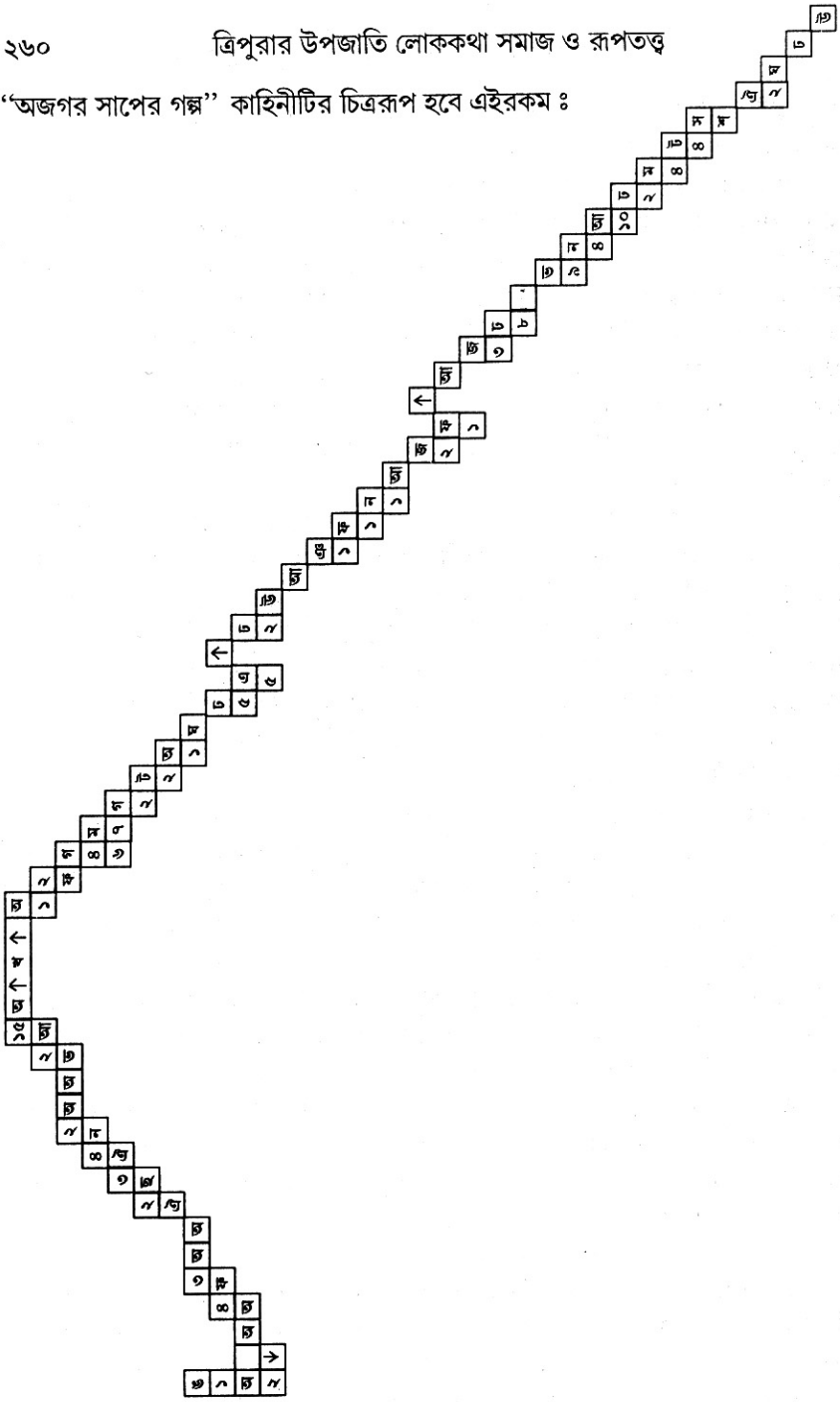

কাহিনী ঃ একুশ

চাঁদের ছেলে

চাঁদের ছেলে কাহিনীটিকে সাধারণ লোককথা শ্রেণীর ঐন্দ্রজালিক কাহিনীর অন্তর্গত অলৌকিক বা মোহময় স্বামী টাইপ ৪০০-৪৫৯ এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

একাধিক গতিপ্রবাহ সম্পন্ন কাহিনী এটি।

১ম গতিপ্রবাহ ঃ এক চাষীর বোন মারা গেলে তার মেয়ে চাষীর কাছেই থাকে। কিছুদিন পর বড় হয়ে সে চন্দ্রমাদেবকে ভালোবাসে এবং গর্ভবতী হলে চাষী তাকে ফেলে যাওয়া জুমে রেখে আসে। একটি ব্যাঙরূপী ছেলে হয় তার। নাম হল চন্দ্রকুমার।

২য় গতিপ্রবাহ ঃ ব্যাঙরূপী ছেলে চন্দ্রকুমার একমনে চন্দ্রমাদেবকে ডাকে ও বাবার দেখা পায়। দেবতা ওদের জন্য ঘর তৈরী করে দেয়। বাবার নির্দেশে সে ব্যাঙের খোলা খুলে রেখে মানুষরূপে যখনই ইচ্ছে হয় ঘুরে বেড়াতে পারে।

তৃতীয় প্রবাহ ঃ চন্দ্রকুমার রাজবাড়ী দেখতে যায় ও রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়। ব্যাঙের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়।

৪র্থ গতিপ্রবাহ ঃ ব্যাঙের মানুষে রূপান্তর ঘটে। গৃহদেবতা "নকছুমীতায়" এর পুজোর প্রচলন হল। চন্দ্রকুমার সিংহাসনে বসে। চন্দ্রমাদেব ছেলেকে অর্দ্ধচন্দ্রবাণ নিয়ে আশীর্বাদ করেন।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে এভাবে বিভক্ত করা চলে ঃ

অনেক পুরনোদিনে দূর পাহাড়ের কোলে এক জুমচাষী আর তার বৌ থাকতো। ওদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিলোনা (১)। (১) প্রাথমিক অবস্থা (ঙ)

চাষীর ছিল একটি বোন। বোনটি যখন গর্ভবতী তখন একদিন সাপের ছোবলে তার স্বামী মারা যায়। কিছুদিন পর সে-ও মারা যায় (২)। রেখে গেল একটি মেয়েকে। মেয়েটি মামা-মামীর কাছে বড় হ'তে লাগলো। ওর নাম কুফুরতি। বড় হ'বার সাথে সাথে তার রূপলাবণ্য যেন ঝরে পড়তে লাগলো। কাজকর্মেও তার জুড়ি নেই (৩)। (২) শিশুটির পিতামাতার মৃত্যু (ছ') (৩) নায়িকার গুণগত দিক

রোজ আকাশে চাঁদ উঠে, অস্ত যায়। চাঁদ উঠলেই কুফুরতি চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে। সুন্দর চাঁদের ভেতর থেকে কে একজন পুরুষ যেন কুফুরতিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। এমন সুন্দর পুরুষ কুফুর জীবনে দেখেনি। সে তাকে মনেমনে ভালোবাসে। লোকটি স্বয়ং চন্দ্রমাদেব (৪)। (৪) সংযোগকারী ক্রিয়াশীলতা (ঙ)

বসন্তকালের নিশুতিরাতে মামা-মামী ও কুফুরতি ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ঘোরে কুফুর স্বপ্ন দেখলো যেন চন্দ্রমাদেব এসে ওকে বলছে, "কুফুর আমি এসেছি, আমাকে গ্রহণ করো (৫)। সারা রাত চন্দ্রমাদেব ওর পাশেই রইলো। এমনি করে সারারাত কেটে গেল। কখন ভোর হলো মেয়ে বুঝতেই পারলোনা। মামীর ডাকে তার ঘুম ভাঙ্গলো। (৫) নায়িকার স্বপ্ন দর্শন।

চন্দ্রমাদেবের ছোঁয়ার রেশটুকু যেন তার শরীরে লেগে রইলো (৬)। পরদিন রাতে কুফুর ঘুমোলোনা। নিশুতি রাতে তিনি এলে কুফুর তাকে বসার জায়গা দিলো। সেদিন থেকে রোজ গোপনে চন্দ্রমাদেব এসে মিলিত হ'তে লাগলেন। কিছুদিন পর কুফুর সন্তানসম্ভবা হলে এই পরিবর্তন মামা-মামীর চোখে পড়লো। মামী ওকে জিজ্ঞেস করলে সে সব খুলে বললো। মেয়ের কথা শুনে মামা-মামী দুজনেই অবাক। দেবতার সঙ্গে মানুষের বিয়ে কি করে হয় (৭)?

(৬) নায়িকা স্বপ্নে চন্দ্রমাদেবের সঙ্গে কথা বলে। (ভ[৮])

সকলের কানেই কথাটা গেলে লজ্জায় মামা-মামীর মুখ দেখাবার উপায় রইলোনা। গাঁয়ের সর্দার ও বড়রা মিলিত হয়ে একদিন কুফুরের মামাকে জিজ্ঞেস করলো। কুফুর যা বলেছে মামা তা-ই সকলকে জানালো। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলোনা। উপরন্তু মামাকেই সকলে দোষী সাব্যস্ত করলো। সে লজ্জায় মাটির সঙ্গে যেন মিশে গেল। কুফুরও সব শুনলো। শুনে চোখের জল ফেললো (৮)।

(৭) সরাসরি জিজ্ঞাসার দ্বারা মামী তথ্য সংগ্রহ করে (ঐ[২])

সবদিক বিচার করে গ্রামের লোকেরা কুফুরকে গাঁ থেকে বের করে দেবার জন্য বললো। নয়তো কেউ ওদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবেনা জানালো। অগত্যা কুফুরকে এই হুকুম মানতে হ'ল (৯)।

(৮) গ্রামবাসীদের সন্দেহ।

(৯) গ্রামবাসীদের নির্দেশে কুফুরকে বহিষ্কার করে মামা মামী গ্রাম থেকে (আ[১০])

গাঁ থেকে একটু দূরে একটি ফেলে যাওয়া জুমে কুফুরকে রেখে এলে সে খুব কাঁদলো (১০)। সন্ধ্যে হ'তেই চন্দ্রমাদেব নেমে এলেন ওর পাশে। কেঁদে কেঁদে চন্দ্রমাদেবকে সবকিছু জানালে তিনি ওকে অনেককিছু বলে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি বল্লেন, "তুমি ভয় করোনা কুফুর, দূর থেকে আমি সবসময় তোমাকে দেখবো। বনের বাঘ-ভালুক তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। তোমার ছেলে ও তোমার মাধ্যমে কোনো এক দেবতার পুজোর প্রচার হ'বে বলে তোমাদের এত কষ্ট করতে হচ্ছে। শীঘ্রই তোমার কোলে আমার ছেলে আসবে। ওর দ্বারাই তোমার সব দুঃখ দূর হ'বে। তুমি যখনই ডাকবে, তখনই আমি ছুটে আসবো", বলে চন্দ্রমাদেব বিদায় নিলেন (১১)।

(১০) পুরনো গাঁয়রিঙে সে অসহায় অবস্থায় থাকে (ব[৫])

(১১) চন্দ্রমাদেব কর্তৃক নির্দেশদান (ঢ[২])

গাঁয়রিঙের পাশেই কুফুর জুম চাষ করতে লাগলো। মামা-মামীরাও কখনো সখনো এসে জুমের কাজে সাহায্য করে। সন্ধ্যেয় নেমে আসেন চন্দ্রমাদেব। রাতভর ওরা গল্প করে। তারপর কুফুরের একটি সন্তান হ'ল। মানুষ হ'লনা সে, হল একটি সোনাব্যাঙ। নাতি দেখেতো মামা-মামীর চোখ ছানাবড়া (১২)। মানুষের ঘরে কি কখনো ব্যাঙ হয়? ব্যাঙই কুফুরের নয়নের মণি। চাঁদের ছেলে বলে নাম হ'ল

(১২) অলৌকিকভাবে কুফুরের ছেলে হল সোনাব্যাঙ।

তার চন্দ্রকুমার। ব্যাঙ হ'লে কি হ'বে তার দারুণ বুদ্ধি। মাকে জিজ্ঞেস করে "বাবা কোথায় থাকেন? তিনি কেন একটা ভালা গীয়রিঙ বানিয়ে দেননা? মা বলে, "তুমি চাইলে বানিয়ে দেবে বৈকি"। ছেলে জানতে চায় কি করে সে বাবার দেখা পাবে"। মা বললো, "একমনে বাবাকে ডাকলেই তাঁর দেখা পাবে" (১৩)।

(১৩) ছেলে বড় হয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে পিতা সম্পর্কে (ঐ[১])

পরদিন ছেলে মায়ের সাহায্যে গীয়রিঙ থেকে নেমে গান গাইতে গাইতে থপ্ থপ্ করে এগিয়ে চললো। কিছুদূর গিয়েই ঝোপের আড়াল থেকে একমনে বাবাকে ডাকতে লাগলো। ছেলের ডাকে চন্দ্রমাদেব এলেন। সে নিজের ও মায়ের কষ্টের কথা বাবাকে জানালো। তিনি বল্লেন, "তুমি আমারই ছেলে বটে। কোনো এক দেবতার কারণে তুমি ব্যাঙ হয়ে আছো। কোনো নারী তোমাকে পতিত্বে বরণ করে নিলেই তোমার খোলাটি খসে যাবে। সেদিন আর খুব দূরে নয়।" চন্দ্রকুমার আশ্বস্ত হয়ে একটি গীয়রিঙ তুলে দিতে বললো। চন্দ্রকুমারও থপ্ থপ্ করে ফিরে এলো (১৪)।

(১৪) পিতার কাছে অনুরোধ (ঢ[১])

পরদিন ঘুম থেকে উঠে মা ও ছেলে দেখলো খানিকটা দূরেই এক প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর মতো গীয়রিঙ। ঘরে সব জিনিষ সাজানো রয়েছে। কুফুর ভাবলো চন্দ্রমাদেব ওদের কষ্ট দেখে ঘরটি তৈরী করে দিয়েছেন (১৫)।

(১৫) অভাব অপসারিত (অঅ)

মা ও ছেলে নতুন ঘরে উঠে এসেছে। একদিন ছেলের মনের কষ্টের কথা শুনে (১৬) চন্দ্রমাদেব বল্লেন, "সময় হ'লে ব্যাঙের খোলাটি আপনিই খসে পড়বে, তবে এখন থেকে যখন খুশী খোলাটি খুলে মানুষ হয়ে ঘোরাফেরা করতে পারবি। কিন্তু কাজ শেষ হলেই খোলাটি এঁটে ব্যাঙ হয়ে থাকতে হ'বে। কিন্তু ভুলেও যেন কেউ না দেখে" তারপর সে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজারে গেল (১৭)।

(১৬) ছেলে ব্যাঙ হয়ে চলা ফেরার অসুবিধের কথা জানায় বাবাকে (ঢ[৪])

(১৭)দাতার প্রতিক্রিয়া। ব্যাঙের খোলা খুলে রেখে মানুষের রূপ ধরে চলাফেরা করার অনুমতি দান। (এ[৫])

খোলাটি গাছের গর্তে লুকিয়ে রেখে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে ফিরে এলো গাছের গোড়ায়। লোকেরা তাকে রাজপুত্র ভেবে পথ ছেড়ে দিলো। তারপর গায়ে খোলা এঁটে ফিরে এলো গীয়রিঙে (১৮)। এতো জিনিষ সে কি করে কিনেছে তা মা জানতে চাইলে সে বললো, একজন লোক তাকে টাকা দিয়েছেন। কুফুর ভাবলো হয়তো চন্দ্রমাদেবই ওকে টাকা দিয়েছেন (১৯)।

(১৮) প্রয়োজনে ব্যাঙের মানুষে রূপান্তর (ট)

(১৯) পুত্র মায়ের কাছে সত্যগোপন করে।

চন্দ্রকুমার যৌবনে পা দিয়েছে। একদিন সে মাকে জানালো যে সে রাজবাড়ী দেখতে চায়। মা তো ভয়ে কাঠ। অনেক নিষেধ সত্ত্বেও

(২০) সে গেল (২১)। মা বলে দিলো কোনও বিপদ হ'লে যেন বাবাকে ডাকে (২২)। কিছু দূর গিয়েই সে বাবাকে ডাকলো এবং একটি তেজী ঘোড়া ও একপ্রস্থ রাজার পোষাক চেয়ে নিলো। এবার ব্যাঙের খোলা গাছের গর্তে লুকিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে রাজবাড়ীর দিকে রওয়ানা হ'ল (২৩)।

(২০) পুত্র রাজবাড়ী দেখতে চায়, পুত্রের প্রতি মায়ের নিষেধ (ঞ[১])

(২১) নিষেধ লঙ্ঘন (ড[২])

(২২) সতর্কতামূলক নির্দেশ (ঞ[১])

(২৩) অনুসন্ধানীয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ ও নতুন পোষাক পরিধান (অঅ, ট[৩])

ঘোড়াকে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে রাজবাড়ী দেখতে চললো। রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কত দাসদাসী সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। রোজদিনের মতো সেদিনও রাজকন্যা সরোবরের পাশে জলতরঙ্গ ঘরে হাওয়া খাচ্ছিল। চন্দ্রকুমারও যাচ্ছিল সেই ঘরের পাশ দিয়ে। সেই ঘর থেকে রাজকন্যা দেখলো তাকে। দেখেই রাজকন্যা তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল। দাসীকে পাঠিয়ে সে রাজপুত্রকে ডেকে আনলো। তারপর থেকে দুজনের রোজ দেখা হয়। (২৪)

(২৪) পরিচয় গোপন করে প্রতিদিন উভয়ের সাক্ষাৎ (ও)

একদিন কথাচ্ছলে রাজকুমারের পরিচয় জানতে চাইল। চন্দ্রকুমারও অকপটে তার জীবনের কহিনী শোনালো (২৫)। সব শুনে কুমারী অবাক। এমন রূপবান যুবক কি ব্যাঙ হ'তে পারে? তবুও ব্যাঙকেই বিয়ে করতে মনস্থ করলো। তাদের জাতির এক মহীয়সী নারীওতো সাপকে বরণ করেছিলেন। পরদিন কুমার ব্যাঙের খোলা গায়ে এঁটে কুমারীর সামনে এসে বলতে লাগলো, "কুমারী তোমার স্বামী এসেছে, তাকে বরণ করে নাও দেখি (২৬)। কুমারী ব্যাঙকে আদর করে বললো, "অজগরকে বরণ করলো পূণ্যবতী নারী সোনাব্যাঙকে বরণ করতে আমিও যে পারি" (২৭)।

(২৫) কুমারের পরিচয় দান (শ)

(২৬) কঠিন কাজ পরীক্ষা, মৌখিক ভাবে (ম[৩])

(২৭) কঠিন কাজ সমাধান (স)

কিছুক্ষর পর চন্দ্রকুমার জঙ্গলে গিয়ে মানুষের রূপ ধরে এসে কুমারীকে জিজ্ঞেস করলো, কি গো কুমারী, এবার তোমার সোনাব্যাঙ রাজকুমারকে দেখলে তো? ভয় পেয়োনা বাবা বলেছেন, কোনো নারী যদি আমাকে পতিরূপে বরণ করে নেয় তাহলেই দেবতার কোপ কমে যাবে। আমার খোলাটিও চিরদিনের মতো খসে যাবে। সবসময় মানুষের রূপ ধরেথাকতে পারবো। (২৮)

(২৮) কুমার নিজের দুর্ভাগ্যের অবসানের কথা বলে কুমারীকে নিশ্চিন্ত করে।

একদিন রাজা কুমারী ও কুমারকে পরস্পর গল্প করতে দেখলেন। বুড়ো মন্ত্রীকে পাঠিয়ে কুমার সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করলেন।

যেদিন ওকে দেখতে রাজার লোক এলো সেদিন চন্দ্রকুমার মা-কে শিখিয়ে দিলো, "চন্দ্রকুমার বাড়ীতে নেই" বলার জন্য। কুফুর

রাজার লোকদের খুব করে খাইয়ে দাইয়ে দিলো। ওরা খুব খুশী হল। রাজাকে এসে সব শোনালো। রাজা এই কুমারের সঙ্গেই কুমারীর বিয়ে দেবেন মনস্থ করলেন (২৯)।

(২৯) রাজার পরিদর্শন পরিক্রমা, সহায়কের সাহায্যে (ঐ[৪])

হাতীর পিঠে চড়ে ব্যাঙ এলো বিয়ে (৩০) করতে। লজ্জায় অপমানে রাজা-রানী দরজার খিল এঁটে বসে রইলেন। রাজকুমারীর বিয়ে হল ব্যাঙের সাথে (৩১)। ব্যাঙরূপী চন্দ্রকুমার বৌকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো। মা দুজনকে ঘরে নিয়ে তুললো (৩২)।

(৩০) হাতীর পিঠে চড়ে ব্যাঙ বিয়ে করতে আসে।

(৩১) কুমারের সঙ্গে কুমারীর বিবাহ (উ)

(৩২) মা ছেলে ও বৌকে বরণ করে।

দিনভর ব্যাঙ হয়ে থেকে রাতে শোবার আগে চন্দ্রকুমার খোলাটি খুলে শোয়। একদিন কুমারী চুপিচুপি উঠে খোলাটি পোড়াতে যাবে অমনি সে মানুষের স্বরে বলে উঠলো।

"রাজকন্যা, আমি নকছু মৌতায় (গৃহদেবতা)। আমার পুজোর প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমি এতোদিন কুমারের গায়ে জড়িয়ে ছিলাম (৩৩)। ঘরের এককোণে আমার পুজোর ব্যবস্থা করে দাও, তোমাদের মঙ্গল হ'বে। আমি ঘরদোর পাহারা দিয়ে গৃহস্থকে রক্ষা করে থাকি। রাজকন্যা রাজী হয়। তার হাতের বাঁধন আল্‌গা হ'তেই নকছু মৌতায় হাওয়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল (৩৪)। আগুন জ্বেলে খোলাটি তাতে ফেলতেই কুমার ভীষণ জ্বালায় চীৎকার করে উঠলো। রাজকন্যা তড়িঘড়ি পাখা এনে এগিয়ে গেল বাতাস করতে । মা এসে কিছুটা গোবর লেপে দিলো ছেলের শরীরে। ভীষণ জ্বালার পর আরাম পেয়ে চন্দ্রকুমার শান্তিতে ঘুমোলো (৩৫)।

(৩৩) গৃহদেবতা আত্মপরিচয় দেন।

(৩৪) গৃহদেবতার নির্দেশদান (ঞ[২])

(৩৫) দুর্ভাগ্যের অবসান (অঅ)

মা ছেলের মানুষরূপ দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। (৩৬)

(৩৬) নায়কের আকৃতি পরিবর্তন (ট)

এদিকে কুফুরতির মামা-মামী বুড়ো হয়ে গেছে। ওরা দুজনে এখানেই থাকে। চন্দ্রকুমারের ব্যবহারে সবাই খুব খুশী। লোকমুখে খবর জেনে জামাইকে আনতে লোক পাঠালেন রাজা। তাকে বললেন, "বাবা আমার ছেলে নেই। তুমিই এখন থেকে রাজ্যপাট দেখবে, প্রজাপালন করবে" (৩৭)।

(৩৭) রাজা কুমারকে রাজ্য দান করলেন (ঊ[৩])

খুব জাঁকজমক করে চন্দ্রকুমার সিংহাসনে বসলো। চন্দ্রমাদেব তাঁকে আশীর্বাদ করে "অর্দ্ধচন্দ্রবাণ" দিয়ে বল্লেন, "আজ থেকে তুমি চন্দ্রবংশীয় রাজা বলে পরিচিত হ'বে।" কিছুকাল পর রাজারানী ভগবানকে ডাকার জন্য মনু নদীর তীরে মায়ানি পর্বতে চলে গেলেন। সেদিন থেকে প্রজারা কুমারকে 'ফা' বলে ডাকে এবং চন্দ্রবংশীয় রাজাদের নামের সঙ্গে 'ফা' যোগ করা হয়ে থাকে।

সমগ্র কাহিনীটির আংকিক রূপটি হ'বে এমন ঃ

ঙ ছ^{২} ভ^{৯} ঐ^{২} আ^{১০} ব^{৫} ঢ^{১} ঐ^{২} ঢ^{৭} অঅ ঢ^{৪} এ^{৫} ট ঞ^{১} ড^{২} ঞ^{১} অঅ ট^{৩} ও শ ম^{৩} স ঐ^{৪} ঊ ঞ^{২} অঅ ট ঊ^{৩}

মোটিফ ঃ

মানবী ও দেবতার বিয়ের মোটিফ T111. মহাভারতের সূর্য ও কুন্তীর সহবাসে কর্ণের জন্ম এবং চন্দ্রমাদেবের (চাঁদ) সঙ্গে কুফুরতির সহবাসে চন্দ্রকুমারের জন্ম সম অভিপ্রায়জাত। ভারতীয় আদিবাসী সমাজে এই ধারণাটি রয়েছে।

আদিম সমাজ ব্যবস্থায় কুমারীর গর্ভধারণ নিন্দনীয় ছিলোনা। কিন্তু সভ্যতার উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অন্যায় বলে গৃহীত হ'ল। জারজসন্তানকে দেবতায় উন্নয়ন সার্বজনীন লোক অভিপ্রায়। নারীকর্তৃক পশুপাখির জন্মদানের মোটিফ T 500-T 599। মানুষের পোষাক গায়ে দিয়ে ব্যাঙ রূপের ঐন্দ্রজালিক গুণ থেকে মুক্তি পাওয়ার মোটিফ D 700। চন্দ্রকুমার ও রাজকুমারী উভয়ের উভয়কে দেখে প্রেমসঞ্চার T10। ব্যাঙের মানুষে রূপান্তর অভিপ্রায়টি (Motif D) কাহিনীর শেষদিকে এসেছে। ব্যাঙের চামড়া এখানে দেবতাজ্ঞানে পুজো পাচ্ছে। খোলস ও চন্দ্রকুমার দুটো আলাদাসত্তা। খোলস নিজেই এখানে কথা বলছে। উর্বরতা কেন্দ্রিক সংস্কার এখানে প্রকাশিত।

ত্রিপুরার চন্দ্রবংশীয় রাজাদের 'ফা' উপাধিধারণের কিংবদন্তীমূলক কাহিনীও এটি।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

সমাজ প্রশাসনিক রীতিনীতি দ্বারা চালিত হয়ে সমাজ মানুষ তারই অধীনস্থ হয়ে থাকে। অনেক সময় সুবিচারও সুদূরপরাহত হয়। বঞ্চিত অন্তরের অন্তঃস্থলে ক্ষোভ, প্রতিবাদ জমে থাকে। এখানে কুফুর অলৌকিকভাবে সন্তানসম্ভবা হ'লে গ্রামবাসীরা অন্যায়ভাবে তাকে গ্রামচ্যুত করে। সে প্রতিবাদী হ'তে চেয়েও হ'তে পারেনা। দারিদ্র্যও এর একটি প্রচ্ছন্ন কারণ। চন্দ্রমাদেবের সহায়তায় কুফুরের ব্যাঙরূপী ছেলে রাজকন্যাকে বিয়ে করে রাজা হয়। অর্থাৎ সামাজিক দিক থেকে নীচে অবস্থান করেও বিশেষ সহায়তায় সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছে।

লেভিষ্ট্রসের সূত্রটি অনুসরণ করে কাহিনীর দ্বান্দ্বিক পটভূমিকে এভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে যেমন,

পক্ষ ঃ (a) - কুফুরকে গ্রামচ্যুত করা হয়।

(b) - কুফুরের ক্ষোভ।

ক্রিয়াশীলতা (f)

(x) - সহায়ক চন্দ্রমাদেব

(y) - রাজা হওয়া

অর্থাৎ সংক্ষেপে, $fx(a) : fx(b) : fx(b) : fa^{-1}(y)$

চাঁদের ছেলে কাহিনীটির চিত্ররূপ ঃ

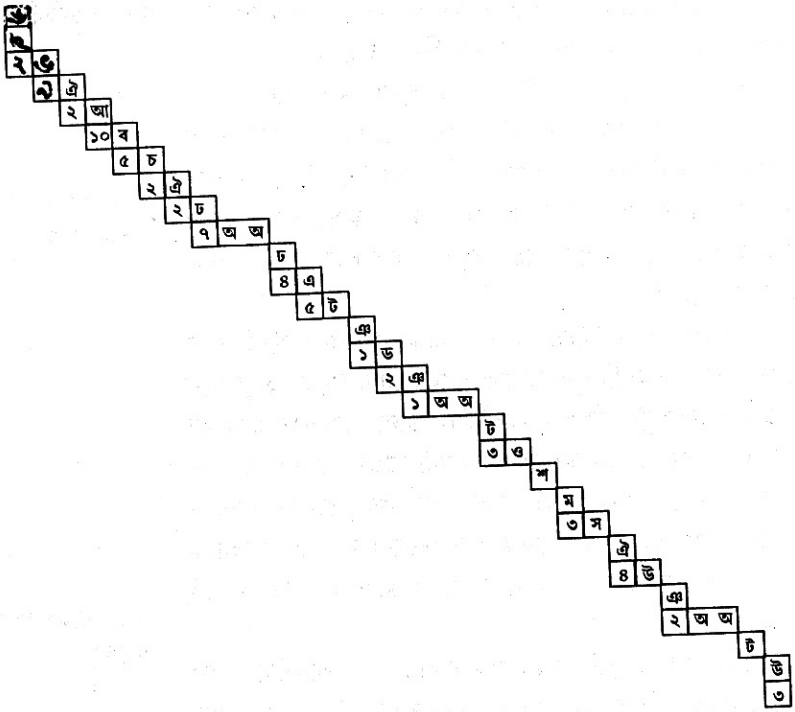

কাহিনী ঃ বাইশ

কাঞ্চনমালা

"কাঞ্চনমালা" কাহিনীটি পারিবারিক কাহিনীর অন্তর্গত, টাইপ ১৩৫০-১৪৩৯ স্বামী-স্ত্রী। কাহিনীটির দ্বিগতিপ্রবাহ সম্পন্ন।

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ সহোদর ভাইয়ের খলত্বের জন্যই যুবককে যুদ্ধে যেতে হয়। মেয়েটির শোক প্রকাশ। প্রথম প্রবাহে বিলাপ জুড়ে থাকে।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ যুবকের খল ভাই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে। মেয়েটি প্রতিদিন তার অপেক্ষায় থাকে। কোনোদিই যুবক আর ফিরে আসেনি।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

প্রাচীনকালে আমাদের এই রাজ্যের রাজার সঙ্গে অন্য কারু যুদ্ধ বাঁধলে রাজা গাঁয়েগঞ্জে "ফুরাই" পাঠাতেন। "ফুরাই" (সৈন্যদলে যোগদানের পরোয়ানা) এলেই শক্ত সমর্থ সমস্ত পুরুষকেই যুদ্ধে যোগ দিতে হত (১)। যারা পালিয়ে যেতো রাজার পুলিশ এসে (বিরিন্দিয়া) ধরে নিয়ে যেতো।

(১) জোরালো প্রাথমিক অবস্থা (ঙ১)

এভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া এক যুবকের স্ত্রীর নাম "কাঞ্চনমালা"। স্বামী স্ত্রী দুজনেই এক গাঁয়ের লোক। দুজনেই দুজনকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু খুব বেশীদিন ওদের একসঙ্গে থাকা হল না। কাঞ্চনমালার ভাসুর অনেকদিন ধরেই রাজার সৈন্যদলে কাজ করে। রাজধানীতে থাকে। কাঞ্চনমালাকে সে যখন দেখেছে, তখন ও খুব ছোট। এবার ভাইয়ের বিয়েতে এসে ভরযৌবনা কাঞ্চনমালাকে দেখে ওর খুব মনে ধরলো। যে করেই হোক কাঞ্চনমালাকে পেতেই হবে (২)।

(২) খলত্বের প্ররোচনা অনুভব।

এমনি সময়ে হাচিখুংগের যুদ্ধে যাবার খবর এসেছিল। খবর এলেও কাঞ্চনমালার বর যুদ্ধ গেল না। ঘরে নতুন বৌকে ছেড়ে যেতে মন চাইলো না। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ভাসুর। সে রাজার সৈন্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো বাড়ীতে, কাঞ্চনমালার স্বামীকে ধরে নিয়ে যেতে। সে ভেবেছিলো যে করেই হোক কাঞ্চনমালার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে হয়তো কাঞ্চনমালাকে পাওয়া যাবে (৩)।

(৩) খল সৈন্যদের দ্বারা ভাইকে অর্ন্তধানীত করে (আ৮)

ওদের দেখেই কাঞ্চনমালার বুক দুরদুর করে উঠলো। সে তাঁর স্বামীকে উদ্দেশ্য করে কেঁদে কেঁদে বললো— "তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হল, তার মঞ্চ এখনো ভাঙ্গে নি, তা মাটির ঢিপি হয়ে আছে। তোমার সঙ্গে যে বিয়ে হয়েছে, বেদীর চিহ্ন এখনো লোপ পায় নি।

বনমোরগের মতো লালে লাল হয়ে, বক পাখির মতো সাদায় সাদাময় হয়ে আসছে রাজার সৈন্যদল। ওগো প্রাণাধিক তোমার দাদাতো চাকুরী করেন, তাঁর কাছে পরামর্শ চাও। পাহাড়ে রামছাগল পাওয়া যায়, তা কিনে পুজো দাও। ডানহাতে পাঁচ টাকা ও বাঁ হাতে পাঁচ টাকা নিয়ে না হয় দাদাকে প্রণাম কর। দাদার নিকট মুক্তি প্রার্থনা কর (৪)।

(৪) দুর্ভাগ্যের কথা সরাসরি বলা ও শোকবাচক প্রকাশ (ব^{৪}, ব^{৮})

এতোক্ষণে বিরিন্দিয়ারা গীয়রিঙে ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় এসে গেছে। কাঞ্চনমালার স্বামীও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সে বললো, "সিঁড়ির গোড়ায় এসে গেছে ওরা, আর থাকতে পারবো না। ওগো প্রাণ, চোখের জল মুছে নিয়ে চালের পুঁটলি বেঁধে দাও, এসো" (৫)।

(৫) নায়িকাকে নায়কের অনুরোধ (ঢ^{১})

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে অসতেসৈন্যদল বললো, (৬) "অঞ্জনির চামড়ার মতো মসৃন পাটি পেতে রাখ। আমরা এসে বসবো"। কাঞ্চনমালা তার স্বামীকে বললো, "ওগো প্রিয়তম, আমাদের বিয়ের সময়ের ব্যবহৃত সুগন্ধ তেলের ঘ্রাণ এখনো মিলিয়ে যায় নি। বিয়ে বাড়ীর ভোজের এঁটো পাতাগুলো আজও রয়ে গেছে। বিবাহ কুঞ্জে অনুষ্ঠিত যজ্ঞস্থলীর শেষ চিহ্নটুকুও আজো মুছে যায় নি। ওগো প্রিয়তম তোমার সঙ্গে একটা রিদ্রাক এ ঘুমোব ভেবেছিলাম। কিন্তু পাছড়ার কিনারার সূতোগুলো বাদ সাধছে। আজ অব্দি এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে দিয়েও সেবা করতে পারিনি। এর মধ্যেই এসে গেল যুদ্ধে যাবার ডাক। তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাবো। তোমার কণ্ঠের রক্ত যেখানে পড়বে, আমার কণ্ঠের রক্তও সেখানে ঝরে পড়ুক (৭)।

(৬) সৈন্যদলের আগমন।

(৭) শোকবাচক প্রকাশ (ব^{৮})

কাঞ্চনমালার স্বামীও তখন বলছে— "ওগো প্রিয়তমা পশ্চিম দিকে আমরা যাবো, এসময়ে চোখের জল দেখিয়ো না। আলনার বাঁশ ধরে ম্লান মুখ করে কি ভাবছো? কাপড় রাখবে তো রাখ। "বাকা"র বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ভাতের হাঁড়ি রাখবে তো রাখো। একটি লংকারও যদি অভাব হয় তাহলে দাদার ঘরে যেও। সামান্য নুনেরও যদি অভাব হয় তবে দাদার ঘরে যেয়ো। এভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাঞ্চনমালার স্বামী সৈন্যদের সাথে চলে গেল (৮)।

(৮) নায়ক স্ত্রীকে নির্দেশ দেয় ও গৃহত্যাগ করে (ঞ^{২}↑)

দু তিনমাস পর কাঞ্চনমালার ভাসুর একা ফিরে এলো (৯)। কিন্তু তার স্বামী এলো না। ভাসুর ফিরে আসতেই কাঞ্চনমালা জিজ্ঞেস করলো — "পাটি, বালিশ ফিরে এলো, আপনার ভাইকে কোথায় রেখে এলেন? আসুন ঘরে আসুন। আপনার ভাইয়ের খবর বলুন।

(৯) খলের প্রত্যাবর্তন (↓)

আপনার ভাইয়ের জন্য মদ তৈরী করেছিলাম, তা থেকে এক পাত্র নয়, দু পাত্র নয়, তিনপাত্র মদ পান করে বলুন, আপনার ভাই কেমন আছে (১০)? দু তিন পাত্র পান করে কাঞ্চনমালার ভাসুর বললো, "হাতীর মাথার মতো গম্বুজওয়ালা পাথরের যে দালান রয়েছে, সেখানেই আমার ভাইকে রেখে এসেছি (১১)।

তারপর আর কাঞ্চনমালার স্বামীর খবর আসে নি। কিন্তু সে তার স্বামীকে ভোলে নি। আজ আসবে, কাল আসবে ভেবে ভেবে তার দিন যায়। তার স্বামী আর আসে নি। (১২)

(১০) পতির অভাব, নায়িকার অনুরোধ (অ১০ ঢ৭)

(১১) খলের প্রত্যুত্তর সাধুতার আড়ালে ছলনাজাল (ন১)

(১২) নায়ক নিরুদ্দিষ্ট পতির অভাব। (অ১)

কাহিনীর আংকিক রূপটি হবে এইরকম ঃ

ঙ১ আ৮ ব৪,৮ ঢ৭ ব৮ ঞ২ ↑↓ অ১ ঢ৭ ন১ অ১

মোটিফ ঃ লোককথার আঙ্গিকে কাহিনীটি শুরু হলেও এর মধ্যে গীতিকার আঙ্গিক মিশে গেছে।

কাঞ্চনমালার প্রেম ও বিশ্বস্ততা (স্বামী-স্ত্রী) T 215, প্রথম দর্শনে ছোটভাইয়ের স্ত্রীকে ভালো লাগা T 15, স্বামীর পথ চেয়ে কাঞ্চনমালার দিন যাওয়ার মধ্যে সতীত্বের ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। Motif 300 ফুরাইয়ের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধবিরোধী মনোভাব, যার উপর বর্তমানে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তারও প্রকাশ।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

এই কাহিনীটিতে দুটো বিরোধী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে ভাসুর ও মেয়েটিকে। ভাসুরের খলত্বের শিকার হয়েই নববিবাহিত যুবককে যুদ্ধে যেতে হয়।

পক্ষ
- a - ভাসুর
- b - মেয়েটি (ও তার স্বামী)

ক্রিয়াশীলতা (f)
- x - স্বামীর সংবাদের জন্য বারবার জিজ্ঞাসা
- y - ভাসুরের অন্যায় কামনাকে অগ্রাহ্য করা ও স্বামীর পথ চেয়ে থাকা

লেভিষ্ট্রসের $fx(a) : fy(b) : fx(b) : fa^{-1}(y)$ সূত্র অনুযায়ী এই কাহিনীতেও দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ মেয়েটির একনিষ্ঠ প্রেমের জয় সূচিত হয়।

"কাঞ্চনমালা" কাহিনীর চিত্ররূপ ঃ

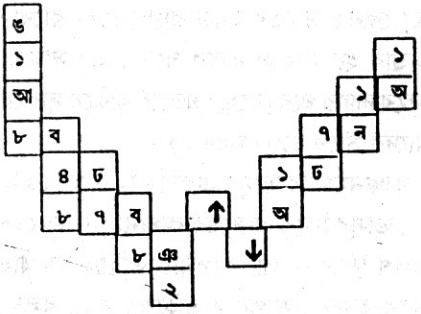

কাহিনী ঃ তেইশ

নাঐ পাখীর গল্প

"নাঐ পাখির গল্প" কাহিনীটি সাধারণ লোককথা শ্রেণীর অন্তর্গত। অলৌকিক সাহায্যকারী টাইপ ৫১০। গতিপ্রবাহের ভিত্তিতে কাহিনীটিকে এভাবে ভাগ করা যায়।

প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ জুম চাষীর দু মেয়ে খুমতি আর করমতি। জুমে গিয়ে একদিন দুবোনে সামান্য মনোমালিন্য। খুমতি দোলনায় জোরে ধাক্কা দিলে করমতি জলে পড়ে যায়। খুমতি বাড়ী চলে আসে।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ ঠাকুমা করমতিকে মাছের পেট থেকে উদ্ধার করে। সবাই মিলে খুমতিকে শাস্তি দেয় খাঁচায় আটকে রেখে। খাবার বা জল কিছুই দেয়না কেউ ওকে। পরে মাঝেমাঝে করমতি খেতে দেয়।

তৃতীয় গতিপ্রবাহ ঃ নাঐ পাখিদের কাছ থেকে পালক, নখ, ঠোঁট চেয়ে এনে খুমতি ওদের সাথে দূর আকাশে উড়ে চলে যায়। শাস্তিস্বরূপ নাঐ পাখিরা মা বাবার গায়ে মলত্যাগ করে।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে।

এক জুম চাষী। বুড়ো মা বাবা স্ত্রী ও ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে তার সংসার। মেয়েটি একেবারেই ছোট যখন এমনি সময়ে চাষীর বৌ মারা গেল। সংসারে রইলো স্বামী আর খুমতি (১)। চাষী বাধ্য হয়ে আবার বিয়ে করলো। বছর ঘুরতেই আরেকটি মেয়ে হল চাষীর। গায়ের রঙ হলুদ বর্ণ বলে ওর নাম রাখলো করমতি। করমতি আর খুমতি দুবোন এবার বড় হয়েছে, বিয়ের বয়স হয়েছে। দুবোনে খুব ভাব। একসঙ্গেই জুমের, গেরস্থালীর কাজকর্ম করে। বড়বোন খুমতির গায়ের রঙ ছিল কালো। মনটিও ছিল খারাপ। কোনো কাজেই সে করমতির সঙ্গে পেরে উঠতো না। তাই করমতিকে সে মনে মনে খুব হিংসা করতো (২)।

(১) প্রাথমিক অবস্থা (ঙ[১])

(২) ছোটবোনের প্রতি বড়বোনের ঈর্ষা

জুমের ফসল পেকেছে। ঘরে তুলতে হবে বলে দুবোন মাথায় লাঙ্গা নিয়ে জুমে গেল একদিন (৩)। বড় বোন খুমতি ফসল তোলে আর খেয়ে ফেলে। যা খেতে পারে না, তা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ফেলে। লাঙ্গাতে একটি তরকারীও রাখলো না (৪)। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটবোনের লাঙ্গা ভরে গেল। এবার বাড়ী ফেরার পালা। করমতি ডেকে বললো, "দিদি, আমার লাঙ্গাতো ভরে গেছে, তোমার কতটুকু হল চল এবার বাড়ী যাই"। খুমতি বললো, "আমি যে একটা তরকারীও খুঁজে পাচ্ছি না। কি করে লাঙ্গা ভরবে? তোর লাঙ্গা থেকে বরং আমাকে

(৩) ঘটনাস্থলে উপস্থিতি (ছ[৪])

(৪) দিদি শস্য বিনষ্ট করে (আ[৪])

কিছু দে। না হলে বাড়ী গিয়ে কি দেখাবো বল দেখি (৫)? দিদির কথায় ছোটবোন খুব বিরক্ত হল এবং বললো দিদি কাঁচা পাকা যা পেয়েছে সব খেয়ে ফেলেছে। ওর লাঙ্গা তাই ভরে নি। সবাই এক সাথে ভাগ করে খাবে বলেই সে সব নিয়ে যাচ্ছে। দিদিকে একটিও দেবে না(৬)।

খুমতি ছোটবোনের কথায় মনে মনে খুব রাগ করলেও মুখ ফুটে কিছু বললো না। দুবোন নীরবে বাড়ীর পথে চলতে লাগলো। পথেই একটা নদী পেরোতে হয়। নদীর পারে এসে খুমতি করমতিকে বললো, "চল্ করম্ আমরা এখানে একটু জিরিয়ে নিই"। নদী থেকে ওদের বাড়ী খুব দূরে ছিলো না। করম দিদির কথায় রাজী হল (৭) নদীর পার ঘেঁষে একটা বট গাছ ছিলো। ডালপালাগুলো নদীর উপর ছড়ানো। খুমতি ছোটবোনকে বললো ঐ ডালে দড়ি বেঁধে দোল খেতে খুব ভালো লাগবে। তারপর দুজনে মিলে লম্বা লতা দিয়ে একটা দোলনা বানিয়ে ফেললো। প্রথমে খুমতি দোলনায় উঠে ছোটবোনকে বললো দুলিয়ে দিতে। নীচ থেকে করম দিদিকে বললো, "দিদি তুমি তো বেশ দোল খেলে, এবার নেমে এসে আমায় দাও। আমি একটু দোল খেয়ে নিই"। করম দোলনায় বসলে খুমতি দোলাতে লাগলো। কিছুটা ফল তরকারী দিতে বলেছিল, তা-ও দেয় নি দেখে মনে মনে ফন্দী আঁটতে লাগলো (৮) ভয় পেয়ে করম বললো, "এতো জোরে দিও না দিদি পড়ে যাচ্ছি যে" (৯)। খুমতি বোনের কথায় কান না দিয়ে আচমকা দোলনায় একটা ধাক্কা দিল (১০)। টাল সামলাতে না পেরে করম নদীর জলে পড়ে গেল (১১)। ওদিকে নদীতে বোয়াল মাছ ওৎ পেতে ছিলো। খাবার ভেবে করমকে মুখে পুরে দিলো (১২)। করম মুখে এতোটুকু শব্দ করার সময় পেলো না। কাঁচা হলুদ বরণ করমতির ছোঁয়া পেয়ে নদীর সবটা জল হলুদ হয়ে গেল। ভয় পেয়ে সব তরকারীগুলো লাঙ্গায় ভরে নিয়ে খুমতি বাড়ী চলে এলো। বোন আসছে, বলে সে খেতে বসলো। খুমতির ঠাকুমা নদীতে স্নান করতে গিয়েই দেখে নদীর জল হলুদ হয়ে গেছে। এমন তো কখনো হয় নি। কেউ হয়তো হলুদ মিশিয়েছে (১৩)। ঘাটের তক্তার উপর যেমনি ঠাকুমা কাপড় কাচতে লাগলো অমনি কে যেন করুণসুরে বললো, "ও ঠাকুমা আমার পায়ে লাগছে। ঠাকুমা এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার নিজের কাজ করতে লাগলো। এবার

(৫) সাধুতার আচরণে ছলনা জাল। প্রতারণামূলক অনুরোধ (ন[১])

(৬) অনুরোধ ছোটবোন সাড়া দেয় না (জ[৩])

(৭) দিদির মধ্যে খলত্বের প্রকাশ। বোন তার অনুরোধে সাড়া দেয় (জ[১])

(৮) দিদি প্রতিশোধ মূলক কাজের সূচনা করে (চ)

(৯) ভীত হয়ে অনুরোধ (ঢ[৭])

(১০) ক্রমাগত ক্ষতিসাধনের প্রসাস (ন[২])

(১১) বোনকে নদীতে ফেলে দেয় (আ)

(১২) বোয়াল মাছ বোনকে খেয়ে নেয়।

(১৩) নদীর জল হলুদ হয়।

কে যেন বললো, "ও ঠাকুমা আমার মাথায় লাগছে"। এবার ঠাকুমার মনে হল করমতি। জিজ্ঞেস করলো, "করমতি তুই কোত্থেকে কথা বলছিস্। সে ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলো "আমি ঘাটের নীচে বোয়াল মাছের পেটে রয়েছি (১৪)। ঠাকুমা এ কথা শুনেই ঘাটের কাঠ সরিয়ে একটা প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ দেখতে পেলো। মাছটা করমতিকে গলা অব্দি গিলে রেখেছে। বুড়ী সমস্ত শক্তি দিয়ে মাছটাকে ডাঙ্গায় তুলে আনলো। ঘাট থেকে চীৎকার করে বুড়োকে একটি কাস্তে নিয়ে আসতে বললো। ঠাকুমা মাছের পেট চিরে করমতিকে বের করলো (১৫)।

করমতি কেঁদে ঠাকুমাকে সব বললো। খুমতির উপর প্রচণ্ড রাগ হল ঠাকুমার। ওরা বাড়ীতে এলো। ঠাকুমা খুমতিকে আর ছেলেকে বকতে লাগলো। মেয়ের কথা শুনে বাবা ওকে কঠিন সাজা দেবে ভাবলো এবং সবাইকে নিষেধ করে দিলো যেন ওকে কেউ কিছু না বলে (১৬)। পরদিন ভোরে খুমতির বাবা প্রকাণ্ড একটা বাঁশের খাঁচা বানালো। সেটা যেমন প্রকাণ্ড তেমনই মজবুত। খাঁচা বাঁধা শেষ হলে মেয়েকে বললো, "দেখতো এর ভেতরে দাঁড়াতে পারিস্ কিনা।" মেয়ে ভেতরে ঢোকামাত্রই বাবা খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিলো (১৭)। ভয় পেয়ে মেয়ে অনেক কাঁদলো, কাকুতি মিনতি করলো দরজা খুলে দেবার জন্য (১৮) কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে বাবা ওকে বকতে লাগলো, "হতচ্ছাড়ী তুই করমকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলি। তার সাজা তোকে পেতেই হবে।"

খাঁচার ভেতরে রোদে, জলে হিমে খুবই কষ্টে খুমতির দিন কাটছে (১৯)। ক্ষিদে তৃষ্ণায় কেউ ওকে একফোঁটা জল বা খাবার দেয় না (২০)। সেদিন রাতভোর হতেই বাড়ীর সবাই যে যার মতো জুমের কাজে গেলে খুমতি ছোটবোনকে একটু জল এনে দিতে বললো ও (২১) ক্ষমা করতে বললো। বোন এবার সুযোগ বুঝে দিদিকে একটা বাঁশের ডগায় দুটো ভাতের মোচা ও একচোঙ্গা জল দিয়ে বললো যেন এই কথা আর কেউ না জানে। এভাবে মাঝেমাঝে খাবার দিয়ে ছোটবোন দিদিকে বাঁচিয়ে রাখলো (২২)।

দুপুরবেলা সবাই যখন জুমে চলে যায় খুমতি উড়ন্ত নাঐ পাখিদের দিকে চেয়ে ভাবতো যদি সেও ঐ পাখিদের মতো উড়ে বেড়াতে পারতো (২৩)। হঠাৎ একদিন অজান্তেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল করুণ সুর "ওগো আমার নাঐ পাখি বারেক ফিরে চাও নীল

(১৪) সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ°)

(১৫) সহায়কের সাহায্যে বোয়াল মাছের পেট থেকে মেয়েটির উদ্ধারলাভ।

(১৬) সবাই বড়বোনকে শাস্তি দেবার কথা ভাবে। তাকে তিরস্কার করে।

(১৭) ছলনায় যান্ত্রিকভাবে মেয়েটি সাড়া দেয় (জ°)

(১৮) আবদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির জন্য অনুরোধ (ঢ°)

(১৯) শারীরিক পীড়ন করা হয়। তাকে হত্যার উদ্যোগ গ্রহণ (পর°)

(২০) খেতেও দেয়া হয় না (অ°)

(২১) ছোটবোনকে একটু খাবার জল দিতে অনুরোধ করে এবং ক্ষমা করতে বলে (ঢ°, ঢ১)

(২২) আবেদকের প্রতি নায়িকার করুণা প্রদর্শন ও সেবামূলক কাজ (এ৭.৭) জীবনরক্ষা করে।

(২৩) মুক্তির আকাঙ্খা। অভাববোধ (অ°)

আকাশে উড়তে সাধ পালক এনে দাও''। খুমতির করুণ বিলাপে পাখিদের মন ভিজে গেল (২৪)। দলবেঁধে এসে ওরা সবাই খুমতিকে এক একটি পালক দিয়ে গেল। পরদিন নখর এনে দিলো (২৫)। সবকিছু সে গুছিয়ে রেখে বাবার অনুপস্থিতিতে সৎমা-য়ের কাছে সূঁচ ও সুতো চাইলো। মা দিলোনা দেখে ঠাকুমার কাছে চাইলো। ঠাকুমা সূঁচ সুতো দিলে সে এবার নখ, পালক, ঠোঁটগুলোকে জড়ো করে একটা সুন্দর নাঐ পাখির পোষাক তৈরী করলো। তারপর পোষাকটি গায়ে দেয়ামাত্রই (২৬) তার গায়ে নাঐ পাখির মতো প্রচণ্ড শক্তি এলো।

এবার খাঁচা ভেঙ্গে একদিন ভোরে দুপাখা নেড়ে গাছের ডালে গিয়ে বসলো। মুক্তির আনন্দে (২৭) দু পাখা নেড়ে বাড়ীর উপর বেড়াতে লাগলো (২৮) আর দূর আকাশের দিকে নাঐ পাখিদের ডেকে বলতে লাগলো।

''ওই আকাশে ক্ষণেক দাঁড়াও
আমায় নিয়ে যাও
উড়ে যাবো নীল আকাশে ডানায় শক্তি দাও''। খুমতিকে আকাশে উড়তে দেখে সবাই এসে উঠোনে জড়ো হয়েছে। মা বাবা ওকে বারবার ফিরে আসতে বললো (২৯)। কিন্তু ও বললো, ওর ক্ষিধে তৃষ্ণায় কেউ একবিন্দু জল বা খাবার ওকে দেয় নি। এদের চেয়ে নীলাকাশের পাখিরা অনেক বেশী আপন (৩০)। করম্‌কে মেরে ফেলার ইচ্ছে ওর ছিল না। শুধু কপালমন্দ বলেই বোয়ালমাছ ওকে গিলে ফেলেছিলো। করম্‌কে উদ্দেশ্য করে বললো, '' তোর কথা কখনো ভুলতে পারবো না। খাবার ও জল দিয়ে তুই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিস। তোর ভালো ঘরে বিয়ে হবে। তুই সুখী হবি। তোর হলুদবরণ দেহের ছোঁয়ায় নদীটির নাম হবে হলুদবরণ নদী''।

খুমতির আহ্বানে দলে দলে নাঐ পাখিরা ওদের বাড়ীর উপর এসে উড়তে লাগলো। যাবার আগে (৩১) শেষবারের মতো বোনকে ডেকে বললো, ''তুই ঘরে চলে যা'' আর নাঐ পাখিদের বললো উড়ে যেতে যেতে ওরা ওদের দেহের যত ময়লা আছে, সব যেন মা বাবার গায়ে ফেলে। সাথে সাথে পাখিরা খুমতির মা বাবার গায়ে মলত্যাগ করলো (৩২)।

সুদূর পাহাড়ের গায়ে ''তীয় করম্‌'' নদী আজো দুবোনের সেই করুণ কাহিনী আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

(২৪) পাখিদের কাছে অনুরোধ করে (ঢ[১])
(২৫) নাঐ পাখি সহায়ক হয় (ভ[৯])
(২৬) নতুন পোষাক পরিধান (ট[৩])
(২৭) বন্দীর মুক্তি (অঅ[১০])
(২৮) গৃহত্যাগ (ণ[১])
(২৯) নায়িকাকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান (ব[৩])
(৩০) অনুরোধে সাড়া না দেয়া (এ[১])
(৩১) নায়িকার পাখিতে রূপান্তর ও আত্মরক্ষা (রস[৩])
(৩২) প্রতিশোধমূলক কাজ (চ) ও দূর আকাশে মেয়েটির যাত্রা (গ[১])

কাহিনীর আংকিক রূপ ঃ

ঙ১ ছ৪ আ৪ ন১ জ৩ জ১ চ ঢ৭ ন২ আ ঐ৩ জ২ ঢ৪ পর৬ অ৬ ঢ৫ ঢ৭ এ৫ এ৭ অ৬ ঢ৭ ভ১ ট৩ অঅ১০ ↑ ব৩ এ২ রস৬ চ গ১

মোটিফ ঃ মিথ এর ছোঁয়া থাকা এই কাহিনীর মূল মোটিফ্ রূপান্তর, মানুষ থেকে পাখিতে— D 150 মানুষের আকাশে পাখি হয়ে উড়ার ইচ্ছে চিরন্তন। অন্যান্য মোটিফগুলোর মধ্যে হিংসুক বোন — K 242.1, ছলনা করে (বড়বোনকে) খাঁচায় বন্দী করা— K 711

বোয়ালমাছ সর্বগ্রাসী বলেই চিহ্নিত। বোয়ালমাছের কন্যা গলাধঃকরণ ও পুনরুদ্ধার অভিপ্রায়টি B 210। বাবা মায়ের গায়ে পাখিদের নোংরা ফেলে দেয়া Q. 410। নাঐ পাখিদের দেয়া পালক, নখ ইত্যাদির দ্বারা তৈরী পোষাক গায়ে দেয়ামাত্র খুমতির শরীরে অনন্য শক্তির প্রকাশের দ্বারা জাদুর অধিকারী বস্তুর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মোটিফ্ - D 1700 । খুমতি করমতিকে যে আশীর্বাদ করলো ভালো ঘরে তার বিয়ে হবে, সে সুখী হবে, এর মধ্যে ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রকাশের ইঙ্গিত রয়েছে। এটি D motif - এর অন্তর্গত। অবিবেচক পিতার শাস্তিপ্রদত্ত কন্যাকে ফিরে আসার অনুরোধ L-motif - এর অন্তর্গত। খুমতির নাঐ পাখি হয়ে আকাশ ভ্রমণ F-10 । করমতি (হলুদ) নামের মধ্যে এবং তার দেহের ছোঁয়ায় নদীর রঙ হলুদ হয়ে যাবার মধ্যে অরণ্যচারী মানুষের নান্দনিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়াও বলা যায়, উড়িষ্যার সীমান্ত সন্নিহিত নদী সুবর্ণরেখার জলও হলুদবর্ণ। সোনার বরণ রাশিরাশি স্বর্ণকণিকাই এর উৎস। হয়তো এখানে করম্ নদীর জলের নীচে এরকম কোনো সুবর্ণকণিকার অস্তিত্বই এই হলুদবরণ হবার কারণ। এখানকার আদিবাসীরা সোনার ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো বলে এই নদীর হলুদবরণ হবার কারণকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হ'তে পারে। নাঐ পাখি একধরণের ছোট্ট বাজ পাখি।

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

ঈর্ষাজনিত কারণেই বড়বোন ছোটবোনকে নদীতে ফেলে দেয় এবং তার ফলে বোয়াল মাছ ওকে খেয়ে ফেলে। এই দুষ্কর্মের জন্য সে যে শাস্তি পায় তার মধ্যেও বাড়াবাড়ি রয়েছে। লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়। এই গুরুদণ্ড থেকে মুক্তি পাবার জন্য নীলাকাশে উড়ে যেতে উন্মুখ প্রার্থনা জানায়। এখানে মেয়েটি সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে উঠেছে। বিচারের নামে এটি তার কাছে প্রহসন বলে মনে হয়। অন্যায় শাস্তির প্রতিশোধ গ্রহণে সে তৎপর হয়ে উঠে। এটি আসলে সমাজ মানুষের এক চিরন্তন সমস্যা। দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব এভাবেই কাহিনীতে ফুটে উঠেছে। প্রথমে খলত্ব (ঈর্ষা) থাকলেও পরে ছোটবোনের সহায়তায়ই অবিচারের হাত থেকে মুক্তি পায় ও শাস্তিদাতাকে শাস্তি দেয়। লেভিস্ট্রসের সূত্রটিকে এখানে এভাবে প্রয়োগ করা যায় ঃ

পক্ষ a - অল্পদোষে অধিক সাজা (বাবা ও অন্যান্যরা)

b - শাস্তিপ্রাপ্ত মেয়েটি

ক্রিয়াশীলতা (f)

X - মুক্তির জন্য প্রার্থনা

Y - নীলাকাশে মুক্তির স্বাদ ও বাবা মায়ের শাস্তি।

অর্থাৎ $fx(a) : fy(b) : fx(b) : fa^{-1}(y)$

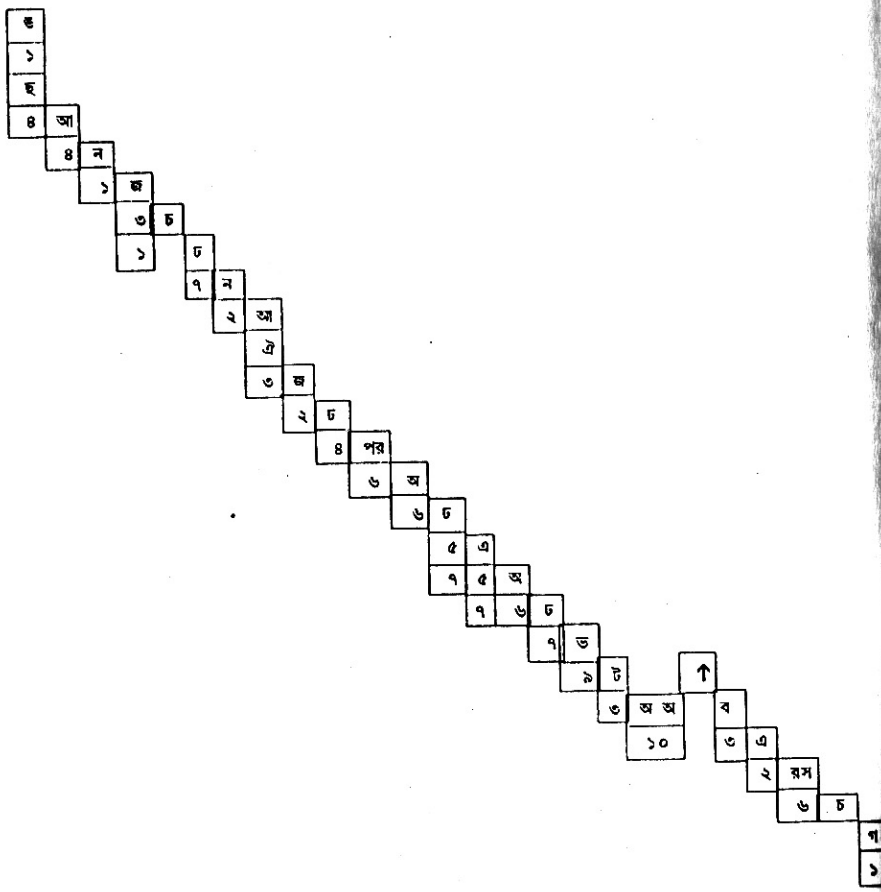

কাহিনী ঃ চব্বিশ

বিগ্রাছা

"বিগ্রাছা" নামক লোককথাটি সাধারণ লোককথার অন্তর্গত টাইপ ৫৬০-৬৪৯ যাদু ও ঐন্দ্রজালিক বস্তু কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বি-গতি প্রবাহ সম্পন্ন কাহিনী এটি।

গতিপ্রবাহ অনুসারে কাহিনীটিকে এভাবে বিভক্ত করা চলে। প্রথম গতিপ্রবাহ ঃ একজন গরিব লোক বাঁশের ব্যাপারী, সে বুড়ো হলে তার ছেলেও একই কাজ করে। সে একবার কুমীর, ভোঁদড়, বেড়াল, কেনে। কুমীরের সঙ্গে তার বাড়ীতে গিয়ে সে 'ছিরংগতি' (মণিমুক্তোখচিত আঙটি) পায়। ছিরংগতির সাহায্যেই সে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় গতিপ্রবাহ ঃ রাজকন্যা আংটির সাহায্যে তার ঘোড়াসহ পলায়ন করে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে। ভোঁদড় আর বেড়ালের সাহায্যে আংটি ফেরৎ পাওয়া যায়। আংটির সাহায্যে রাজকন্যার মন্দিরকে সাতসমুদ্র তেরোনদীর পার থেকে উঠিয়ে আনা যায়। রাজা এককোপে কন্যা ও ঘোড়াকে কেটে ফেললেন।

ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে কাহিনীটিকে বিভক্ত করা হল ঃ

বহুদিন আগে রাজবাড়ীর কিছু দূরে থাকতো একজন লোক। সে বাঁশের ব্যাপারী ছিলো। বাবার মৃত্যুর পর তার ছেলেও বাঁশের ব্যবসাই করতো তার নাম ছিলো বিগ্রাছা (১)। একদিন বিগ্রাছা বাঁশ বিক্রী করে মেলায় ঢুকলো (২) কিছু পছন্দসই জিনিষ কিনবে বলে। কিন্তু কিছুই সে দেখতে পেলোনা। অবাক হয়ে দেখলো মেলার একদিকে যত রাজ্যের জীবজন্তু বিক্রী হচ্ছে। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক সবই আছে সেখানে। তার পছন্দ হ'ল একটা কুমীর, একটা ভোঁদড় আর একটা বেড়াল (৩)। সেগুলোকে নিয়ে বাঁশের ভেলায় উঠে ভেলা ছেড়ে দিলো বাড়ীর উদ্দেশে (৪)। রাত হয়ে এলে একটা পাহাড়ের নীচে ভেলাটা বাঁধলো। গভীর রাতে বিগ্রাছা ঘুমিয়ে পড়লো। তখন ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলো কুমীর তাকে বলছে, "বিগ্রাছা তুমি আমাদের ধর্মের বন্ধু, আমাদের ছেড়ে দাও। আমাদের নিয়ে তোমার কোনো কাজ হবেনা। বসিয়ে খাওয়াতে হ'বে। তার থেকে বরং আমাদের ছেড়ে দাও, যখন কোনো বিপদে আপদে পড়বে আমাদের ডেকো, আমরা ঠিক তোমার কাছে এসে হাজির হ'বো (৫)।

বিগ্রাছাকে ওরা ধর্মের বন্ধু বলে ডেকেছে, তাই সে তাদের ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো (৬)। তখন কুমীর তাকে বললো কুমীরের দেশে যাবার জন্য। বিড়াল আর ভোঁদড়কে মুক্ত করে দিয়ে কুমীরের

(১) প্রাথমিক অবস্থা (ঙ)

(২) নায়কের স্থানগত পরিবর্তন, মেলায় যায় (↑)

(৩) যাদুনিমিত্তের ক্রয় (ভ)

(৪) বাড়ীর পথে রওয়ানা হয় (↓)

(৫) সহায়কের অনুরোধ (ঢ^{s})

(৬) অনুরোধে সাড়া দেয়া (এ^{s})

পিঠে চড়ে সে কুমীরের দেশে রওয়ানা হ'ল। কুমীর তাকে বললো, "বন্ধু তোমাকে কেউ কিছু করবেনা। তবে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে আমার ঠাকুরদা, ঠাকুরমাকে প্রণাম করো। ঠাকুমা তখন অনেক কিছু দিতে চাইবে। তুমি অন্য কিছু না নিয়ে ঠাকুমাকে বলবে, "ঠাকুমা আমি অন্য কিছু চাইনা, শুধু তোমার পেটের মধ্যে যে "ছিরংগতি" আছে (মণিমুক্তা খচিত আংটি), সেটা আমাকে দাও, আমি আর কোনো কিছু নেবোনা"। (৭)

(৭) যাদুনিমিত্ত নায়ককে সাহায্য করে (ভ[৪])

কুমীরের বাড়ীতে পৌঁছে বিগ্রাছা কুমীরের কথামতো ঠাকুমার কাছে ছিরংগতি চাইলো। ঠাকুমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "নাতি, তুমি ছিরংগতি নিয়ে কি করবে? ওটা সোনাও নয়, রূপো নয়, এই আংটি কেউ নেয়? এর থেকে তুমি কাড়ি কাড়ি রূপো মোহর নিয়ে যাও তোমার দেশে"। বিগ্রাছা বারবার ছিরংগতির কথা বলায় ঠাকুমা পেট থেকে ছিরংগতি উগরে বের করে বিগ্রাছার হাতে দিলো। ছিরংগতি পেয়ে নাতি তো খুব খুশী (৮)। সঙ্গে সঙ্গে সে অনামিকাতে তা পরে নিলো। এরপর আরো কদিন থাকলো বিগ্রাছা কুমীরের রাজ্যে। কত বিচিত্র রকম কুমীর দেখলো সে কুমীরের রাজ্যে। কিন্তু বাড়ী ফেরার জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বুড়ো বাবা কি করছে কে জানে? সে এসেছে বেশ ক'দিন হ'ল। ঘরে তেল নেই, নুন নেই, নিশ্চয়ই তার কষ্ট হচ্ছে। কুমীর-বন্ধুর পিঠে চড়ে বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা হ'ল (৯)।

(৮) অনুসন্ধানীয় বস্তু বুদ্ধির সাহায্যে হস্তগত হয় (অঅ[১])

(৯) বাড়ীর পথে যাত্রা, জলপথে যায় নায়ক (গ[২])

যেতে যেতে কুমীর-বন্ধুকে বিগ্রাছা বললো, "আচ্ছা বন্ধু এই ছিরংগতি দিয়ে আমি কি করবো? তার চেয়ে সোনা রূপো মণিমুক্তো আনলে আমার মতো গরীব লোক বেঁচে যেতো" কুমীর বললো "এই ছিরংগতির কাছে যখন যা চাইবে, তা-ই পাবে। সোনা রূপো মোহর মুক্তো একবার চাইলেই হ'ল সঙ্গে সঙ্গে সব হাজির হ'বে তোমার সামনে। আসলে "ছিরংগতি" একটি জাদু আংটি। তার কাছে যা চাওয়া যায়, তা-ই পাওয়া যায়।

সব শুনেতো কুমীর অবাক। কুমীর বললো, "যা চাইবে সব রাত্রিতে সবাই যখন খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে থাকবে তখন। গভীর রাতে ছিরংগতির সঙ্গে তোমার কথোপকথন যেন কেউ না শোনে"।

বিপদে আপদে বিগ্রাছা যেন কুমীরকে স্মরণ করে, একথা বলে কুমীর জলের নীচে তলিয়ে গেল (১০)। এদিকে বাড়ী ফিরে দেখে

(১০) যাদুনিমিত্ত সম্পর্কে নির্দেশ (ভ[২])

বিগ্রাছার বাবা ছেলের জন্য চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছে। ঘরে তেল, নুন, ধান কিছু নেই। এক প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে সে সবকিছু ধার করে এনে দিনটা কোনোরকমে চালিয়ে দিলো। তারপর রাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। গভীররাতে বাবা ঘুমিয়ে পড়লে বিগ্রাছা হাতের অনামিকায় থাকা ছিরংগতির দিকে চেয়ে বললো, "ছিরংগতি, তুমি কার?" আংটি বললো, 'আমি আগে বুড়ী কুমীরের, এখন আমি বিগ্রাছার"। বিগ্রাছা বললো, "তাই যদি হয় তবে তুমি আজ রাতের মধ্যে আমার ঘরে মন মন চাল তেল নুন সব এনে দাও, আমার ঘরে কিছু নেই" (১১)।

(১১) নায়ক যাদু আংটির সঙ্গে কথা বলে। অনুরোধ (ঢ')। নায়ক বাড়ী আসে। (↓)

ভোর হ'তে তার ঘরে সব ভরে যায় (১২)। বিগ্রাছা মনে মনে ভাবে ছিরংগতির কাছে যদি সব পাওয়া যায় তাহলে তো অনায়াসে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে পারে (১৩)। বাবাকে তার ইচ্ছের কথা জানালে বুড়ো বাঁশ ব্যাপারী বাবার দুচোখ কপালে উঠে যায়। কিন্তু ছেলে বারবার অনুরোধ করাতে বাবা রাজবাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়। রাজামশাই তখন রাজপ্রাসাদের সামনে হাওয়া খাচ্ছিলেন। বাবা ভয়ে রাজার সাথে কথা না বলেই বাড়ী ফিরে গেল। পরদিন আবার ছেলের অনুরোধে রাজবাড়ীর দিকে গিয়ে রাজার কাছে ছেলের ইচ্ছের কথা জানালো। সব শুনে রাজা বললেন যে, "যদি বিগ্রাছা এক রাতের মধ্যে রাজার রাজপ্রাসাদের মতো প্রাসাদ তৈরী করতে পারে, প্রাসাদের চারদিকে দীঘি কাটতে পারে, তাহ'লেই তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হ'তে পারে (১৪)। আরেকটি শর্ত হ'ল তার বাড়ী থেকে রাজবাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তা করতে হ'বে, আর সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলবে"। রাজাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বাবা বাড়ী ফিরে এসে ভয়ে ভয়ে ছেলেকে এই শর্তের কথা জানালে ছেলে মুচকি হাসলো। সারাদিন সে ভাবতে লাগলো রাজকন্যার কথা, আর অপেক্ষা করতে লাগলো রাতের জন্য। রাত হলে সে ছিরংগতিকে বললো, "আজ রাতের মধ্যে আমার বাড়ী রাজবাড়ীর মতো করে দাও। আর তার চারধারে কেটে দাও চারটি দীঘি। রাজবাড়ী থেকে আমার এই বাড়ী পর্যন্ত করে দিতে হ'বে পাকা সড়ক, সেই সড়ক দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলবে, তবেই আমার সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে হ'বে।" বিগ্রাছার কথা শুনে ছিরংগতিও চুপ করে রইলো, বিগ্রাছাও ঘুমিয়ে রইলো। ঘুম ভাঙতেই দেখে রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে সে। সবে ভোর হয়েছে। বুড়ো বাবাও ঘুম থেকে উঠে সব দেখে অবাক।

(১২) জাদু আংটির সাহায্যে দারিদ্র্য মুক্তি (অঅ°)

(১৩) নায়ক রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায়।

(১৪) নায়কের নির্বাচন মূলক ভাগ্য পরীক্ষা (ম°)

ওদিকে ভোরে ফুলবাগানে হাওয়া খেতে বেরিয়ে রাজা দেখলেন দূরে রাজপ্রাসাদের মতো এক বাড়ী। তাড়াতাড়ি উজীরকে বাঁশ ব্যাপারীর বাড়ীর দিকে পাঠালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে উজীর ফিরে এসে সব ঘটনা রাজাকে জানালেন (১৫)। রাজা, রাণী এবং রাজকন্যাকে একথা জানালেন। রাণী ও রাজকন্যার অনিচ্ছা সত্বেও একদিন বিগ্রাছার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হ'ল (১৬)।

(১৫) জাদু আংটির সহায়তায় নায়ক কাজ সম্পন্ন করে (স)
(১৬) বিবাহ (উ)

বিয়ের পর প্রতিদিন রাজকন্যাকে বিগ্রাছা নিত্যনতুন হীরে মুক্তোর অলংকারে সাজাতে লাগলো। তবু যেন রাজকন্যা খুশী নয়। সবসময় বিষণ্ন হয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করলে বলে, "কিছু নয়, ভালোইতো আছি"। এইভাবে কদিন কেটে গেল। বিগ্রাছা রোজরাতে সোনার পালঙ্কে রাজকন্যাকে নিয়ে শোয়। রোজ রাতে ছিরংগতির সঙ্গে কথা বলে বিগ্রাছা আর সে যা চায় সব ঘরে এসে যায়। একদিন রাতে বিগ্রাছা ছিরংগতির সঙ্গে কথা বলছিল যখন, রাজকন্যার ঘুম ভেঙে গেল। সে সব কথা শুনলো। পরদিন সকালে বিগ্রাছা যখন রাজকন্যাকে জড়ি দেয়া দামী জামাকাপড় হীরা মোতি উপহার দিলো রাজকন্যা জড়িয়ে ধরলো বিগ্রাছাকে। এমন ভাব দেখালো যেন সে বেজায় খুশী। রাজকন্যা বুঝলো ছিরংগতির জন্যই বিগ্রাছা প্রাসাদ তুল্য বাড়ী করেছে। রোজ রাতে জাদু আংটি সব ঐশ্বর্য্য নিয়ে আসে। তবে যাই হোক, সে বাঁশ ব্যাপারীর সঙ্গে থাকতে পারবেনা। তাকে বিগ্রাছার কবল থেকে মুক্ত হ'তেই হ'বে। এইসব ভাবতে ভাবতে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে ঠিক করলো বিগ্রাছা যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন তার আঙুল থেকে ছিরংগতি খুলে নিয়ে পালিয়ে যাবে (১৭)।

(১৭) রাজকুমারীর খলত্ব (আ)

তারপর রাতে বিগ্রাছার হাত থেকে আংটি খুলে নিয়ে তাকে বললো সাতসমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে একটা মন্দির গড়ে দিতে। একটা ইঁদুর যাবার মতো ছিদ্র থাকবে শুধু। আর সেই মন্দিরে রাজকন্যাকে তার খেলার ঘোড়াসমেত রেখে আসতে হবে। তারপর সে বিগ্রাছার পাশে এসে শুয়ে পড়লো।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে বিগ্রাছা দেখলো রাজকন্যা পাশে নেই, ছিরংগতিও নেই (১৮)। সে বুঝলো রাজকন্যা আংটির সাহায্যে পালিয়েছে।

(১৮) রাজকন্যা আংটি চুরি করে (আ[১])

এই খবর শুনে রাজা রেগে আগুন, রাণী দুঃখে চুল ছিঁড়তে

লাগলেন। বিগ্রাছা রাজকন্যার খোঁজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। যেতে যেতে সে একদিন সাগরের ধারে এসে পৌঁছুলো। সেই সাগরের ধারে ছিলো একটা উঁচু গাছ। সেই গাছের তলায় বসে সে ভাবতে লাগলো তার দুঃখের কথা। এমন সময় তাঁর ধর্মবন্ধু কুমীর, ভোঁদড় আর বিড়ালের কথা মনে পড়লো। সে বন্ধুদের স্মরণ করলো চোখ বুঁজে (১৯)। চোখ খুলেই দেখে তারা তিনজন হেসে হেসে এদিকেই আসছে। বিগ্রাছা বন্ধুদের সব কথা জানালো। সব কথা শুনে বিড়াল ও ভোঁদড় চললো সাগরপারে। হঠাৎ লক্ষ্য করলো একটা ইঁদুর কলসি করে জল ভরতে এসেছে ঘাটে। ইঁদুর বিড়ালকে বললো, "বন্ধু আমাকে মেরোনা। আমি মরে গেলে রাজকন্যে জল না খেতে পেয়ে মরে যাবে"।

(১৯) নায়ক সহায়ক বন্ধুদের স্মরণ করে।

বিড়াল তখন জানতে চাইলো এই রাজকন্যের হাতের আঙুলে কোনো আংটি আছে কিনা। তখন ইঁদুর বললো "রাজকন্যা একটি আংটি সবসময় আঙুলে পরে থাকে"। বিড়ালের অনুরোধে ইঁদুর রাজকন্যার হাত থেকে আংটি খুলে নিতে গেল কিন্তু সেটা পড়ে গেল কন্যার বুকের উপর আর ঘুমের ঘোরে কন্যা আংটিটি মুখে পুরে দিলো। বিপদাপন্ন হয়ে ইঁদুর বিড়ালের সঙ্গে পরামর্শ করতে সাগরপারে এলো ও বিড়ালের কথামতো লেজটা রাজকন্যার নাকে পুরে দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা হাঁচি দিলো ও আংটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে বিছানায় পড়লো। রাজকন্যা টেরও পেলোনা। আংটি নিয়ে ইঁদুর গেল বিড়ালের কাছে। বিড়াল ভোঁদড়ের পিঠে চড়ে বিগ্রাছার কাছে গিয়ে তাঁকে "ছিরংগতি" দিলো (২০)।

(২০) বন্ধু দের সহায়তায় নায়ক আংটি ফেরৎ পায়। (ভ)

বিগ্রাছা রাতে ছিরংগতিকে বললো সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে মন্দির শুদ্ধ রাজকন্যাকে উঠিয়ে আনতে (২১)।

(২১) জাদু আংটি মন্দির শুদ্ধ রাজকন্যাকে উঠিয়ে আনে (ভ)

খুব ভোরে বিগ্রাছা দেখে তার অট্টালিকার পাশেই বড় মন্দির। একটু পরেই রাজা এলেন লোকজন নিয়ে। রাজার আদেশে মন্দির ভেঙে ফেলা হ'ল। দেখা গেল, রাজকন্যা আর তার ঘোড়া ঘুমিয়ে আছে। রাজা রেগে গিয়ে তরবারি দিয়ে রাজকন্যা ও ঘোড়াকে কেটে ফেল্লেন। (২২)

(২২) রাজা রাজকন্যা ও ঘোড়াকে কেটে ফেলে (উ)

কাহিনীটির আংকিক রূপটি হ'বে এরকম ঃ

ঙ ↑ভ[৪] ↓ ঢ[৪] এ[৪] ভ[৯] অ অ[১] গ[২] ভ[২] ↓ ঢ[৭] অ অ[৬] ম[৪] স ঊ আ[২] ভ[৯] উ।

মোটিফ ঃ

'বিগ্রাছা' নামক লোককথাটির মূল মোটিফ ছিরংগতির (জাদু আংটি) motif D-1076 এ ছাড়া অন্যান্য মোটিফগুলো পাওয়া যাচ্ছে এরকমভাবে, যেমন কথা বলা পশু (কুমীর) - B 10 , কুমীরের রাজ্যে যাওয়া B-220 , সাহায্যকারী বিশেষ জন্তু B-431, জীবজন্তু মানুষের বহনকারী B 550 , কারু সামনে ছিরংগতির সঙ্গে কথা না বলার নির্দেশ দান C-motif -এর অন্দর্গত। ম্যাজিক আংটি হারানো D-860, ম্যাজিক আংটি ফেরৎ পাওয়া D 880, ম্যাজিক প্রাসাদ D-1132 , যাদু আংটি পরে অসাধ্যসাধন D 1470 বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা সৎপাত্র নির্বাচন H 310 , স্ত্রীর প্রতারণা ও পলায়ন K motif-এর অন্তর্গত। রাজকন্যার শাস্তি Q-241.

অন্যান্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ঃ

এই কাহিনীটিতে বিরুদ্ধ শক্তি দুটোকে এভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। একটি বিগ্রাছা'র দারিদ্র্য, অন্যটি দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের স্পৃহা। কাঠামো বিশ্লেষণের দ্বারা সমাজজীবনের এক চিরকালীন সত্য ধরা পড়ে। দারিদ্র্য একদিকে যেমন মানুষের জীবনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তেমনি চেতনে-অবচেতনে মানুষ যেভাবেই হোক তাকে অতিক্রম করে যেতে চায়। সামাজিক দিক থেকে নীচে অবস্থান করেও নায়ক একটি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'তে পেরেছে সহায়ক ছিরংগতির সাহায্যে। অর্থাৎ সর্বশেষ সমাধান হিসেবে বিগ্রাছার সমস্ত অন্তরায় অপসৃত হয়েছে, এমনকি তাঁর স্ত্রীর খলত্বও। এই পর্যায়টি $fa^{-1}(y)$ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। তাহ'লে লেভিস্ট্রসের সূত্রটিকে এই কাহিনীতে এভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে ঃ

পক্ষ (a) দারিদ্র্য

(b) দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের স্পৃহা

ক্রিয়াশীলতা (f)

X- সহায়ক (ছিরংগতি)

Y - দারিদ্র্য অপসারণ।

আঙ্কিক ফর্মুলায় কাহিনীটিকে এভাবে দেখানো যায়—

$fx\ (a) : fy\ (b) : fx\ (b) : fa^{-1}\ (y)$

"বিগ্রাছা" কাহিনীটির চিত্ররূপ ঃ

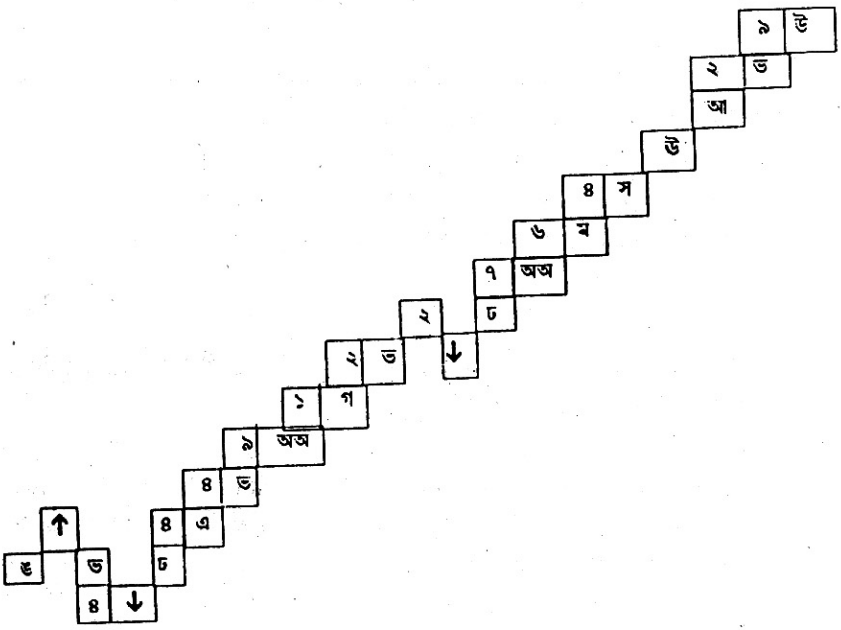

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সূত্রউল্লেখপঞ্জী

১) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ লোককথা বিশ্লেষণের পদ্ধতি, প্রবন্ধ 'অনুষ্টুপ', শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃঃ ১৪৬।

২) Propp. V. J. : Morphologgy of Folktale, 3rd Edn. P.7, (উদ্ধৃতি, মযহারুল ইসলাম ঃ ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, পৃঃ ৯)

৩) Stith Thompson The Folktale, P. 415, 1977. (উদ্ধৃতি, দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ অনুষ্টুপ শারদীয় সংখ্যা, পৃঃ ১৫৭)

৪) মযহারুল ইসলাম ঃ ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, ১৯৮২, পৃঃ ৩।

৫) ঐ - ঐ- ঐ পৃঃ ৭৬।

৬) Propp. V. J.– Morphology of Folktale, 2nd Edn, P.5. (উদ্ধৃতি, মযহারুল ইসলাম ঃ ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, পৃঃ ১৪)

৭) মযহারুল ইসলাম ঃ ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, পৃঃ ৫৬।

৮) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৫ পৃঃ ১৪৯।

৯) মযহারুল ইসলাম ঃ ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, পৃঃ ৭৬।

১০) ঐ - ঐ - ঐ - পৃঃ ৭৭।

১১) ঐ - ঐ - ঐ - পৃঃ ৮৩।

১২) Stith Thompson : The Folktale, P. 415. (উদ্ধৃতি, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৫ পৃঃ ১৬০।)

১৩) Jawharlal Handoo : Common Motifs : A case study. The paper was published in the souvenir of the IX Indian Folklore Congress, Sambalpur University, 9th April 1986. (উদ্ধৃতি, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৫ পৃঃ ১৬১।)

১৪) দিব্যজ্যোতি মজুমদার - ঐ - পৃঃ ১৬১।

১৫) মযহারুল ইসলাম ঃ ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, পৃঃ ১৬১।

১৬) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৩৯৫, পৃঃ ১৫১।

১৭) দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৩৯৫ পৃঃ ১৫২।

উপসংহার

লোককথার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন এবং ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাস। একমাত্র লোককথার ভেতর দিয়েই জাতীয় চরিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। মানবসমাজজীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লোককথারও ক্রমবিকাশ ঘটে এবং এজন্যই লোককথাকে 'সমাজজীবনের অগ্রগতির দলিল' হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ত্রিপুরার অন্য কোন সংকলিত লোককথা যেমন আমাদের হাতে নেই, তেমনিই প্রাচীন প্রাচীনারাও তেমন আর কেউ নেই যাদের কাছ থেকে আমরা নতুন কাহিনী পেতে পারি। এর আগে এখানকার লোককথা নিয়ে এমন বিশ্লেষণমূলক কোনো কাজ হয় নি। তাই এই গবেষণা কাজের শুরু। তাছাড়া এই রাজ্যে শিল্পায়নের সুযোগ না থাকলেও নগরায়নের যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে এই কাজটুকু না করলে অদূর ভবিষ্যতে এই কাহিনীগুলোই অবলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাহিনীগুলো মধ্যযুগের আগে রচিত। লোকপুরাণ, ব্রতকথা ইত্যাদি গড়ে ওঠার অনেক আগের কাহিনী এগুলো। এখানে সর্বপ্রাণবাদী ধারণার চিহ্ন সর্বত্র বিদ্যমান। কোথাও লোকপুরাণের ছায়ার আভাস পাওয়া গেলেও এগুলোকে সেভাবে লোকপুরাণ বলা যাবে না, কারণ আদিমতার চিহ্ন কাহিনীগুলোর সর্বাঙ্গে রয়েছে। রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়া এই লোককথাগুলোর কোনোরকম বিশ্লেষণই সম্ভব হ'ত না। এগুলো যে খাপছাড়াভাবে রচিত হয় নি, এদের পেছনে যে তৎকালীন মানুষের সুচিন্তিত মনন ও ভাবনাচিন্তা ছিল, তা পরিষ্কারভাবে উদঘাটিত হয়েছে এই রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা।

সমগ্র পৃথিবীর লোককথাকে যে আঙ্কিক ফর্মুলায় ফেলে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই গবেষণাকর্মের সাহায্যে ত্রিপুরার লোককথাও যে বিচার করা যায়, এখানে তারই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে। তাদের সমাজমনন, কল্পনা, জীবনযাত্রা ইত্যাদি সবকিছুর মূল মর্ম উদঘাটন করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এটি প্রমাণিত হয় যে অদিবাসী বা উপজাতি বলে এখানকার উপজাতি সমাজকে ব্রাত্য করে রাখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

টাইপ-মোটিফ পদ্ধতির সাহায্যে এখানে কাহিনীগুলোর টাইপ ও মোটিফ নির্ণয় করার চেষ্টা হয়েছে। টাইপ ও মোটিফগুলোর মধ্যে সমাজজীবনের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা, বিস্মৃত আচার-আচরণ অর্থাৎ এককথায় জাতিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের সামাজিক ধারাটি লক্ষ্য করা যায়।

এই নির্ণয় দ্বারা একটি বাস্তবসত্য উদঘাটিত হয়েছে যে, ফেলে আসা কোন্ সুদূর অতীতে এই পাহাড়ী প্রত্যন্ত প্রদেশের উপজাতি মানুষদের মন কোন্ অলক্ষ্য সূত্রে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে গাঁথা ছিল কে জানে? অন্যান্য লোককাহিনীর সঙ্গে এখানকার লোককাহিনীর এত সাদৃশ্য কেন? বিশ্বজনীন বিভিন্ন মোটিফের সাদৃশ্য আমাদের কল্পনাকে লাগামছাড়া করে দেয়। কি করে এটা সম্ভব হ'ল?

মনোসমীক্ষণমূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে এখানে কোথাও কোথাও কাহিনীগুলোর অন্তর্নিহিত সুরকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষের প্রত্যক্ষ বাস্তবজগতের অন্তরালে তার মানসজগতের ক্রিয়া সব সময়ই কাজ করে চলে। লোককথাগুলোর মধ্য থেকে সেই অন্তরালবর্তী জগতের সন্ধান নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা গেছে সেই আদিম যুগেও বাস্তবজগতের কার্যাবলীর সমান্তরালে মানুষের মানস জগতের ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলেছে। এই বিশ্লেষণের সাহায্যে সমাজ মনস্তত্ত্বের অবচেতনলোকের একটি স্বচ্ছ ছবি ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদী অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে শাসন ও শোষণের চেহারাটা। এটি যে সর্বত্র এবং সর্বকালে একই থাকে তার প্রমাণ দেখা গেছে ত্রিপুরার লোককথাতেও। নিপীড়িত, শোষিত মানুষের যন্ত্রণার তীব্রতা দুঃখকষ্ট থেকে উত্তরণের আজন্মস্পৃহা থেকে প্রতিবাদী অথবা বিদ্রোহী হয়ে ওঠা কিংবা বিচারহীনতার কষ্ট-এ সবই এখানে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পগুলো এখনো আদিমজীবনের মৌলিকতা থেকে বিচ্যুত হয় নি। আশার কথা সেটাই।

কৃষিভিত্তিক জীবন যখন অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখনই লোকপুরাণের উদ্ভব হয়েছিল। আর এই লোককথাগুলো এমন একটা আদিম উপজাতি গোষ্ঠীর, যারা এখনো উন্নত প্রথায় চাষাবাদ জানেনা। লোহার ফাল লাগানো লাঙলের ব্যবহার জানে না। যাদের চাষের কাজে ব্যবহৃত হয় সাধারণ 'খোন্তা' জাতীয় যন্ত্র 'টাক্কাল'। গানের সুরে এর দ্বারাই মাটিতে গর্ত করে, বীজ বোনে। এদের দৈনন্দিন জীবন, আনন্দ, নাচগান সবই এই চাষাবাদকে ঘিরে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে যে কাঠের লাঙলের কথা জানা যায়, তার ব্যবহারও ওরা জানতো না বা জানেনা। এর চেয়ে আদিম জীবন আর কি হ'তে পারে? তাদের আনন্দসূচক ধ্বনির সঙ্গে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য উপজাতিদেরও ধ্বনির সাদৃশ্য দেখা যায়।

লোককথাগুলোর মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরার প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিশেষ জীবনধারণ প্রকৃতি, জীবিকা প্রণালী, জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন উপকরণের চিহ্ন। এছাড়াও পার্থিব, অপার্থিব বস্তু সমূহ, ধর্মীয় আচার, সংস্কার, বিশ্বাস, নৃত্যগীত, শিল্পভাবনা, বোধবুদ্ধি আমোদ প্রমোদের একটি নিটোল চিত্রও এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

সংহত সমাজে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির প্রাধান্য বেশী স্বীকৃত হয়। এই বৈশিষ্ট্যটিও আমরা লক্ষ্য করি লোককথাগুলোতে।

উপজাতি লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রামের কথা অথবা প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার কথার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, প্রেম, সামাজিক উৎপীড়ণ ষড়যন্ত্র আত্মত্যাগ ইত্যাদির হদিশও দিচ্ছে কাহিনীগুলো।

পশুচারণকালেও যেমন তারা যূথবদ্ধভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে প্রচরণ করেছে কৃষি উদ্ভবের পরও যে তাদের যূথবদ্ধতা একই থেকে গেছে, তারও তো হদিশ দেয় উপজাতিদের লোকবথাগুলো। ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ত্রিপুরার অবস্থান।

১০,৪৯১.৬৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই রাজ্যের উত্তরে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, নোয়াখালি ও কুমিল্লা জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা, পশ্চিমে কুমিল্লা জেলা এবং পূর্ব দিকে আসাম ও মিজোরামের সীমান্ত। এই ত্রিপুরাই আগে 'হিল টিপারা' বা পার্বত্য ত্রিপুরা নামে পরিচিত ছিল। প্রাকৃতিক অবস্থান এমনই যে সহজেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সুপ্রাচীনকাল থেকে এই রাজ্যের যোগাযোগ ছিল।

এই রাজ্যের বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীকে মোট ১৯টি ভাগে ভাগ করা যায়। এরা যথাক্রমে ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, চাক্‌মা, হালাম, নোয়াতিয়া, মগ, লুসাই, উচই, কুকি, গারো, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, খাসিয়া, ভীল, ছাইমল, ভুটিয়া ও লেপ্‌চা।

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীর সর্বত্র একদিন যে কৃষিপদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং এখনো অনেক অনগ্রসর উপজাতিদের মধ্যে যা প্রচলিত রয়েছে, সেই পদ্ধতিটিই 'জুম চাষ' নামে ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে এখনো প্রচলিত। এই পদ্ধতিই এদের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। প্রায় প্রতিটি লোককথায়ই 'জুম'এর উল্লেখ আছে।

এখানকার উপজাতি সমাজের লোকবিশ্বাস ও লোকপ্রথা, অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এক অলৌকিক জগৎ তথা 'আত্মা' সম্পর্কিত ধারণাকে কেন্দ্র করে। এই ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও জুমসম্পর্কিত সমস্তরকম ভালোমন্দকে ঘিরে যার ফলে বিভিন্ন আচার-আচরণ ও পূজার উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য গবেষণার উদ্দিষ্ট মানস হচ্ছে লোককথাগুলোর মধ্য থেকে চিরায়ত লোক ঐতিহ্যের স্বরূপটি অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মানস ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করা। প্রথম অধ্যায়ে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের চেষ্টা রয়েছে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, এদের জীবনধারণের প্রধান উৎসে থাকা 'জুম'-এর কথা। যেহেতু নারী-পুরুষ উভয়েই জুমের কাজে নিরত থাকতো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, তাই তাদের উভয়েরই জীবনের নানা স্বপ্নও জুমের ক্ষেতের কর্মচাঞ্চল্যের ভেতর দিয়েই প্রকাশিত হ'ত। তারা প্রাচীণ কাল থেকেই দেবদেবীর কোনো সুস্পষ্টরূপ কল্পনা করেনি। সভ্যতার একটি স্তরে পৌঁছে আদিমমানব প্রকৃতির সকল বিষয়কেই স-প্রাণ বলে ভাবতে শিখেছিলো। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর সকল বস্তুতেই সাদৃশ্যের নীতি প্রয়োগ করে মানবীয় গুণারোপের ফলে তাদের কাছে সবকিছুই পূজনীয় হয়ে উঠেছিলো। আদিম মানুষের এই সর্বপ্রাণবাদী ধারণা বা গুণারোপের ফলে তাদের কাছে সবকিছুই পূজনীয় হয়ে উঠেছিলো। আদিম মানুষেরর এই সর্বপ্রাণবাদী ধারণা বা animism-এর ধারণাটি ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবনে ধর্মভাবনার উৎসে রয়েছে বলেই লোককথাগুলো নানাভাবে প্রতিপন্ন করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পূজা, ব্রতধর্মী আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির উদ্ভবেরও একটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র উপহার দেয় কাহিনীগুলো।

প্রাচীন ত্রিপুরার তথ্যনিষ্ঠ কোনো কাহিনী বা ঐতিহাসিক ঘটনার কোনো বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস আমাদের হাতে নেই, অথচ কিংবদন্তীমূলক কিছু কাহিনীর প্রতিভাস আমাদের সেই, অবলুপ্ত সময়কে অনুভব করার প্রেরণা দেয়।

কিছু কিছু নৃতাত্ত্বিকের মতে সমাজ বিকাশ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি দেশের প্রতিটি জাতিই একই ধরণের স্তর অতিক্রম করে এবং সমস্ত দেশের ও জাতির মানবমন এক নিগূঢ় ঐক্যে গ্রথিত। এই লোককথাগুলো সেই ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।

এখানকার আদিম জনমানবগোষ্ঠী যে কৌম জীবনে অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী ছিল,প্রকৃতির সঙ্গে ছিল নিয়তসংগ্রামে রত এবং সাম্যবাদী সমাজ জীবনের মধ্য দিয়েই তারা জীবন পরিক্রমা করেছে, তারও তো সাক্ষ্য দেয় এই লোককথাগুলোই। সেখানে যৌথশক্তির প্রতীকরূপে চিহ্নিত হতে পারে কূলপতি বা 'সর্দার' বা ' চৌধুরী'। (চক্‌দ্রি)

ফসল উৎপাদনের প্রতিটি পর্বে ছিল এদের সমবেত অংশগ্রহণ। অরণ্য পরিষ্কার করা, শুকনো গাছপালাকে পুড়িয়ে জমি তৈরী করা, বীজবোনা, আগাছা পরিষ্কার করা, ফসলের পরিচর্যা, দেখাশোনা, ফসল ঘরে তোলা সবই তখন গোষ্ঠীগতভাবে করা হ'ত।

সামন্ততন্ত্র অধ্যুষিত উপজাতি সমাজে রাজাই ছিলেন সমস্ত কিছুর মূলে। ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ রাজা। এই ধারণাটি জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করে রাজা প্রজাদের কাছে সমস্তরকম লৌকিকতার ঊর্দ্ধে থাকতে চেয়েছে। সে যেন সমস্ত অন্যায়ের ঊর্দ্ধে।

সংঘবদ্ধভাবে পথ চলতে গিয়ে যে সংহত গোষ্ঠীচেতনার জন্ম হয়েছিল আদিম মানুষের মনে, তারই পাশাপাশি আপন আপন গোষ্ঠীর বাইরের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধেও জন্মেছিল শত্রুতার মনোভাব। এমনি করেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শুরু। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বের রূপটিও পাল্টেছে। গোষ্ঠীর বাইরের দ্বন্দ্ব যে গোষ্ঠীর অভ্যন্তরেও সংক্রামিত হয়ে গেছে তার হদিশতো দেয় এই লোককথাগুলোই। সমাজ সংঘাতের রূপটি আমরা পাচ্ছি বিভিন্নভাবে। কখনো সংঘাতের চিত্র প্রত্যক্ষ, কখনো বা রূপকের আশ্রয়ে আশ্রিত। কখনো তা মানুষে-মানুষে, কখনো মানুষে-পশুতে, কখনো পশুতে পশুতে।

এখানকার উপজাতি সমাজ যে টোটেম-এ বিশ্বাসী ছিল, তার একান্ত দলিল এদের লোককথা। প্রাণী, লতা গুল্ম, ফল, ইত্যাদিকে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে বেঁধে নিয়ে এ সম্পর্কিত বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

সর্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তি 'মানা'কেও যে এরা বিশ্বাস করতো এবং বিভিন্ন উপাদানে যে এইশক্তির অবস্থান ছিলো, তার সাক্ষ্যও তো এই কাহিনীগুলোই দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য 'রক্তপিপাসু দেবতা' কাহিনীতে 'সতীনারী' রাণীমার 'রিছা' র (বক্ষাবরণী) কথা, যা এক দুর্দম ষণ্ডকেও বশ করতে পারে। 'মানা'র শক্তিতেই সোনার আংটির মতো জড় বস্তুও কথা বলতে পারে। (দ্রঃ কথা বলা আংটি)।

এখানে রয়েছে 'ট্যাবু'র ধারণাও। নানারকম বাধা নিষেধকে অনুসরণ এবং ভঙ্গ করার মধ্য দিয়ে ট্যাবু সংক্রান্ত বিভিন্ন আচার-আচরণের প্রকাশও ঘটতে দেখা গেছে বিভিন্ন কাহিনীতে। এছাড়াও রয়েছে সামাজিক দ্বন্দ্ব, মিথষ্ক্রিয়া ও সমন্বয়ের চিত্র। পারস্পরিক আচার-আচরণের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মানসিকতার মাধ্যমে সামাজিক দ্বন্দ্বের চিত্রটি প্রকাটিত হয়। গোষ্ঠীজীবনে অভ্যস্ত ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ এই বিরোধের মধ্যেও একটি সংমিশ্রণের চেষ্টা করেছে। মিথষ্ক্রিয়ার এই চিত্রটি নানাভাবে ফুটে উঠেছে লোককথায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার সঙ্গে দেশ-বিদেশের লোককথার সম্পর্কটি। এই অনুসন্ধানপর্বে আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে এক অনন্য সাদৃশ্য। যে সাদৃশ্য আমাদের শুধু বিস্ময়াবিষ্টই করে না, বিশ্বমানবমনের নিগূঢ় ঐক্যের অনুভূতিতে আমাদের মোহমুগ্ধও করে। মনে হয় এই ঐক্য আজকের বিচ্ছিন্নতাকামী মানবমনের কাছে হিমালয় সম এক দার্ঢ্যের পরিচায়ক। প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদির পার্থক্য এবং চরিত্রগত ও কাহিনীর মোটিফ্-এ ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এখানকার উপজাতি লোককথাগুলো সমাজ ও সময়ের বৃত্ত পেরিয়ে পৃথিবীর নানা অঞ্চলের লোককথার মধ্যে কখন যেন আপনাকে মিশিয়ে নিয়েছে। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল বন্য প্রাণীর উৎপাত, যাতায়াতের অব্যবস্থা অর্থাৎ সরাসরি সংযোগ মাধ্যমের অভাব থাকা সত্ত্বেও দেশ বিদেশের লোককথার সঙ্গে এখানকার লোককথার এই সাদৃশ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

এই সাদৃশ্য আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, পিল্‌পের নীতিকথা ইত্যাদির মধ্যে প্রাচীণ ভারতবর্ষের প্রচলিত যে সমস্ত লোককথা রয়েছে তার ভেতর থেকে। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী সমূহ, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীসহ জাতকের কাহিনীসমূহের সঙ্গেও এখানকার কাহিনীগুলোর সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করার প্রচেষ্টা রয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে এই প্রসঙ্গেও যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক একটি চিত্র যেন ফুটে ওঠার অবকাশ পেয়েছে বলে মনে হয়।

তেমনি বর্হিভারতীয় লোককথার সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার সম্পর্ক খুঁজতে গিয়েও বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। অনগ্রসর এই উপজাতি সমাজে সভ্যতার আলো যেখানে আজো প্রবেশাধিকার পায় অত্যন্ত ধীরলয়ে, সেখানকার কাহিনী 'ছিপিংতুই মাইরুতুই' - এর সঙ্গে যখন ইউরোপীয় লোককথা 'টোড্‌স এন্ড ডায়মন্ডস' এর সান্নিধ্য খুঁজে পাওয়া যায় তখন তা নিঃসন্দেহে ভালো লাগার অনুভূতি জাগায়। অথবা যখন এক অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় 'দ্য ফ্রগ প্রিন্স' (ইউরোপীয় লোককথা) এর সঙ্গে 'চাঁদের ছেলের' কাহিনীটির। কাহিনীর কাঠামো এবং অভিপ্রায়গত দিক থেকে দুটো কাহিনীই যেন এক।

পৃথিবী বিখ্যাত 'সিন্ডারেলা'- কেও খুঁজে পাওয়া যায় 'ছিপিংতুই' এর মধ্যে। এমনি রয়েছে আরো অসংখ্য চিত্র। তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায় অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক উপাদান, শ্রুতি-স্মৃতি-বিস্মৃতি এবং এখানকার লোককথায় অন্যান্য লোককথা ও লোকবিশ্বাসের প্রভাবটি অনুভব করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান যে ভূখন্ডটিকে ত্রিপুরা বলা হয় তার নামকরণ সম্পর্কে সঠিক এবং প্রামাণ্য প্রাক্-ইতিহাস পাওয়া যায় না। উপরন্তু ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ বিভিন্ন সময়ে এখানকার বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যপাট স্থাপন করেছে। ফলে ত্রিপুরার প্রাচীন, এবং মধ্যযুগের শাসনতন্ত্রের কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না।

'তুই' এবং 'প্রা' শব্দ দুটির সহযোগে 'তুইপ্রা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 'তুইপ্রা' থেকে 'তিপ্রা' এবং তিপ্রা থেকে ক্রমে 'তৃপুরা' 'ত্রীপুরা' এবং 'ত্রিপুরা' শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করেন অনেকে। ত্রিপুরী ভাষায় 'তুই' বলা হয় জলকে। 'প্রা' শব্দের অর্থ 'সমুদ্র'। অর্থাৎ কিরাতগণ কর্তৃক সমুদ্র তীরবর্তী বিস্তৃত স্থলভূমি অর্থে 'তুইপ্রা' আখ্যা দেওয়া হ'তে পারে।

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরী জনজাতিকে 'কিরাত' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন এবং এদের ভাষাকে 'বোড়ো' ভাষা গোষ্ঠীর বলে অভিহিত করেছেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বৎসর আগে সাইবেরীয়া, মঙ্গোলীয়া থেকে ক্রমশঃ চীনের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী উপত্যকায় সমৃদ্ধ উন্নত সভ্যতার স্পর্শ নিয়ে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর মানুষেরা হিমালয়ের পাদদেশে আশ্রয় নেয় এবং ধীরে ধীরে মণিপুর, আসাম, খাসিয়া-জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তবে ত্রিপুরায় আদিম অরণ্যচারী পার্বত্য উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা কবে থেকে বসবাস শুরু করেছিল তার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

ত্রিপুরা রাজ্যের শাসকরা যদিও ত্রিপুরবংশীয়, তবুও এখানে বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। যার ফলে এখানকার উপজাতি সমাজ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সম্মিলনে।

উপজাতি মানবগোষ্ঠীর সমাজ মানস ও জীবনধারাকে বোঝা যায় তাদের উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে। এরা নানা দেব দেবীর পূজা করলেও মূর্তির পরিবর্তে বাঁশই সেই পূজার প্রধান উপকরণ হিসেবে গৃহীত। এই ধারাটি আবহমান কাল ধরেই যে প্রবাহিত তার প্রমাণ তো উপজাতি লোককথাগুলোই দেয়। রয়েছে চতুর্দশ দেবতার কথা, যা পরবর্তী সময়ে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়ে গেছে। রয়েছে গড়িয়া দেবতার পূজার উল্লেখ। অতীতের কোন সামাজিক বা ঐতিহাসিক উপকরণ যেহেতু লিখিত রূপের ভেতর দিয়ে বর্তমানের জন্য সংরক্ষিত হয় নি আলাদাভাবে, লোককথার মধ্য থেকেই সেই প্রচ্ছন্ন ইতিহাসকে তাই বের করে নিতে হয়। শ্রুতি-স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য দিয়েই সেই ইতিহাস কোনো না কোনো ভাবে ধরা থাকে লোককথার অবয়বে। লোকজীবনে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা আনুষ্ঠানিক রীতিগুলোর মধ্যে সমষ্টিগত জীবনচর্চার কোনো না কোনো স্মৃতি জড়িত থাকে। এই স্মৃতিটুকুকে এখানে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথার সঙ্গেও এখানকার এই লোককথাগুলোর মিল অমিলের প্রসঙ্গটি খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। দেবতা কর্তৃক রাণীমার পুত্রের রক্তপান করার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা গেছে বাংলায় উপাসিত লৌকিক দেবী কর্তৃক পুরোহিত কন্যার রক্তপানের কাহিনীর সঙ্গে। তেমনি মানুষের পাখি হয়ে যাওয়ার মোটিফটির উপস্থিতি দেখা যায় বাংলায় প্রচলিত 'ইষ্টিকুটুম' নামক লোককথাটির মধ্যে। ''নাঐ পাখির গল্প'টি মনে পড়িয়ে

দেয় নাগাল্যান্ডের জেমি নাগা উপজাতিদের একটি কাহিনীকে। এইভাবে বিভিন্ন লোককথার প্রভাব খোঁজার চেষ্টা হয়েছে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথায়। অবশ্য পরে মনে হয়েছে কে যে কার দ্বারা প্রভাবিত তা ভালো করে বোঝা যায় না। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের লোককথাকে যেমন গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি গ্রহণ করা হয়েছে আসামের অসমীয়া লোককথা ও মিরি লোককথার সঙ্গে সঙ্গে গারো, খাসিয়া, সাঁওতালী, হিমাচলী, আঙ্গামী নাগা, নেপালী, কাছাড়ী, মণিপুরী এবং অরুণাচল প্রদেশের লোককথাও। এছাড়াও রয়েছে মিকির উপজাতি গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ।

সংহত জনসমষ্টি যে বিশেষ আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে এবং যেগুলোর সঙ্গে শুভাশুভ বোধ জড়িত, সেই লোকবিশ্বাসগুলো লোককথার ভেতর ফুটে উঠেছে নানা ভাবে। ঐন্দ্রজালিক শক্তি ও দৈবশক্তিতে বিশ্বাস আদিবাসী জীবনের মজ্জাগত। বিপন্নতায় মানুষের সহায়তা না পেয়েও অনেক সময় শেষ আশ্রয় হিসেবেই উপজাতি মানুষ দৈবনির্ভর হয়ে উঠেছে। তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ যেন মনে হয় 'ছাতিম গাছের কাহিনী'।

চতুর্থ অধ্যায়ে উপজাতি লোককথার শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। শ্রেণীবিন্যাসের প্রচলিত ছকের অনুসরণ করেও কাহিনীগুলোর কিছু বিশিষ্ট অভিব্যক্তির প্রেক্ষিতে এগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, পশুপাখির কাহিনী, নীতিকথা, উর্বরাশক্তিমূলক কাহিনী, গোষ্ঠীগত কাহিনী, সাংসারিক কাহিনী, আদিম প্রথানির্ভর কাহিনী, নিষিদ্ধ জীবনচর্যা ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিবাদী সুর, ভৌতিক গালগল্প, হাস্যকৌতুক, নিরাধার কাহিনী ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার সামাজিক উপাদান ও তার দ্বান্দ্বিক সূত্রটি খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পাওয়া গেছে অসংখ্য মোটিফের সন্ধান, যাদের স্বভাব একান্তই বিশ্বজনীন। রয়েছে কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত মোটিফ, যেমন, সতীস্ত্রীর আশ্রয়দানার্থে 'ঝর্ণার জল ফুলে ওঠা' ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন লোককথায় বহুল ব্যবহারের ফলে 'ছ কুড়ি ছ' ঘরের গাঁ' অথবা 'দশ গাঁয়ের সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের গাঁ ইত্যাদিও মোটিফ-এ পরিণত হয়েছে। তেমনি দেখা যায় বিশ্বে বহুল প্রচারিত 'সর্পের প্রতিহিংসা বা revengeful serpent motif (দ্রঃ 'পুরোহিত' নামক লোককথা), জয়ী কনিষ্ঠা কন্যা অথবা পুত্রের মোটিফটিও। সমাজকাঠামোয় বসবাস করতে গিয়ে উপজাতি মানুষ যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছে তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে, তাকেও খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। লোককথায় বিভিন্ন চরিত্রকে ঘিরে এই দ্বন্দ্বের স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে। সৎ-মা সপত্নীকন্যার দ্বন্দ্বটি চিরন্তন রূপেই এখানে হাজির। ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের স্বরূপটিও চেনা যায়। উল্লেখ্য, সজারুর বুদ্ধি, মুরগীর পিঠে ইত্যাদি। আশ্চর্যজনকভাবে এই কাহিনীগুলোতে ক্ষুদ্র তথা শারীরিকভাবে দুর্বলের জয়ই ঘোষিত হয়েছে। তবে যদিও এই কাহিনীর চরিত্রেরা পশু, তবু মনে হয় এরা সমাজ মানুষেরই প্রতীক। সবলের বিরুদ্ধে দুর্বল মানুষ যখন মুখ খুলতে পারে না তখন এভাবে রূপকেরই আশ্রয় তাকে নিতে হয়।

লোককথায় উপজাতি সমাজ মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের ধারনাটিও উপেক্ষিত থাকে নি এবং শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বময় ক্রমপরিণতিতে যে শুভের জয় হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী, সেটিও খুঁজে পাওয়া গেছে বলেই মনে হয়। অধিকাংশ গল্পেই এমন একটি দ্বন্দ্বময় প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছে যেখানে পরিণতিতে অশুভ নতজানু হতে বাধ্য হয় শুভের কাছে। তাছাড়া লোককথায় সামাজিক উপাদানের দ্বান্দ্বিক সূত্রটি খুঁজতে গিয়ে মানুষের অবচেতন মনে যে দ্বৈতসত্তার প্রবহমান ধারাটি রয়েছে তার অস্তিত্ব বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করা গেছে। পারস্পরিক সৌর্হাদ্যপূর্ণ মনোভাব অপসৃত হয়ে গেছে, পারস্পরিক স্বার্থ ব্যাহত হয়ে গেছে। 'বিচার' নামক লোককথাটি এর এক উজ্জ্বল উদাহরণ। ধনী ও নির্ধনের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য যে দ্বন্দ্বের একটি মূল কারণ, তা লক্ষ্য করা যায় 'একফালি লাউ' গল্পে।

ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে সর্বশেষে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে। ত্রিপুরার লোককথার কাঠামোগত বিশ্লেষণ যেহেতু আগে আর কখনো করা হয় নি তাই সমাজমন বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে লোককথাগুলোর রূপগত শ্রেণী বৈশিষ্ট্য, কাঠামোগত গতিপ্রবাহ, ক্রিয়াশীলতা, মোটিফ্ এবং বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের দ্বারা এদের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্বজনীন লোককথার বিশ্বজনীন রূপটি যেমন আমাদের সামনে ধরা পড়েছে, তেমনি সমস্ত লোককথার আন্তর অবয়বে যে এক অদৃশ্য রূপগত ঐক্য বিরাজমান তাও প্রকাশিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণটুকু না করা হলে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার সামগ্রিক রূপটি অনুদ্ঘাটিত থেকে যেতো মনে হয়। বিশ্বলোককথার দরবারে তার বরেণ্য রূপটিরও হদিশ হয়তো পাওয়া যেতো না।

এই লোককথাগুলোর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই এদের মেজাজও চরিত্র নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এর জন্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকসংস্কৃতি গবেষক আর্নে ও স্টীথ টমসন্ কৃত 'টাইপ ইনডেক্স' এর সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ইনডেক্স এর দ্বারা এই লোককথাগুলোর একটি সুসম্পূর্ণ শ্রেণীকরণ করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়।

তদানীন্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ ভ্লাদিমির জে প্রপ বলেছেন, যে কাহিনী স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণের সময় অনেকক্ষেত্রে বিষয়ের হেরফের ঘটলেও তার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে। রূপতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়টিও লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া কাহিনীর মূল উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করলে ক্রিয়াশীলতা লাভ করা যায় এবং তাদের সহায়ক গতিপ্রবাহ তাদের অনুগামী হয়। একটি বাক্যে যেমন কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া থাকে, তেমনি লোককথার কর্তা বা বিশেষ্য যা করে তাকেই ক্রিয়াশীলতা বলে।

প্রপ্ লোককথার পাত্র-পাত্রীদের ক্রিয়াশীলতাকে (function) একত্রিশটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলোই মূল ক্রিয়াশীলতা। তিনি এই ক্রিয়াশীলতাগুলোর জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ মযহারুল ইসলাম সেই চিহ্নগুলোর জন্য সমার্থক বাংলা চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। এই গবেষণা নিবন্ধের বাংলা সাংকেতিক চিহ্ন মযহারুল ইসলামকে অনুসরণ করেই দেওয়া হয়েছে। প্রপের মত অনুযায়ী ক্রিয়াশীলতাগুলোর সঙ্গে

সঙ্গে প্রতিটি গল্পেরই প্রাথমিক অবস্থা অবশ্যই থাকবে। তা কখনো সাধারণ, কখনো জোরোলো হ'তে পারে। এই প্রাথমিক অবস্থাতে থাকে নায়কের পরিচয়, সমাজে তার স্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি। কোনো গল্পে যে একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতাই থাকবে তা-ও নয়, কখনো কম সংখ্যাও থাকে। এই ক্রিয়াশীলতাগুলোই কাহিনীকে নানা আকার পরিগ্রহ করায় এবং পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই অধ্যায়ে প্রপ্ বর্ণিত ক্রিয়াশীলতাগুলোর মযহারুল ইসলামকৃত বাংলা রূপান্তর দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি উপজাতি লোককথারই ক্রিয়াশীলতাগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে যে ত্রিপুরার লোককথাগুলোতে প্রপ্ কথিত ক্রিয়াশীলতার সূত্রগুলো যথাযথভাবেই রক্ষিত। স্থান-কাল পাত্র ভেদে উপাদানে বা আচরণে কোথাও কোথাও স্থানিক বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হলেও মূল ক্রিয়াশীলতার রূপগুলো অভিন্নই থেকে গেছে।

প্রাথমিক অবস্থা (সাংকেতিক চিহ্ন, ঙ) সহ অনুপস্থিতি, (ছ), নিষেধাজ্ঞা (ঞ), সতর্কতা বা নিষেধাজ্ঞা যঙ্ঘন (ড), পরিদর্শন পরিক্রমা (ঐ) খলনায়কের বিরুদ্ধে তথ্যসংগ্রহ করা (ফ), ছলনাজান বিস্তার (ন), দুষ্কর্মে নিজের অজান্তে বশীভূত হাওয়া (জ) খলত্ব (আ), অভাব (অ), মধ্যস্থকারী ক্রিয়াশীলতা (ব), প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক কাজের সূত্রপাত (চ), সহায়কের প্রথম ক্রিয়াশীলতা (ঢ), নায়কের প্রতিক্রিয়া (এ), যাদুনিমিত্তের প্রয়োগ কৌশল লাভ (ভ), নায়কের স্থানগত পরিবর্তন ও পথ প্রদর্শন (গ), সংগ্রাম বা যুদ্ধ (হ), চিহ্নিতকরণ, (য), বিজয় (ই), অভাব অপসারিত (অ অ) নায়ক ফিরে আসে, কখনো খল, (↓) নায়ককে অনুসরণ করা হয় (প র), অনুসরণ থেকে নায়কের উদ্ধার (রস) নায়কের অপরিচিত অবস্থায় আগমন (ও), মেকিনায়কের দাবী অগ্রাহ্য হয় (ল), কঠিন কাজ (ম), কাজগুলো সম্পন্ন করা (স), নায়ককে চিনতে পারা (শ), মেকিনায়কের মুখোশ উন্মোচন (ঘ), নায়কের আকৃতি পরিবর্তন বা রূপান্তরকরণ, (ট), খলের শাস্তি (উ), বিবাহ (ঊ) ইত্যাদি একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতা।

একটি কাহিনীর কাঠামোতে এক বা একাধিক কাহিনী আছে কিনা তা নির্ণয় করার জন্য প্রপ্ কাহিনীর বিভিন্ন গতিপ্রবাহের যে সংযুক্তি বা অনুসরণক্রমের কথা বলেছেন, তা-ও ত্রিপুরার লোককথায় উপস্থিত রয়েছে। সারা বিশ্বের প্রতিটি লোককথারই মধ্যে এক বা একাধিক মূল বিষয় রয়েছে। এটিকে মেটিফ বলা হয়। একটি লোককথাকে ভেঙে কাহিনীব্যবচ্ছেদ করলে তার ভেতর থেকে যে এক বা একাধিক কাহিনী অংশ পাওয়া যায় স্টীথ টমসন তাকে ই মোটিফ বলেছেন। বিশ্ববিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানী ষ্টীথ টমসন 'মোটিফ ইনডেক্স অব্ ফোক লিটারেচার' গ্রন্থে অসংখ্য মোটিফকে প্রণালীবদ্ধ করে সাজিয়েছেন। এই মোটিফইনডেক্স-এর সাহায্যে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথার মুল প্রাণসত্তাটিকে অনুভব করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই মোটিফ বা অভিপ্রায়গুলোর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিশ্বজনীন মানুষের সঙ্গে এখানকার উপজাতি মানুষের এক মানসিক ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। কোনো কোনো

অভিপ্রায়ে স্থানীয় বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধরা থাকলেও; এর ভেতর রয়েছে এক সর্বজনীন রূপ। এর সাহায্যে সমগ্র মানবসমাজের অন্তরের অন্তর্নিহিত অভিন্নতার রূপটিও ধরা পড়ে। লোকসমাজের উদার মন ভৌগোলিক সীমারেখা, কৃত্রিম রাজনৈতিক মানচিত্রের বিভাজন বা অন্য কোনো রকম বিভেদকে যে মেনে নেয়না তাও এই বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায়।

ইংরেজী IOY এই এই তিনটি বর্ণকে বাদ দিয়ে বাকী ২৩টি ঘিরে মোটিফ পঞ্জী সাজানো হয়েছে। বন্ধনীর মধ্যে সমার্থক বর্ণগুলো দেয়া হল। যেমন লোকপুরাণ (A) জীবজন্তু (B) ট্যাবু (C) ঐন্দ্রজালিকতা (D) মৃত (E) অসাধ্যসাধন (F) রাক্ষসখোক্কস দৈত্য দানব (G) চালাক ও বোকা (J) প্রতারণা (K) ভাগ্যচক্র (L) ভাগ্যকে বশে আনা (M) অদৃষ্ট ও কপাল (N) সমাজ (P) পুরস্কার ও শাস্তি (Q) বন্দী ও পলাতক (R) অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা (S) ইন্দ্রিয় (T) জীবন প্রকৃতি (U) ধর্ম (V) চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য (W) হাসি ঠাট্টা (X) বিভিন্ন মোটিফ (Z) ইত্যাদি।

ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লড্ লেভি ষ্ট্রস রূপতাত্ত্বিক গবেষণা-পদ্ধতির সাহায্যে লোকসাহিত্যের সকল উপাদানের মধ্যে বিপরীতমুখী দুটো শক্তির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। এই দুটো শক্তিকে binary opposition বা "যুগ্ম বৈপরীত্য" বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি মোটিফের বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে লোককথার সঠিক অর্থটি অনুধাবন করার জন্য তিনি মোটিফগুলোকে বিযুক্ত করার কথাও বলেছেন। অর্থবোধক পন্থায় এগুলোকে সাজিয়ে তারপর বিপরীতমুখী বক্তব্য ও ক্রিয়াসমূহকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

একইভাবে ত্রিপুরার উপজাতি লোককথাকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা রয়েছে এখানে। প্রথমেই আমরা প্রতিটি কাহিনীর মোটিফগুলো খুঁজে বের করার প্রয়াস নিয়ে এগুলো থীথ টম্‌সনকৃত বর্গীকরণ অনুযায়ী বর্গীকৃত করেছি এবং পরবর্তী সময়ে কাহিনীর যুগ্ম বৈপরীত্যমূলক শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়াশীলতায় কাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ঘটনাগুলো কিভাবে আবর্তিত হয়ে ধীরে ধীরে মধ্যস্থকারী শক্তির সাহায্যে একটি সংগতিপূর্ণ সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়, তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। লেভিষ্ট্রস এই প্রসঙ্গে যে রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিগত সূত্রটি নির্দেশ করেছেন, অর্থাৎ $fx(a) : fy(b) :: fx(b) : fa^{-1}(y)$, তাকেই আমরা প্রতিটি কাহিনীতে অনুসন্ধান করেছি। অনুসন্ধান শেষে লব্ধফল হিসেবে Opposition বা যুগ্ম বৈপরীত্যের বিষয়টি প্রতিটি কাহিনীতেই লক্ষ্য করা গেছে। যুগ্ম বৈপরীত্য বা দুটো শক্তি কিভাবে বিভিন্ন ক্রিয়াশীলতা, কর্মকান্ডের ভেতর দিয়ে সংযোগকারী শক্তির সহায়তায় একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে পরিশেষে জয়ী হয়, সেটি ত্রিপুরার লোককথাগুলোতে খুব সুন্দরভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

সম্ভবত এই যুগ্ম বৈপরীত্যের অনুসন্ধান ছাড়া লোককথাগুলোর অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব হত না। রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে পরবর্তীকালে যাঁরা আরো সম্প্রসারিত করেছেন তাঁদের মধ্যে নোয়াম চমস্কি, ই কে মারান্ডা, পি মারান্ডা, অ্যালান ডান্ডিস ইত্যাদি খ্যাতিমান।

নোয়াম্ চমস্কিকৃত তত্ত্বটির নাম Generative grammer, বাংলায় যার সমার্থক শব্দ হিসেবে 'সঞ্জননী ব্যাকরণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি পুরোপুরি ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে রচিত বলে এবং ধ্বনিতত্ত্ব উপভাষা বিশেষণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ যথাযথ হয় বলে লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চমস্কির তত্ত্বটিকে এই গবেষণা কার্যে অনুসরণ করার প্রয়াস হয় নি। অবশ্যই ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব ব্যাপক আলোড়ণ সৃষ্টিকারী। ই, কে মারান্ডা ও পি মারান্ডা রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে লেভিষ্ট্রসের "যুগ্ম বৈপরীত্যের" সূত্রকে অনুসরণ করেই নিজস্ব উদ্ভাবিত যে সূত্রটি যোগ করেছেন, তা-ও এই লোককথাগুলোর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্থানে ব্যাবহার করা হয়েছে।
কয়েকটি কাহিনীর ক্ষেত্রে এই সূত্রটি, অর্থাৎ QS : QR : FS : FR.

QS = Quasi Solution (আপাত সমাধান)
QR = Quasi Result (আপাতফল)
FS = Final Solution (শেষ সমাধান)
FR = Final Result (শেষ ফলাফল)

ব্যবহার করে মনে হয়েছে যে এই নানা পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের জন্য ত্রিপুরার উপজাতি লোককথাগুলো যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ।

বিশ্ব লোককথার দরবারে অজ্ঞাতকুলশীল হয়ে পড়ে থাকা ত্রিপুরার এই সমস্ত অনন্য লোককথা যে কোনো মতেই ব্রাত্য নয় বরং লোককথার সতেজ সজীব প্রাণটিকে বুকে বয়েই যে লোককথাগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, সারা পৃথিবীর লোককথার সঙ্গে এই কাহিনীগুলোর মূলসুরও এক ও অভিন্ন তা উদ্ঘাটিতই হ'ত না এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ না করলে। আর ঠিক তেমনি করেই লোককথার অন্তর্নিহিত সমাজ মানসটিও অন্ধকারেই ঢাকা পড়ে থাকতো বলে মনে হয়।

এই বক্তব্যের সপক্ষে এটুকুই বলা যায় যে পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ততম অঞ্চল এই ত্রিপুরা, যেখানে আজো যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য এবং বহুবিধ অভাব ও পশ্চাদপদতার জন্য মানুষকে নিয়তই ম্রিয়মান হয়ে থাকতে হয়, সেখানে এই সমস্ত লোককথা, যাদের অনেকগুলোই আমাদের কাছে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর সুর শুনিয়ে যায় এবং এক ঐক্যবোধে জারিত করে তোলে, সেগুলো অসীম সম্ভাবনাময় প্রেক্ষিত তুলে ধ'রে আমাদের আনন্দে আপ্লুত করে দেয়।

পরিশিষ্ট

(১) পৌরাণিক অভিপ্রায় ঃ রক্তপিপাসু দেবতা—

(ক) ত্রিপুরার রানী হীরাবতী জল আনতে গেছেন নদীতে। এমন সময় চৌদ্দজন দেবতা রানীমায়ের কাছে এসে আশ্রয় চেয়ে বলেন, একটি পাজি মোষ তাঁদের তাড়া করে এনেছে। রানীমা যেন তাদের বাঁচান। রানীমা রিছা দিয়া মোষকে বশীভূত করেন। লোকজনেরা মোষটাকে বলি দেয়। রানীমা দেবতাদের আশ্রয় দেন ও নিজহাতে পুজো করেন প্রতিদিন। দেবতারা রানীমার ছেলের রক্ত পান করে, ছাগলে রূপান্তরিত করে। রানীমা এতে ক্রুদ্ধ হন ও দেবতাদের বকেন। দেবতারা লজ্জা পান অবশেষে প্রতিদিন দেবতাদের জন্য রুধির ভোগের ব্যবস্থা হয়

(খ) নাঐ পাখির গল্প— এক জুম চাষীর দুই মেয়ে। বড় বোন খুমতির গায়ের রঙ কালো, মনটিও ভালো নয়। ছোটবোন করমতিকে খুব হিংসে করতো। একদিন সে ছোট বোনের কাছে তরকারী চেয়ে না পেয়ে ছোটবোনকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিল। নদীর জলে ছিল বোয়াল মাছ। সে করমতিকে খেয়ে ফেললো। করমতির হলুদ বরণ গায়ের রঙে জলের রঙ হলুদ হয়ে গেল। বোয়াল মাছের পেট চিরে করমতিকে বের করা হ'ল ও খুমতিকে শাস্তি হিসেবে একটা খাঁচায় ঢুকিয়ে অভুক্ত রাখা হ'ল। খুমতি নাঐ পাখিদের কাছ থেকে নখ, ইত্যাদি সংগ্রহ করে নাঐ পাখিদের সঙ্গে দূর আকাশে চলে গেল।

(গ) চাঁদের ছেলে— এক চাষীর বোনের মেয়ের নাম কুফুরতি। সে বাবা-মাকে হারিয়ে মামা-মামীর কাছে থাকে। আকাশের চাঁদের সংগে তার ভালোবাসা জন্মায়। রোজ রাতে সে চন্দ্রমাদেবের সংগে গল্প করে এবং একদিন গর্ভবতী হয় ও পরে তার একটি ছেলে হয় ব্যাঙ রূপে। ব্যাঙ রূপী চন্দ্রকুমার এক রাজকুমারীকে বিয়ে করেও দেবতার অভিশাপ কেটে গিয়ে সে অন্যরূপ পায়।

(ঘ) অজগর সাপের গল্প— এক অচাইয়ের দুই মেয়ে। বনদেবী ওদের প্রার্থনা শুনে জুমে টংঘর বানিয়ে দেয়। একটা অজগরকে বেরিয়ে যেতে দেখে ওরা ভাবলো সেই টংঘর বানিয়েছে। অজগরকে বড়বোন স্বামী হিসেবে বরণ করে প্রতিজ্ঞানুসারে। অচাই ছোটবোনের সহায়তায় তাকে হত্যা করে। অজগরের মাথা যেখানে ফেলা হয়েছিল সেই ঝর্ণায় খুম্পুই ফুল জন্মালো। বড়বোন অজগরের সন্ধানে ঝর্ণার জলের তলায় তলিয়ে গেল। ছোটবোন রাজরানী হলেও অন্যরানীদের দুরভিসন্ধিতে দুঃখভোগ করে। তবে পরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখভোগ করে।

(ঙ) ছাতিম গাছের কাহিনী— ভাই বোনকে বিয়ে করতে চাইলে বোন রাজী হয় না। স্বপ্নে দেবতার আশীর্বাদে সে একটি ছাতিমের চারা এনে পুজো করে। গাছটি বড় হয়ে গেলে গানের সুরের সংগে.সংগে, মেয়েটি গাছের সাহায্যে আকাশে উঠে গেল।

(চ) **প্রতিজ্ঞা**— এক গেরস্ত বৌ আর গরু বৌ প্রতিজ্ঞা করে তাদের ছেলেমেয়ে হ'লে পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে দেবে। গেরস্তের মেয়েকে সবাই গরু বৌ বলে ক্ষেপায়। মনের দুঃখে মেয়েটি আত্মহত্যা করলে গরুটিও তাই করলো। উভয়েরই পুনর্জন্ম হ'ল। মেয়েটি রাজবাড়ীতে রাজকুমারী, ও গরুটি শ্বেতহস্তী রূপে জন্ম নিলো। একদিন শ্বেত হস্তী মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে গেলে রাঙিয়া ভুতুয়া দুভাই হাতিকে মেরে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। পরে রাক্ষসীকেও বধ করে তাঁরা। রাঙিয়ার সংগে রাজকুমারীর বিয়ে হয়, ভুতুয়া ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করে।

(ছ) **পুরোহিত**— এক বিধবার আলসে ছেলে জুমে আগুন দিলে নাগরাজার ছেলেপিলেরা মারা গেলে নাগরাজা ছেলেটির বাড়ীটাকে সাতপাকে জড়িয়ে রাখে। বুড়ো দেবতার পুজো দিয়ে সে নাগরাজার হাত থেকে মুক্তি পায়।

(জ) **রাজহাঁসের কাহিনী**— এক বিধবার ছেলে রাজার পোষা রাজহাঁস ধরে বাড়ীতে নিয়ে আসে। পাহারাদারেরা ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গেল। স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেয়ে মা 'ছাকলক' দেবীর পুজো করে। ছেলেটি মুক্তি পায়।

(২) পশুকাহিনী ঃ

(ক) **বিচার**— বিধবার জুমে শূয়োর ঢোকে ও ধান খায়। ব্যাঙ আর চামচিকেতে খুব ভাব। কিন্তু একদিন দুজনের মতান্তর হলে এ ওকে খেয়ে ফেলবে বলে ভয় দেখালো। চামচিকে ভয়ে ধনেশের নাকের ভেতর ঢুকে গেল। সে হ্যাঁচ্চু করে উঠলো। গাছের মগডালে থাকা বানরের হাতে থাকা ফলটা পড়লো হরিণের গায়ে। সে দৌড়ে পালাতে গিয়ে মুরগীর ডিম নষ্ট করে দিলো। মুরগী রেগে গিয়ে লাল পিঁপড়েদের বাসা নষ্ট করে দিলো। লাল পিঁপড়েরা রেগে কামড়ে দিল শূয়োরকে আর তখনই শূয়োর জুমের ধান খেয়ে ফেললো। বিধবা রাজার কাছে নালিশ করলে রাজা ব্যাঙকে দোষী সাব্যস্ত করে। তার কোমর ভেঙে দিল সেপাইরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে।

(খ) **মুরগীর পিঠে**— বিড়াল ও মুরগীতে খুব বন্ধুত্ব। পিঠে খাওয়া নিয়ে দুজনের মতানৈক্য। বিড়াল মুরগীকে ধ্বংস করতে চাইলে, সে নিজেই মারা গেল।

(গ) **সজারুর বুদ্ধি**— খুব বড় এক দাঁতাল হাতি। সে ঘোলা জল দেখে সজারুকে দায়ী করলো এজন্য। সজারু কাঁটা ছুঁড়ে হাতিকে ভয় পাইয়ে দিলো। ভয়ে হাতি পালিয়ে গেল সেই বন ছেড়ে।

(৩) মানুষ ও পশুকাহিনী ঃ

(ক) **বানরবর**— একটি বানর একদিন একটি মেয়েকে ছলনা করে বন্দী করে ও বিয়ে করে। পরে মেয়েটি সুযোগ বুঝে ছেলেকে নিয়ে পালায় ও বানরকে হত্যা করে।

(খ) **উইপোকা স্বামী**—জুমচাষীর দুই মেয়ের জন্য বর খুঁজে আনা হ'ল। ছোট মেয়েটি উইপোকাকে স্বামীরূপে বরণ করে পরে রাজরানী হয় ও বড় মেয়েটি অজগরের দ্বারা ভক্ষিত হয়।

(৪) ট্যাবু বা নিষিদ্ধ মূলক কাহিনী ঃ

(ক) কথা বলোনা— মা বাবা জুমে যাবার সময় মেয়েদের বারণ করে যায় কথা না বলার জন্য। মেয়েরা তা লঙ্ঘন করে ও রাজার লোকেরা তাঁদের নিয়ে যায়। দাসী করে রাখে। ওরা মনের দুঃখে মারা যায় ও পরজন্মে পাখি হয়ে জন্মায়।

(খ) স্বর্গের ফুল রাস্না— পথে যেতে যেতে এক যুবকের স্ত্রী বায়না ধরলো সে রাস্না ফুল চুলে পরবে। যুবক বারণ করলেও সে শোনে না। যুবক গাছ থেকে ফুল পেড়ে দিলে স্ত্রী তা মাথায় দেয়া মাত্রই যুবক হুলক্ হয়ে যায়। পরে স্ত্রীও মারা যায় ও 'গোধিকা' রূপে জন্মায়।

(৫) উর্বরাশক্তিমূলক ঃ

গুল্মকুমারী— এক যুবক জুম ক্ষেতে একটি গুল্ম কুড়িয়ে পায় ও গুল্ম তাঁর সংসারের কাজ করে দেয়। লেবু, লাউ, ল্যাটামাছ, নারকেল ইত্যাদিরূপে গুল্ম জন্মান্তর গ্রহণ করে। পরে গুল্মকুমারীকে যুবক বিয়ে করে।

(৬) নিষিদ্ধমূলক কাহিনী ঃ

কাঞ্চনমালা— নববিবাহিত স্ত্রী কাঞ্চনমালার স্বামীকে রাজার সৈন্যদলে যোগ দিতে হয় বিয়ের অব্যবহিত পরেই। কাঞ্চনমালার ভাসুর সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তবে কাঞ্চনমালা স্বামীর পথ চেয়েই দিন কাটায়।

(৭) সাংসারিক কাহিনী ঃ

ছিপিংতুই মাইরুংতুই— দুইবোন ছিপিংতুই আর মাইরুংতুই।

ছিপিং রানী হওয়াতে মাইরুং আর তার মা ঈর্ষান্বিত হয়ে মেয়ের গায়ে গরম জল ঢেলে দিল। ছিপিং-এর সাজে সেজে মাইরুং রাজবাড়ীতে গেল। হরিণের কাছ থেকে সবকিছু জেনে রাজা মাইরুংকে হত্যা করে ছিপিংকে রাজবাড়ীতে নিয়ে এলেন।

(ক) একফালি লাউয়ের গল্প— দুবোন। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে। ছোটবোন ধনী। বড়বোন গরীব। একদিন বড়বোন ছোটবোনের কাছে সাহায্য চাইলে ছোটবোন একফালি লাউ ও কিছু চাল দিয়েও পরে ফেরৎ নিয়ে নেয় ও বোনকে তাড়িয়ে দেয়। বড়বোন সেদ্ধ কচু থেকে অনেক সোনা পেয়ে ধনী হলে একদিন ছোটবোনের বাড়ী এসে কিছু না খেয়ে চলে যায়।

(৮) বোকাদের কাহিনী ঃ

ধনেশপাখির গল্প— কচাক রায় আলসে। তার বৌ সব কাজ করে। সে শুধু বাঁশী বাজায়। একদিন তাঁর দোষেই ভালুক তার ছেলেকে নিয়ে যায়। স্ত্রীর অভিশাপে স্বামী গনেশ পাখি হয়ে জন্ম নেয়।

(৯) হাস্যকৌতুকময় কাহিনী ঃ

একটি মাছির গল্প— এক যুবক বৌদিদের কথায় মাছির সাহায্যে চুউান, চুউানের বদলে মোরগ, গরু ইত্যাদির বিনিময়ে একটি যুবতীকে বিয়ে করে।

(১০) নিরাধার কাহিনী ঃ

সব কালাদের একঘর— রাজার লোকেরা দূরের পথে যাবার সময় জুমের ক্ষেতে এক মহিলাকে গাঁয়ের পথ জিজ্ঞেস করলো। সে ছিল কালা। এদের পরিবারের সবাই কালা ছিল বলে কেউ কারো কথা না বুঝে অহেতুক ঝগড়া করলো।

(১১) সুযোগ ও ভাগ্য ঃ

কথা বলা আংটি— এক বুড়ো তার দুই নাতিকে ঘর থেকে বের করে দিলে ক্ষুধায় কাতর হয়ে একভাই শকুনের ডিম খেয়ে শকুন হয়ে যায়। সে অন্য ভাইকে এক বিধবার জুম দেখিয়ে দিয়ে চলে যায়। অন্য ভাই বিধবার সঙ্গে থাকে। সে একটি আংটি পায়। আংটির সাহায্যে ওরা অনেক ধনী হয় ও গ্রামের চক্‌দ্রির মেয়েকে বিয়ে করে।

(১২) বিগ্রাছা— বহুদিন আগে বাঁশ ব্যাপারী বিগ্রাছা কুমীর বন্ধুর সাহায্যে তার ঠাকুমার কাছ থেকে ছিরংগতি পায় ও তার সাহায্যে ধনী হয়ে রাজকন্যাকে বিয়ে করে। কিন্তু রাজকন্যা ছিরংগতি নিয়ে পালিয়ে যায় একটি ঘোড়া সহ।। পরে বিগ্রাছা তার কুমীর, ভোঁদড় আর বিড়াল বন্ধুর সাহায্যে ছিরংগতি ফিরে পায় ও রাজামশাই তরবারি দিয়ে রাজকন্যা ও তার ঘোড়াকে কেটে ফেলেন।

নির্বাচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-তালিকা

অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা ঃ ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক চিকিৎসা; উপজাতি গবেষণাকেন্দ্র, আগরতলা, ১৯৯৫।

অরুন্ধতী রায় ঃ ত্রিপুরার লোক সাহিত্যের নানা শব্দচিত্র। প্রবন্ধ, 'গোমতী'— ত্রিপুরা সরকারের মাসিক পত্রিকা, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৯৬।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম ও ৪র্থ খণ্ড।

আশরাফ সিদ্দিকী ঃ লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৩।

আবদুল হাফিজ ঃ লোককাহিনীর দিক্‌দিগন্ত।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ ঃ জাতক, হরফ প্রকাশনী, ১৩৮৪।

উপজাতি গবেষণাধিকার ঃ ত্রিপুরার রূপকথা, আগরতলা, ১৯৮০।

ঋগ্বেদ সংহিতা ঃ হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৯৬।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ ঃ রাজমালা (অখণ্ড), বর্ণমালা প্রকাশনী, আগরতলা, ১৯৮৪।

কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত ও অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ধর্মদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৪।

কুমুদকুণ্ডু চৌধুরী ঃ কেরেঙ কথমা (১), আগরতলা, ১৯৯৪।

'গাণ্ডীব' ঃ বিশেষ লোকসংখ্যা (৭ম), কলিকাতা, ১৯৯০।

টম বটোমোর ঃ সমাজবিদ্যা-তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা।

তীর্থপতি দত্ত ঃ (সম্পাদনা) সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স, কলিকাতা, ১৯৮৪।

তুষার চট্টোপাধ্যায় ঃ লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপসন্ধান, কলিকাতা, ১৯৮৫।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার ঃ আদিবাসী লোককথা, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮২।

ডঃ দনীগোপাল চক্রবর্তী ঃ পূর্ব-দক্ষিণবঙ্গের লোককাহিনী।

পরিমল ভূষণ কর ঃ সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ, ১৯৭৪।

পল্লব সেনগুপ্ত ঃ লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি (সম্পাদনা), কলিকাতা, ১৯৮২।

পল্লব সেনগুপ্ত ঃ রেড ইণ্ডিয়ান রূপকথা, ১৯৮৪।

প্রদীপ দাশগুপ্ত ঃ ধর্মাধর্ম, কলিকাতা, ১৯৯৫।

বরুণ কুমার চক্রবর্তী ঃ লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার।

ডঃ মযহারুল ইসলাম ঃ ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, কলিকাতা, ১৯৮২।

মলয় বসু ঃ বাংলাসাহিত্যে রূপকথাচর্চা, ১৯৮০।

ডঃ রঞ্জিৎ দে ঃ ত্রিপুরার লোকজীবন ও লোক সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৮৬।

রেঃ লালবিহারী দে ঃ বাংলার উপকথা।

সুজিত চৌধুরী ঃ প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য, কলিকাতা, ১৯৯০।

সুশীল কুমার চক্রবর্তী ঃ (অনুবাদ) ধর্মদর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৭।

সুনীল চক্রবর্তী ঃ লোকায়ত বাংলা।

সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ঃ মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৮৬।

ডঃ সুধীর করণ ঃ লোকসাহিত্যে ঈশপ।

A. C. Bhattacharjee : Progressive Tripura, 1930.

Claude Levy Strauss : Treatise on Traditional Social Institutions of the tripuri Community, Agartala.

MACIVER & PAGE : SOCIETY, DELHI, 1987.

Prafulladatta Goswami : Essays on the Folkore abd culture of North-Eastern India, 1982.

Paul Manansala : The Naga Race, Calcutta, 1994.

Dr. Pradip nath Bhattacharjee : Jamatiya Folklore, A Sociological Study, Tribal Research Institute, 1195.

Dr. S. B. Saha : Tribes of North-East India, Agartala, 1987.

Suchintya Bhattacharjee : From Jhuming to Tapping, Directorate of Research, Deptt. of Welfare for sch. Tribes, Govt. of Tripura.

Sashi Bhusan Dasgupta : Aspect of Indian Religious Thought, Calcutta, 1957.

Walt Disney : Giant Book of Favourites

Walt Disney : Giant Book of Fairy Tales, 1985.